অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

বৰ্দ্ধমান

চৈত্র ১৩২১, এপ্রিল ১৯১৫

কার্য্য-বিবরণ • বৰ্দ্ধমানের পুরাকথা • ইতিহাস শাখা

১ম খণ্ড

ভূমিকা

অনিরুদ্ধ রায়

সম্পাদনা

গোপীকান্ত কোঙার

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট • কলকাতা-৭৩

ASTAM BANGIYA SAHITYA SAMMILAN VOL-I
Karjya Bibaran, Bardhamaner Purakatha, Itihas Shakha
Edited by Dr. Gopikanta Konar

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০০০

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ পি. দত্ত

লেজার কম্পোজ
গ্রন্থমিত্র
১বি, রাজা লেন
কলকাতা-৯

শ্রীকমল মিত্র কর্তৃক প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং নারায়ণ প্রিন্টিং
৩, মুক্তারামবাবু লেন. কলকাতা-৭ থেকে মুদ্রিত।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মরণে

এবং

বিশ শতকের শুরুতে বাংলার ইতিহাস ও

সংস্কৃতি চর্চায় যাঁরা পথ দেখিয়েছেন

তাঁদের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

সম্পাদকের অন্যান্য গ্রন্থসমূহ

- বর্ধমান জেলার মেলা ঃ সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা
- বর্ধমান সমগ্র, (১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ খণ্ড)
- বর্ধমান সমগ্র, (৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে)
- বর্ধমান জেলার পূজা-পার্বণ ও উৎসব
- বর্ধমান জেলার সাহিত্যিক অভিধান
- Bardhaman : Glimpses of Tourism
- বর্ধমান ঃ এক ঝলকে পর্যটন
- পত্র-পত্রিকা পরিচিতি ঃ বর্ধমান
- বর্দ্ধমান রাজবংশানুচরিত ও জাল প্রতাপচাঁদ মামলা

ভূমিকা

১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ শুরু হবার পর ১৩২১ সালে বর্ধমানের রাজা বিজয়চন্দ মহতাবের অনুরোধে ও উৎসাহে বর্ধমানে অষ্টম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে কার্য বিবরণী সমেত সম্মেলনের পঠিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। সম্পাদক এখানে কার্য বিবরণীর উপর লিখেছেন। সুতরাং এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। শুধু কয়েকটা কথা বলা যেতে পারে।

প্রায় এক বছর ধরে রাজা বিজয়চন্দ মহতাবের অকুণ্ঠ উৎসাহে ও বলা নিষ্প্রয়োজন, আর্থিক আনুকূল্যে অভ্যর্থনা সমিতি দপ্তর খুলে বেতনভোগী করণিক ও স্থানীয় ছাত্রদের সাহায্যে কাজ চালাতে থাকে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাড়াও প্রায় তিন হাজার চিঠি ও উত্তরের জন্য পোস্টকার্ড সমেত পাঠানো হয়। বর্তমানে ইন্টারনেটের সাহায্যে দেশ-বিদেশের সম্মেলনের সংবাদ পরিবেশন করা হয়। কিন্তু এ যুগের আগে এত বড় ব্যয়বহুল প্রচারাভিযান অন্তত বাংলায় দেখা যায়নি। সেদিক থেকে এটিকে পৃথক বলা যায়। এর একটা কারণ হয়ত হতে পারে, যার উল্লেখ কার্য বিবরণীতে নেই, যে এই পরিষদের কোনো স্থায়ী সদস্য ছিল না। তাহলেও এই বিশাল কর্মকাণ্ড অন্যান্য অধিবেশনে হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

কার্য বিবরণী থেকে জানা যায় যে ১৫ই এপ্রিল ১৯১৫ সালে তিন দিনের অধিবেশন শুরু হয়। মূল সভাপ্রাঙ্গণ তৈরি করা হয় রাজবাড়ীর সামনের মাঠে। এখানেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মূল সভাপতির অভিভাষণ দেন। এখানে বলা যেতে পারে যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মূল অভিভাষণ দেওয়া ছাড়াও সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন এবং ইতিহাস শাখায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। একই অধিবেশেন তিনটি জায়গায় তিন দিনের মধ্যে তিনটি বিষয়ে বক্তৃতা একজন পণ্ডিত দিচ্ছেন, এরকম বর্তমানকালে দেখা যায় না।

বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও ত্রিপুরা ও ভাগলপুর থেকে প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন যার সংখ্যা প্রায় এক হাজার। এঁদের সকলের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থার জন্য রাজা বিজয়চন্দ অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হননি। প্রতিনিধিদের মধ্যে বহু বিদ্বজ্জন ছিলেন, যাঁদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় মেঘনাদ সাহা, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যদুনাথ সরকার, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ।

তিন দিনের সম্মেলনের মধ্যে শেষ দুদিন প্রবন্ধ পাঠ করা হয় এবং তারপর আলোচনাও হয়। কার্য বিবরণীতে অবশ্য শাখার সভাপতির মন্তব্য ছাড়া আলোচনা

ছাপা হয়নি। অধিবেশন চারটি শাখায় ভাগ করা হয়—বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন। ইতিহাস শাখার সভাপতি ছিলেন যদুনাথ সরকার যখন তিনি পাটনা কলেজের লেকচারার। তাঁর বিখ্যাত বই 'আওরঙ্গজেব' কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে। শাখার অধিবেশনগুলি রাজবাড়ীর কাছাকাছি হয়েছিল। ইতিহাস শাখার অধিবেশন একটি বড় সামিয়ানার মধ্যে হয়, যদিও কার্য বিবরণীতে এটিকে তাঁবু বলা হচ্ছে। এই শাখায় ২৪টি প্রবন্ধ পাঠ করা হয় যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা এখানে করব।

প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির আলোচনার আগে ঐ সময়কার ইতিহাসের ধারার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই ইংরাজ আমলারা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য আওরঙ্গজেবের হিন্দু-বিরোধী মতাদর্শ ও কার্যকলাপকে দায়ী করেছেন। ঐ আকবরের হিন্দুনীতির প্রশংসা করা হয় ও হিন্দু-মুসলিম বিভাজন সামনে আসেনি। একই সঙ্গে বলা হতে থাকে যে মধ্যযুগ একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নৈরাজ্যের যুগ যেখান থেকে ইংরাজরা ভারতীয়দের উদ্ধার করে সব ভারতীয়কে সমানভাবে দেখেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জেমস্ মিল ভারতীয় যুগকে ধর্মের ভিত্তিতে বা সম্প্রাদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করেছেন—হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ। বলা নিষ্প্রয়োজন যে শেষোক্ত ভাগটি প্রধান হওয়া উচিত ছিল, যেটা করা হয়নি।

১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের শেষ দিক থেকেই ইংরাজ আমলাদের বহু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত চিঠিপত্র ও প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে তাঁরা বিদ্রোহের জন্য মুসলমানদের দায়ী করছেন যদিও সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা যাচ্ছে যে প্রায় এক লক্ষ বিদ্রোহী সিপাহীর মধ্যে প্রায় আশিভাগই ছিল হিন্দু। এদেব মধ্যে প্রধান অংশ ছিল উঁচুজাতের ব্রাহ্মণ ও রাজপুত। স্বভাবতই বিদ্রোহ দমনের পর ইংরাজদের অধীনে চাকুরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রাধান্য দেওয়া হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে কংগ্রেস পার্টি তৈরি হলে ইংরাজরা ভেদনীতির প্রয়োগ শুরু করে। যদুনাথ সরকারের 'আওরঙ্গজেবের ইতিহাস' পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হলে তাঁর হিন্দু-বিরোধী সত্তা ও কার্যকলাপের সমর্থন আসে। সাম্প্রতিক গবেষণায় (১৯৪৭ সালের পর) দেখা গিয়েছে যে যদুনাথ সরকারের তত্ত্ব ইতিহাসের সাক্ষ্যপ্রমাণে টেকে না। আকবর থেকে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত দেখা যায় যে হিন্দু মনসবদারদের সংখ্যা আওরঙ্গজেবের সময়েই সব থেকে বেশি ছিল। উনি শুধু রাজপুতদের বদলে মারাঠাদের মনসবদার করেছিলেন, প্রধানত মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষের জন্য যার মধ্যে ধর্ম বা সম্প্রদায়ের বড় কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু ১৯১৫ সালে এসব তথ্য বা যুক্তি পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ সংস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং কার্জন সাহেব পুরাতত্ত্ব আইনও পাশ করেছেন। কানিংহাম ও অনান্যরা পুরাতত্ত্বের নানা কাজ শুরু করেছেন যার বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কানিংহাম ও অনান্য প্রত্নতত্ত্ববিদদের লেখা ঐ সংস্থা বর্তমানে প্রকাশ করছে এবং উৎসাহী পাঠক সেগুলি দেখতে পারেন। কিন্তু ঐ সময়ে পুরাতত্ত্বের যে মতাদর্শ তৈরি হয়েছিল সেটি ১৯১৫ সালের কয়েকটি প্রবন্ধে দেখা যায় এবং দুঃখের বিষয় এখনো তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদরা ধর্মের ভিত্তিতে পুরাতত্ত্বকে ভাগ করেছেন—অর্থাৎ হিন্দু স্থাপত্য, বৌদ্ধ স্থাপত্য, মুসলিম স্থাপত্য ইত্যাদি। এমনকি কানিংহাম লক্ষ্মণাবতী ও গৌড় শহরের পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানের পর বলেন যে হিন্দু শহর লক্ষ্মণাবতীর উপর মুসলমান গৌড় চাপানো হয়েছে। এদের এই বিভাজনের নীতির ফলে, যার মধ্যে কার্জনের বঙ্গ বিভাজন উল্লেখযোগ্য, যদিও সেটি স্থায়ী হয়নি, ক্রমশ এই ধারণা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আসতে থাকে যে মুসলমানরা বাংলায় আসার ফলে (১২০৪ সালের শেষে বা ১২০৫ সালের প্রথম) হিন্দু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পরে কয়েকজন ইংরাজ ও ভারতীয় ঐতিহাসিক দেখাতে চেষ্টা করেন যে তথাকথিত মুসলমান স্থাপত্যের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাব ছিল। কিন্তু ১৯১৫ সালে এসব তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে হিন্দু সভ্যতা ধংস, যার মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করা প্রধান, এই অধিবেশনে লেখা প্রবন্ধের মধ্যে দেখা যায় যার সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। উল্লেখযোগ্য যে এই কার্য বিবরণীতে বলা হয়েছে অন্যান্য অধিবেশনের তুলনায় এই সম্মেলনে অনেক বেশি মুসলমান প্রতিনিধি এসেছিলেন। পঠিত প্রবন্ধের উপর তাঁদের বক্তব্য, অন্যান্যদের মতোই লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কিন্তু তাঁদের পঠিত কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে যার সম্পর্কে কিছু আলোচনা পরে করা যেতে পারে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে মুঘল আমলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কোনো ইতিহাস নেই। বরং ইংরাজ আমলে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলায় এই ধরনের দাঙ্গার বহু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এই সঙ্গে এটাও বলা দরকার যে মুঘল আমলের উচ্চ সাংস্কৃতিক ও স্থাপত্যের প্রচুর নমুনা আছে। ভারতীয় ঐতিহাসিক ও কিছু ইংরাজ লেখক এ সম্বন্ধে প্রচুর আলোকপাত করেছেন। যেটা ইংরাজরা করেনি ও প্রথমদিকে বাঙালী ঐতিহাসিকরা উদাসীন ছিলেন সেটি হচ্ছে বহু মুসলমান জমিদার বাংলা সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দেওয়া ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাও বাংলা ভাষায় লিখেছেন। কিন্তু আবারও বলা যায় যে ১৯১৫ সালে এগুলি খুব পরিষ্কার হয়নি।

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের আর একটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং যেটি বর্তমানকালের অধিবেশনে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। এটি হচ্ছে অধিবেশনের আগে

একটি দল তৈরি করে বর্ধমানের পুরাকীর্তির বিষয় অনুসন্ধান করা ও অধিবেশনের আগে এর কার্য বিবরণী প্রকাশ করা। বলা বাহুল্য তখনো পর্যন্ত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সংস্থা বড় বড় প্রাচীন শহর ও নামকরা ধ্বংসস্তূপগুলির উপর অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এই ধরনের কাজ যেটি এই দলটি মাত্র দশদিনের মধ্যে করেছে ও ফলাফল প্রকাশ করেছে, সে ধরনের কাজ তারা তখনো করেনি। এখনও করছে না। ঐ দিক থেকে দেখলে অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধগুলির থেকেও এই কাজটি আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। যদিও কোনো কোনো বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই।

প্রথমেই বর্ধমানের অস্তিত্ব ও নামকরণ নিয়ে নগেন্দ্রনাথ বসু একটি অসাধারণ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি ও গ্রিক-রোমান ভৌগোলিক ও অন্যান্যদের রচনা থেকে প্রাক্ সুলতানি যুগে বর্ধমান বিভাগের ভৌগোলিক চেহারা বের করার চেষ্টা করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ওঁর বক্তব্য প্রমাণযোগ্য করার জন্য উনি বিভিন্ন পুঁথি ও অনান্য লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রমাণ-এর উপর নির্ভরশীল প্রবাদ বাক্যের উপর নয়। গ্রিক-রোমান ভৌগোলিকদের 'গঙ্গারিডি' রাজ্যের অবস্থান উনি ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে রাঢ়ের মধ্যে রেখেছেন। এটি নিয়ে পরবর্তীকালে বির্তকের সৃষ্টি হয়। নিম্নবঙ্গে যে এর রাজধানী ছিল এটি বলা হলেও কোথায় ছিল এটি স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়নি। একটা সমস্যা রয়েছে যার উল্লেখ নগেন্দ্রনাথ বসু করেননি। ভাগীরথী বহুবার নিম্নবঙ্গে তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে সেটির উল্লেখ বিশেষ নেই। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে নীহাররঞ্জন রায় এই গতিপথ পরিবর্তনের ইতিহাস ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন জৈন গ্রন্থ থেকে নগেন্দ্রনাথ বসু দেখাচ্ছেন যে বজ্জভূমি ও সুহ্মভূমি দুটি আলাদা দেশ বলে উল্লেখ থাকলেও প্রধানত পুরাণের সাহায্যে এই দুটি মিলিয়ে বর্ধমান। সুহ্মকে উনি রাঢ়ের সঙ্গে একাত্মক বলে ধরেছেন মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের বক্তব্য অনুযায়ী। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষ আলোচিত হয়নি। এখানে নগেন্দ্রনাথ বসু পরিষ্কারভাবে দেখাতে সমর্থ হয়েছেন যে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আগেই বর্ধমান প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। গ্রিক ও রোমান লেখনীর সাহায্যে বর্ধমানের রাজধানীর অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। ওঁদের লেখায় Portalis বলে যে শহরের নাম পাওয়া যায় দ্বিগ্বিজয় প্রবন্ধে উল্লিখিত "পরতাল" একই, এক ফরাসি পণ্ডিতের (St. Martin) কথামত একেই বর্ধমান বলে বসু অভিহিত করেছেন যদিও বিশেষ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। উনি অবশ্য বলেছেন যে আরো অনুসন্ধান আবশ্যক যদিও সেটি আর করা যায়নি। পাশ্চাত্য লেখকদের লেখায় গঙ্গে ও কাটাদীপা নামে যে দুটি জায়গার উল্লেখ আছে সেগুলির স্থান নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়নি। ধর্ম সম্পর্কে উনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীব মত মেনেছেন যে ধর্মপূজাই বৌদ্ধ ধর্ম।

পরবর্তী লেখক রাখালরাজ রায় বর্তমান বর্ধমান নিয়ে লিখেছেন, যার মধ্যে উনি ঐ সময়কার বর্ধমানের বিভিন্ন স্থানের মন্দির, মসজিদ ও কোনো কোনো গ্রাম মধ্যযুগের ও পরবর্তীকালের বিখ্যাত লোকেদের জন্মস্থানের বৃত্তান্ত দিয়েছেন। এ ছাড়াও শের-আফগানের মৃত্যু নিয়ে ঐ সময়কার প্রচলিত ধারণা যে জাহাঙ্গীর শের আফগানের স্ত্রীকে বিবাহ করার জন্য তাঁর মৃত্যু ঘটান। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে লেখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত *History of Bengal*-এ এটি সমর্থিত হয়েছে। কিন্তু এরপরে প্রয়াত অধ্যাপক মহিরুল হাসান একটি প্রবন্ধে এটিকে নেহাৎই প্রবাদ বলে ধরেছেন। ঘটনার সময় জাহাঙ্গীর কাবুলে ছিলেন। তাছাড়া বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে ভুল বোঝাবুঝির ফলে শের আফগানের মৃত্যু হয়েছিল।

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই দলে ছিলেন। তিনি উজানি ও মঙ্গলকোট পরিদর্শন করেন ও ওঁর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, যেটি বহু পরে আবার একটি সংকলনে বর্তমান সম্পাদক প্রকাশ করেছেন। অল্প সময়ের জন্য পরিদর্শন করলেও রাখালবাবু ঐ দুই শহরের অবস্থান, কুনুর নদীর প্রকৃতি, বিভিন্ন স্থানের মন্দির ও মসজিদ ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। বহু বাড়ির বা মন্দিরের সঠিক মাপও দিয়েছেন। দুটি বিষয় উল্লেখ করা যায়—উনি বলেছেন, উজানি নগরে বহু বণিক বাস করত ও তারা বাণিজ্যপোত নিয়ে সমুদ্রে যেত। এই উজানির গৌরব স্থায়ী ছিল গৌড়ের সমৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত। উনি বলছেন যে গৌড়ের পতনের পর (১৫৬৫ সাল নাগাদ রাজধানী গৌড় থেকে আরো পশ্চিমে তাণ্ডায় চলে যায়) উজানির পতন হয়। কিন্তু ঐ দুই শহরের মধ্যে কোথায় যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিল এ সম্বন্ধে রাখালদাসবাবু কিছু বলেননি। এছাড়া ষষ্ঠদশ শতকের শেষের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী উজানি নগরে বণিক ধনপতি দত্ত ও শ্রীমন্ত দত্তের বাসভবন ছিল বলেছেন। সুতরাং বলা যায় যে ১৫৬৫ সালের পরও উজানি গ্রাম ছিল। অবশ্য এটা মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে মুকুন্দরাম ১৫৬৫ সালের আগের গৌড়ের বর্ণনা দিচ্ছেন।

আর একটি বিষয় হল যে রাখালদাসবাবু ধনপতি ও শ্রীমন্তর বাসভবন বলে যেটির কথা বলেছেন সেটি জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে ওনার লোচনদাসের (বৈষ্ণব কবি) কোগ্রামে পাটের বিবরণ অনেক বেশি ইতিহাস-নির্ভর। মাঝে মাঝে যে ভাঙা মন্দির আছে সেগুলি মুসলমানরা ভেঙেছে বলে বলা হচ্ছে তার কোনো প্রমাণ নেই। ভাঙা মসজিদও পাওয়া গিয়েছে কিন্তু সেগুলি হিন্দুরা ভেঙেছে বলে বলা হয়নি। আমরা পরে আবার এই আলোচনায় ফিরব।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উজানির ভ্রমরার ঘাট জায়গাটি স্থির করেছেন। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য থেকে তার উদাহরণও দিয়েছেন। এটি অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলে ছিল। এখানেই ব্যাপারীদের নৌকা জলে ডোবানো থাকত ও যাবার আগে তুলে নেওয়া

হত বলে তৎকালীন সাহিত্যে বলা হচ্ছে। অজয়ের গতি পরিবর্তন হবার ফলে আশেপাশের বাড়ীগুলি নদীর গর্ভে চলে গিয়েছে। উজানি দেখার পর ওঁরা মঙ্গলকোটে যান যেখানে মৌলভী মুহম্মদ ইসমাইল সাহেব ওঁদেরকে দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়ে প্রাচীন কাহিনী বিবৃত করেন। উল্লেখযোগ্য যে রাখালদাস বাবু এগুলিকে ইতিহাস বলেননি, কাহিনী বলেছেন।

মঙ্গলকোটের বর্ণনায় রাখালদাস বাবু শুধু দর্শনীয় স্থান ও প্রাচীন কাহিনীগুলির বর্ণনা করেননি, প্রত্নতত্ত্ববিদের মত ভগ্ন খোদিত শিলালিপির পাঠ (অনুবাদ) দিয়েছেন। এখানে উঁচুডাঙার বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজার প্রাসাদ ও গড় (নাম মঙ্গলকোট) ছিল তার আয়তন কত ছিল ধরার চেষ্টা করেছেন। ওঁর মতে প্রায় দুশ বিঘা জুড়ে প্রাসাদ। সম্ভবত এর মধ্যে ছিল আস্তাবল। সৈন্যদের থাকার ব্যবস্থা। কর্মচারীদের বাড়ী। রাখালদাসবাবুর সময়ে মাত্র পঁচিশ বিঘা জমি পড়ে যার নীচে ভগ্নস্তূপ। উনি এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন করার কথা বলেছেন। এখান থেকে মাঝে মাঝে সোনার টুকরো ও মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে বলে উনি শুনেছেন। সমস্যা হচ্ছে বিক্রমাদিত্য নামে কোনো রাজার নাম সাহিত্যে দু-একটি উল্লেখ ছাড়া পাওয়া যায় না। যে ভগ্ন শিলালিপিগুলি পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে চন্দ্রসেন নামে একজনের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিহাসে এর নাম নেই। এটা হতে পারে যে উনি সেন বংশের কোনো আত্মীয় ছিলেন। এই শিলালিপির লেখনী রাখালদাস বাবুর কাছে মনে হয়েছে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন সৌধের বর্ণনা, তার জমি, সৌধের স্থাপত্য বিন্যাস রাখালদাস বাবু নিপুণতার সঙ্গে করেছেন। একটা পুকুর থেকে মাটির নীচের নালী দিয়ে পাশে হাম্মামে পড়ত বলে উনি বলেছেন। কিন্তু ঐ হাম্মামের কোনো চিহ্ন এখন নেই—বাড়িটির ভগ্নাবশেষ আছে যার থেকে ওটি হাম্মাম ছিল কিনা বলা শক্ত। কিন্তু অনেকখানি অনুমান হলেও এই ভাবে গ্রামের মধ্যে ঘুরে ঘুরে এগুলি লিপিবদ্ধ করার যে কাজ আর পরে করা হয়নি।

অম্বিকা ব্রহ্মচারী শূরনগরের যে ইতিহাস দিয়েছেন সেটি প্রবাদের উপর ভিত্তি করে করা। ইতিহাসের উপাদান খোঁজার চেষ্টাও হয়নি। বিরাট ভগ্নস্তূপ, কয়েকটা বড় দীঘি ও ভাঙা মন্দির (মুসলমানরা ভেঙেছিল বলা হচ্ছে) থেকে বলা হচ্ছে যে এটি রাজা আদিশূরের রাজধানী ছিল। এক নাম ছাড়া আর কোনো উপাদান পাওয়া যায়নি। নামটিও কবে থেকে চালু হয়েছিল সেটাও খোঁজ করে দেখা হয়নি।

অন্যদিকে নগেন্দ্রনাথ বসুর স্থান পরিচয় অনেক উন্নতমানের লেখা। প্রাচীন পাশ্চাত্য লেখক আরিয়ানের লেখায় 'কাঁটাদুপাকে' কাটোয়া বলা হচ্ছে যেটি ছিল অজয় ও গঙ্গা নদীর মোহনায়। আরিয়ানের লেখা থেকে মনে হয় যে উনি একটি দ্বীপের কথা বলছেন যার সঙ্গে বর্তমান কাটোয়া মেলে না। কিন্তু আরিয়ানের কালে

নদীর গতিপথ কিছু ভিন্ন হওয়ায় এটা দ্বীপের চেহারা নিতে পারে। বসু মহাশয় বলছেন যে সামুদ্রিক জাহাজ এখানে আসত। আদি গঙ্গার জল বেশি থাকায় সেটাও সম্ভব। যদিও এর কোনো প্রমাণ নেই। রাখালদাসবাবু উজানির উত্থান পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (গৌড়ের উত্থানের সময়কালের সঙ্গে মেশালে) ধরেছেন। তার আগে কাটোয়া বন্দর হিসাবে থাকতে পারে। সম্ভবত এর পরে কাটোয়া আর বন্দর থাকে না। নীহাররঞ্জন রায় দেখাচ্ছেন যে অষ্টম শতাব্দীর পর গঙ্গা তাম্রলিপ্ত ছেড়ে পূর্বে সরে আসতে থাকে আদি গঙ্গার পথ ধরে। তাহলে কাটোয়ার উত্থান এর পরেই হয়েছিল এবং চতুর্দশ শতাব্দীর পর থেকে ধীরে ধীরে বন্দরের অবলুপ্তি হতে থাকে। অজয়ের জল ঐ সময় বাড়ায় উজানির উত্থান সম্ভাবপর হয়।

কিন্তু কাটোয়ার পুরানো বাণিজ্য প্রথা চলছিল বলে মনে হয় এবং ওখানে বহু ব্যাপারী থাকতে পারে যার ফলে চৈতন্যদেবের আগমন হয়। অবশ্য গৌরাঙ্গ বাড়ির সম্মুখভাগ বলে যে ছবিটা (প্রথম চিত্র) দেওয়া হয়েছে সেটি ঊনবিংশ শতাব্দীর তৈরি। অন্যান্য দেশের মতো বাকী স্থান মাহাত্ম্যও প্রবাদের উপর নির্ভরশীল যা নবদ্বীপেও দেখা যায়। কাটোয়া ও পাশে দাইঘাটার মধ্যে মধ্যযুগের ইন্দ্রাণী পরগণা ছিল এটা বসুমশায় বলেছেন। আরও অনেকগুলি স্থান বিবরণ আছে যার মধ্যে দেবগ্রাম দশম শতাব্দী থেকেই শিলালিপিতে পাওয়া যায়, যার উল্লেখ লেখক করেছেন। এই সঙ্গে নদীর স্রোত কোথায় ছিল এবং এখন কতদূরে আছে তার কথাও বলেছেন। এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে মুসলমানদের ধ্বংসলীলার ফলে গ্রামগুলি নষ্ট হয়েছে তা সব জায়গায় হয়ত ঠিক নয়। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন নিশ্চয়ই কারণ হিসাবে ছিল কিন্তু ভৌগোলিক কারণ একটা বড় উপাদান। দুর্ভাগ্যবশত তার ইতিহাস রচিত হয়নি কয়েকজনের লেখা ছাড়া।

যদিও আমরা ইতিহাস শাখায় পেশ করা ও প্রকাশিত প্রবন্ধের উপর মন্তব্য করছি, কিন্তু সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষণের উপর কয়েকটি মন্তব্য বা মতামত দেওয়া যেতে পারে। এগুলি বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখার বিরোধিতা করা নয়। এটা দেখানো যে ঐ সময়ে ইতিহাস বলতে কী বোঝাতো ও ইতিহাসের তথ্য তখন কতটা জানা ছিল। স্থানাভাবে ওঁর বিরাট ভাষণের কয়েকটি খণ্ডিত অংশের উপর আলোচনা করা যেতে পারে।

বাংলা, মগধ ও চের দেশে বৈদিক ধর্মনীতি ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধর্মমত ছিল যেগুলি বৈদিক ধর্মমত থেকে ভিন্ন। বৈদিক সাহিত্যে চারটি আশ্রমের কথা বলা হয়েছে, যার শেষেরটি হচ্ছে ভিক্ষা ধর্ম। গৃহস্থ ভিক্ষা করে দিন কাটাবেন। কিন্তু বৈরাগ্যর কথা কোথাও নেই যেখানে অন্য ধর্মমত প্রথম থেকেই গৃহস্থ ধর্ম ত্যাগ করার উপদেশ

দিচ্ছে। পরবর্তীকালে শশীভূষণ দাশগুপ্ত যে অসাধারণ কাজটি করেছেন অনান্য ধর্মমত সম্পর্কে তাঁর মতের সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতের বিশেষ তফাৎ নেই।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর ভাষণের সবটাই "বাংলার গৌরব" ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্যে তিনি বাংলার রেশম উৎপাদন এনেছেন 'অর্থশাস্ত্রের' উল্লেখ থেকে। কিন্তু ওর মধ্যে পৌণ্ড্র ছাড়াও অন্য জায়গার যে উল্লেখ আছে তাকে উনি উত্তরবঙ্গ ধরেছেন। কিন্তু চীনদেশে রেশমের ও তুঁত গাছের চাষ হত। বাংলাতে পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে তুঁত গাছের চাষ করার উল্লেখ নেই। বাংলাতে যে রেশম হত সেই দুটি বন্য জাতীয়—তসর ও এড়ি। আসামে ছিল মুগা ও চম্পা যার বিস্তৃত বিবরণ আছে। পারস্যে তুঁতগাছ থেকে রেশম করার পদ্ধতি একাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এসে গিয়েছিল। বংলায় এত পরে কেন এল সেটা একটু আশ্চর্যের বিষয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার রেশম তৈরি বিরাট অবস্থায় পৌঁছে যায়। সুতরাং বলা যায় যে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চীনা প্রতিনিধি মা-হুয়ান যে রেশমের কথা বলছেন সেটা প্রাচীন বাংলার রেশম নয়, চীনা রেশম।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আর এক জায়গায় সেকালে বাকল পরার কথা বলেছেন যার চিত্র উনি সাঁচীর পাঁচিলের গায়ে দেখেছেন। এই সঙ্গে বলেছেন যে বাকল থেকে সুতো বের করে কাপড় তৈরি হত ও শন, পাট ইত্যাদি দড়ি তৈরি হত। প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে রানিরা পট্টবস্ত্র পরছেন এর উল্লেখ আছে। সাম্প্রতিককালে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধে দেখাচ্ছেন যে এই পট্টবস্ত্র বর্তমানকালের পাট নয়। এটি তখনকার কালের দামী কাপড়। অবশ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ব্যবহার করে বাংলায় উৎকৃষ্ট বাকলের কাপড় তৈরির কথা বলেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলায় তৈরি নৌকা ও জাহাজের কথা বলেছেন। ভারতে জাহাজ তৈরি হত এ নিয়ে সন্দেহ নেই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে মার্কো পোলোর ও পরবর্তী শতাব্দীতে ইবন বতুতার বর্ণনায় ভারতে তৈরি জাহাজেয় উল্লেখ আছে যার মধ্যে একটা হাল, একটি মাস্তুল ও একটি পাল ছিল। কিন্তু বিজয় সিংহ যে জাহাজে করে লাঙ্কাদ্বীপে যান, সেটি যে বাংলাতে তৈরি হয়েছিল এর কোনো প্রমাণ নেই। অজন্তার চিত্রে জাহাজের ছবি প্রমাণ করে না যে ওটি বাংলায় তৈরি হয়েছিল। আংকরভাটে যে জাহাজের ছবি আছে সেটি দক্ষিণ ভারতের ক্লিং গোষ্ঠীর বণিকদের জাহাজ বলা হচ্ছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চীনা প্রতিনিধি বাংলায় বণিকদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের কথা বলেছেন, কিন্তু সেগুলি কোথায় তৈরি বলেননি। ষষ্ঠদশ শতকের শেষে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বাংলার জাহাজ তৈরির বর্ণনা দিয়েছেন, সেটি মাঝারি মাপের জাহাজ, একশ টনের নীচে। তবে মধ্যযুগে প্রথম দিকে ভারতীয় জাহাজের 'ডেক' না থাকায় প্রচুর লোক ভিতরে থাকতে পারত। ইবন বতুতা যে জাহাজে এসেছিলেন সেটাতে সাতশ

লোক ছিল। কিন্তু এটা আরব 'ধাও'। বাংলাতে ঐ ধরনের বড় জাহাজ তৈরি করার প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। ফাহিয়ান তাম্রলিপ্ত থেকে চীনদেশে জাহাজে যান। কিন্তু ঐ জাহাজ যে বাংলা দেশে তৈরি এটা বলেননি। মঙ্গলকাব্যের সময়েই বাংলায় তৈরি মাঝারি জাহাজ বা বড় নৌকার কথা পাওয়া যায় যেগুলি উপকূল ঘেঁসে যেত। সুতরাং বাংলার গৌরব বললে এখানে মধ্যযুগকে বোঝায় যে যুগ সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিশেষ কিছু বলেননি।

আরও একটি দুটি মন্তব্য করে আমরা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিভাষণ শেষ করব। পঞ্চদশ গৌরব বলতে গিয়ে বলেছেন যে মুসলমানরা আফগান দেশ থেকে এসে প্রতিটি বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করে। অত্যাচারিত লোকেরা, অর্থাৎ হিন্দু ও বৌদ্ধরা নেপাল ও তিব্বতে পালায়। কুলজী গ্রন্থগুলি থেকে এই দুর্দশার কথা জানা যায়। আবার হিন্দুধর্ম জেগে ওঠে রাজা গণেশের আমলে যখন বৃহস্পতি ও অনান্য পণ্ডিতরা আবার সংস্কৃত চর্চা শুরু করেন। বর্তমানকালের গবেষণায় এগুলি মেনে নেওয়া শক্ত যদিও বলা প্রয়োজন যে ১৯১৫ সালে ঐ ধরনের ধারণা হিন্দুদের মধ্যে ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় ইখতিয়ারউদ্দীন বখতিয়ার খলজীর আগমন ও কার্যকলাপ এবং তার পরবর্তী প্রায় চল্লিশ বছরের ইতিহাস মীনহাজ-আস সিরাজ তাঁর গ্রন্থ *তবাকৎ-ই নাসিরী*-তে যার ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়। মীনহাজ নিজে বাংলাতে এসেছিলেন ১২৪৫ সাল নাগাদ (লেখা ১২৬০ সাল নাগাদ) ও বখতিয়ারের দুজন সৈনিকের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনেছিলেন। তিনি প্রথম যুগের আফগান শাসনে লক্ষ্মণাবতীর গরিমার বর্ণনা দিয়েছেন, যার কিছুই এখন আর পাওয়া যায় না।

মীনহাজ-এর গ্রন্থে মুসলমান দ্বারা ওদন্তপুরী বিহার ধ্বংসের বিবরণ আছে। কেল্লার মতো দেখতে এই বিহার রক্ষার্থে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যুদ্ধও করেছিলেন। 'হাজার হাজার' ভিক্ষু ওখানে ছিলেন এরকম কথা কোনো সমকালীন সূত্রে পাওয়া যায় না। এছাড়াও 'প্রতিটি বিহার' ধ্বংস করা হয়েছিল এরকম কোনো প্রমাণ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। আফগানদের তৈরি লক্ষ্মণাবতী কোনো সৌধ এখন আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু বলা যাবে না যে হিন্দুরা বা বৌদ্ধরা সেগুলি ধ্বংস করেছিল। যার ধ্বংসাবশেষও পাওয়া যায়নি। অন্য জায়গায় আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে লক্ষ্মণাবতীর অধিকাংশই গঙ্গার পথ পরিবর্তনের ফলে নদীর গর্ভে চলে গিয়েছে। আসলে আফগানরা যখন বাংলায় আসে তখন বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি হয়েছে। সেন রাজারা বৌদ্ধ বিরোধী না হলেও প্রধানত হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলে পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধ বিহারগুলি যে রকম রাজ আনুকূল্য পেয়েছিল সেটা তার প্রায় একশ বছর পরে আর ছিল না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছাড়াও সমকালীন ও পরবর্তীকালের কিছু লেখক বলেছেন যে হিন্দু ও বৌদ্ধরা তাদের পুঁথি নিয়ে তিব্বত ও নেপালে চলে গিয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিলেন ও ঐ বংশ আরো প্রায় একশ বছর ওখানে রাজত্ব করেছিলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে ওদের প্রচুর তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। মুসলমানদের হাতে পূর্ববঙ্গ আসে নদীয়া বিজয়ের প্রায় একশ বছর পরে। এমনকি ভাগীরথীর তীরে সপ্তগ্রাম দখল করতে মুসলমানদের ৯৫ বছর লেগে যায়। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে নদীয়ার ব্রাহ্মণ ও বণিকরা বক্তিয়ার আসার আগেই চলে গিয়েছিল যার উল্লেখ মীনহাজ করেছেন। এটা অনুমান করা কঠিন নয় যে তাঁরা পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গে যাওয়া ছিল তিব্বত ও নেপালে যাওয়ার থেকে অনেক সহজ। তিব্বত ও নেপালে সংস্কৃত পুঁথি যে এই সময়ে এসেছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও আরো কয়েকজন এই অধিবেশনে কুলজী গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন। যদুনাথ সরকার ও পরবর্তীকালে দীনেশ চন্দ্র সরকার (কুলজী গ্রন্থের উপর ওঁর একটি বই আছে) বলেছেন কুলজী গ্রন্থগুলি পরবর্তীকালের রচনা ও নির্ভরযোগ্য নয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে, "রাজা গণেশের" আমলে বৃহস্পতি মিশ্র ও তার শিষ্য সহযোগীদের উত্থানের ফলে সংস্কৃত সাহিত্য আবার জেগে উঠে। ভাদুড়িয়ার জমিদার গণেশ (মুসলমান ঐতিহাসিকরা 'কানস' বলে অভিহিত করেছেন) আনুষ্ঠানিকভাবে রাজা হয়েছিলেন কিনা এ নিয়ে বিতর্ক আছে। যদুনাথ সরকার তাঁর *বাংলার ইতিহাস* গ্রন্থের সম্পাদনায় এটি মেনেছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত গণেশের নামাঙ্কিত কোনো মুদ্রা পাওয়া যায়নি। কিছুকাল আগে সুখময় মুখোপাধ্যায় ও সাম্প্রতিককালে এজাজ হোসেন এ নিয়ে লিখে মত দিয়েছেন যে গণেশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন (নিহত সুলতানের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেছিলেন)। সাম্প্রতিককালে নূর কুতুব আলম ও অনান্য দরবেশদের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে গণেশের অভ্যুত্থানের আগেই হিন্দু অভিজাতরা রাজদরবারে ক্ষমতায় এসেছিলেন। এটাও বলা হচ্ছে যে গণেশকে ক্ষমতায় আনানোর পিছনে মুসলমান অভিজাতদের বড় একটা অংশের সমর্থন ছিল। সুতরাং গণেশের উত্থানকে শুধু হিন্দু-শক্তির উত্থান হিসাবে দেখা ঠিক হবে না। পরবর্তীকালে ফিরিস্তা বলেছেন যে গণেশের মৃত্যুর পর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় ওঁকে নিজেদের সম্প্রদায়ের লোক বলে দাবি করেছিল।

বৃহস্পতি মিশ্রের আনুষ্ঠানিক উত্থান (রায়মুকুট উপাধি লাভ ইত্যাদি) হয় গণেশের ছেলে যদুর আমলের প্রথম দিকে। যদু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে রাজা হন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে মুসলমানরা সংস্কৃত বিরোধী ছিল ও তারা প্রচুর গ্রন্থ ধ্বংস করেছে। যদিও তার কোনো প্রমাণ দেননি। নবদ্বীপে মুসলমান কাজী ও কোতোয়াল থাকলেও ওখানে সংস্কৃত চর্চা চলতে থাকে যার কথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন। আসলে বাংলা

ভাষায় লেখা শুরু হয়ে গিয়েছিল, যেগুলি আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে পাই। বিপ্রদাস পিপলাই (পঞ্চদশ শতকের শেষ) মুসলমানদের মন্দির ধ্বংস করার কথা বললেও সপ্তগ্রামে বহু মন্দির ছিল বলেছেন ও সেখানে শঙ্খ ঘণ্টা সহকারে পুজো হচ্ছে এ কথাও বলেছেন। ষষ্ঠদশ শতকের শেষেও সপ্তগ্রামে এ ব্যবস্থা চলছিল সেটা আমরা সমকালীন এক ফরাসি পরিব্রাজক (Vincent Le Blanc)-এর বর্ণনায় পাই যিনি সপ্তগ্রামে গিয়েছিলেন। বিপ্রদাসের কয়েক বছর আগে বিজয়গুপ্ত রাখালদের সঙ্গে কাজীর বিরোধের কথা বলেছেন। কিন্তু বিজয় গুপ্ত সুলতান ফতে শাহর প্রশংসা করেছেন—"সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি, নিজ বাহুবলে রাজা জিনিল পৃথিবী।" এরা শাসনযন্ত্র ও কাজী ও মোল্লাদের মধ্যে একটা তফাৎ করেছেন যেটা উত্তর ভারতেও দেখা যায়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে বাংলা ভাষায় লেখা জনপ্রিয় হতে শুরু করলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা কমতে থাকে কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। মুসলমান অভিজাতরাও বাংলা ভাষায় লেখাকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং কেউ কেউ এই ভাষায় লিখেছেন। পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় চীনা দূতরা পাণ্ডুয়ার রাজসভায় গিয়েছিলেন। ওঁরা বলছেন যে রাজদরবারে সব কাজ বাংলা ভাষাতে হচ্ছে। শুধু কয়েকজন অভিজাত বাড়িতে ফার্সি ভাষায় কথা বলেন। এটাও মনে রাখতে হবে যে কোনো মুসলমান শাসক হিন্দুদের জাতপ্রথার মধ্যে হস্তক্ষেপ করেনি। সুতরাং জোর করে সবাইকে মুসলমান করা হয়েছিল এরকম মনে করার কারণ নেই, প্রমাণও নেই। ঐদিক থেকে দেখলে বলতে হয় যে জোর করে বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব করা হয়েছিল। সেটাও যেমন জানা যায় না, তেমনি অন্যটাও প্রমাণাভাবে মানা কঠিন। জোর করে মুসলমান করার কয়েকটি উদাহরণ বিরল নয়। আসলে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য নীচুজাতের ও নীচু শ্রেণীর লোকদের কাছে খুব সুখকর ছিল বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালে কুলিন প্রথায় ঐ ধরনের আধিপত্য ও অত্যাচারের আভাষ পাওয়া যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর অভিভাষণের শেষদিকে বলেছেন যে মুসলমানদের উপরে রাগ ছিল ও মুঘলরা এসে কায়স্থদের জমিদারি কেড়ে নিয়ে ব্রাহ্মণ ও বিদেশীদের দেন। ইতিহাসে অবশ্য এ পাঠ মেলে না। আদি মধ্যযুগ থেকেই ব্রাহ্মণরা নিষ্কর জমি ভোগ করা ছাড়াও জমিদার ছিলেন এরকম দৃষ্টান্ত আছে। দু-একজন কায়স্থের নানা কারণে জমিদারি চলে গেলেও রাজকার্য থেকে বিতাড়িত হয়নি। ষষ্ঠদশ শতকের শেষে মুকুন্দরামের লেখায় কায়স্থদের যে প্রভাব ছিল তার আভাষ স্পষ্ট। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন যে "লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে"। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নবাব শায়েস্তা খানের রাজদরবারে এক ইংরাজ পর্যটক (S. Morter) কর্মচারীদের যে নামের তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে কায়স্থ আছে। বিদেশী বলতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাদের বলেছেন তারা উত্তর ভারতের ক্ষত্রি।

বর্ধমানের রাজা বিজয়চন্দ মহতাবের পূর্বপুরুষ ক্ষত্রি ছিলেন এবং মুঘল অভিযানের সময়ে সাহায্য করার জন্য জমিদারি পান বলে বলা হয়। এদের সংখ্যা অবশ্য বেশি ছিল না।

বলা প্রয়োজন যে বিখ্যাত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমরা বলছি না। ঐ সময়ে ওঁর কাছে যে ইতিহাসের তথ্য ও মানসিকতার আবরণ ছিল উনি তার ভিত্তিতেই লিখেছেন। আমরা শুধু দেখাতে চেষ্টা করেছি যে পরবর্তীকালের ইতিহাস ঐ যুগ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে নূতন তথ্য ও নূতন মানসিকতার উন্মেষের ফলে। ১৯১৫ সালে ইংরাজদের লেখা ইতিহাস অধিকাংশ সময়ই সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বিশেষ আদর্শবোধ নিয়ে লেখা হয়েছিল তার ছাপ এখানে রয়েছে। শুধু এটুকু বলা যায় যে বাংলার গৌরব বলতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মুসলমানদের অবদানের কথার কোনো উল্লেখ করেননি। এটি একটু বিস্ময়কর।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বাঙালীর জাত্যভিমান যে বেড়ে চলেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ফলে বহু প্রাচীন গ্রন্থের দোহাই দিয়ে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখা হতে থাকে যা বেড়ে যায় বঙ্গবিভাগের প্রচেষ্টা থেকে। ইতিহাস শাখার সভাপতি যদুনাথ সরকার এ বিষয়ে সুধীমণ্ডলীকে আহ্বান করছেন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনা করার জন্য, যার জন্য প্রয়োজনে অপ্রিয় সত্যও বলা প্রয়োজন। বলা দরকার যে পরবর্তীকালে যদুনাথ সরকার তাঁর অজস্র লেখনীর মধ্য দিয়ে এই কাজ করার চেষ্টা করেছেন। এই অভিভাষণে উনি ঐতিহাসিককে সত্য নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন প্রণালীর ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে সূত্র অনুসন্ধান ও সূত্র সম্পর্কে কঠিন দৃষ্টি রাখা। উনি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাচ্ছেন যে ইউরোপের ইতিহাস চর্চার উন্নতি হয়েছে নূতনভাবে অনুসন্ধান করে ইতিহাস রচনা করার ফলে, নির্বিবাদে প্রবাদ গ্রহণ করে নয়। উনি পরিষ্কার জানাচ্ছেন যে প্রবাদ ইতিহাস নয় তবে এটি অনুসন্ধানে সাহায্য করে। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সূত্র ও প্রমাণের সম্পূর্ণ উল্লেখ করে (ফুটনোটে) উনি ইতিহাস রচনা করার আবেদন রেখেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্য শাখার কাজের মধ্যে এসে ইতিহাস শাখায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতে উনি দেখাচ্ছেন যে আওরঙ্গজেব সম্পর্কে শুধু ফার্সি লেখকরাই লেখেন নি, হিন্দুদের প্রচুর লেখা আছে। শাস্ত্রী মশায় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে এই ধরনের লেখার সমীক্ষা করেছেন। এর থেকে দু-একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, যেমন আওরঙ্গজেবের মন্দির ধ্বংসের কাহিনী যেখানে আওরঙ্গজেব ফৌজদারকে ভর্ৎসনা করছেন মথুরার মন্দির ধ্বংস করার জন্য। সভাপতি যদুনাথ সরকার জানাচ্ছেন যে এ তথ্যটি ভুল। কিন্তু এটা অসম্ভব নয়। সাম্প্রতিককালে ফরাসি বণিক ও অন্যান্যদের লেখা থেকে জানা যায় যে ১৬৬৯ সালে সুরাট শহরের কাজী একটি

মন্দির ধ্বংস করেন যার ফলে শহরের হিন্দু ও জৈন বণিকরা শহর ছেড়ে চলে যায়। আওরঙ্গজেব খবর পেয়ে কাজীকে বদলি করলে বণিকরা শহরে ফিরে আসে। আসলে সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা যায় যে আওরঙ্গজেব ১৬৭০ সাল থেকে ইসলাম ধর্মের বিধান মানার দিকে ঝুঁকতে থাকেন। কিন্তু দু-একটি দৃষ্টান্ত ছাড়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানাননি যে হিন্দুরা আওরঙ্গজেব সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করত যা ঐ সব পুঁথিতে দেখা যায়।

কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্তর *বাজার-দর* ও ক্ষীরোদ চন্দ্র পুরকায়স্থর *নগদ-বাকী* অর্থনৈতিক বিষয়ক প্রবন্ধ। কার্য বিবরণী থেকে জানা যায় যে প্রথমটির খুব প্রশংসা হয়েছিল। এটি বাজার-এর দর কিভাবে স্থির করা হয়, মুদ্রার সংকোচনা বা প্রসারের ফলে কি হয় তার থেকে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে ৩০-৪০ বছর আগে মূল্যমান কম থাকলেও লোকেরা বর্তমানের বর্ধিত মূল্যমানের তুলনায় সুখী ছিল বলা যায় না। অবশ্য যাদের আয় বাঁধা তারা অসুবিধায় পড়েছিল। নীচু মূল্যমান মুদ্রার সংকোচনের ফলে হয়েছিল। ফলে লোকের হাতে বেশি মুদ্রা ছিল না। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে *চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী আলাউদ্দিন খলজীর সময়ে* নীচু মূল্যমান সম্পর্কে একই কথা বলেছেন। ক্ষীরোদ চন্দ্র বিভিন্ন তালিকা তৈরি করে (কোথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন জানান নি) যে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের এক-চতুর্থাংশ বাকীতে চলে যার ফলে হুন্ডি, বরাত (চেক) ইত্যাদির প্রচলন বেড়েছে ও ধাতব মুদ্রার প্রচলন কমেছে। এতে অবশ্য সাধারণ লোকেদের ক্ষতি বা লাভ হয়েছে কিনা জানাননি। মন্মথনাথ ঘোষ দেখাচ্ছেন যে আনুষঙ্গিক শিল্পের অভাবে ও কারিগর ও অনান্যরা নিরক্ষর হওয়ার ফলে বিদেশ থেকে মাল আমদানি করতে হয় যার মূল্য অনেক বেশি। উনি চাইছেন যে এখানে কিছু শুল্ক ছাড় বা Protective duty চালু করা প্রয়োজন।

গণপতি রায়ের শ্যাম দেশে হিন্দুধর্মের প্রসার একটি সুলিখিত প্রবন্ধ যার মধ্যে হ্যানয়ে অবস্থিত ফরাসি ইনস্টিটিউটের গবেষণার ফল রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে হিন্দুধর্মের প্রসার পরবর্তীকালের প্রখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিকরা যা লিখেছেন তার সঙ্গে গণপতি রায়ের লেখার বিরোধ নেই। সভাপতি এই লেখাটির প্রশংসা করেছেন। এক সময় ওখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রধান হয়ে দাঁড়ায় এ কথা উনি প্রমাণ করেছেন। শেষে একটি গ্রন্থ তালিকাও দিয়েছেন।

মূল এলাকা থেকে উপাদান সংগ্রহ করলে ঐতিহাসিক চিত্র কত প্রামাণ্য ও আকর্ষণীয় হয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুলবদন বেগম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সূত্রগুলি ফুটনোটে পাতার সংখ্যা সমেত উল্লেখ করেছেন যার ফলে সভাপতির অনুশাসনের রীতির পরিবর্তন হয়নি। পরবর্তীকালে ব্রজেনবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

থেকে অমূল্য কয়েকটি গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন ও এই প্রবন্ধের ধরনের লেখা আরো লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য যে উনি মূল আকরগুলির ইংরাজী অনুবাদ ব্যবহার করলেও ইংরাজ ঐতিহাসিকদের লেখা নেন নি। এছাড়া গুলবদন বেগমকে শুধু এক রাজকন্যা হিসাবে না দেখে সমকালীন ইতিহাসের মধ্যে স্থাপন করেছেন যার ফলে এটি একটি যুগের ইতিহাস হয়ে যায়। স্বভাবতই ঐ যুগে মহিলাদের ক্ষমতায়ন বিশেষ ছিল না ব্যতিক্রমী রাজিয়া বা নুরজাহান ছাড়া। কিন্তু ঐ পুরুষশাসিত শাসনের মধ্যে রাজপরিবারের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যে গুলবদনের বুদ্ধি ও চরিত্রের যে প্রমাণ লেখক দিয়েছেন তার জন্য তিনি সব ভারতীয় ঐতিহাসিকদের কাছে উঁচু জায়গায় আসন পাবেন।

আবদুল গফুর সিদ্দিকীর "আবেদা খাসবিবি" একই ধরনের হলেও রচনা প্রণালী ভিন্ন। বসিরহাট মহকুমায় বালিয়া পরগণার খাসপুর গ্রামে খাসবিবির সমাধি। ওখানে *কুর্সিনামা* বা কুলজী গ্রন্থ থেকে লেখক তথ্য সংগ্রহ করেছেন যা কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু ইতিহাসসম্মত কিনা সন্দেহ। কোন্ সময় এই *কুর্সিনামা* লেখা হয়েছিল তা নিয়ে লেখক প্রশ্ন তোলেন নি। লেখক বলছেন যে মধ্যএশিয়া থেকে মঙ্গোল আক্রমণের সময় খাসবিবির পূর্বপুরুষ দিল্লিতে বলবনের সভায় আসেন। সেখানকার কথাবার্তার বিবরণ দিয়েছেন। ওরা কেউ সভাসদ, কেউ মন্ত্রী ইত্যাদি পদ পান যদিও সমকালীন ফার্সি ইতিহাসে এঁদের কোনো উল্লেখ নেই। ১৫৪৪ সালে খাসবিবির জন্ম ও হুমায়ুন ১৫৫৫ সালে আবার ভারত অধিকার করায় ওঁর আশ্রিতা হন। খাসবিবি বিবাহ করেননি। মৃত্যুকালে খাসবিবিকে হুমায়ুন আকবরের কাছে অর্পণ করেন। এরপর যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য বিদ্রোহী হলে আকবর রাজা মানসিংহকে বাংলাতে পাঠান। খাসবিবি ও তাঁর ভাই সৈন্যদলের সঙ্গে বাংলায় আসেন ও ঐ গ্রামে জায়গীর পান। মানসিংহ মৌতালার দুর্গ দখল করার পর এটি করা হয়, সভায় মানসিংহর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তর্কযুদ্ধে স্থানীয় ব্রাহ্মণের কাছে পরাজয়ের পর।

আবুল ফজলের *আকবরনামার* পাঠে ঐ ইতিহাস পাওয়া যায় না। ঐ সময়ের প্রধান বিদ্রোহী ছিল আফগানরা। মানসিংহ বিহারের শাসক ছিলেন এবং উনি বিরুদ্ধে অভিযান চালান উড়িষ্যাতে। এর পরে উনি পূর্ববাংলা দখল করার জন্য অভিযান করেন ও কেদার রায়কে পরাজিত করে প্রতাপাদিত্যকে দেখাশোনার ভার দেন এবং প্রতাপাদিত্য সহযোগিতা করেন। ১৭ই মার্চ ১৫৯৪ সালে যুবরাজ সলীমের অধীনে লাহোর থেকে (দিল্লি বা আগ্রা থেকে নয়) যাত্রা শুরু করেন বাংলার দিকে। সলীম পূর্ব বাংলায় তাই সভাপতিদের ও অভিজাতদের জায়গীর দেন। মৌতালার দুর্গ আক্রমণের কোনো কথা নেই—আছে মানসিংহর ভাষণ ও বিক্রমপুর দখল ১৫৯৬ থেকে ১৬০৩ এর মধ্যে। উল্লেযোগ্য এই কুর্সিনামার আফগান বিদ্রোহী বা কেদার

রায়ের বিদ্রোহের কোনো কথা নেই। অবশ্য ১৯১৫ সালে আবুল ফজলের *আকবর-নামার* অনুবাদ হয়েছিল এবং লেখক কেন সেটি না দেখে পরবর্তীকালে সংগ্রহ ও প্রবাদের উপর নির্ভর করেছেন সেটাই আশ্চর্যের বিষয়।

সম্ভবত পরের লেখাটি একটি পীরের সমাধির উপর। একই জেলা একই লেখকের লেখা। একই মহকুমা কিন্তু অন্য গ্রামের সৈয়দ আব্বাস আলীর জীবনী। এর সূত্রনির্দেশ কোথাও নেই—মনে হয় সংরক্ষিত প্রবাদ থেকেই লেখা হয়েছে। সমাধিটি তখনো ছিল। সৈয়দ সাহেবের আধ্যাত্মিক জীবনী লেখাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য।

খোন্দকার গোলাম আহমদের পীর বহরামের সমাধি বর্ণনা। ইনি শাহ্-ইসমাইলের জল সরবরাহ করতেন বলে প্রবাদ আছে। সমাধিটি বর্ধমানের এক প্রান্তে জঙ্গলের মধ্যে। অবদুল লতিফের খাজা আনোয়ারের সমাধি ইতিহাসাশ্রিত। সম্ভবত *রিয়াজ-উস-সালাতিন* থেকে আজিমুস্বানের সুবাদার হিসাবে বাংলায় আগমন ও তাঁর মন্ত্রী খাজা আনোয়ারের অকস্মাৎ মৃত্যু বিদ্রোহী নেতা রহিম খানের হাতে (১৬৯৮)। পরবর্তীকালে যদুনাথ সরকার এ কাহিনীর সমর্থন করেন সলিমুল্লার *তারিখ-ই বাংলা* ও 'আখবরাত' থেকে। সাম্প্রতিককালে অবশ্য দেখা গিয়েছে যে আখবরাতগুলি সঠিক তথ্য দেয় না। প্রবন্ধের রচয়িতা ও পরবর্তীকালে যদুনাথ সরকার খাজা আনোয়ারকে মন্ত্রী বলেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে আকবর বিভিন্ন প্রদেশে যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো করে দেন সপ্তদশ শতাব্দীতে তার পরিবর্তন হয়। এখানে সুবাদার, দেওয়ান, ফৌজদার ইত্যাদি ছিলেন যার মধ্যে মন্ত্রীর কোনো কথা নেই। তখন দেওয়ান ছিলেন কাফায়েৎ খান, যার পরে আসেন ১৭০০ সালে মুর্শিদকুলী খান। সুতরাং বলা যায় যে খাজা আনোয়ার দেওয়ান ছিলেন না। তবে তিনি ঘনিষ্ঠ সভাসদ ছিলেন বলে মনে হয়, কারণ তাঁর সমাধি বর্ধমানে আছে। ফার্সি কবিতা থেকে উনি যে তারিখ দিয়েছেন সেটিও ঠিক। পরবর্তী লেখা মুর্শিদাবাদের গ্রামের দু-একটি সমাধি সম্পর্কে যার ভগ্নস্তূপের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন।

মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তীর 'শ্যামারূপার গড়' ঘনরাম চক্রবর্তীর *ধর্মমঙ্গল* ও মানিক গাঙ্গুলীর অষ্টাদশ শতকের লেখা থেকে নিয়েছেন অজয়ের তীরে 'সেনপাহাড়ী গড়' বা 'শ্যামারূপার গড়ে'র ইতিহাস লেখার জন্য। ষষ্ঠ শতাব্দীর উল্লিখিত সুহ্মের রাজধানী ছিল শ্যামারূপার গড় যা ধর্মমঙ্গল থেকে পাওয়া যায়। লাউসেন নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ছিলেন এবং তার প্রায় আটশ বছর পরে ঘনরাম চক্রবর্তী, লাউসেনের আত্মচরিত বর্ণনা করেছেন প্রধানত প্রবাদ থেকে। গড়ের বর্ণনা থাকলে লেখাটি আকর্ষণীয় হত।

সুরেন্দ্রনাথ রায়ের 'রাজার পোতা' খুবই আকর্ষণীয়। বর্ধমানের চোদ্দ মাইল উত্তর পশ্চিমে মাধবপুর গ্রামের পাভুক গ্রামের পাশে উঁচু টিলায় পুরনো যুগের ইঁটের ভগ্নস্তূপ

দেখা যায়। ১৩১৮ সালে অজয়ের বন্যায় গ্রামের অনেকখানি লুপ্ত হয়। উঁচু টিলায় রাজপ্রাসাদ ছিল বলে যে জনশ্রুতি আছে তার আংশিক প্রমাণ ওখানে সোনার মুদ্রা পাওয়া যায়। লেখক একটি কিনেছিলেন যার একদিকে রাজার মূর্তি ও অন্যদিকে রানির মূর্তি আছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রাটি পরীক্ষা করে "নগেন্দ্র গুপ্ত" নাম পেয়েছেন। কাছে দেবীমূর্তিও রয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ কুমারের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ বীতপাল ও ধীমানের উপর লেখা। মূল অধিবেশনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই দুজনকে বাংলার গৌরব বলেছেন। তিব্বতীয় ভাষায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে তারানাথের লেখায় এই দুই শিল্পীর নাম পাওয়া যায় যদিও শিলালেখ বা তাম্রশাসনে এদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তারানাথের গ্রন্থে প্রচুর ভুল বেরিয়েছে—অন্তত পাল রাজাদের বংশলতিকা উনি যা দিয়েছেন খোদিত লিপি থেকে তার ভুল লেখক দেখিয়েছেন। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় এদের তৈরি একটি মূর্তি আছে বলে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাঁর ইংরাজী তালিকায় দিয়েছেন যদিও মূর্তিতে কোনো খোদিত লিপি নেই। বাংলায় নানারকম পাথরের ও ধাতুর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে যেগুলি শৈলীর দিক থেকে উচ্চমানের। কিন্তু সেগুলির কোনো খোদিত লিপি নেই। ফলে শিল্পীর নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং বীতপাল ও ধীমান সম্বন্ধে প্রশ্ন রয়ে যায়।

ননীগোপাল মজুমদার বঙ্গীয় স্থাপত্যের ধারায় তিনটি যুগের কথা বলেছেন। প্রথমটি প্রাক-সুলতানি যুগে যেখানে ইঁট ও পাথর মিশিয়ে মন্দির করা হত যার অনেক উদাহরণ লেখক দিয়েছেন। দ্বিতীয় যুগে বক্তিয়ার খলজীর বঙ্গবিজয়ের পর থেকে যেখানে মুসলমান শাসকরা "হিন্দু-বিদ্বেষের" মন্দিরগুলি ভেঙে তার উপাদান নিয়ে মসজিদ করেছে। হিন্দু-মন্দিরের উপাদান সপ্তগ্রামে জাফরখান গাজীর মসজিদে পাওয়া যায় যার বিবরণ মনমোহন চক্রবর্তী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮-০৯ সালে দিয়েছেন। কিন্তু বক্তিয়ার খলজী গৌড়ের মন্দিরগুলি ভেঙেছিলেন এ তথ্য লেখক ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছেন। সমকালীন কোনো সূত্র নেই। উল্লেখযোগ্য যে গত পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে গৌড় প্রাসাদের কাছ থেকে বহু বৌদ্ধ ও হিন্দু লেখনী ও মূর্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, যেগুলির অধিকাংশ মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। উল্লেখযোগ্য যে লেখক তৃতীয় যুগ ধরেছেন আলাউদ্দীন হোসেনের সময় (১৪৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দ) থেকে যদিও স্থাপত্য শৈলীর কোনো পরিবর্তন হয়নি। আলাউদ্দীন হোসেন শাহর তৈরি গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সেতুর (তৈরি ১৫০৫ শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে) ভগ্নাবশেষ যে তখনো ছিল তার উল্লেখ করেছেন, যেটি এখন আর পাওয়া যায় না। রচনাটিতে স্থাপত্য শৈলীর আলোচনা না থাকায় এটি একটি তালিকার মতো হয়েছে।

মন্মথনাথ চক্রবর্তী "ভারতীয় স্থাপত্য বিজ্ঞান" নিয়ে প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্র সম্বন্ধীয় *মানসারা* গ্রন্থগুলি আলোচনা করেছেন যার একটি প্রাচীন পুঁথি এশিয়াটিক সোসাইটির মহাফেজখানায় রয়েছে। বর্তমানে "মানসারা" স্থাপত্য নিয়ে কয়েকটি বই বেরোনোর ফলে বিষয়টি জানা, কিন্তু ঐ সময়ে এটি সেরকম জানা ছিল না। প্রাচীন যুগে বাস্তুশিল্পের যে ধারণা ছিল সেটা পরিষ্কার হয়ে আসে। প্রধানত আর্যদের শিল্পশাস্ত্র বললেও অনার্য, যাদের দানব বা অসুর বলা হচ্ছে, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থপতি ছিলেন ময়দানব বলে বলা হচ্ছে এবং ময়দানবকে অতি উচ্চাসনে বসানো হয়েছে। ফলে একে "ময়শিল্প" বলা হয়।

শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী "বেদের সরমা" অত্যন্ত আকর্ষণীয় লেখা যদিও এর মূল ধারণাটি হিউইট সাহেবের লেখা থেকে নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বেদে সরমা শব্দের অর্থ কুকুরী। লেখক সাফল্যের সঙ্গে দেখাচ্ছেন যে এটি গ্রিক 'সিরিয়াস্' (Sirius) নক্ষত্র, যার কাল তেসরা জুলাই থেকে ১১ই আগস্ট পর্যন্ত। বেদে যে ধরনের কথা এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে সেগুলির বিশ্লেষণ করেছেন হিউইট সাহেব। তাঁর লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক দেখাচ্ছেন যে বেদে উল্লিখিত সরমা হচ্ছে কুকুর-নক্ষত্র (Dog-Star) যাকে হিন্দুরা মৃগ-শিরা নক্ষত্র এবং হোমার ওরিয়নের কুকুর বলেছেন। বেদের শ্লোক উদ্ধৃত করে লেখক দেখাচ্ছেন যে বেদে উদ্ধৃত পণি বণিকরা ফিলিশিয়ান যারা সামুদ্রিক বাণিজ্য করে। বেদে গুহা থেকে কুকুরের সাহায্যে লুকানো গরু উদ্ধার আসলে মেঘ থেকে বর্ষা আনা যা ভারতের দিকে চলতে থাকে। বেদে দুই কুকুরের উল্লেখ দুটি নক্ষত্র—Canis major and Canis minor বলে বলা হয়েছে।

পরবর্তী লেখায় ফা-হিয়েনের বক্তব্যে চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে যা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই জানা। পরবর্তীকালে প্রবোধ বাগচী ও হরপ্রসাদ রায় চীন-ভারত সম্পর্ক নিয়ে অনেক লিখেছেন। সুতরাং এ নিয়ে পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। উল্লেখযোগ্য যে লেখক গুণালঙ্কার মহাস্থবির ফা-হিয়েনের যাত্রা বিশদ বর্ণনা করেছেন ও স্থানগুলি সনাক্ত করেছেন।

সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস কৈবর্ত জাতি বাংলার প্রায় সব জায়গায় ছিল বলে অনুমান করেছেন "রাজা ভীমের" রাজ্য বিস্তার নিয়ে। কিন্তু আধকৃত সব জায়গায় যে কৈবর্ত ছিল এরকম প্রমাণ নেই। লেখক রামকমল তর্কালঙ্কারের কৈর্বত জাতির মূল ধারণা গ্রহণ না করে জার্মান-সংস্কৃত ভাষার অভিধানের ধারণা নিয়েছেন। অন্যান্য জার্মান গ্রন্থের সাহায্যে উনি দেখাচ্ছেন যে কিম্বক্ত থেকে কৈবর্ত এসেছে এবং এটি স্থানের সঙ্গে যুক্ত। উনি ব্রহ্মকৈবর্তপুরাণ এদের নিয়েই লেখা বলে ধরেছেন, কিন্তু মহিশূরে বা তাঞ্জোরে রক্ষিত পুঁথিগুলি দেখেন নি। এতে অবশ্য সন্দেহ নেই যে বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় এই ধরনের অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়।

আর একখানি এই ধরনের প্রবন্ধ (লেখক ব্রজনাথ চন্দ) প্রকাশিত হয়েছে মেদিনীপুরে শুক্লী জাতির উপর। এদের দুটি তাম্রশাসন নগেন্দ্রনাথ বসু প্রকাশ করে বলেছেন যে এরা চালুক্যদের একটি শাখা যাদের শোলাঙ্কি বলা হত। ব্রজনাথ বাবু প্রবাদ ও কুলজী গ্রন্থ থেকে বলছেন যে মুসলমানদের অত্যাচারে এরা পুরীতে চলে আসে এবং রাজত্ব করতে থাকে প্রধানত পার্বত্য অঞ্চলে। ক্রমে এরা মেদিনীপুর জেলায় ছড়িয়ে পরে মাইতি নামে কৃষক সম্প্রদায় হয়ে যায়। কি করে এবং কেন ক্ষত্রিয় থেকে শূদ্র হল তার আলোচনা নেই। আরো বহু ক্ষত্রিয় বাংলায় এসেছিল, কিন্তু তারা সকলেই শূদ্র হয়নি।

এই ধরনের সংকলনের যে প্রয়োজন আছে সেটা অনস্বীকার্য এবং এ জন্য সম্পাদক গোপীকান্ত কোঙার আমাদের সকলের কাছ থেকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ পেতে পারেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল, দেশের ইতিহাসের তথ্য ও কালক্রম এবং বিভিন্ন জাতির বাংলায় আগমন ও বসবাস ইত্যাদি সম্পর্কে ঐ সময়কার বহু বিদগ্ধজনের মতামত পাওয়া যায়। প্রায় একশ বছর পরে ঐ সব তথ্য ও ধারণা পৃথকভাবে লেখা হয়েছে, প্রচুর নূতন তথ্যও সংগৃহীত হয়েছে যার কিছুটা আভাস এই ভূমিকায় আমরা দিয়েছি।

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের এই অধিবেশনের উল্লেখযোগ্য অবদান বর্দ্ধমানের প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান ও অধিবেশনের আগে তার প্রকাশনা। যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্তত দুজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন। বলা বাহুল্য প্রত্নখনন না হবার ফলে তথ্যই অজানা থেকে যায়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের মিশ্রণ করার যে প্রচেষ্টা সেটা ইংরেজ সরকার শুরু করেন যার কিছুটা নির্দশন এখানে পাওয়া যায়। এর আগে ও পরে কোনো কোনো লেখক এই মিশ্রণ করে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস উজ্জ্বল করে রেখেছেন। এখানে দল করে অনুসন্ধান চালানো হয় যেটা সরকারি আনুকূল্য ছাড়া তখন করা শক্ত ছিল।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে দুটি সীমাবদ্ধতা চোখে পড়ে যার প্রথমটি আগেকার যুগ থেকে চলে আসছে। এটি হল প্রবাদবাক্য, জনশ্রুতি ও কুলজী গ্রন্থের উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীলতা। এর ফলে একুনে তথ্য অনুসন্ধান ব্যাহত হয় ও তথ্যের ভুল সম্বলিত ইতিহাস লেখা হতে থাকে। এর কয়েকটি নির্দশন আমরা এখানে দিয়েছি। বলা প্রয়োজন যে ইতিহাস শাখার সভাপতি যদুনাথ সবকার তাঁর অভিভাষণে এ সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন।

দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতাটি একটু জটিল। এটি আসছে প্রধানত বাংলার গৌরব ও সমৃদ্ধিশালী ঐতিহ্যকে দেখানোর থেকে। একদিকে এটি জাতীয়তাবাদী অন্দোলনের

একটা অংশ (সম্পাদক মশাই বলেছেন) যেটি ইংরাজদের প্রতিপাদ্য বিষয় যে ভারতীয় বা বাঙালী হীনবল, কোনো উন্নত কাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তার বিরুদ্ধে ইতিহাসের আলোচনা করে প্রতিবাদ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মূল অভিভাষণে এটা স্পষ্ট হয়ে আসে। অন্যান্য হিন্দু লেখকদের মধ্যেও এটা দেখা যায়।

এটি জটিল এই কারণে যে একদিকে প্রতিবাদী কণ্ঠ হলেও অন্যদিকে ইংরাজদের সৃষ্ট ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করছে। এটি দেখা যায় যে এই ধারাটির মধ্যে যে প্রাচীন বাংলার যা কিছু ভালো ছিল, হিন্দু ও বৌদ্ধদের মঠ, মন্দির তাদের সংস্কৃতি-ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি—সবই মুসলমানরা ধ্বংস করেছে। বিনা প্রতিবাদে এটা মেনে নিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্যরা একই কথার পুনরাবৃত্তি করে গিয়েছেন। এক ওদন্ত বিহার ধ্বংস করা ছাড়া, যার কথা মীনহাজ-ই সিরাজ বলেছেন, আর কোনো মন্দির বা মঠের বিবরণ এরা দেন নি। অবশ্য ভাঙা মন্দিরের অংশ যে মসজিদে লাগানো হয়েছে তার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতি, পুঁথি সমেত ধ্বংস করা হয়েছিল তার প্রমাণ কোথায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আক্ষেপ করেছেন যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হয়েছে। সাম্প্রতিক Gail Omvett দেখাচ্ছেন যে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংঘাত ছিল। পাল বংশের পতনের পর বাংলায় বৌদ্ধধর্মের পতন হতে শুরু করে ও সেনরাজাদের আনুকূল্যে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান শুরু হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হাবিবুল্লাহ্ দেখিয়েছেন যে এক বৌদ্ধই বক্তিয়ার খলজিকে পথ দেখিয়েছিল এবং ঝাড়খন্ডের মধ্য দিয়ে ঐ পথে বৌদ্ধ বণিকদের অন্তত একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যাতায়াত ছিল তার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আছে। যেহেতু বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে সে জন্য মুসলমান শাসক বৌদ্ধদের সাহায্য নেবে এটা ভাবা অনুচিত হবে না। অন্তত চৈতন্যের সময়ে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ অদেশ দিয়েছিলেন বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা না নিতে। এই কারণে জটিলতা যে ইংরেজদের ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে নিয়ে একটা ধারা সম্পর্কে প্রতিবাদী কণ্ঠ তোলার চেষ্টা হচ্ছে। অন্য ধারাটি অন্ধভাবে অনুসরণ করে একটা পরস্পরবিরোধী জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

বলা হচ্ছে যে অন্যান্যকালের তুলনায় বেশি মুসলমান প্রতিনিধি এখানে ছিলেন যাদের তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকজন হিন্দু লেখকদের মধ্যে মুসলমান বিরোধী কথা থাকলেও মুসলমান লেখকদের মধ্যে হিন্দু বা ব্রাহ্মণবিরোধী লেখার আভাস পাওয়া যায় না। বরঞ্চ একটি লেখার মধ্যে ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে নানা কথা আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেই মুসলমানদের দেখা পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিভাষণে বিংশটি গৌরবের মধ্য মুসলমান নেই। তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে আওরঙ্গজেব সম্পর্কে কোথায় কোথায় হিন্দু পুঁথি পাওয়া যায় বলেছেন—তারা কি

বলেছে সেটি মাত্র এক জায়গায় মন্দির ধ্বংস সম্পর্কে বলা হয়েছে। সভাপতি যদুনাথ সরকার লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে তথ্যটি ভুল।

উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাঙালীর সাধনার কথা প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন। পরবর্তীকালে নীহাররঞ্জন রায় ভাষা, সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বর মিশ্রণ করে বাঙালীর ইতিহাস রচনা করেছেন। কিন্তু এতগুলো বিদগ্ধজনের একটি সংকলনের মধ্যে আসা বিরল। এটি আমাদের কাছে আনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ও আমাকে এই সংকলনের প্রকাশনার মধ্যে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ভূমিকা শেষ করলাম।

সম্পাদনার কথা

বাঙালীর সংস্কৃতি ও ভাষা চর্চার ইতিহাস খুব প্রাচীন না হলেও এর গুরুত্ব বা ঐতিহ্য কিন্তু কম নয়। ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা, শ্রীরামপুরে পাদরীদের দ্বারা বাংলা বই প্রকাশ, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের গ্রন্থ প্রকাশ, বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশ, ১৮৫১ সালে লিটন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, তৎকালীন বাংলাদেশের ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর জন বীম্‌স কর্তৃক Academy of Literature-এর প্রয়োজন সম্পর্কে প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশ, ১৮৯৩ সালে কলকাতায় শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে মহারাজ বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে 'The Bengal Academy of Literature'-এর প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন সাহিত্য সভা, সামাজিক সভার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতি তার ভাষা ও সাহিত্যকে একটি মাধ্যম বা উপায় হিসাবে বেছে নিতে শুরু করে। বাঙালীকে একত্রিত করার জন্য বাঙালী সংঘ গড়ে উঠল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনীতিতে গণআন্দোলনের যে সূত্রপাত ঘটলো তাকে আরও সুনির্দিষ্ট ও সক্রিয়ভাবে পরিচালনার স্বার্থে অরাজনৈতিক বহু ব্যক্তিত্ব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারে সক্রিয়ভাবে সামিল হলেন। এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁদের লেখা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। এদৎসত্ত্বেও ১৯০৫ সালে সরকারিভাবে বঙ্গবিভাগ কার্যকর হয়। কিন্তু সাহিত্য ও ভাষা চর্চার আন্দোলন থেমে থাকেনি। বাংলার সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। গ্রামে গ্রামে বা নগরে নগরে সাহিত্য সভা করে সাহিত্য প্রসারের আন্দোলন অব্যাহত থাকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ ধরনের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তাই এটি নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে বাঙালীর এক সংকটপূর্ণ অবস্থায় বাংলার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩০১ সালে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, নৃতত্ত্ব ও সংস্কৃতির নানা বিষয়ে চর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। তাছাড়া তৎকালীন স্বদেশী যুগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাংলার মানুষের চিন্তায় জাতীয়তার কেন্দ্র, স্বরাজ শক্তির প্রতিমূর্তি এবং স্বাধীনতার উৎস হিসাবে এবং বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক সত্তা সন্ধানের এক উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হতো। এক কথায় বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। এরপর দেশ স্বাধীন হয়েছে; সমাজিক,

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তন হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও চলার পথে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে একশত ষোল বছর পরে তার অতীত ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলেছে। ঐতিহ্য কোনো স্থাণু বিষয় নয়। আর এই ঐতিহ্যকে ভিত্তি করেই পরবর্তী প্রজন্ম নিজের মতো করে ঐতিহ্য গড়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগৃহীত গ্রন্থ, চিত্র, মূর্তি, পুঁথি, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি আজও গবেষক এবং বিদ্বজ্জনদের চিন্তার খোরাক জোগায় এবং ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সজীব রয়েছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর সাধারণভাবে বার্ষিক অধিবেশন প্রথম থেকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। এবং অন্যান্য অধিবেশনও হয়েছে যেখানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পরিচালনা সক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে সভ্য অন্তর্ভুক্তি-করণ, বিভিন্ন সমিতি গঠন, পত্রিকা সম্পাদনা, পুস্তক প্রকাশ, পুঁথি সংগ্রহ প্রভৃতি বহু বিষয়। কিন্তু ১৩১২ সালে সাহিত্য পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ঐ বৎসর প্রথমে রংপুর এবং পরে ভাগলপুরে পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরমর্শ দেন যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কলকাতায় না করে বাংলার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হলে আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য সম্বন্ধে দেশকে সচেতন করা যাবে এবং সেজন্য সাহিত্য পরিষদকে উদ্যোগ নিতে হবে। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনীতির সঙ্গে দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষাকে সংরক্ষিত করার আহ্বান জানান। ১৩১২ সালে ৯ই ভাদ্র বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদে কলকাতায় টাউন হলে একটি জনসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধ বার করেন তাতে উল্লেখ করলেন ঃ "আমরা এই সময়ে এই উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পরের দিকে না তাকাইয়া, নিজেকে পরের কাছে প্রচার না করিয়া, নিজের সাধ্যমত স্বদেশের পরিচয়লাভ ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডার পূরণ করিতে হইবে, এবং পর্যায়ক্রমে এক একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে—এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুকূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।"

১৩১১ সালে ময়মনসিংহ শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৩১২ সালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশে এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সাড়া জেগেছিল। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে লোকদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু সরকারের দমননীতি উক্ত সম্মেলনকে ভণ্ডুল করে

দেয়। ১৩১৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে বহরমপুরে সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এবং এই সময় নাম দেওয়া হয় 'প্রদেশিক সাহিত্য সম্মেলন'। কিন্তু প্রায় সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সাহিত্য সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক রাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মারা যাওয়ায় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হলেও সাহিত্য সম্মেলন করা সম্ভব হয়নি। তবে কলকাতায় শিল্প প্রদর্শনী ক্ষেত্রে সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন' নাম দিয়ে ১৩১৪ সাল থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নেতৃত্বে সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৩১৪ সাল থেকে শুরু করে মাঝের কয়েকটি বছর বাদ দিয়ে ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত এবং ১৩৪৬ সাল থেকে বন্ধ থাকার পর ১৩৬৬ থেকে ১৪১২ সাল পর্যন্ত মোট ৬০টি অধিবেশন বাংলার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। ১৩১৪ সালে প্রথম অধিবেশন হয় কাশিমবাজার (বহরমপুর) রাজবাড়িতে এবং এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অধিবেশনগুলিতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রমুখেরা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন। অধিবেশনগুলির বৎসর, স্থান ও মূল সভাপতিবৃন্দের নাম এখানে দেওয়া হল।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

অধিবেশন	বৎসর	স্থান	মূল সভাপতি/সভানেত্রী
প্রথম	১৩১৪	মুর্শিদাবাদ (কাশিমবাজার)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্বিতীয়	১৩১৫	রাজসাহী শহর	প্রফুল্লচন্দ্র রায়
তৃতীয়	১৩১৬	ভাগলপুর (বিহার)	সারদাচরণ মিত্র
চতুর্থ	১৩১৮	ময়মনসিংহ শহর	জগদীশচন্দ্র বসু
পঞ্চম	১৩১৮	চুঁচুড়া (হুগলী)	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
ষষ্ঠ	১৩১৯	চট্টগ্রাম শহর	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
সপ্তম	১৩২০	কলকাতা	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অষ্টম	১৩২১	বর্ধমান শহর	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
নবম	১৩২২	যশোহর শহর	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
দশম	১৩২৩	বাঁকিপুর (বিহার)	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
একাদশ	১৩২৪	ঢাকা শহর	চিত্তরঞ্জন দাশ
দ্বাদশ	১৩২৬	হাওড়া শহর	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
ত্রয়োদশ	১৩২৯	মেদিনীপুর শহর	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
চতুর্দশ	১৩৩০	নৈহাটী (২৪ পরগণা)	বিজয়চন্দ মহতাব
পঞ্চদশ	১৩৩১	হাওড়া (রাধানগর)	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ষোড়শ	১৩৩১	ঢাকা (মুন্সীগঞ্জ)	জগদীন্দ্রনাথ রায়

অধিবেশন	বৎসর	স্থান	মূল সভাপতি/সভানেত্রী
সপ্তদশ	১৩৩২	বীরভূম (সিউড়ি)	অমৃতলাল বসু
অষ্টাদশ	১৩৩৫	হাওড়া (মাজু)	দীনেশচন্দ্র সেন
ঊনবিংশ	১৩৩৬	কলকাতা (ভবানীপুর)	স্বর্ণকুমারী দেবী
বিংশ	১৩৪৩	হুগলী (চন্দননগর)	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২১তম	১৩৪৪	কৃষ্ণনগর (নদীয়া)	প্রমথ চৌধুরী
২২তম	১৩৪৫	কুমিল্লা	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন

২৩তম	১৩৬৬	মেদিনীপুর (বৈষ্ণবচক)	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪তম	১৩৬৭	কলকাতা (ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হল)	প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশ
২৫তম	১৩৬৮	বর্ধমান (গঙ্গাটিকুরী)	সুধীররঞ্জন দাস
২৬তম	১৩৬৯	কৃষ্ণনগর (নদীয়া)	রমেশচন্দ্র মজুমদার
২৭তম	১৩৭০	কামারপুকুর (হুগলী)	নরেন্দ্র দেব
২৮তম	১৩৭২	বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)	ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী
২৯তম	১৩৭২	জলপাইগুড়ি শহর	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০তম	১৩৭৪	সিউড়ি (বীরভূম)	মনোজ বসু
৩১তম	১৩৭৪	রামচন্দ্রপুর (পুরুলিয়া)	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৩২তম	১৩৭৫	কান্দি (মুর্শিদাবাদ)	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
৩৩তম	১৩৭৬	তমলুক (মেদিনীপুর)	অন্নদাশঙ্কর রায়
৩৪তম	১৩৭৭	পুরুলিয়া	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫তম	১৩৭৮	শিলিগুড়ি শহর	প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়
৩৬তম	১৩৭৯	মেদিনীপুর (ঝাড়গ্রাম)	সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩৭তম	১৩৮০	বর্ধমান শহর	আশাপূর্ণা দেবী
৩৮তম	১৩৮১	কোচবিহার শহর	আশাপূর্ণা দেবী
৩৯তম	১৩৮৩	হুগলী রাজহাটী বন্দর	চপলাকান্ত ভট্টচার্য্য
৪০তম	১৩৮৪	চন্দননগর (হুগলী)	আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
৪১তম	১৩৮৪	মেদিনীপুর (বিদিশা উপনিবেশ)	কালীকিংকর সেনগুপ্ত
৪২তম	১৩৮৬	বারাকপুর (২৪ পরগণা)	কালীকিংকর সেনগুপ্ত (অন্নদাশঙ্কর রায়ের অনুপস্থিতিতে)
৪৩তম	১৩৮৬	আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পোর্টব্লেয়ার	মনোজ বসু

অধিবেশন	বৎসর	স্থান	মূল সভাপতি/সভানেত্রী
৪৪তম	১৩৮৭	২৪ পরগণা (জয়নগর-মাজিলপুর)	আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
৪৫তম	১৩৮৮	হাওড়া (ভারতচন্দ্র মেলা)	দেবেশ দাশ
৪৬তম	১৩৮৯	কলকাতা (স্কটিশচার্চ কলেজ ভবন)	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৭তম	১৩৯০	জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী (কলিকাতা)	জীবনতারা হালদার
৪৮তম	১৩৯১	সুধাকরপুর (নদীয়া)	ড. উমা রায়
৪৯তম	১৩৯৩	শান্তিনিকেতন	ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
৫০তম	১৩৯৪	হাটথুবা (২৪ পরগণা)	চপলাকান্ত ভট্টাচার্য
৫১তম	১৩৯৫	মালদহ	ড. অজিত কুমার ঘোষ
৫২তম	১৩৯৬	বাঁকুড়া	ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৩তম	১৩৯৭	রাজপুর, মেদিনীপুর (হলদিয়া)	ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
৫৪তম	১৩৯৮	জলপাইগুড়ি	ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৫তম	১৩৯৯	বার্ণপুর	ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
৫৬তম	১৪০১	কৃষ্ণনগর	ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
৫৭তম	১৪০৩	মুর্শিদাবাদ	ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
৫৮তম	১৪০৬	পুরুলিয়া	ড. সরোজমোহন মিত্র
৫৯তম	১৪১১	অমৃতপুর (সাতগাড়া)	ড. সরোজমোহন মিত্র
৬০তম	১৪১২	কাটোয়া (বর্ধমান)	ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। সেটি হল রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন' শুরু হয় তা ১৩৪৫ সালে ২২তম সম্মিলনের পর বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বঙ্গদেশ বিভাগ প্রভৃতি কারণে যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার পর কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির উদ্যোগে ১৩৬৬ সালে সম্মেলন পুনরায় শুরু হয় 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন' নামে অভিহিত করে। এক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর কোনো উদ্যোগ ছিল বলে জানা যায় না এবং পৃথকভাবে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন নামে নথীভুক্তকরণ হয়। বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের বর্তমান কার্যালয়ের ঠিকানা পৃথক এবং এটির সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর কোনো সম্পর্ক নেই বলা যেতে পারে। বর্তমানে

এটির ২২জন সদস্যের একটি কমিটি রয়েছে যেটি সদস্যদের দ্বারা দু বছর অন্তর নির্বাচিত হয়। ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ১৩৬৬ সালের সম্মিলনকে ২৩তম সম্মিলন বলে উল্লেখ করা হয় এবং পরবর্তী সম্মিলনগুলিতে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ১৪১২ সালে ৬০তম বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রায় প্রতিটি অধিবেশনে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু বিদগ্ধ মানুষ এবং বিভিন্ন পেশা বা রুচির মানুষ যেমন গ্রন্থকার, সাময়িক ও দৈনিক সংবাদপত্রের প্রকাশক ও সম্পাদক, বিভিন্ন ধর্ম ও সাহিত্য সভার সম্পাদক ও সভাপতি, শিক্ষা বিভাগের সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধি, ব্যবহারজীবী, মহারাজ থেকে প্রজা, এমনকি সামান্য ভূম্যধিকারী, চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ, শাস্ত্রানুরাগী, দার্শনিক, সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক আছে এমন মানুষ, বিজ্ঞানী প্রভৃতি উপস্থিত থেকেছেন, আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য (১) সাহিত্য শাখা (কাব্য, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি) (২) ইতিহাস শাখা (ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি) (৩) বিজ্ঞানশাখা (গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, শিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি) (৪) দর্শন শাখা (দর্শনের বিভিন্ন বিষয়) প্রভৃতি ভাগে ভাগ করে আলোচনার পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া প্রাদেশিক সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা এবং অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্মেলন যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেজন্য প্রথম অধিবেশন থেকেই বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য তৃতীয় অধিবেশনে যে নিয়মাবলীর উল্লেখ করা হয় তা চূড়ান্ত রূপ পায় চতুর্থ অধিবেশনে যেখানে নির্দিষ্টভাবে ১৯টি নিয়ম বা কার্যপদ্ধতির কথা বলা হয়। নিয়মাবলীর ১৪(খ) তে বলা হয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে কার্যবিবরণ মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান করে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনগুলির লিখিত বিবরণ খুব কমই পাওয়া যায়। তবুও বলা যায় এত প্রাচীন এবং ঐতিহ্যপূর্ণ সাহিত্য সম্মেলন নজির বিহীন।

পরবর্তী সময়ে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন, (১৩৬৬ সাল থেকে) যেগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলির জাঁকজমকতা যেমন পূর্বের মত রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, তেমনি বিষয়বস্তু, আলোচনা ও অংশগ্রহণও ম্লান হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনগুলিতে দেড় থেকে দু হাজার পর্যন্ত প্রতিনিধির উপস্থিতি থাকলেও শেষের দিকে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনগুলিতে প্রতিনিধির সংখ্যা অনেকক্ষেত্রে দেড় থেকে দুশোতেও নেমে আসে। আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্মিলন প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত করাও

সম্ভব হয়নি। কয়েকটি ক্ষেত্রে অধিবেশনগুলিতে সংক্ষিপ্ত আকারে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমান বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সদস্য সংখ্যা প্রায় তিনশো। অধিবেশনগুলি মূলত দুদিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে সাহিত্য, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা এবং কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান হয়। কলকাতায় অবস্থিত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের কলকাতা ছাড়াও বগুড়া, হুগলী, মালদহ প্রভৃতি স্থানে শাখা রয়েছে এবং সেগুলি পৃথক কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু এতে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার প্রতি অনুরাগ ও প্রসারে বাঙালীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতীক বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের যে ঐতিহ্য তার গুরুত্ব হ্রাস পায়নি।

অতীতে সাহিত্য সম্মেলন বহু অনুষ্ঠিত হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে। আবার বহু সম্মেলন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একটি ঐতিহ্যপূর্ণ সাহিত্য সম্মেলনের উল্লেখ করতেই হয়। সেটি হল 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' যেটি ১৯২৩ সালে শুরু হয় এবং এখানেও বারানসীতে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে মূল সভাপতি ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সম্মেলনের জন্ম ১৯২২ সালে বাংলার বাইরে 'উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' নাম নিয়ে। পরের বৎসর ১৯২৩ সালে এটির নাম হয় 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' এবং ১৯৫৩ সালে পুনরায় নাম পরিবর্তন করে এটির নাম হয় 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'। 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন' গুলিতে প্রবাসী বাঙ্গালীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা ও গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়। 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর অধিবেশন আজ পর্যন্ত ৮১টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০০৮ সালে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঝাড়খণ্ডের কোডারমায় প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে। এক কথায় ১৯২৩ সাল থেকে শুরু করে প্রায় শতাব্দী প্রাচীন সর্ব ভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘকাল ধরে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে ব্যাপৃত আছে। কেবলমাত্র সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা প্রকাশ নয়, নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করা এবং বেশ কয়েকটি গ্রন্থও উক্ত সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। *সাহিত্য সম্মেলন পরিক্রমা*, সুনীলময় ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৯, ৩য় সংস্করণ, ২০০৬, প্রায় হাজার পৃষ্ঠার গ্রন্থে সম্মেলনের দীর্ঘকালের ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড উল্লিখিত হয়েছে। *সম্মেলন সাহিত্য সংগ্রহ, বহির্বঙ্গে বাঙালি*, ১ম খণ্ড (২০০৭), ২য় খণ্ড (২০০৮), উপদেষ্টা, সুনীলময় ঘোষ, মুখ্য সম্পাদক ড. রামদুলাল বসু গ্রন্থগুলিতে বহু প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে যা বাঙালী মনের চিন্তন ও দর্শন একটি দর্পণে ধরা পড়েছে বলা যায়।

পরবর্তী সময়ে আরও বিভিন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান সময়েও রাজ্য, জেলা, মহকুমা, ব্লক প্রভৃতি স্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে থাকে। তাছাড়া বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন (যা প্রায় কলকাতা-কেন্দ্রিক) অথবা

বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (যার পরিধি পৃথিবী জুড়ে বলা হচ্ছে) তাদের বয়স এখনও এক দশক হয়নি। আবার বর্তমান সময়ে সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, আন্দোলন, সমবায়, শিক্ষা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে সম্মেলন প্রায়শই অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। আর বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রভূমি হিসাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম উপযুক্ত স্থান হিসাবেও বিবেচিত হয়।

কিন্তু আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে (১৩২১ সালে) বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন। এ সম্মিলন আর পাঁচটা সম্মেলনের মতো সাধারণ সম্মিলন ছিল না। তার প্রমাণ পাই উক্ত সম্মিলনের অধিবেশন সংক্রান্ত কার্যবিবরণী থেকে যেটি ১৩২২ সালে ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন বর্ধমান মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাব এই সম্মিলনের আহ্বায়ক ছিলেন এবং তাঁরই সভাপতিত্বে এই সম্মিলনের প্রথম দিনেই উপস্থিত ছিলেন দেড় হাজার দর্শক, শ্রোতা ও প্রতিনিধি। সেদিনের সভার মূল সভাপতি ছিলেন স্বয়ং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। আর নক্ষত্র সমাবেশ হয়েছিল যাঁদের নিয়ে তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জীতেন্দ্রনাথ দত্ত, যদুনাথ সরকার, রমাপ্রসাদ চন্দ্র, ননীগোপাল মজুমদার, যোগেশ চন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, নগেন্দ্রনাথ বসু, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কুমার মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মুন্সী রওসন আলী চৌধুরী, ব্যোমকেশ মুস্তফি, গুণালঙ্কার মহাস্থবির, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, জলধর সেন, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, নলিনাক্ষ বসু, রাখালরাজ রায়, হর্ষ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রায় যামিনীমোহন মিত্র প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা, এমনকি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ত্রিপুরা, ভাগলপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান থেকে এমনকি দিল্লি থেকে বহু বিদগ্ধ মানুষ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

অধিবেশনের আলোচনা চারটি শাখায় ভাগ করা হয়। (১) সাহিত্য শাখায় সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং এই শাখায় ৪৯টি প্রবন্ধ; (২) বিজ্ঞান শাখায় সভাপতি ছিলেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং এই শাখায় ১৬ টি প্রবন্ধ; (৩) ইতিহাস শাখায় সভাপতি ছিলেন যদুনাথ সরকার এবং ২৩টি প্রবন্ধ এবং দর্শন শাখায় সভাপতি ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং এই শাখায় ১৭টি প্রবন্ধ রাখা হয়েছিল। অধিবেশন-এর কার্য-বিবরণী থেকে জানা যায় ঐ সমস্ত প্রবন্ধগুলি ছিল অতি উচ্চমানের এবং সমসাময়িক সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তাভাবনার প্রতিফলন।

অধিবেশন যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে তার জন্য যে প্রস্তুতি ও আয়োজনের কথা কার্যবিবরণীর মধ্যে রাখা হয়েছে তা দেখে অবাক হতে হয় এই ভেবে যে শতবর্ষ পূর্বে বর্ধমান শহরে এমন একটা আয়োজন বোধ হয় খুব সহজ

ব্যাপার ছিল না। নিমন্ত্রণ থেকে শুরু করে অভ্যর্থনা জানানো, থাকার ব্যবস্থা, রেল কনসেশন-এর ব্যবস্থা, যানবাহনের ব্যবস্থা, বাসস্থান, মণ্ডপ, প্রদর্শনী, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতার ব্যবস্থা, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, প্রভৃতি বহু বিষয় সুচারুভাবে সম্পন্ন করার পদ্ধতি-প্রকরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে।

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম দিনের কার্যসূচীতে দেখা যায় অভ্যাগতদের আহ্বান-অভিনন্দন জানানোর সুপরিচালিত এক সভা। সেখানে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অভিভাষণ দিচ্ছেন। পূর্ববর্তী সপ্তম সম্মিলনের কার্যবিবরণী পঠিত হচ্ছে এবং অন্যান্য কার্য সমাধা হচ্ছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চন্দ মহতাব বর্ধমান সাহিত্য শাখা-পরিষদ, বর্ধমান পুরবাসী, বর্ধমান রাজার পক্ষ থেকে অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। সম্মিলনের প্রধান সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের গুণাবলী সম্পর্কে মহারাজের উক্তি ছিল খুবই তাৎপর্য। তাছাড়া সভাপতির অভিভাষণ, দ্বিতীয় দিনের কার্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, সভার শেষে অভ্যাগতদের প্রতি মহারাজের বিনম্র আবেদন, থাকা-খাওয়া এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবরণ সত্যই চমৎকৃত করে।

দ্বিতীয় দিনের কার্যসূচী খুবই সুপরিকল্পিত ছিল এবং সুচারুভাবে কার্যকরী হয়। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান এই চারটি শাখায় আলোচনার জন্য পৃথক মণ্ডপের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি শাখায় যে সমস্ত প্রবন্ধ এসেছিল তার মধ্যে থেকে বাছাই করে নির্দিষ্ট প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়। এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

তৃতীয় দিন ইতিহাস ও দর্শন বিভাগের দ্বিতীয় দিনের অবশিষ্ট প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা করা হয় এবং এই দুই সভার কাজ শেষ হওয়ার পর চারটি শাখা একত্র হয়ে বেলা একটার সময় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন শুরু হয়। পূর্ববর্তী বৎসরে পরলোকগত সাহিত্যিক ও সাহিত্য বন্ধুদের প্রতি শোক প্রকাশ থেকে শুরু করে অনুপস্থিত সদস্যদের প্রেরিত পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠ, বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ প্রভৃতি সামগ্রিক বিষয় কার্যবিবরণীর অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

সভাপতির সম্বোধনসহ 'ক' থেকে 'ঞ' পর্যন্ত দশটি পরিশিষ্টে স্বস্তিবাদ, নবম বার্ষিক সম্মিলন পরিচালন সমিতি, অভ্যর্থনা সমিতির কর্মাধ্যক্ষগণ, কার্যনির্বাহক সভার সাধারণ সদস্য, পরামর্শ সমিতি, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ, বর্ধমান অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে প্রতিনিধি প্রেরণকারী সভাসমিতি, পুস্তকাগার ও পাঠাগারের তালিকা, সম্মিলনে বিদেশাগত প্রতিনিধি ও দর্শকগণের তালিকা, স্বেচ্ছাসেবকগণের কর্মবিভাগ, প্রতিনিধিগণের বাসস্থান, প্রদর্শিত দ্রব্যের তালিকা, অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

উপলক্ষ্যে বর্ধমান রাজবাটীতে আমোদ-প্রমোদ, আয়-ব্যয়, প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বিশেষত 'ক' পরিশিষ্টে সভাপতির সম্বোধনে উল্লিখিত কুড়িটি বর্ধমান তথা বাঙালীর 'গৌরব'-এর কথার উল্লেখ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সমগ্র বিষয়টি বর্তমান গ্রন্থের কার্য্যবিবরণ অংশে রাখা হয়েছে।

"ট" পরিশিষ্টে 'বর্ধমানের পুরাকথা' স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সম্মেলন শুরুর আগেই ৬ই ফাল্গুন থেকে ১৫ই ফাল্গুন পর্যন্ত শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে অনুসন্ধান সমিতির কয়েকজন সদস্য বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধানের জন্য পরিদর্শন করেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁদের একাজে রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির পৃষ্ঠপোষক মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাব যেমন সাহায্য ও সহযোগিতা করেন, তেমনি অগ্রদ্বীপের জমিদার রমাপ্রসাদ মল্লিক, প্রসূন পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতি প্রসাদ সিংহ, কাটোয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখেরাও অনুসন্ধান কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। নগেন্দ্রনাথ বসুর ভূমিকা এবং শ্রী রাখালরাজ রায়, শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী প্রমুখের পাঁচটি প্রবন্ধ গ্রন্থ মধ্যে 'বর্ধমানের পুরাকথা' অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে অনুষ্ঠিত চারটি পৃথক শাখার মধ্যে ইতিহাস শাখার বিষয়বস্তু বর্তমান প্রথম খণ্ডে রাখা হল। কার্য বিবরণীর মধ্যে দেখা যায় ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে স্থান বর্ণনা বিষয়ক, জীবনী বিষয়ক, আলোচনা বিষয়ক. ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, অর্থনীতি বিষয়ক প্রভৃতি ভাগে ভাগ করে আলোচিত হয়। সভাপতির মন্তব্যও যুক্ত করা হয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে প্রবন্ধগুলি পাঠের মধ্যে দিয়ে সুনির্দিষ্ট ইতিহাস চর্চার সন্ধান যেমন মেলে, তেমনি তৎকালীন অর্থনীতি, শিল্প-স্থাপত্য, প্রত্নতত্ত্ব, ব্যক্তি ইতিহাস, স্থানিক বিষয়, জাতিতত্ত্ব, বেদ-পুরাণের তথ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় বৈচিত্র্যও সুপ্রচুর। আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি প্রকরণ দেখে অবাক হতে হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে অনুমান এবং প্রবাদ-কাহিনীর উপর নির্ভর করে ইতিহাসের প্রবন্ধ রচিত হলেও বহু প্রবন্ধের তথ্যগত মূল্য অপরিসীম। পরবর্তীকালে বহু আলোচনা, গবেষণা, নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু প্রায় একশ বছর পূর্বে ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা এবং প্রবন্ধগুলিতে বহু বিশিষ্ট বিদগ্ধজনের জ্ঞানসমৃদ্ধ আলোচনা বা মতামত এর গুরুত্ব আজও আমাদের অনেকক্ষেত্রে পাথেয় হয়ে ওঠে। ইতিহাস শাখার সভাপতি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার তাঁর দীর্ঘ অভিভাষণের মধ্যে ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি, বিশুদ্ধ প্রমাণপঞ্জি ব্যবহার, বাংলা ভাষায় ইতিহাস লেখার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। এরপর ইতিহাস শাখায় নির্বাচিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয় এবং অষ্টম

অধিবেশনের ইতিহাস শাখায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এই অংশটি বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অংশে রাখা হল।

এক কথায় অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন এর কার্যবিবরণী তৎকালীন সমাজ, সংস্কৃতি-ইতিহাস সম্পর্কে একটি আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। যেখানে স্বয়ং মহারাজ অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক সেখানে অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং জাঁকজমকতা থাকবে এটা আশা করা যেতেই পারে, কিন্তু আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে বাংলার সাহিত্য চর্চার লক্ষ্যে যে উদ্যোগ তা সত্যই আকর্ষণীয় এবং অনুধাবনযোগ্য।

প্রসঙ্গত একটি পরিতাপের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন' নামে যে ২২টি অধিবেশন হয় এবং 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন' নাম নিয়ে যে ৩৮টি অধিবেশন আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য খুব কমই পাওয়া গেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে যা রক্ষিত আছে তা অতি সামান্য একটি অংশ মাত্র বলা যায়। 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন, সংস্থার কাছেও তথ্য রক্ষিত হয়নি।

বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশ করার বাসনা অনেকদিন আগে থেকেই ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে যেমন কিছু সময় লেগে যায়, তেমনি আমার চাকুরিজনিত কর্মব্যস্ততার কারণেও হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া গ্রন্থটি কোন একটি জায়গা থেকে সামগ্রিকভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে যেমন কিছু অংশ পেয়েছি, তেমনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার থেকেও কিছু অংশ সংগৃহীত হয়েছে। "লুপ্তরত্ন উদ্ধার" করা এবং গ্রন্থটি প্রকাশ করার কাজে যাঁদের অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি তাঁদের কথা উল্লেখ করতেই হয়। প্রয়াত প্রভাত ভট্টাচার্য যিনি মূল গ্রন্থটির একটি বড় অংশ তাঁর সংগ্রহ থেকে ফটোকপি করে নিতে সাহায্য করেছিলেন; অধ্যাপক শ্রী রামদুলাল বসু নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রাক্তন সভাপতি যিনি তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। অধ্যাপক শ্রী কিশোরীরঞ্জন দাশ, সম্পাদক, বীরভূম সাহিত্য পরিষদ, শ্রী অজয় কুমার ঘোষ, অধ্যাপক ড. দেবকুমার ঘোষ প্রমুখেরা নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। ড. সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রী নির্মল গঙ্গোপাধ্যায় যাঁরা বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত রয়েছেন, তাঁরাও পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। শ্রী সদানন্দ দাস, যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বর্ধমান শাখার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত, বার-বার তাগাদা দিয়ে আমাকে একাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাছাড়া অনেকেই নানাভাবে সাহায্য করেছেন এবং আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন, এঁদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা। অধ্যাপক শ্রী স্বপন বসু, সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মহাশয় তাঁর অকৃপণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা। এছাড়া, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

শতবর্ষপূর্তি স্মারক সংখ্যা *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, সম্পাদক সত্যজিৎ চৌধুরী, ১৪০৩, *সাহিত্য সম্মেলনের ইতিবৃত্ত*, অমরনাথ করণ, নবজাতক প্রকাশন, ১৪০১; *সাহিত্য সম্মেলন পরিক্রমা*, সুনীলময় ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৯, ৩য় সংস্করণ, ২০০৯; *সম্মেলন সাহিত্য সংগ্রহ, বহির্বঙ্গে বাঙালি*, ১ম খণ্ড (২০০৭), ২য় খণ্ড (২০০৮) প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বিভিন্ন অধিবেশনের স্মরণিকা, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির সাহায্য নিয়েছি এবং তাঁদের কাছে আমি ঋণী।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করতেই হয়। সেটি হলো প্রায় শতবর্ষ পূর্বে যে ভাষা ও বানান ব্যবহার করা হয়েছে তা অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করেছি। পাঠক যাতে মূল বিষয়-ভাবনা সরাসরি গ্রহণ করতে পারে তার জন্য মন্তব্য থেকে সচেতনভাবে বিরত থেকেছি।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. অনিরুদ্ধ রায় মহাশয়, প্রাক্তন অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাক্তন সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমার এই উদ্যোগকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমার সহধর্মিণী সুলেখা কোঙার সাংসারিক দায়দায়িত্ব থেকে প্রায় মুক্তি দিয়ে আমার একাজে সহযোগিতা করেছে, উৎসাহ যুগিয়েছে। পুত্র প্রিয়দর্শন ও পুত্রবধূ অর্চনা সতত প্রহরী হিসাবে আমার একাজে সহায়তা করেছে। আর আমার ছোট্ট ভাই অমর্ত্য তার আদর আর আবদার দিয়ে আমার একাজের ক্লান্তি দূর করেছে। সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ভালবাসা, শুভেচ্ছা। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর শ্রী কমল মিত্র মহাশয় এবং তাঁর কর্মীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এত দ্রুত এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাঁদেরকে জানাই আমার শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা।

সবশেষে, যেটা বলতে চাই তা হলো গ্রন্থটি প্রকাশের কাজে কিছু ভুলত্রুটি হয়তো থেকে যেতে পারে। মূল গ্রন্থের জীর্ণ অবস্থা এবং পুরাতন ফটোকপি থেকে কপি করে নেওয়ার দরুন কিছু অস্পষ্টতা ছিল। সে কারণে হয়তো ত্রুটিমুক্ত করা যায়নি। তাছাড়া পুরাতন বানানকে রক্ষা করতে গিয়ে কিছু ভুল হয়তো থেকে যেতে পারে। এক্ষেত্রে দায় সম্পূর্ণ আমার। কিন্তু আগামী দিনের গবেষক, বিদ্বজ্জন ও অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাজে লাগলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

গোপীকান্ত কোঙার

সূচীপত্র

ইতিহাস শাখা ২৬৭-৪১৬

বিজ্ঞাপন

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ মুদ্রিত হইল। ইহা ৫ খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথম খণ্ডে—কার্য্য-বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ডে—সাহিত্য-শাখায় পঠিত প্রবন্ধ, তৃতীয় খণ্ডে—দর্শন-শাখায় পঠিত প্রবন্ধ, চতুর্থ খণ্ডে—ইতিহাস শাখায় পঠিত প্রবন্ধ এবং পঞ্চম খণ্ডে—বিজ্ঞান শাখায় পঠিত প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কার্য্য-বিবরণ-সঙ্কলনে শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

প্রত্যেক শাখার সভাপতি মহাশয় সেই শাখায় পঠিত প্রবন্ধ মধ্যে যেগুলি মুদ্রিত হইবে তাহা নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞানশাখার প্রবন্ধগুলির প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় এই পুস্তক ছাপাইবার ভার লইয়াছিলেন। এজন্য সকল মহাশয়গণকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ছাপাইবার জন্য পঠিত প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধলেখক সম্মিলনের সময় তাঁহাদের প্রবন্ধ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং পাঠের পর তাহা আমাদের না দিয়া ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কয়েকটী প্রবন্ধ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পাওয়া যায় নাই। এ কারণে দর্শনশাখার "বেদান্ত-দর্শনে বাঙ্গালী" প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের কবিতাও পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশিত হয় নাই।

এই সুবৃহৎ পুস্তক মুদ্রণে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে, সম্মিলনের হস্তে যে টাকা ছিল তাহা বাদেও অনেক টাকা লাগিয়াছে, এ কারণ এবং যাহাতে এ পুস্তক সাধারণের হস্তগত হইতে পারে তাহার জন্য ইহার মূল্য ২ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই পুস্তক বিক্রয় হইয়া যাহা আয় হইবে তাহা বর্দ্ধমান শাখা-পরিষদে অর্পিত হইবে। ইতি

বর্দ্ধমান
১৯ শে ফাল্গুন, ১৩২২ সাল

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মিত্র
ও
শ্রী দেবেন্দ্রনাথ সরকার

কার্য্য-বিবরণ

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর
কে. সি. এস্. আই., অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

অষ্টম অধিবেশন, বৰ্দ্ধমান—১৩২১

কাৰ্য্য-বিবরণ

সূচনা

১৩২০ সালের চৈত্র মাসের ইষ্টার-পর্ব্বের ছুটিতে কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের শেষ দিবসে মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বর্দ্ধমানবাসী ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-বর্দ্ধমান-শাখার পক্ষ হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে আগামী বর্ষে বর্দ্ধমাননগরে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে পত্র লিখিয়াছিলেন। যশোহরের রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্ এ, বি এল বাহাদুরও ঐ বৎসরের নিমিত্তই যশোহরে সম্মিলনকে আহ্বান করেন; কিন্তু সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, আগামী বর্ষে বর্দ্ধমানেই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে এবং তৎ-পর বৎসর যশোহরে অধিবেশন হইবে।

অভ্যর্থনা-সমিতি

তদনুসারে ১৩২১ সালের ১০ই শ্রাবণ বর্দ্ধমান বংশগোপাল-টাউন-হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-বর্দ্ধমান-শাখার আহ্বানে বর্দ্ধমান জনসাধারণের একটি সভা হয়। সম্মিলনের কার্য্যসৌকর্য্যার্থ সর্ব্বশ্রেণীর লোক লইয়া অভ্যর্থনা-সমিতি এবং তাহা হইতে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভা ও পরামর্শ সমিতি গঠিত হয়। রাজা, জমীদার, রাজপুরুষ, উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার যে সকল অধিবাসী কর্ম্মোপলক্ষে ভিন্ন জেলায় বাস করেন, সন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকেও সদস্য করিয়া লওয়া হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যবর্গের নাম পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে যাঁহারা সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন ও যাঁহারা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম "গ" পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

কার্য্য-প্রণালী ও দিন-স্থির

অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্য-প্রণালী ও নিয়মাবলী স্থির করিবার জন্য ২০শে ভাদ্র বর্দ্ধমান-বংশগোপাল-টাউনহলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতি, সহকারী-সভাপতি, জেলা-জজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় আই সি এস মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য-প্রণালী ও মণ্ডপ-প্রবেশ-সম্বন্ধে নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হয়। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সহিত

পরামর্শ করিয়া ২০শে, ২১শে ও ২২শে চৈত্র ইষ্টার-পর্ব্বের ছুটির সময় সম্মিলনের অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির করা হয়।

সভাপতি-নির্ব্বাচন

২৭শে অগ্রহায়ণ রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর সাহেব সি এস আই মহোদয়ের সভাপতিত্বে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার ২য় অধিবেশনে সভাপতি-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পরিগৃহীত হয় ঃ—

১. (ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহোদয় অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

(খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহোদয় সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

(গ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় সম্মিলনের ইতিহাস-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

(ঘ) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সম্মিলনের দর্শন-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

(ঙ) সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন-মণ্ডপে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ বিদ্যানিধি মহাশয় বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

উক্ত মহোদয়গণ সভাপতি-পদ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

কার্য্যালয়

রাজপাবলিক-লাইব্রেরী-কমিটি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে কার্য্যালয়ের জন্য লাইব্রেরী-ভবনের একটী কক্ষ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সহকারী-সম্পাদকগণই ইহার কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। সম্মিলনের পূর্ব্বে ১ মাসের জন্য জনৈক বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয়। স্থানীয় বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র নানাপ্রকার কার্য্যালয়ের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছে।

মণ্ডপের ও প্রতিনিধিগণের আতিথ্যের সমস্ত ব্যবস্থাই অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এবং অন্যতম সহকারী সভাপতি রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর সাহেব নিজ কর্ম্মচারী দ্বারাই করাইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা পরামর্শ সমিতির প্রধান সদস্যগণের সহিত পরামর্শ নিয়ে কার্য্য করিতেন, সুতরাং এ বিষয়ে সুদক্ষহস্তে কার্যের ভার দিয়া অভ্যর্থনা সমিতি নিখুতভাবে কাজ করিয়াছিল।

প্রবন্ধ-সংগ্রহ

প্রবন্ধ-সংগ্রহের জন্য কার্ত্তিক ও পৌষমাসে বাঙ্গালার প্রায় ৫০ খানি সাময়িক পত্রে সাহিত্যিকদিগকে সাধারণভাবে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য আহ্বান করা হয়। তদ্ভিন্ন যে সকল সাহিত্যিকদিগের ঠিকানা পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহাদিগকে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখাও হয়। ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে প্রবন্ধ পাঠাইবার জন্য প্রায় সকলকেই অনুরোধ করা হইয়াছিল; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, অতি অল্প লেখকই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন। অনেকে অধিবেশনের দিন প্রবন্ধ আনিয়া সভাপতি মহাশয়দিগের কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা করিয়া তুলিয়াছিলেন। যাহা হউক প্রবন্ধ-সংখ্যা মোটের উপর যথেষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু সারগর্ভ প্রবন্ধের সংখ্যা আশানুরূপ হয় নাই। প্রবন্ধলেখকগণ দিন থাকিতে অনুরোধ-পত্র বা বিজ্ঞাপন পাইয়া থাকেন। তাঁহারা যদি সেই সময় হইতে প্রবন্ধ লিখিয়া যথাসময়ে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের অভাব হয় না।

প্রতিনিধি-সংগ্রহ ও নিমন্ত্রণ

মাঘ মাসে বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত সাময়িক-পত্রে, সভা-সমিতির সম্পাদকগণকে প্রতিনিধির নাম পাঠাইবার জন্য আহ্বান করা হয়। তদ্ভিন্ন সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদক মহাশয় যে সকল সভা-সমিতি, পুস্তক-পাঠাগার ও সংবাদপত্রের তালিকা দিয়াছিলেন, তদনুযায়ী সেই সকল সভা-সমিতির সম্পাদকগণকে ২৩শে ফাল্গুনের মধ্যে প্রতিনিধির নাম পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখা হয়। বহু স্থান হইতে আমরা যথাসময়ে প্রতিনিধিগণের নাম পাই নাই। অনেকে সম্মিলনের অধিবেশনের ২/৩ দিন মাত্র পূর্ব্বে নাম পাঠাইয়াছিলেন। তখন নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইবার আর সময় ছিল না। যে সকল সভা-সমিতি সম্মিলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম "গ" পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

সংবাদপত্রের লেখকগণের ও সাহিত্যিক-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের দুইটি তালিকা পরিচালন সমিতির নিকট সংগ্রহ করিয়া দেশের সর্ব্ববিধ লোকের মধ্যে ৩০০০ নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরিত হয়।

রেলওয়ে-কন্‌সেশন্‌ ও শিক্ষা-বিভাগের ছুটি

ই বি এস রেলওয়ে ও আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ট্রাফিক্-ম্যানেজার মহোদয়দ্বয় প্রতিনিধি ও দর্শকগণের এক ভাড়ায় যাতায়তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও পূর্ব্ববঙ্গ-আসামের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার মহোদয়গণ শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিগণকে সম্মিলনে যোগ দিবার অনুমতি ও ছুটি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ই আই রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া কন্‌সেশন্‌ দিতে পারেন নাই, কিন্তু

২০শে চৈত্র শনিবার-দিন সম্মিলনের যাত্রিগণের জন্য হাওড়া ষ্টেশন হইতে দুইখানি ট্রেণে কয়েকখানি কামরা জুড়িয়া দিয়াছিলেন। এজন্য আমরা বিভিন্ন রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

প্রতিনিধি-সমাগম

অভ্যাগত প্রতিনিধিগণের আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থার জন্য নিমন্ত্রণ-পত্রের সহিত কয়েকটি প্রশ্নসম্বলিত একখানি মুদ্রিত পোষ্টকার্ড উত্তরের জন্য প্রত্যেক প্রতিনিধির নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। এইরূপে প্রেরিত ৩ সহস্র পোষ্টকার্ডের মধ্যে ৫০ খানি মাত্র আমাদের হস্তগত হয়। ইঁহাদের মধ্যেও আবার অনেকে অধিবেশনের সময় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু প্রথম দিন প্রায় ১০০০ প্রতিনিধি ও দর্শক অভ্যর্থনা-সমিতির আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিবেশনের দিন মধ্যাহ্নের ট্রেণে আশাতীত প্রতিনিধির আগমন হওয়ায় অভ্যর্থনা-সমিতি আশানুরূপ যান-বাহনের সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য কোন কোন অভ্যাগত ব্যক্তির কিছু অসুবিধা হইয়াছিল। সে জন্য ত্রুটি-স্বীকার করা ব্যতীত বলিবার আর কিছু নাই। এবৎসর একটা বিশেষ সুখের কথা এই যে, এবার সম্মিলনে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা অধিক হইয়াছিল।

নিরামিষাশী প্রতিনিধির সংখ্যা শতাধিক হইয়াছিল। বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন হইতে প্রধান সভাপতি বর্দ্ধমানে আসেন এবং ক্রমশঃ বিভিন্নস্থানের প্রতিনিধিগণ আসিতে আরম্ভ করেন। বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত স্থান হইতে প্রতিনিধি ও দর্শকগণ বর্দ্ধমানে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

প্রথম অধিবেশনের দিন দর্শক ও প্রতিনিধির সংখ্যা প্রায় ১৫০০ হইয়াছিল। বর্দ্ধমানবাসীর মহাসৌভাগ্যের কথা যে, আর কোন সম্মিলনে বিদেশাগত এত প্রতিনিধি যোগদান করেন নাই। যাহারা দর্শকরূপে আসিয়া প্রথম দিনই বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। কয়েকজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সকল প্রতিনিধি ও দর্শকের নাম আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাঁহাদিগের নাম "চ" পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

যান-বাহন

ষ্টেশন হইতে বাসস্থানে এবং বাসস্থান হইতে সভামণ্ডপে ও অন্যান্য স্থানে প্রতিনিধি মহাশয়গণের যাতায়াতের জন্য ৭৫ খানি অশ্ব-শকট দিবারাত্রির জন্য নিযুক্ত করা হয়। বর্দ্ধমানের জনসাধারণের জন্য কিছু ভাড়াটিয়া গাড়ী রাখিতে হইয়াছিল বলিয়া, অভ্যর্থনা-সমিতিকে মেমারি হইতে ২৫ খানি গাড়ী আনিতে হইয়াছিল। যে সকল

বাসা সভামণ্ডপের অতি সন্নিকটে অবস্থিত, সেই সকল বাসার প্রতিনিধিগণের জন্য অশ্ব-যানের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ও স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের মোটর এবং অন্যান্য যানবাহন সম্মিলনের জন্য নানা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল।

বাসস্থান

সর্ব্বশুদ্ধ ২৩টি বাসস্থান প্রতিনিধি মহাশয়গণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহার মধ্যে অধিকাংশ বাড়ীই মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের, ২টি রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর সাহেবের, ১টি মিউনিসিপালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী মহাশয়ের মিউনিসিপালিটির সুযোগ্য চেয়ারম্যান বাহাদুর বংশগোপাল-টাউন-হলটি প্রতিনিধি-গণের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন কয়েকজন রাজ-কর্ম্মচারী ও সম্মিলনের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় আপনাদের কয়েকটি বাটী এইজন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে ইঁহারা সকলেই অভ্যর্থনা-সমিতিকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই ২৩টি বাড়ীর মধ্যে ১টি নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণের জন্য ও ৩টি মুসলমান প্রতিনিধিগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। নিরামিষাশী প্রতিনিধিগণেব জন্য পৃথক্ বাসস্থান রাখিবার সঙ্কল্প নানা কারণে পরিত্যক্ত হয়। প্রত্যেক বাসস্থানেই নিরামিষাশীগণের জন্য পৃথক্ বন্দোবস্ত করা হয়।

কেহ বিছানা না আনিলে তাঁহাদিগের শয্যা-রচনার জন্য প্রত্যেক বাসস্থানে নূতন নূতন বিছানা, মশারি, মজুত রাখা হইয়াছিল। প্রত্যেকের বিছানায় একখানি করিয়া তালবৃন্ত রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। পত্রাদি লিখিবার জন্য প্রত্যেক বাসস্থানে টেবল, চেয়ার, দোয়াত, কলম প্রভৃতি ছিল। (বাসস্থান "ছ" পরিশিষ্ট)।

আদর-আপ্যায়ন ও পরিদর্শন

১৮ই চৈত্র বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ হইতেই অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ ও স্বেচ্ছা-সেবকদল প্রতিনিধিগণের আগমনের অপেক্ষায় ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিতেন। এজন্য ষ্টেশনে স্বেচ্ছাসেবকদলের একটি কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রত্যেক বাসস্থানে অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ, বাসস্থানের ভার-প্রাপ্ত মহারাজার কর্ম্মচারী। একজন অধিনায়কের অধীনে স্বেচ্ছাসেবকদল, পাচক-ব্রাহ্মণ ও চাকর নিযুক্ত ছিল।

প্রত্যহ দুইবেলা মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, রাজা বনবিহারী কপূর সাহেব ও অভ্যর্থনা-সমিতির পরিদর্শকগণ প্রতিনিধিগণের সংবাদ লইতেন এবং স্বাস্থ্য-বিভাগের

সহকারী পরিদর্শকগণ ও মহারাজার চিকিৎসকগণ প্রতিনিধি মহাশয়গণের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে তত্ত্ব লইতেন। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর চিকিৎসার জন্য পৃথক্ ঔষধ আনাইয়াছিলেন এবং পৃথক্ বাড়ী নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আহারাদি

প্রত্যেক বাসস্থানেই এক একটি পৃথক্ ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাতে ও অপরাহ্নে চা ও জলযোগ এবং মধ্যাহ্ন ও রাত্রিতে আহারের জন্য বিবিধ প্রকার ভোজ্যের আয়োজন ছিল। পিপাসা-শান্তির জন্য ডাব, সোডা, লেমনেড, বরফ, সরবৎ এবং ধূমপানের জন্য তামাক, চুরুট ও সিগারেটের ব্যবস্থা ছিল। নিরামিষাশী প্রতিনিধিগণের আহারের জন্য প্রত্যেক বাসস্থানেই স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল।

মণ্ডপ

রাজবাড়ীর বিশাল সরস্বতী-প্রাঙ্গণ জুড়িয়া মূলমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মণ্ডপের উর্দ্ধদেশ ও চতুঃপার্শ্ব নানাবিধ মনোরম শ্বেত, রক্ত, নীলবস্ত্রে সুশোভিত করা হইয়াছিল। দক্ষিণপার্শ্বের মধ্যস্থলে সভা-বেদিকা। তাহার দুই পার্শ্বে অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণের স্থান, সম্মুখে প্রতিনিধিগণের ও তাহার দুই পার্শ্বে দর্শকগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

২য় দিবস মূলমণ্ডপ কানাত দিয়া দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সাহিত্য ও দর্শন-শাখার জন্য স্থান করা হয়। সরস্বতী-প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে রাসমঞ্চের সন্নিকটে ইতিহাস-শাখার জন্য তাঁবু খাটান হইয়াছিল। রাজ-নাট্যশালায় বিজ্ঞান-শাখার স্থান হইয়াছিল।

সরস্বতীর নাট-মন্দিরের এক পার্শ্বে দর্শক ও প্রতিনিধিগণের জন্য চা, ডাব, বরফ, সোডা, লেমনেড অধিবেশনের সময় রাখা হইত। প্রত্যেক আসনেই একখানি করিয়া তাল-পাখা রাখা হইয়াছিল।

মণ্ডপ-প্রবেশের ব্যবস্থা

অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণের এবং প্রতিনিধিগণের পীতবর্ণের নিদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিনিধিগণের সংখ্যা আশাতিরিক্ত হওয়ায় সকলকে নিদর্শন দিতে পারা যায় নাই। তজ্জন্য স্বেচ্ছাসেবকদলের প্রতি আদেশ ছিল, তাঁহারা প্রতিনিধিগণকে বিনা নিদর্শনে যেখানে প্রয়োজন লইয়া যাইতে পারিবেন। দর্শকগণের জন্য বিনামূল্যে ৩ দিনে ৩ রঙ্গের টিকিট বিতরণের জন্য ব্যবস্থা ছিল। এতদ্ভিন্ন দ্বাররক্ষক স্বেচ্ছাসেবক-গণের প্রতি উপদেশ ছিল, ভদ্রলোক দেখিলে বিনা টিকিট-নিদর্শনে মণ্ডপে প্রবেশ করিতে দিবে।

প্রদর্শনী

জনসাধারণের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা বাড়াইবার জন্য একটি সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক ও কৃষি-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। সরস্বতী-মন্দিরে, রাসমঞ্চে ও রাজবাড়ীর বাহিরে

কোতখানায় প্রদর্শনীয় দ্রব্যাদি রক্ষিত হইয়াছিল। প্রস্তর-ধাতুমূর্ত্তি, তাম্রশাসন, হস্তলিখিত পুথি, দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত পুথি, মুদ্রা, রাজবাড়ীর প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র. সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক প্রদর্শনীতে সংগৃহীত হইয়াছিল। বৰ্দ্ধমান কৃষিপ্রধান স্থান বলিয়া সম্মিলনের অধিবেশনের ৪দিন পূর্ব্বে কৃষি-প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা করা হয়। বর্দ্ধমান-বিভাগের কৃষি দপ্তরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ও বর্দ্ধমান-কৃষিক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যোগীন্দ্রচরণ দে মহাশয়দ্বয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে কৃষি-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বর্দ্ধমান-কাঞ্চননগরের বিখ্যাত কর্ম্মকার শ্রীপ্রেমচাঁদ মিস্ত্রি প্রদর্শনীর জন্য তাঁহার নির্ম্মিত বিবিধ প্রকারের ছুরি, কাঁচি এবং বর্দ্ধমান-বড়বাজারের বস্ত্র-ব্যবসায়ী শ্রীহংসেশ্বর দত্ত বর্দ্ধমানের বিভিন্ন পল্লীতে প্রস্তুত তাঁতের কাপড় দেখাইয়াছিলেন। ("জ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

জনসাধারণের শিক্ষাপ্রদ আমোদের জন্য ২য় দিবস ইতিহাস-শাখা-মণ্ডপে ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পাটনা কলেজের ইতিহাসের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ মহাশয় "বিহারে বৌদ্ধ-কীর্ত্তি" সম্বন্ধে, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ভূতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় বর্দ্ধমানের ভূতত্ত্ব-সম্বন্ধে, বরাকরের শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় এম আই এম ই মহাশয় "কয়লাখনি" সম্বন্ধে ও গভর্ণমেন্ট কৃষি-বিভাগের শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় "কৃষি" সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে বিবিধ তথ্যপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় কার্য্য-বিবরণীতে যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। অধ্যাপক মহশয়গণ নিজ ব্যয়ে ছায়াচিত্রের কাঁচের ছবিগুলি এই উপলক্ষে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উদ্যান-সম্মিলন ও আমোদ-প্রমোদ

সমাগত প্রতিনিধিবর্গের সম্মিলনের জন্য প্রথম দিন অপরাহ্নে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাঁহার প্রাসাদের পশ্চিম প্রাঙ্গণে উদ্যান-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেখানে বৈকালিক জলযোগের জন্য চা, মিষ্টান্ন, ফল-মূল, ডাব, লেমনেড প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। চিত্তরঞ্জনের জন্য বৈঠকীগান, বালকের ধ্রুপদগান ও পাখোয়াজ-বাজনা, কনসার্ট, বাউলের গান প্রভৃতির ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন প্রত্যহ সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও চণ্ডীর গান এবং রাত্রিতে রাজ-রঙ্গমঞ্চে নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থাও ছিল। ("ঝ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

স্বেচ্ছাসেবক

একজন অধ্যক্ষ, একজন সহকারী অধ্যক্ষ ও কয়েকজন অধিনায়কের অধীনে প্রধানতঃ স্কুল, কলেজ ও চতুষ্পাঠীর ছাত্র এবং স্থানীয় যুবকবৃন্দ লইয়া স্বেচ্ছাসেবকদল গঠিত

হইয়াছিল। ইহারা তিনপ্রকার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। একদল ষ্টেশনে প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনার জন্য, ২য় দল বিভিন্ন বাসস্থানে প্রতিনিধিগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীতে এবং মণ্ডপের নিকটস্থ কার্য্যালয়ের জন্য নিযুক্ত ছিল। সকল স্থানেই কয়েকজন করিয়া দ্বিচক্র-যানবাহী স্বেচ্ছাসেবক ছিল। ("ছ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) এই স্বেচ্ছাসেবকদল যেরূপ অক্লান্তভাবে দিবারাত্রি খাটিয়া কর্ত্তব্যপালন করিয়াছে, তাহাতে অভ্যর্থনা-সমিতি ইহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছেন।

পুস্তিকা-বিতরণ

অভ্যর্থনা-সঙ্গীত সমিতি যে সকল গান অভ্যাস করিয়াছিলেন সেইগুলি ও কয়েকটি নির্ব্বাচিত কবিতা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করা হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়গণের অভিভাষণ, শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ "হিন্দুর মুখে আওরঙ্গজেবের কথা" ও অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক অনুসন্ধান-কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সম্পাদিত "বর্দ্ধমানের কথা" নামক সচিত্র পুস্তক অভ্যর্থনা-সমিতি মুদ্রিত করিয়া সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকগণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের সচিত্র অভিভাষণ পুস্তিকা কলিকাতার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কে ভি সেন কোম্পানি অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের কার্য্যের নমুনাস্বরূপ বিতরণ করিয়াছিলেন। 'বর্দ্ধমানের কথা' পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। অভিভাষণগুলি বিভিন্ন শাখার খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রারম্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

আয়-ব্যয়

সাধারণের নিকট চাঁদা হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩২০৭৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ডাক-ব্যয়, মুদ্রণ, প্রদর্শনী-কার্য্যালয়ের সরঞ্জাম, গাড়ী-ভাড়া প্রভৃতি বাবদে ১৯১৭৷৷৶৫ খরচ হইয়াছে। অবশিষ্ট ১২৯৮।৵১৫ প্রবন্ধ-সম্বলিত কার্য্য-বিবরণ মুদ্রিত করিবার জন্য রাখা হইয়াছে। ("ঝ" পরিশিষ্ট)।

প্রতিনিধিগণের আহার, যাতায়াতের ঘোড়াগাড়ী, মণ্ডপ, গৃহ-সজ্জা, আলোক, আবাসন ও আমোদ-প্রমোদের সমস্ত ব্যয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বহন করিয়াছেন।

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, বৰ্দ্ধমান

প্রথম দিন

সময়—২০শে চৈত্র ১৩২১, ৩রা এপ্রিল ১৯১৫, শনিবার অপরাহ্ন ২টা

কার্য্য-সূচী

১. স্বস্তিবাদ-বর্দ্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

২. শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক পূজার দালান-মধ্য হইতে মাল্য লইয়া মঞ্চোপরি সভাপতিদ্বয়কে মাল্য-প্রদান।

৩. আবাহন-সঙ্গীত—কথা—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ। গায়ক—অভ্যর্থনা-সঙ্গীত-সমিতি।

৪. আবাহন (কবিতা) 'কপিঞ্জল' রচিত।

৫. বন্দনাগীত—কথা—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ। গায়ক-অভ্যর্থনা-সঙ্গীত-সমিতি।

৬. আবাহন (কবিতা)—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ।

৭. আবাহন-অভিনন্দন-গীত—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি এ। গায়ক—অভ্যর্থনা-সঙ্গীত-সমিতি।

৮. গত বর্ষের কলিকাতার সপ্তম সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্র পাঠ।

৯. অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুরের অভিভাষণ।

১০. সভাপতি-বরণ—

প্রস্তাবক—মহারাজাধিরাজ স্যার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর (বর্দ্ধমান)
সমর্থক—মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর (মুর্শিদাবাদ)
অনুমোদক—মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি (নদীয়া)

(২) শ্রীযুক্ত মুন্শী মহম্মদ রৌশনআলি চৌধুরী (ফরিদপুর)

১১. সঙ্গীত—কথা—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ।
গায়ক—মেরিগোল্ড ক্লাব।

১২. কবিতা (১) শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্ এ বি এল্।
(২) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

১৩. সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ।

১৪. সপ্তম সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ—মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, এল্ এল্ ডি, ডি এল্, সি আই ই (সম্পাদক)।

১৫. উক্ত কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ-প্রস্তাব—
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় প্রমথনাথ চৌধুরী (সন্তোষ)।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ।

১৬. বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠন—
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্ত-বাচস্পতি, এম্ এ, বি এল্ (যশোহর)।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু এম্ এ, বি এল্ (বৰ্দ্ধমান)।

(যদুবাবুর প্রস্তাবে দেশ-বিদেশ হইতে আগত প্রতিনিধি সমস্ত এবং বর্দ্ধমান-অভ্যর্থনা-সমিতির উপস্থিত সদস্যগণকে এই সমিতির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়।)

কার্য্য-বিবরণ

প্রথম দিন

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই সরস্বতী-মন্দিরে সম্মিলন-উপলক্ষে ভগবতী সরস্বতীর বিশেষ পূজা হইয়াছিল। রাজ-চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয় চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণকে লইয়া সরস্বতী-মন্দিরেই স্ব-রচিত স্বস্তিবাচন সমস্বরে পাঠ করেন। তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের ভ্রাতা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় এই স্বস্তিবাচন পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন।

স্বস্তিবাচনের পর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম এ, বি এল এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সরস্বতী-মন্দির হইতে প্রসাদ-মাল্য লইয়া আসিয়া সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর কে সি, এস, আই, কে, সি, আই, ই, আই ও এম্ মহাশয়দ্বয়ের গলদেশে প্রদান করিলেন। অভ্যর্থনা-সঙ্গীত-সমিতি শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ মহাশয়ের রচিত আবাহন-সঙ্গীত গান করিলেন। (খ-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) তৎপরে শ্রীযুক্ত "কপিঞ্জল" প্রণীত "আবাহন" কবিতা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পাঠ করিলে পর অভ্যর্থনাসঙ্গীত-সমিতি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ রচিত "বন্দনাগীত" গান করিলেন।

ইহার পর শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ রচিত "আবাহন কবিতা" শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পাঠ করেন ও শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি এ মহাশয়ের রচিত "আবাহন-অভিনন্দন গীত" অভ্যর্থনা-সঙ্গীত-সমিতি গান করেন। ("খ-পরিশিষ্টে" কবিতা ও গানগুলি দ্রষ্টব্য)।

তাহার পর গতবর্ষের কলিকাতায় সপ্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্র পড়া হইল। তাহার পর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর নিজের নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন,

"সমবেত বঙ্গের সাহিত্যসেবী সভ্যবৃন্দ,

বর্দ্ধমান সাহিত্য-শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে, বর্দ্ধমান পুরবাসিগণের পক্ষ হইতে, এবং এই নগরে প্রতিষ্ঠিত বর্দ্ধমান-রাজের পক্ষ হইতে আমি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্বরূপে আপনাদিগকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। আপনারা অদ্য এই স্থানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন প্রারম্ভ করত আমাদের সকলের প্রীতি

ও উৎসাহ বর্দ্ধন করুন ও এই সম্মিলনে দেশের সাহিত্য-প্রচার সম্বন্ধে নববল প্রদান করুন। অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্দ্ধমান রাঢ়ের একটি প্রধান স্থান বলিয়া খ্যাত, এবং সেই কারণেই বোধ হয়, আমার পূর্ব্বপুরুষগণও বর্দ্ধমানে আসিয়া ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতিকল্পে অনেক সময়ে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশবাসিগণ রাজনৈতিক আলোচনা ও গবেষণায় এত অধিক পরিব্যাপ্ত যে, দেশের ও সমাজের অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার যথোপযুক্ত অবসর তাঁহাদের মিলে না; ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। এই উপেক্ষিত কর্ত্তব্যের কিয়দংশ পালন করা সাহিত্য-পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য, সেই কারণে আমি এই পরিষদের কার্য্যে বিশেষরূপে আকৃষ্ট এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি আপনাদের এই সদ্দৃষ্টান্ত পূর্ব্বকথিত রাজনৈতিকগণের অনুকরণীয় হউক এবং আপনাদের সাধু চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হউক। আপনারা যে রাঢ়ের রাণী বর্দ্ধমানকে এতদিন ভুলিয়াছিলেন, তাহা কেবল কালবৈগুণ্যে; তবে সন্তান যেমন অশেষ দোষ করিলেও কেবল একবার "মা" বলিয়া মার কাছে আসিলেই জননী তাহাকে বুকে টানিয়া লন, তেম্‌নি আপনারা তত্ত্বানুসন্ধান ও সাহিত্য-প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া আজ যখন রাঢ় জননী বর্দ্ধমানের ক্রোড়ে সমবেত হইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিয়া তাঁহার ও বঙ্গের সুসন্তানগণকে নিজ সাধ্যানুরূপ সমাদর করিতে চেষ্টা করিবেন। আপনারা যে কার্য্যে ব্রতী, তাহা সাধু ও স্বদেশানুরাগ প্রণোদিত সন্দেহ নাই। পরন্তু এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এইটুকু মাত্র যে, আপনারা নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, বনে বনে, বহু পরিশ্রমে পরিভ্রমণ করিয়া যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ, ইষ্টক ও প্রস্তর ফলকাদি সংগ্রহ করিতেছেন এবং তাহা হইতে যে অভিনবতত্ত্ব ও বিস্মৃত বা বিকৃত ইতিহাসের যথার্থ কাহিনী আবিষ্কার করিয়া তাহার প্রচারকল্পে বিপুল অর্থব্যয়ে গ্রন্থাদি মুদ্রণ করিতেছেন, তাহার ফল যাহাতে স্থায়ী হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ইহা শুধু অর্থ-বলসাপেক্ষ নহে-লোকবল ব্যতীত এই চেষ্টা কদাচিৎ সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইতে পারে না। আপনারা যদি আপনাদিগের উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে না বুঝাইয়া পল্লীবাসিগণের নিকট হইতে তাহাদের পুঁথি-পত্র, বিগ্রহাদি সংগ্রহ করিতে থাকেন, তাহা হইলে হয়ত তাহারা কিছুকাল পরে আপনাদিগকে স্বদেশবৎসল, লোকহিতব্রত মহাপুরুষস্বরূপ মনে না করিয়া কোন নূতন জাতীয় তস্কর মাত্র মনে করিতে পারে। কারণ নিরীহ অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত পল্লিবাসিগণ সাধারণতঃ সাহিত্য-পরিষদের বড় একটা ধার ধারে না বা নব প্রচারিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির কোন খোঁজ-খবরও রাখে না। যদি বলেন, "এ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য?" তাহার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে—যে যে ব্যক্তির নিকট হইতে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার্থে কোনও দ্রব্য সংগৃহীত হইবে, তাহাদের প্রত্যেককে তত্তৎবিষয়ের আলোচনাসম্বলিত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাদি

বিনামূল্যে বিতরণ করা ত উচিতই, অধিকন্তু সেই স্থানে যদি কোনও লোকপূজ্য, চিরস্মরণীয় কবি বা মহাপুরুষের সংশ্রব থাকে, তাহা হইলে তাহার নিদর্শনার্থে কোনওরূপ স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা কর্ত্তব্য ও প্রাচীন প্রথার অনুকরণে কথক বা গায়ক সম্প্রদায়ের সাহায্যে তাঁহাদের পবিত্র কাহিনী স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। স্বদেশানুরাগ ও স্মৃতি-পূজার ইহা একটি প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া আমার মনে হয়। যদি জনসাধারণের হৃদয়ে এই অনুরাগ বদ্ধমূল না হয় এবং মহাপুরুষগণের উজ্জ্বল আদর্শ যদি আমরা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে অক্ষম হই, তাহা হইলে আমরা ক্রমে জনসাধারণের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইয়া পরিণামে বিফল-প্রযত্ন হইব।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পক্ষে এরূপ আলোচনা করা বোধ হয় সমীচীন নহে। সুতরাং পরিষদের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

এক্ষণে আমাদের এই সম্মিলনের যিনি প্রধান সভাপতি, মহামহোপাধ্যায় শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, যাঁহার সূক্ষ্ম তত্ত্বানুধাবনতৎপরতা ও ধীশক্তি আপনাদের কাহারও অবিদিত নহে, তাঁহার নিকট ও বঙ্গের অন্যান্য কৃতী সন্তানগণ, "যাঁহারা বিভিন্ন শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা এবং সমবেত বঙ্গের উজ্জ্বলতম সাহিত্য-সেবিগণ অদ্য এই স্থানে উপনীত হওয়ায় আমরা সকলেই সাতিশয় গৌরবান্বিত অনুভব করিতেছি । এক্ষণে তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করুন। পরিশেষে আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি যে, এ বৎসর বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনী আমন্ত্রণের প্রধান উদ্যোগী কাসিমবাজারাধিপতি মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহোদয়; যে মহানুভবের অমায়িকতায় বঙ্গবাসীমাত্রেই আপ্যায়িত; তাঁহারই দ্বারা উৎসাহিত হইয়া আমি এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম; আপনারা নিজগুণে আমাদের সকল ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিলেই আমরা নিজ নিজ শ্রম সফল জ্ঞান করিব।"

মহারাজাধিরাজ এইরূপে সমাগত জনমণ্ডলীকে অভিনন্দন করিয়া বর্ত্তমান সম্মিলনের নির্ব্বাচিত প্রধান সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের গুণাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে বিশেষ প্রশংসাবাদ করিয়া এই সম্মিলনের সভাপতিপদে আসীন হইতে প্রস্তাব করিলেন। নাটোরের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন এবং কাসিমবাজারের মাননীয় মহারাজ (এখন স্যার) মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর, ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত মুন্‌সী রওশন আলী চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়গণ এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সংক্ষেপে বিনয় প্রকাশ করিয়া দুইচারি

কথা বলিয়া কলিকাতার "মেরিগোল্ড ক্লাবকে" শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয়ের রচিত "আবাহন" গীত গান করিতে আদেশ করিলেন। গান হইলে পর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্ এ বি এল্ মহাশয় স্বরচিত "মাতৃ-দর্শন" নামক কবিতা নিজে পাঠ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীযুক্ত মহাশয় চট্টগ্রামের জীবেন্দ্রকুমার দত্তের "আবীরাবির্ম এধি" নামক কবিতা পাঠ করেন ("খ" পরিশিষ্টে গান ও কবিতা দ্রষ্টব্য)

অতঃপর সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় নিজ অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (ইহার শেষাংশ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় পড়িয়াছিলেন।) ("ক" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

তাহার পর গত বর্ষের সপ্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অন্যতম সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, বি এল, এল এল ডি ডি সি এল মহাশয় গতবর্ষের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন। ময়মনসিংহ সন্তোষের কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম এ মহাশয়ের সমর্থনে এই কার্য্যবিবরণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর যশোহরের প্রবীণ উকীল, হিন্দু-পত্রিকার সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং বর্দ্ধমানের উকীল শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু মহাশয়ের সমর্থনে দেশ-বিদেশ হইতে সমাগত সমস্ত প্রতিনিধি এবং বর্দ্ধমানের অভ্যর্থনা-সমিতির উপস্থিত সদস্যগণকে লইয়া বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠিত হইল। এই প্রসঙ্গে সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে জানাইলেন যে,—সেই দিন সন্ধ্যার পর সভাপতি মহাশয়ের বাসায় "উইলবাড়ী" নামক প্রাসাদে বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হইবে। যাঁহারা ইহার সদস্য হইলেন, তাঁহারা সকলে সেখানে উপস্থিত হইবেন। যাঁহার সভায় পড়িবার জন্য প্রবন্ধাদি আনিয়াছেন বা যাঁহারা সভায় আলোচনা করিবার জন্য কোন বিষয়ে কোন প্রস্তাব করিবেন, তাঁহারা প্রবন্ধাদি লইয়া উপস্থিত হইবেন।

ব্যোমকেশ বাবু এই সময়ে আরও জানাইয়া দেন যে, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি অভ্যর্থনা সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও সভাকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস এই চারিভাগে বিভাগ করিয়া বিভিন্ন বিভাগের প্রবন্ধপাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন। চারিভাগের জন্য চারিজন স্বতন্ত্র সভাপতিও নির্দ্দিষ্ট আছেন। সাহিত্য বিভাগের সভাপতি হইবেন শাস্ত্রী মহাশয়, দর্শন বিভাগে হীরেন্দ্রবাবু, ইতিহাস বিভাগে পাটনার যদুবাবু আর বিজ্ঞান বিভাগে কটকের রায়সাহেব

যোগেশবাবু। আপাততঃ ঠিক করা হইয়াছে যে, কাল দুইবেলায় দুইবার প্রতি বিভাগের অধিবেশন হইবে এবং প্রবন্ধ পড়া হইবে। তাহাতে সময়ে না কুলাইলে পরশ্ব সোমবারেও একবেলা প্রবন্ধ পড়া হইবে আর সোমবারের বৈকালে আবার চারি বিভাগ একত্র করিয়া প্রস্তাবাদির আলোচনা করা যাইবে। বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতি উপযুক্ত বোধ করিলে ইহার রদ-বদল করিতে পারিবেন।

তাহার পর মহারাজাধিরাজ উঠিয়া জানাইলেন যে, এই সভাভঙ্গের পর রাজবাড়ীর বাগানে একটী উদ্যান-সম্মিলন হইবে। আমি নিজের পক্ষ হইতে (অর্থাৎ বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজরূপে, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে সে পক্ষ হইতে নয় বিদেশাগত সমস্ত অভ্যাগতকে সেই সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিতেছি। এজন্য অল্পসংখ্যক নিমন্ত্রণপত্র (কার্ড) যাঁহারা আগে আসিয়াছেন, এমন কতকগুলি অভ্যাগতকে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বর্দ্ধমানের এবং আমার মহাসৌভাগ্যের কথা যে, আজ অভ্যাগতের সংখ্যা আশার অতিরিক্ত বাড়িয়া গিয়াছে, কাজেই সকলকে নিমন্ত্রণের কার্ড বা প্রতিনিধির নিদর্শন রেশমী ফিতার ফুল দিতে কুলায় নাই, অতএব আমার সবিনয় নিবেদন যে, যাহারা নিমন্ত্রণ-পত্র বা ফিতার ফুল পান নাই, তাঁহারা আমাদের ক্রটী মনে না করিয়া, আমাদের অবস্থা বুঝিয়া আমার এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন, —আমি সেই জন্য সভাস্থলে দাঁড়াইয়া আপনাদের সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। এখন আর আপনাদের বাসায় গিয়া নিমন্ত্রণের সময় নাই, কাজেই আমি এইখানেই আপনাদের সকলকেই সবিনয়ে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছি, আপনারা সকলে উপস্থিত হইলে সুখী ও বাধিত হইব। অভ্যর্থনা-সমিতির সকল সদস্যই ইহাতে যোগ দিবেন, তাঁহাদেরও নিমন্ত্রণ করিতেছি।

তাহার পর মহারাজের অনুরোধে ব্যোমকেশ বাবু আরও জানাইলেন যে, আজকার বৈকালিক জলযোগাদি রাজবাড়ীতেই সম্পন্ন হইবে। রাত্রিতে রাজবাড়ীর নাট্যশালায় অভিনয় দেখিবার আর সভাস্থলে চণ্ডীর গান শুনিবার যে ব্যবস্থা আছে, সে সকল স্থানেও প্রবেশের জন্য কাহাকেও উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না। অভ্যাগতমাত্রই নিজের নিজের বাসায় একজন ভলান্টিয়ারকে সঙ্গে লইয়া আসিলেই সর্ব্বত্র যাইতে-আসিতে পারিবেন, রাজবাড়ীর সঙ্গীণ-পাহারার জন্য কাহারও কোন সঙ্কোচের কারণ নাই। মহারাজাধিরাজ তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থাই করিয়াছেন। যাঁহারা রেশমী-ফিতার ফুল বা কার্ড পাইয়াছেন আর যাঁহারা পান নাই,—তাঁহারা সকলেই উদ্যান-সম্মিলনে, থিয়েটার দেখিতে আর চণ্ডীর গান শুনিতে অসঙ্কোচে আসিবেন।

অতঃপর প্রথম দিনের সভাভঙ্গ হয়। সভাভঙ্গের পর রাজবাড়ীর বাগানে উদ্যান-সম্মিলন হয়। সেখানে অভ্যাগতবর্গের জলযোগাদির বিপুল ব্যবস্থা ছিল। আমোদ-আনন্দের জন্য কনসার্ট ছিল, বাউলের গান ছিল। মহারাজাধিরাজের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত-নায়ক—সঙ্গীতবিদ্যার্ণব মহাশয়ের ৯ বৎসরের

পুত্র শ্রীমান রমেশচন্দ্র ও ১৩ বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকী-গানে রাগ-রাগিণীর আলাপে সকলকে মোহিত ও বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল। বরাহনগরনিবাসী শ্রীমান্ পঞ্চানন পাল নামে আর একটী ১২ বৎসরের বালক ইহাদের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাইয়া বিস্ময়ের পরিমাণ আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। এই তিনজনই এজন্য ৩টী স্বর্ণ-পদক পাইয়াছে। মহারাজাধিরাজ, রাজা বনবিহারী কপূর আর রাজকর্ম্মচারিগণের আদর আপ্যায়নে অভ্যাগত সকলেই বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। রাত্রি ৭॥০ টার সময় উদ্যান-সম্মিলন ভঙ্গ হয়।

উহার পর সভাপতি মহাশয়ের বাসায় বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। বহু অভ্যাগত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে অনেকেই স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধ বিষয়ভেদে বিভিন্ন বিভাগের সভাপতিগণের হাতে দিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয়েরা নিজেরাই প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনের ভার লইয়াছিলেন। চারি-বিভাগেই বহু প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহার পর হিন্দু-মুসলমান বহু প্রতিনিধি নানা বিষয়ের আলোচনা প্রস্তাব করিলেন। যথানিয়মে সেগুলির বিচারাদির পর কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইল, কতকগুলি প্রস্তাব সাহিত্য-সম্মিলনের আলোচ্য নহে। সাহিত্য-পরিষদে আলোচ্য হইতে পারে বিবেচনায় প্রস্তাবগুলি সাহিত্য-পরিষদে পাঠাইয়া দিবার জন্য প্রস্তাবকদিগকে অনুরোধ করা হইল। দুই চারটি বিষয় সাহিত্য-সম্মিলনের আলোচনার উপযোগী নহে বলিয়া পরিত্যাগ করা হইল। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি যে সকল নিয়ম গঠনের প্রস্তাব ও পূর্ব্বনিয়মের পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাও এই সভায় আলোচিত হইয়া যথানিয়মে পরিবর্ত্তনাদির পর কতক কতক গৃহীত হইল। রাত্রি ১১ টার সময় বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির কার্য্য শেষ হয়।

ইতিমধ্যে রাজবাড়ীর নাট্যশালায় মহারাজাধিরাজ রচিত "শিব-শক্তি", "ত্রিচিত্র" ও "চন্দ্রজিৎ" নাটকের অভিনয় ও সভামণ্ডপে চণ্ডীর গান আরম্ভ হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে গোপেশ্বর বাবুর "জলতরঙ্গ" বাজনা হইতেছিল। বহু অভ্যাগত (প্রতিনিধি ও দর্শক) বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে না গিয়া এই সকল আমোদ-আনন্দের স্থলে উপস্থিত ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ, অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ এবং মহারাজাধিরাজ নিজে এই দিকেই ছিলেন। রাত্রি একটার সময় এই সকল আমোদ-আনন্দের ব্যাপার শেষ হইলে অভ্যাগতবর্গ সে দিনের মত ছুটি পান।

দ্বিতীয় দিন

সময়—২১শে চৈত্র, ১৩২১, ৪ঠা এপ্রিল ১৯১৫ রবিবার।

দ্বিতীয় দিন পূর্ব্বের ব্যবস্থামত সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান এই চারিশাখায় ভাগ হইয়া গেল।

মূল-সভামণ্ডপের মাঝখানে কানাত দিয়া দুইটি ভাগ করা হইয়াছিল। ইহার একটিতে সাহিত্য-শাখার ও অন্যটিতে দর্শন-শাখার বৈঠক বসিয়াছিল। রাজবাড়ীর ৺লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের রাসমঞ্চের সাম্‌নের খোলা জায়গায় স্বতন্ত্র একটা তাঁবু খাটাইয়া আর একটি সভার স্থান হইয়াছিল। এইখানে ইতিহাস-শাখার বৈঠক বসিয়াছিল, আর রাজবাড়ীর নাট্যশালায় বিজ্ঞান-শাখার স্থান হইয়াছিল।

প্রাতে ৮টার সময় চারি শাখারই কাজ আরম্ভ হয়। প্রাতঃকালের বৈঠক ১২ টায় ভাঙে, পরে পুনরায় ২টার সময় আরম্ভ হইয়াছিল।

সাহিত্য-শাখা

যথাসময় সাহিত্য-শাখার অধিবেশন আরম্ভ হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি, আই, ই, মহাশয় এই শাখার সভাপতি নির্দ্দিষ্ট ছিলেন। তিনি যথাসময়ে কাজ আরম্ভ করিয়া নিজের অভিভাষণ পড়িয়া শুনাইলেন। বর্দ্ধমানের উকীল শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল্ এই বিভাগের সম্পাদকের কাজ করিতে লাগিলেন।

এবার এই বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ৭০টি প্রবন্ধ আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে ৪০ টি গদ্য এবং ৩০ টি পদ্য ছিল। ইহার মধ্যে ২৭টি গদ্য ও ৬টি কবিতা পঠিত আর ১০টি গদ্য ও ৫টি পদ্য পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে আর পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের নাম ও লেখকের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ক. পঠিত প্রবন্ধ ও কবিতা ঃ

১. লেখ্য ও কথ্য ভাষার মিলন—শ্রী আশুতোষ দাসগুপ্ত (খুলনা)।
২. শ্রীহট্টের ভট্টকবিতা—শ্রী জগন্নাথদেব, শিলচর।
৩. বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণবকবি—শ্রী কমলকৃষ্ণ বসু বি, এল, বর্দ্ধমান।
৪. বাঙ্গালা-সাহিত্য—শ্রী নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা, কালীঘাট।
৫. ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল—শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঢাকা।
৬. ভালবাসা ও মাতৃত্ব—রায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, কলিকাতা।
৭. বাঙ্গালা-শব্দকোষ সমালোচনা—শ্রী যতীশচন্দ্র রায়, এম, এ, পাবনা।

৮. অনন্তপুরী গোস্বামীর কীর্ত্তি ও তিরোভাব—শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বর্দ্ধমান।
৯. নবাই ময়রার জীবন-চরিত—শ্রী কামিনীনাথ রায়, বর্দ্ধমান।
১০. সাহিত্যের অভাব ও তন্নিবারণের উপায়—শ্রী বিজয়লাল দত্ত, কলিকাতা, ভবানীপুর।
১১. মহত্ত্ব—রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ সরস্বতী, বর্দ্ধমান।
১২. সীতা-নির্ব্বাণ—শ্রী নৃত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ, কোচবিহার।
১৩. মুরলীশিক্ষা—শ্রী ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী বি এল্, বসিরহাট।
১৪. গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—শ্রী সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি.এ, বর্দ্ধমান।
১৫. রামদয়াল চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত ও হরির লুটের কথা—শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বর্দ্ধমান।
১৬. সঙ্গীতের ক্রম-বিকাশ—শ্রী শরচ্চন্দ্র সিংহ, কলিকাতা।
১৭. শাক্ত-কবি নীলাম্বর—শ্রী ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, বর্দ্ধমান।
১৮. আমাদের উৎপত্তি বিষয়ে ভাষার সাক্ষ্য—শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, কাছাড়।
১৯. মির্জ্জা হোসেন-আলী—শ্রী বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
২০. শিক্ষা-তত্ত্ব—শ্রী কালীরঞ্জন লাহিড়ী।
২১. পৌরাণিক কালের কামরূপের পরিচয়—শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌহাটী।
২২. পূর্ব্ববঙ্গের শব্দ-সম্পদ ও তাহার বিশেষত্ব—শ্রী অবনীকান্ত সাহিত্য-বিশারদ, ঢাকা।
২৩. চুপীর দেওয়ান মহাশয়—শ্রী ভুলুয়া বাবা, বর্দ্ধমান।
২৪. হিন্দু-মুসলমান—ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, ২৪ পরগণা।
২৫. প্রেমে কাব্য—কাব্যে প্রেম—শ্রী তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, বরিশাল।
২৬. সাহিত্যে মানব হৃদয়—মহারাজ শ্রী জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, নাটোর।
২৭. বাঙ্গালার শিল্প—শ্রী অসিতকুমার হালদার, বোলপুর।

খ. পঠিত কবিতা ঃ

২৮. অভিনন্দন—শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি.এ, বর্দ্ধমান।
২৯. মাতৃ-দর্শন—রায় শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর এম্ এ, বি, এল, কলিকাতা।
৩০. অবিরাবীর্ম এধি—শ্রী জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, চট্টগ্রাম।
৩১. দেশ-প্রকৃতির পূজা—শ্রী অকিঞ্চন দাস।
৩২. সম্মিলন—শ্রী ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্.এ, কলিকাতা।
৩৩. বাঙ্গালা-দেশ—শ্রী বিভূতিভূষণ মজুমদার, নদীয়া।

গ. পঠিত বলিয়া গৃহীত প্রবন্ধ ঃ

৩৪. বাঙ্গালা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন—শ্রী রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।
৩৫. বর্ত্তমান সাহিত্যের অভাব ও তৎ-প্রতিকার—শ্রী শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৩৬. বঙ্গীয় সাহিত্য ও সমাজ-শিক্ষা—শ্রী রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।
৩৭. বাঙ্গালা সাহিত্যের অভাব ও তন্নিবারণের উপায়—শ্রী উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
৩৮. সত্যনারায়ণের পুথি—শ্রী প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল, রঙ্গপুর।
৩৯. নবনাগরিক সাহিত্য—শ্রী রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বহরমপুর।
৪০. সাহিত্য-বিজ্ঞান ও সীতারাম—শ্রী বিষ্ণুচরণ সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য।
৪১. সাহিত্য ও চিত্রশিল্প—শ্রী সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, লাহোর।
৪২. মুসলমান কবির বাঙ্গালা-কাব্য—মুন্সী আবদুল করিম, চট্টগ্রাম।
৪৩. দ্বিজ রামপ্রসাদ—শ্রী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঢাকা।
৪৪. মেয়েলী-ব্রত—শ্রী ভোলানাথ ব্রহ্মচারী বর্দ্ধমান।

ঘ. পঠিত বলিয়া গৃহীত কবিতা ঃ

৪৫. আবাহন—শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি,এ, বর্দ্ধমান।
৪৬. বিদায়—শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি,এ, বর্দ্ধমান।
৪৭. স্বাগত—শ্রী ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
৪৮. অভিনন্দন—শ্রী বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়।
৪৯. কবি-কথা—শ্রী গিরিজাকুমার বসু।

দর্শন-শাখা

মূল-সভামণ্ডপের একপার্শ্বে দর্শন-বিভাগের সভা বসিয়াছিল। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, এই বিভাগের সভাপতি ছিলেন। হীরেন্দ্রবাবু নিজের অভিভাষণ পড়িয়া শুনাইলেন। এই বিভাগে ২২টী প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল; তন্মধ্যে ১৬টী পঠিত হইয়াছিল, একটী পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। নিম্নে প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-লেখকের নামাদি দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার বসু এম্. এ মহাশয় এই বিভাগের সম্পাদকের কাজ করিয়াছেন।

১. বর্ত্তমান দর্শন ও বাঙ্গালা-সাহিত্যে তাহার প্রভাব—শ্রী নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, বি. এল্ বরিশাল।
২. হিন্দু ও বৌদ্ধ-দর্শনের পার্থক্য কোথায়?—শ্রী ক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ, দেবীপুর, বর্দ্ধমান।
৩. প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য-আবিষ্কারের তারতম্য—শ্রী নলিনীকান্ত বসু, মালদহ।

৪. বৌদ্ধধর্ম্মের দুঃখ-নিবারণের উপায় কি?—গুণালঙ্কার মহাস্থবির, কলিকাতা।
৫. দর্শনশাস্ত্রে মুসলমান—মহম্মদ কে চাঁদ, ২৪ পরগণা।
৬. গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সারতত্ত্ব—ডাঃ শ্রী প্রিয়নাথ নন্দী, কলিকাতা।
৭. বৌদ্ধধর্ম্মে মুক্তি বা নির্ব্বাণ—শ্রী সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।
৮. দর্শনের সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ-বিচার—শ্রী ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।
৯. নব্য ইউরোপীয় দর্শন—শ্রী রবীন্দ্রকুমার বসু এম্ এ, কলিকাতা।
১০. পাশ্চাত্য দর্শনের অভিনব ব্যঞ্জনা—শ্রী নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা।
১১. ভক্তির ক্রমবিকাশ—রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, বাঁকিপুর।
১২. বিশ্ব-জাগরণ—শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, যশোহর।
১৩. আধুনিক দর্শনের গতি—শ্রী শিশিরকুমার মৈত্র, কলিকাতা।
১৪. গৌতমবুদ্ধের ধর্ম্ম—শ্রী রমাপ্রসাদ চন্দ্র বি, এ, রাজসাহী।
১৫. তন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি।
১৬. বেদান্ত-প্রচারে বাঙ্গালী—শ্রী পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ, যশোহর।
১৭. আয়ুর্ব্বেদের জীব-তত্ত্ব—কবিরাজ বিজয়কৃষ্ণ দাসগুপ্ত, কলিকাতা।

এই দিন এই শাখার সমস্ত প্রবন্ধ পড়া শেষ হয় নাই। পরদিন প্রাতে ইহার আর একটী অধিবেশন হইবে স্থির করিয়া সভার কার্য্য শেষ করা হয়।

ইতিহাস-শাখা

যথাসময়ে রাস-মঞ্চের সম্মুখে নির্দ্দিষ্ট তাঁবুতে ইতিহাস-শাখার অধিবেশন হইয়াছিল। পাটনা-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণ পড়িয়া শুনাইলে এই বিভাগের প্রবন্ধ পঠিত হইতে থাকে। এই বিভাগে এবার সর্ব্বশুদ্ধ ৩০টী প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে ২২টী প্রবন্ধ পড়া হইয়াছিল ও ১টী পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত বামাচরণ মজুমদার এই বিভাগের সম্পাদকের কার্য্য কতকটা করিয়াছিলেন। নিম্নে প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-লেখকের নাম দেওয়া হইল ঃ

১. বর্দ্ধমানের পুরাবৃত্ত—শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু।
২. পীর বহরাম—মৌলবী খোন্দকার গোলাম আহম্মদ।
৩. ধীমান ও বীতপাল—শ্রী সুরেন্দ্রনাথ কোঙার, এম্ এ।
৪. গুলবদন বেগম—শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫. রাজার পোতা ও বারাশত—শ্রী সুরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল্।
৬. তারকেশ্বর তীর্থ-তত্ত্ব—শ্রী রাজকুমার বেদতীর্থ।

৭. খাজা আনোয়ার—মৌঃ আবদুল লতিফ।
৮. শ্যামে হিন্দুধর্ম্ম—শ্রী গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ।
৯. বাজার-দর ও বর্ত্তমান সমস্যা—শ্রী কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্ এ।
১০. গোরাচাঁদ শাহ ও আবেদা খাসবিবি—ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
১১. শ্যামারূপার গড়—মহারাজ কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।
১২. অত্তরঙ্গাবাদ—মৌঃ আফ্‌সারউদ্দীন আহম্মদ।
১৩. সবঙ্গ ও লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন—শ্রী ব্রজনাথ চন্দ্র।
১৪. কৈবর্ত্তজাতি ও ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণ—শ্রী সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস।
১৫. আসামে আর্য্য-প্রভাব—শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৬. ভারতের পণ্য ও ভারতে বৈদেশিক জাতি (গ্রীক যুগ)—শ্রী সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
১৭. হিন্দুর মুখে আওরঙ্গজেবের কথা—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ।
১৮. নগদবাকী—শ্রী ক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ।
১৯. ভারতীয় শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা—শ্রী মন্মথনাথ ঘোষ।
২০. ভারতের সঙ্গে চীনের সম্বন্ধ—গুণালঙ্কার মহাস্থবির।
২১. বঙ্গীয় স্থাপত্যের ধারা—শ্রী ননীগোপাল মজুমদার।
২২. ভারতীয় স্থাপত্য-বিজ্ঞান—শ্রী মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।
২৩. বেদে সরমা—শ্রী শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ (পঠিত বলিয়া গৃহীত)।

অভ্যর্থনা-সমিতি, রাঢ়ের প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় ও অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়গণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতি ইঁহাদের অনুসন্ধানের ফলাফল লেখাইয়া পুস্তিকাকারে ছাপাইয়া সম্মিলনে বিতরণ করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবু এখনকার নদীয়াজেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম—বিক্রমপুরে (পূর্ব্বে ইহা বর্দ্ধমান জেলায় ছিল) বল্লালসেনের নামজড়িত কতকগুলি দীঘি, জাঙ্গাল, ঢিপির সন্ধান পাইয়া সেই সকল স্থান হইতে খুঁজিয়া বিস্তর প্রত্ন-তত্ত্বের উপকরণ আবিষ্কার করেন এবং তাঁহার ধারণা হয় যে, এই দেবগ্রাম-বিক্রমপুরেই বল্লালসেনের রাজধানী ছিল। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত রামপাল গ্রামে বল্লালসেনের যে সকল কীর্ত্তি-চিহ্ন আছে, তাহা দেখিয়া ঐতিহাসিকেরা রামপাল গ্রামের নিকটেই বল্লালী-বিক্রমপুরের অস্তিত্ব এতদিন কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন। এখন এই নূতন বিক্রমপুরের সংবাদ নগেন্দ্রবাবু বাহির করায় অনেকেই ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য ইতিহাস-বিভাগের সভাপতি মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন। সভায় যখন এই কথার প্রস্তাব হয়, তখন সভাপতি মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর অনুসন্ধান-সম্বন্ধে বলেন যে, নগেন্দ্রবাবু তাঁহার এই পুস্তিকার বহুস্থানে

বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই, ঢিপিগুলি খুঁড়াইয়া না দেখিলে মীমাংসা হইবে না। অতএব এই অসম্পূর্ণ ব্যাপারের বাদ-প্রতিবাদ না হওয়াই ভাল। তথাপি যাঁহারা প্রতিবাদ করিতে চাহেন, তন্মধ্যে ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি কিছু বলিলে ভাল হয়। যতীন্দ্রবাবুও প্রবন্ধ এবং অনুসন্ধান অসম্পূর্ণ বলিয়া বিশেষ কোন প্রতিবাদ করিতে অস্বীকার করেন, কেবল নগেন্দ্রবাবুর অনুমানের বিপক্ষে ২।৩ টি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছিলেন মাত্র। নগেন্দ্রবাবু তাহার জবাবে কিছু বলিতে চাহিলে যদুবাবু তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলেন, "যখন আপনার অনুসন্ধানই এখনও শেষ হয় নাই তখন অনুমানের উপর উভয় পক্ষের বিতণ্ডা ভাল দেখায় না। আরও যখন এই প্রবন্ধ বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতি হইতে এ সভায় আলোচ্যরূপে আসে নাই, অভ্যর্থনা-সমিতির উপহাররূপে আসিয়াছে, তখন এ সভায় ইহার বাদাবাদী-তর্ক না হওয়াই উচিত, তবে যতীন্দ্রবাবুর যুক্তি কয়টি নগেন্দ্রবাবু ভবিষ্যতে অনুসন্ধান-কালে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সত্য-নিরূপণে তাঁহার সাহায্যই হইবে। যতীন্দ্রবাবু নগেন্দ্রবাবুর অনুসন্ধান-প্রণালীর যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এখানে উত্থাপনের প্রয়োজন ছিল না। কাজের প্রণালী আমরা দেখিব না, কাজের ফল লইয়াই আমাদের কথা।" তাহার পর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেবগ্রাম—বিক্রমপুরে প্রাপ্ত প্রাচীনকীর্ত্তির ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতি হইতে বর্দ্ধমানের প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু জানাইলে এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হয় নাই।

অতঃপর সন্ধ্যা হওয়ায় এই বিভাগের অবশিষ্ট প্রবন্ধ পরদিন পড়া হইবে স্থির হয় এবং সভাভঙ্গ হয়।

বিজ্ঞান-শাখা

যথাসময়ে রাজবাড়ীর নাট্যশালায় বিজ্ঞান-শাখার সভা বসিয়াছিল। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এখানে থাকায় তিনিই এই শাখার কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। কটকের রাভেনশা কলেজের অধ্যাপক, বহু গ্রন্থলেখক বিজ্ঞানবিৎ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ মহাশয় এই সভার সভাপতি নির্দ্দিষ্ট ছিলেন, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বিভাগের সম্পাদকের কাজ করেন। সভাপতি আসন পরিগ্রহ করিয়া নিজের অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার এই শাখার গতবর্ষের কার্য্য-বিবরণ পড়া হয়। তাঁহার পর প্রবন্ধ পড়া আরম্ভ হয়; এবার এই বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ১৬টি প্রবন্ধ পড়া হয়। ইহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

১. বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষি-রসায়ন ব্যবহারের উপায়—শ্রী সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ।
২. বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষি-রসায়ন ব্যবহারের উপায় নির্দ্দেশ—শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুহ।
৩. সংখ্যা-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা—শ্রী হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত।
৪. গতি ও স্থিতি—শ্রী দেবপ্রসাদ ঘোষ।
৫. কঠিন পরমাণুর সহিত এসিডো-গুচ্ছ—শ্রী জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত।
৬. আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত বিচার—শ্রী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত।
৭. তড়িৎ বিপর্য্যয়—শ্রী চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
৮. মনুষ্য-রক্তের লোহিত-কণিকার আকার—শ্রী নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
৯. আয়ুর্ব্বেদ সংক্রামক রোগ—শ্রী রাখালদাস সেনগুপ্ত।
১০. দেবতার বাহন—শ্রী ব্রজবল্লভ রায়।
১১. চৌম্বক-বল সম্বন্ধে বিপর্য্যস্ত বর্গবিধির প্রয়োগ-প্রমাণের কতিপয় প্রয়োগ (সচিত্র)—শ্রী জগদিন্দু রায়।
১২. বিদ্যুৎকণার দৌরাত্ম্য—শ্রী নগেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত।
১৩. পঞ্জিকা-সংস্কার—শ্রী মেঘনাথ সাহা।
১৪. কাগজ—শ্রী অনুকূলচন্দ্র সরকার।
১৫. বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব—শ্রী সুরেশচন্দ্র দত্ত।
১৬. বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা—শ্রী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বৈকালে প্রবন্ধ-পাঠাদির পর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রস্তাব করেন, সাধারণ প্রবন্ধ ও মৌলিক গবেষণার প্রবন্ধের সমান আদর করা হউক। —এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। অতঃপর পর বৎসরে এই শাখার সভাপতি-পদে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসুকে নির্ব্বাচিত করা হয়। বর্দ্ধমানের কৃষি-বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

এই দ্বিতীয় দিনের বৈকালে সাহিত্য-শাখার প্রধান সভাপতি মহাশয় জানাইয়া দেন যে, পরদিন—সোমবার প্রাতে, উইলবাড়ীতে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির পুনরধিবেশন হইবে। সেখানে কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রস্তাবের আলোচনা হইবে। পূর্ব্বদিনের মত সমস্ত প্রতিনিধি ও অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ উপস্থিত থাকিবেন এবং পরদিন প্রাতে কোন শাখার অধিবেশন না হইয়া একবারে ১১টার সময় অধিবেশন হইবে। তন্মধ্যে যে দুই শাখার প্রবন্ধ পড়া বাকী রহিল, তাহাদের কাজ শেষ করিতে এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হইবে এবং চারি শাখার সমবেত সভা ১২টায় আরম্ভ করিয়া বেলা

৩টার সময় শেষ করিতে হইবে, নতুবা ট্রেণের সময় কুলাইবে না। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সভাপতি-মহাশয়ের আদেশে অন্যান্য শাখায় গিয়া এই সংবাদ জানাইয়া আসেন।

এই সময়েই প্রথমে সাহিত্য-শাখার পরে অপরাপর শাখায় গিয়া রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্ত-বাচস্পতি এম্ এ বি এল্ মহাশয় জানাইলেন,—সেইদিনই বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে তিনি চলিয়া যাইতেছেন, এজন্য তিনি আজই আগামী বর্ষের জন্য যশোহরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে অতি বিনীতভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া যাইতেছেন। গতবৎসর কলিকাতায় এই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, এ বৎসর নিয়মমত সেই নিমন্ত্রণের পুনরাবৃত্তিমাত্র করা হইল। রায় বাহাদুরের অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ সর্ব্বত্র গৃহীত হইল। এই দিন সন্ধ্যাকালে ইতিহাস-বিভাগের তাঁবুতে ম্যাজিক-লণ্ঠনের সাহায্যে ছবি দেখাইয়া চারিটী প্রয়োজনীয় এবং এবং কৌতূহল-জনক বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল—

প্রথম—পাটনার—প্রাচীন পাটলীপুত্রনগরের প্রাচীনসহরের নিদর্শন, সহরের মাটীর নীচে কিছু পাওয়া যায় কিনা তাহা নানাস্থানে খুঁড়িয়া দেখা যাইতেছে। ৩০ ফুট মাটীর নীচে সেকালের সহরের নানা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। গুলজারবাগ রেল-ষ্টেশনের নিকটে এই সকল বাহির হইয়াছে। রেলের লাইনের ও ষ্টেশনের নীচে আরও আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার এই সকল খুঁড়িয়া বাহির করা জিনিসের, ছবি তুলিয়া আনিয়া তাহা দেখাইয়া "বিহারে বৌদ্ধ-কীর্ত্তি" সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার বক্তৃতাগুণে সকলেই বেশ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। পাটলীপুত্র-প্রসঙ্গে তিনি নালন্দা ও রাজগৃহেরও কয়েকখানি ঐরূপ মাটীর নীচে প্রাপ্ত প্রাচীন নির্দ্দশনের ছবি দেখাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয়—বর্দ্ধমানের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত কয়েকখানি ছবি দেখাইয়া অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনাইয়াছিলেন। কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর কি অবস্থা ছিল, তখন এই পৃথিবীতে কিরূপ পশু-পক্ষী ছিল,—এই কোটী কোটী বর্ষ পরে পাহাড়ের মধ্যে খুঁড়িয়া, মাটির নীচে খুঁড়িয়া তাহার কত রকম নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার কিছু কিছু দেখাইয়াছিলেন, এই কোটী কোটী বর্ষের পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন জমী ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমানেও তাহা পাওয়া গিয়াছে। সেই জমী বর্দ্ধমানের কোন দিকে, কত নীচে, কেমন অবস্থায় আছে, তাহার ছবি দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি এই অংশ দেখাইয়া বলেন,—গঙ্গা-মেঘনার পলি জমিয়া বাঙ্গালাদেশের যে অংশ জন্মিয়াছে, বর্দ্ধমানের জমীর কোন কোন অংশ যে তাহার কোটী কোটী বৎসর অপেক্ষাও পুরাতন। তাহার পর তিনি বর্দ্ধমানের কয়লার স্তরগুলি

কোথায় কেমনভাবে সাজান আছে, তাহা দেখাইয়া দেন। এই বক্তৃতায় শ্রোতারা অতিমাত্র বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিল।

তৃতীয়—এথোড়া-কয়লার খাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় এম্ আই এম্ ই মহাশয় কোন্ জমীতে কয়লা আছে, তাহার পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া খনির উপরের, ভিতরের, নীচের সকল কাজ দেখাইয়া, কয়লা রেলে বোঝাই দেওয়া পর্য্যন্ত খনি হইতে কয়লা তোলার সমস্ত কাজটা ছবি দেখাইয়া বুঝাইয়া দেন। খনির কাজে কি রকম যন্ত্র কিং কাজে লাগে, তাহা যন্ত্র ও যন্ত্রের কাজের ছবি দেখাইয়া বুঝাইয়া দেন। কয়লা, সবাই ব্যবহার করে, কিন্তু সেই কয়লা পাইতে যে এত বিরাট ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা অনেকেই জানিতেন না। মন্মথবাবুর এই বক্তৃতায় শ্রোতারা সেই সকল দেখিয়া শুনিয়া চমৎকৃত ও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

চতুর্থ—বর্দ্ধমান কৃষি-প্রধান দেশ। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি-কার্য্য চালাইবার জন্য গভর্ণমেন্ট বর্দ্ধমানে আদর্শ-কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বর্দ্ধমান-বিভাগের এই কৃষিক্ষেত্রের অধ্যক্ষ। তিনি ছবি দেখাইয়া বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রণালী, যন্ত্রের ব্যবস্থা সমস্ত বুঝাইয়া দেন। এই বক্তৃতায় অনেকেই কাজের কথা শুনিয়া গিয়াছেন।

এই দিনও রাত্রিতে রাজবাড়ীর নাট্যশালায় অভ্যাগতগণের জন্য প্রথমেই কলিকাতা মেরীগোল্ড ক্লাবের লোকেরা "চাটুয্যে-বাঁড়ুজ্যে" অভিনয় করেন এবং পরে বর্দ্ধমানের থিয়েটার সম্প্রদায় মহারাজের "শিবশক্তি", ক্ষীরোদবাবুর "বরুণা" অভিনয় করেন। দর্শকের মধ্যে ক্ষীরোদবাবুও উপস্থিত ছিলেন। সভামণ্ডপে কীর্ত্তন হইয়াছিল।

তৃতীয় দিন

সময়—২২শে চৈত্র, ১৩২১, ৫ই এপ্রিল, ১৯১৫ সোমবার।

তৃতীয় দিন প্রাতে পূর্ব্বদিনের নির্দ্দেশমত উইলবাড়ীতে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কাশিমবাজারের বিদ্যোৎসাহী মহারাজ বাহাদুরও এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আলোচনার পর অনেকগুলি আলোচ্য বিষয় সম্মিলনের আলোচনার জন্য অবধারিত হয়। বেলা ১০ টার সময় এই সভা ভঙ্গ হয়।

অতঃপর বেলা ১২টার সময় ইতিহাস ও দর্শন-বিভাগের অবশিষ্ট প্রবন্ধ পাঠের জন্য যথাস্থানে স্বতন্ত্র দুই বৈঠক বসিয়াছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে দুই খণ্ড সভার কার্য্য শেষ হইলে চারিশাখা একত্র হইয়া বেলা একটার সময় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

এই দিন কয়টি গান গাইবার ও কয়টি কবিতা পাঠের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম-যাত্রী অভ্যাগতবর্গের ট্রেণের সুবিধার জন্য ৩টার সময় সম্মিলনের কাজ শেষ করিবার পরামর্শ স্থির হইলে, গানগুলি গীত ও কবিতাগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (পরিশিষ্টে গান ও কবিতা দ্রষ্টব্য।)

তৎপরে সভার কার্য্যারম্ভ হইলে, গত বৎসরের মৃত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধুগণের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা হয়। সভাপতি মহাশয় স্বয়ং এই সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া শোক প্রকাশ করেন।

নিম্নলিখিত সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যানুরাগীদিগের পরলোকগমনে এই সাহিত্য-সম্মিলন শোক প্রকাশ করিতেছেন,

১. স্যার তারকনাথ পালিত।
২. রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।
৩. মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
৪. মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন।
৫. পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্।
৬. নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর এম্ এ, বি এল্।
৭. কৈলাসচন্দ্র সিংহ।
৮. অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী।
৯. শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
১০. ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।
১১. অধ্যাপক কালীপদ বসু এম্ এ।
১২. রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুর।

১৩. অধ্যাপক অনাথনাথ পালিত এম্ এ।
১৪. কিশোরীমোহন রায় ("সুরাজ"-সম্পাদক)
১৫. দুর্গাদাস রায়চৌধুরী।
১৬. তারাপ্রসন্ন মিত্র।
১৭. রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।
১৮. কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ
১৯. গুরুনাথ সেন কবিরত্ন।
২০. দেবীদাস করণ।
২১. সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়।
২২. বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ, বি.এল।
২৩. রায় হরিমোহন সিংহ বাহাদুর বি.এ।
২৪. প্রিয়নাথ ঘোষ বি.এ।
২৫. সঙ্গীতবিশারদ অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী।

তৎপরে যাঁহারা সম্মিলনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতি-পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, —শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাঁহাদের পত্রাদি সংক্ষেপে পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তন্মধ্যে কতকগুলির নাম প্রকাশিত হইল।

ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল (ঢাকা), শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মল্লিক (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা (গিরিডী), শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্ (চট্টগ্রাম), রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী (রঙ্গপুর), মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী (রাণাঘাট) প্রভৃতি।

অতঃপর বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবগুলির একে একে আলোচনা আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথমেই সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—

১. আমাদের মহামান্য সম্রাটের ও তাঁহার মিত্ররাজগণের বিরুদ্ধে জর্ম্মণী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন সেই যুদ্ধে আমাদের মহামান্য ও সর্ব্বজনপ্রিয় সম্রাটের মঙ্গল কামনা করিতেছেন এবং যাহাতে এই যুদ্ধে ইংরাজরাজের জয়লাভ হয়, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।
২. আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেল মহোদয় বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।
৩. আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় রাজ-প্রতিনিধি মহামান্য গভর্ণর জেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর বর্ত্তমান ঘোর যুদ্ধের বিপুল ব্যয়-সঙ্কুলন করিয়াও যে এদেশে শিক্ষা-

বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রাজ-প্রতিনিধি মহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

এই তিনটি প্রস্তাব সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থাপিত করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৪. বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রসারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা হইয়াছে, তজ্জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ধন্যবাদ জানাইতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিশ্বাস, —বর্ত্তমান সময় বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের যথাসম্ভব আরও প্রসার বৃদ্ধি হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি আপাততঃ সত্বর অবলম্বন করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বি এ শ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরাজী ও সংস্কৃতভাষার ন্যায় বাঙ্গালাভাষা, বাঙ্গালা-সাহিত্য পঠন-পাঠনের এবং ইংরাজী ও সংস্কৃতভাষা পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গালাভাষারও পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) প্রবেশিকা ও ইন্টার-মিডিয়েট ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালায় লিখিতে পারিবে।

(গ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালাভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন।

(ঘ) বাঙ্গালাভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষাবিজ্ঞান এম্ এ পরীক্ষায় অন্যতম বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। অন্যান্য প্রাকৃত-ভাষাও এই পরীক্ষার শিক্ষার বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রকৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা বাঙ্গালাভাষায় বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রস্তাবক—রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ, (কটক)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, (কলিকাতা)

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম্ এ, (ঢাকা)

বর্দ্ধমানের উকীল শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু বি এল্, বহরমপুরের উকীল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন প্রভৃতি কয়েকজনে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলে সভাপতি মহাশয় ভোট লইয়া বহুজনের মত ইহার স্বপক্ষে পাইয়া প্রস্তাব গৃহীত বলিয়া প্রচার করেন।

৫. (ক) সাহিত্য-সম্মিলনের প্রত্যেক অধিবেশনে সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই যোগ দিতে পারিবেন। এই সাহিত্য-সম্মিলনে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীর লোক হইবেন,

(ক) প্রতিনিধিবর্গ—বিভিন্ন সাহিত্য সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ।

(খ) নিমন্ত্রিত, অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ।

(গ) সাহিত্যানুরাগী—সাহিত্যানুরাগী যে সকল ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইবেন।

(ঘ) সাধারণ দর্শকবৃন্দ।

(খ) বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত যে সমস্ত প্রতিনিধি সম্মিলনে উপস্থিত হইবেন তাহাদের প্রত্যেককে ২ টাকা হিসাবে অভ্যর্থনা-সমিতিতে চাঁদা দিতে হইবে। যাঁহারা চাঁদা দিবেন তাঁহারা নিম্নলিখিত বিশেষ অধিকারগুলি পাইবেন,

(১) সম্মিলনে উপস্থাপিত প্রস্তাবাদি বিচারকালে মতামত প্রদান।

(২) সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ একখণ্ড বিনামূল্যে প্রাপ্তি।

(গ) সাধারণ দর্শকদিগের নিকট কোনরূপ টিকিট বেচিয়া প্রবেশিকা লওয়া হইবে কিনা এবং লইতে হইলে কি হারে লইতে হইবে, তাহা যে বৎসর যে স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সে বৎসর সেই স্থানের অভ্যর্থনা-সমিতি স্থির করিয়া দিবেন।

(ঘ) যে সমস্ত সাহিত্যিক ও সাহিত্যনুরাগী ব্যক্তি কোন সভা-সমিতির প্রতিনিধিরূপে সম্মিলনে আসিবেন অথবা অভ্যর্থনা-সমিতির নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবেন, তাঁহারা প্রতিনিধিগণের পূর্ব্বোক্ত দুই অধিকার পাইবেন না, কিন্তু সম্মিলনে তাহার কোন শাখার যে সমস্ত প্রবন্ধ পড়া হইবে, তাহার আলোচনায় যোগদান পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ, বি এল (২৪ পরগণা)
সমর্থক—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় (ভাগলপুর) সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৬. হিন্দু ও মুসলমান—লেখকগণ যাহাতে নিজ নিজ প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি বাঙ্গালাভাষায় প্রকাশ করেন এবং তাঁহারা এমন ভাবে গ্রন্থাদি লেখেন, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান-সম্প্রদায়-মধ্যে বিদ্বেষভাব না জন্মিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হিন্দু ও মুসলমান লেখকদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তাহার পর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, —

৭. বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ও বঙ্গীয়-প্রাদেশিক-সমিতি যাহাতে পরস্পরের অন্তরায় না হইয়া আপন আপন অধিবেশন করিতে পারেন তাহা বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন ছুটির সময় অধিবেশন করিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে এই অন্তরায় দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা হউক।

মুনসী রওশন আলী চৌধুরী এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে এবং শ্রীযুক্ত জলধর সেন অনুমোদন করিলে, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় জানাইলেন যে, এইরূপ প্রস্তাব গত বৎসর কলিকাতার সম্মিলনে হইয়াছিল এবং কুমিল্লা হইতে এই সম্পর্কে প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সের সভাপতির নিকট হইতে তার পাওয়া গিয়াছিল। কলিকাতার সম্মিলনে এই প্রস্তাবের আলোচনায় দুইটী প্রস্তাব পরিগৃহীত হয় এবং তাহা কুমিল্লার সভাপতিকে তারে জানান হয়। (৭ম সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণীতে ২য় ও ৩য় প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।) এই সংবাদ শুনিয়া মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ও সারদা বাবু প্রভৃতি কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি অনুরোধ করিলে দেবকুমার বাবু এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

৮. আসাম, উড়িষ্যা ও বিহার-যুক্ত-প্রদেশে এবং পাঞ্জাবের শিক্ষা-বিভাগের ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে সেই সেই প্রদেশে বঙ্গভাষার সম্ভবতঃ সমধিক প্রচলনের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

(ক) এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, মাননীয় স্যার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হউক, যতীন্দ্রবাবু ইহার সম্পাদক হউন এবং আবশ্যক হইলে, সমিতি স্বীয় সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

প্রস্তাবক—মৌলবী মহম্মদ মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, (কলিকাতা)

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৯. সমগ্র মানভূম জেলায় আবহমানকাল বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত আছে। এখন উক্ত জেলার ধানবাদ মহকুমায়, বিহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগ,

পাঠশালাসমূহে বাঙ্গালা-ভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দী ভাষার প্রচলন করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন তদ্বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছেন এবং আশা করেন, যে বিহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেন্ট শিক্ষা-বিভাগের এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া ধানবাদ মহকুমার পাঠাশালাসমূহে পূর্ব্ববৎ, বাঙ্গালা-ভাষা শিক্ষা প্রদান করিবেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত (মানভূম)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় (ময়মনসিংহ)

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব-সম্বন্ধে জানাইলেন যে, এ সকল ব্যাপার সভা-সমিতিতে প্রস্তাব করিয়া বিশেষ ফল হয় না। আমি ভার লইতেছি, —এই প্রস্তাব লইয়া আমি বিহার ও উড়িষ্যার ছোটলাট বাহাদুর এবং তাঁহার সেক্রেটারীগণের সঙ্গে দেখা করিয়া যাহাতে এই প্রস্তাব সফল হয় তাহার চেষ্টা করিব। সারদা বাবুর এই প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় অনুমোদন করিলে, ক্ষেত্রবাবু এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

১০. বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য দেশমধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা ও পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য বঙ্গের সমস্ত ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও লোক্যাল-বোর্ডকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

১১. প্রতি বৎসর যে সকল বাঙ্গালাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন দ্বারা সে সকল গ্রন্থের একটি তালিকা সংগৃহীত করিয়া সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করা বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে যথোচিত ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ করা হউক।

১২. বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য করা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইবে এরূপ ব্যক্তিগণকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে এই বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের উদ্যোগে একটি ধনভাণ্ডার স্থাপিত হউক।

এই তিনটি প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় নিজে প্রস্তাব করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৩. আগামী বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি গঠিত হউক,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ (পাটনা)

সমর্থক—গুণালঙ্কার মহাস্থবির (চট্টগ্রাম)

(নামগুলি "গ" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

অতঃপর কাশিমবাজারের মহারাজ মাননীয় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর উঠিয়া সভায় জানাইলেন যে, বহুকাল হইতে দৃগ্-গণিত মিলাইয়া আমাদের হিন্দুর পঞ্জিকা-

সংস্কার করা হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ আমাদের জ্যোতির্ব্বিদ্‌-মতে যন্ত্র-গৃহ নাই। যে দুইটি মান-মন্দির (কাশীতে ও জয়পুরে) আছে, তাহাতে আর এখন কাজ হয় না। কাজেই একটি পূর্ণাঙ্গ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে, হিন্দুর পঞ্জিকা হিন্দু-মতে সংস্কার করিতে পারা যাইবে না। আজ প্রাতঃকালে বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণানন্দ কবিভূষণ ও রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম-এ বিদ্যানিধি মহাশয়েরা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। আলোচনায় স্থির হয় যে, হিন্দু-জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে একটা মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টার জন্য জমী, বাড়ী ও যন্ত্রাদির ব্যয় ব্যতীত মাসিক ২০০্ টাকা খরচে কাজ চলিবে বলিয়া স্থির হয়। আমি বিষয়টির সমস্ত খরচ দিতে প্রস্তুত আছি। এখন আপনারা উপযুক্ত পণ্ডিতবর্গকে লইয়া এ বিষয়ের আয়োজন-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

মহারাজের এই প্রস্তাবে ও বদান্যতায় সকলেই অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়, একটি প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা সভাপতি মহাশয়ের হাতে দিয়া জানাইলেন যে, এই মুদ্রাটি তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করিলেন। মুদ্রাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় এটি দেখিয়া বলিয়াছেন যে, এটি দুষ্প্রাপ্য এবং নরসিংহ গুপ্তের মুদ্রা। সভাপতি মহাশয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে সুরেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ করিয়া মুদ্রাটি গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে বৈঁচি নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, আপনার প্রণীত "তিনটি পথ" নামক পুস্তকের পাঁচশত খণ্ড সাহিত্যিকবর্গকে বিতরণের প্রস্তাব করিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইল।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত রওশন আলী সাহেব চারি শাখার একত্র অধিবেশন করিবার জন্য প্রস্তাব লিখিয়া সভাপতি-মহাশয়ের হাতে দিলেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আজই প্রাতে কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতিতে এ বিষয়ের আলোচনা হইয়া স্থির হইয়াছে, অভ্যর্থনা-সমিতি প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করিবেন, সুতরাং এখানে এ বিষয়ের আর পুনরালোচনা হইতে পারে না।

অতঃপর আসামের জনৈক প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর কটকী মহাশয় অগুরুর ছালে লেখা একখানি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পুথি দেখাইলেন। পুথিখানি আসামের শঙ্করদেবের রচিত ভাষা-রামায়ণ। ইহাতে নানা রঙ্গীণ ছবি আছে। পুথিখানি অতি প্রাচীন, তবে ভাল অবস্থায় আছে। সভাপতি মহাশয কটকী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন। আসামের অন্য একজন প্রতিনিধি যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দুইটি সংস্কৃত কবিতা পাঠ করেন।

তাহার পর মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর সমস্ত অভ্যাগত, প্রতিনিধি, দর্শক এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা-সমিতির আয়োজন-সেবা এবং আদর আপ্যায়নের জন্য উপযুক্ত ভাষায় ধন্যবাদ করিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, গৌহাটীর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়গণ এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

তাহার পর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় উঠিয়া জানাইলেন যে, যদিও যশোহরের মুখপাত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্ত-বাচস্পতি মহাশয় কালই যশোহরের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি শেষদিনেই নিমন্ত্রণ করাটাই যখন প্রথাসিদ্ধ, তখন আমি সেই নিমন্ত্রণের পুনরুল্লেখ করিতেছি। অনেকে বলিবেন, যশোহরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? —আমার পিতৃদেব রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জন্মভূমিই যশোহর। চৌবাড়িয়াগ্রামে আমাদের সেই পৈতৃক-বাড়ী এখনও বর্ত্তমান আছে। আর যশোহরের সঙ্গে আমাদের অন্য সম্বন্ধও বর্ত্তমান আছে। পিতৃভক্ত ললিতবাবু পিতার নাম স্মরণ করিয়াই বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ললিতবাবুর নিমন্ত্রণ সকলেই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর অভ্যর্থনা-সঙ্গীত-সমিতির অন্যতম গায়ক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী সুস্বরে উচ্চকণ্ঠে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি এ মহাশয়ের রচিত "বিদায়" সঙ্গীতটি গাহিয়া সকলের মনকে বিদায়ের দুঃখে অভিভূত করিয়া তুলিবেন। (খ-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

অতঃপর বর্দ্ধমানবাসীর পক্ষ হইতে, অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে এবং বর্দ্ধমানের মহারাজরূপে মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর সমাগত ভদ্রলোক-দিগের নিকট নানাবিধ সেবা-ত্রুটী জানাইয়া বলিলেন,—

আজ তিনদিন ধরিয়া আপনারা এইস্থানে সাহিত্য-সেবা করিয়াছেন। সাহিত্যের নামে-সাহিত্য-সেবার জন্য আপনারা দূর-দেশান্তর হইতে এখানে আসিয়াছেন, দেখিতে দেখিতে আপনাদের যাইবার সময় হইয়া আসিল, আধুনিক প্রচলিত প্রথায় তাই আজ বর্দ্ধমানবাসীর পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে উঠিয়াছি। এ প্রথাটি এ দেশের নহে, কারণ নীরবে আনন্দাশ্রুর সঙ্গে কৃতজ্ঞতা-বহন করাই এ দেশের নিয়ম, তাহা আর এখন নাই। যাহা হউক, আপনাদের সেবার প্রতিপদে কত শত প্রত্যবায় ঘটিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। এখানে সাহিত্য-চর্চ্চার কাজ কেমন হইল, তাহার বিচার আপনারা করিবেন। বর্দ্ধমানবাসী তাহার অধিকারী নহে, কারণ সাহিত্য-সম্মিলন বর্দ্ধমানে এই প্রথম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্মিলনে বর্দ্ধমান হইতে যে বেশী প্রতিনিধি গিয়াছেন, তাহাও নহে। বর্দ্ধমানবাসী জানিত না সাহিত্য-সম্মিলন কি, ইহাতে কি হয়, ইহাতে যোগদান করিলে কি লাভ হয়? এইবার ঘরে বসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াছে —এখন আমার বিশ্বাস যে, পরে যে সকল সাহিত্য-সম্মিলন হইবে, তাহাতে

বৰ্দ্ধমানবাসীগণ বেশী করিয়া যোগ দিবেন—দূর দেশান্তরে এ সম্মিলন হইলেও সেখানে যাইতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

প্রধান সভাপতি মহাশয় ও চারি শাখার সভাপতি মহাশয়গণ সকলেই বর্দ্ধমানবাসীর হৃদয়ের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিভাষণ শুনিয়া তাহারা আপনাদিগকে ধন্যজ্ঞান করিতেছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বৰ্দ্ধমানে আসায় আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। যে কারণেই হউক, বর্দ্ধমানে শিব-মন্দির কিছু বেশী—এক স্থানেই তো ১০৮ টী শিব-মন্দির বৰ্ত্তমান—বর্দ্ধমান শিবেরই মন্দির। শিবনামসম্পন্ন ব্যক্তিগণেরও বুঝি সেই জন্য বর্দ্ধমানের প্রতি আকর্ষণ এবং বোধ হয় সেই কারণেই হরের প্রসাদস্বরূপ স্বয়ং হরপ্রসাদ আজ এখানে অধিষ্ঠিত। শিবই যতিরাজ, তাই আজ স্বয়ং যতীন্দ্র বর্দ্ধমানে আর ব্যোমকেশরূপী ব্যোমকেশ ত বহুদিন হইতেই স্নেহবশে বর্দ্ধমানে যাতায়াত করিতেছেন।

আপনাদের অভ্যর্থনার জন্য এখানকার সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ মিলিয়া অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা আমায় মুখপাত্র করিয়া আমার উপর আয়োজনের ভার দিয়াছিলেন, সেই জন্য আমি জানাইতেছি যে, আমার কার্য্যে যদি প্রশংসনীয় কিছু থাকে, তবে সেটা তাঁহাদের,আর ত্রুটী যাহা কিছু হইয়াছে তাহা সমগ্র আমারই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের মনোনত কার্য্য করিবার জন্য আমার সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা মোটের উপর আমাকে ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী। বর্দ্ধমানের প্রতি আপনাদের এই আকর্ষণ বর্দ্ধমানবাসী বহুদিন ভুলিবে না। আপনারা যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া, যেরূপ স্নেহ ও প্রীতি দেখাইয়া যাইতেছেন, তাহার জন্য আপনারা বর্দ্ধমান-বাসীর ও আমার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

বর্দ্ধমানের প্রতি জলধরেরও কৃপা হইয়াছে। কুমারখালির পুত্র জলধর এখন বর্দ্ধমানের পুত্র হইয়া পড়িয়াছেন। জলধরকে এমন করিয়া জয় করিয়া আনিয়াছে কে? আমাদের স্বনামখ্যাত দেবেন্দ্রবিজয়।

স্বেচ্ছাসেবকগণ বর্দ্ধমানের তরুণবয়স্ক বালক বা নবীন যুবা। তাহারা এমন গুরুভার কার্য্যের বোঝা আর কখনও বহে নাই, তাহাদের শত ত্রুটী অবশ্যম্ভাবী, আপনারা সে সকল ত্রুটী লইবেন না। তাহাদের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাহারা যে এই কার্য্য এমনভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছে তাহা কিসের বলে জানেন?—আপনাদেরই সন্তানগণের দৃষ্টান্তের বলে। দামোদরের বন্যায় যে স্বেচ্ছাসেবকদল বন্যা-তরঙ্গের ন্যায় আসিয়া বর্দ্ধমান ও তৎসন্নিহিত পল্লীগ্রাম সকল ছাইয়া ফেলিয়াছিল এবং ক্ষুধিতকে খাদ্য, নিরাশ্রয় ও আৰ্ত্তজনে অভয় দিয়া বিপন্ন দেশ রক্ষা করিয়াছিল, তাহাদেরই কাছে তাহারা এ শিক্ষা পাইয়াছে।

সম্মিলন-সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। সম্মিলন—মনের সম্মিলন। মনের সম্মিলন হইলেই দেশের সম্মিলন হইবে, এবং দেশের সম্মিলন হইলেই ভারতের সম্মিলন হইবে। এই সম্মিলনের একটা মন্ত্র আপনাদিগকে বলিয়া দিই, এটি আপনাদের 'অজপামন্ত্র' হওয়া উচিত। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণু
ব্যর্থং কুপ্যসি মষ্যসহিষ্ণুঃ।।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানং।।"

এই মন্ত্রের সাধনায় যতক্ষণ দ্বেষ-হিংসা ও স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া সংযম অবলম্বন করিয়া নিজেকে দশের কাজে লাগাইতে না পারিবেন, ততক্ষণ আপনাদের প্রকৃত সম্মিলন হইবে না। পারমেশ্বরিক প্রেমে যতদিন না ক্ষুদ্রতার শৃঙ্খল খসিয়া পড়িবে, ততদিন আমরা স্বর্গের পথে অগ্রসর হইতে পারিব না—ততদিন দেশের উন্নতি হইবে না। সাহিত্য-সেবার প্রকৃত অর্থ বাক্য-ব্রহ্মে মিলন!

এক্ষণে আপনারা আমার বাচালতা মার্জ্জনা করিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

ইহার পর কাশেমবাজারের মহারাজ বাহাদুর জানাইলেন যে, আগামী বৎসরে অর্থাৎ ১৩২২ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশনের নিমন্ত্রণ যশোহর হইয়াছে। কাল সেখানকার মুখপাত্র রায়বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহাশয় স্বয়ং আপনাদিগকে সে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন, আর ললিতবাবুও সেই নিমন্ত্রণ সমর্থন করিয়া অপনাদিগকে আজ আবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সে নিমন্ত্রণ আপনারা গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে আর এক নিমন্ত্রণ উপস্থিত। বাঁকীপুরের মুখপাত্র রায়বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয় আগামী ১৩২৩ সালের দশম-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন বাঁকীপুরে করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং এই নিমন্ত্রণের ভার আমায় দিয়া গিয়াছেন। আমাদের ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা যে, আমরা একবারে দুই দুই বৎসরের নিমন্ত্রণ পাইতেছি। আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালন-ব্যাপারে ক্রুটী থাকিলেও এই নিমন্ত্রণের আগ্রহ হইতেই বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন দেশের লোকের নিকট স্নেহ-শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিয়াছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। এই সঙ্গে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য শেষ হইল।

উপসংহারে সভাপতি মহাশয় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের শেষ কথার উত্তরে অল্প কথায় তাঁহাকে নিজের পক্ষ হইতে এবং সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন এবং বলিলেন, আমাদের এই সম্মিলন কতকটা রাম-লীলার মত। সেও

তিন দিনের ব্যাপার, এও তাই। সেখানকার রামকে তিনদিন সাজিয়া কেবল বসিয়াই থাকিতে হয়, এখানকার সভাপতিকেও তাই করিতে হয়। এখন বাঁচিলাম, এইবার আসুন, সকলে আনন্দ করিয়া স্ব-রূপে ঘরে ফিরিয়া যাই। এই বলিয়া তিনি সভাভঙ্গ ঘোষণা করিলেন। আনন্দ কোলাহলের মধ্যে নমস্কার, প্রতিনমস্কার ও বিদায়গ্রহণের পর অষ্টম-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন শেষ হইল। বর্দ্ধমানবাসী সযত্নে দুঃখিত-হৃদয়ে সকলকে বিদায় দিলেন।

পরিশিষ্ট "ক"

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির সম্বোধন

শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়ঃ

মহারাজাধিরাজ ও সমবেত সাহিত্যসেবিগণ,

আপনারা বর্ত্তমান সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ শুনিলেন। যিনি এই অভিভাষণ পড়িলেন, তিনি বর্দ্ধমানবাসী-বর্দ্ধমানের রাজা, সুতরাং বর্দ্ধমানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি একা বর্দ্ধমানের নহেন, তিনি সারা বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে আদর করিয়া মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি দিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা মহারাজাধিরাজ বলিয়াই জানি। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও তাঁহার প্রতিনিধিবর্গের পরেই তিনিই বাঙ্গালীর নেতা। তাঁহার আহ্বানে বাঙ্গলা সাহিত্য কৃতার্থ হইয়াছে।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অভিভাষণ অতি সুন্দর হইয়াছে। সংসারে তাঁহার যেরূপ প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা তাহার অনুরূপ অভিভাষণ হইয়াছে। এ অভিভাষণের বিশেষত্ব এই যে, উহা অল্প, সংক্ষেপ। লোকে বলে "রসের সার চুট্‌কী"—উহাতে বাগাড়ম্বর নাই, বর্দ্ধমানের ইতিহাস দিবার চেষ্টা নাই, বাঙ্গলারও ইতিহাস দিবার চেষ্টা নাই। উহার প্রধান চেষ্টা—আমাদের সম্বর্দ্ধনা। সে সম্বর্দ্ধনা যে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

এখন আমার কথা। আপনারা আমাকে সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন, আমি কিরূপে আপনাদের মনোরঞ্জন করিব অনেক দিন ভাবিয়াছি। শেষে স্থির করিয়াছি, আমাদের বাঙ্গলার প্রাচীন গৌরবের কতকগুলি কথা লইয়া আলোচনা করিব। পুরাণ কথা শুনিতে সকলেরই ভাল লাগে। সে পুরাণ কথা যদি আবার আপনাদের হয়, তাহা হইলে আরও ভাল লাগে। আবার যদি এখন আমাদের গৌরব কিছুই না থাকে এবং পূর্ব্বকালে অত্যন্ত অধিক থাকে, তাহা হইলে সে আলোচনা লোককে মাতাইয়া তুলিতে পারে। সেই জন্যই, সেই ভরসাতেই আমার এই সম্বোধন আমি কেবল প্রাচীন গৌরবেরই আলোচনা করিব। কারণ, সুখের স্মৃতি সকল সময়ই মধুর।

আমার এ সম্বোধনে অনেকগুলি পরিচ্ছেদ আছে। আমি পরিচ্ছেদ শব্দ ব্যবহার করি নাই। তাহার জায়গায় গৌরব শব্দ ব্যবহার করিয়াছি,—যেমন প্রথম গৌরব, দ্বিতীয় গৌরব ইত্যাদি। অতি প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা বাঙ্গলার গৌরবের কথা বলিয়া মনে হইয়াছে, সেগুলিকেই সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি।

প্রথম গৌরব

হস্তি-চিকিৎসা

বেদের আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা হাতী চিনিতেন না । কারণ, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে হাতী পাওয়া যায় না। বেদের আর্য্য জাতির প্রধান কীর্ত্তি ঋগ্বেদে "হস্তী" শব্দটি পাঁচ বার মাত্র পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে তিন জায়গায় সায়ণাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন, হস্তযুক্ত ঋত্বিক্ বা পদযুক্ত ঋত্বিক্। দুই জায়গায় তিনি অর্থ করিয়াছেন, হাতী। সে দুইটী জায়গা এই ঃ—

"মহিষাসো মায়িনশ্চিত্রভানবো
গিরয়ো ন স্বতবসো রঘুষ্যদঃ।
মৃগা ইব হস্তিনঃ খাদথা বনা
যদারুণীষু তবিষীরযুগ্ধ্বং।।"

১।৬৪।৭।

'হে মরুৎগণ, তোমরা বড় লোক, জ্ঞানবান, তোমাদের দীপ্তি অতি বিচিত্র। তোমরা পাহাড়ের মত আপন বলে বলীয়ান। তোমরা হস্তী মৃগের মত বনগুলি খাইয়া ফেল। অরুণ বর্ণ দিক্‌সমূহে তোমার বল যোজনা কর।'

"সূর উপাকে তন্বং দধানো
বি যত্তে চেত্যমৃতস্য বর্পঃ।
মৃগো ন হস্তী তবিষীমুষাণঃ
সিংহো ন ভীমঃ আয়ুধানি বিভ্রৎ।।"

৪।১৬।১৪

'হে ইন্দ্র, তুমি যখন সূর্য্যের নিকটে আপনার রূপ বিকাশ কর, তখন সে রূপ মলিন না হইয়া আরও উজ্জ্বল হয়। পরের বলনাশক হস্তী মৃগের ন্যায় তুমি আয়ুধ ধারণ করিয়া সিংহের মত ভয়ঙ্কর হও।'

এ দুই জায়গায়ই, হস্তী মৃগের ন্যায়, "মৃগা ইব হস্তীনঃ", "মৃগো ন হস্তী" এইরূপ প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ এই যে, উহারা হস্তী নূতন দেখিতেছেন। উহাকে মৃগবিশেষ বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে। তাই তাঁহারা মৃগজাতীয় হাতী বলিয়া উহার উল্লেখ করিতেছেন। পলিনেসিয়ার ওটাহিটি দ্বীপের লোক কেবল শূকর চিনিত। ইউরোপীয়েরা যখন সেখানে ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া, আরও নানা রকম জানোয়ার লইয়া গেলেন, তখন তাহারা ঘোড়াকে বলিল চিঁ-হিঁ-হিঁ শূয়ার, কুকুরকে বলিল ঘেউ-ঘেউ শূয়ার, ভেড়াকে বলিল ভ্যা-ভ্যা শূয়ার। আর্য্যগণ সেইরূপ মৃগ চিনিতেন, কেন না তাঁহারা শীকারে খুব মজবুত ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া যখন তাঁহারা হাতী দেখিলেন, তখন তাঁহারা তাহাকে হাতওয়ালা মৃগ বলিলেন।

হাতীর আসল বাসস্থান বাঙ্গলা, পূর্ব্ব-উপদ্বীপ, বোর্ণিও, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপ। পশ্চিমে দেরাদুন পর্য্যন্ত হাতী দেখা যায়, দক্ষিণে মহিসুর ও লঙ্কায় দেখা যায়। আফ্রিকায়ও হাতী দেখা যায়, কিন্তু এত বড় নয়, এত ভাল নয়। সুতরাং বৈদিক আর্য্যেরা যে হাতীর বিষয় অল্পই জানিতেন, সে কথা এক রকম স্থির।

ঋগ্বেদে হাতীর নাম ত ঐ দুই বার আছে। ও যে ঠিক হাতীরই নাম, সে বিষয়েও একটু সন্দেহ। কারণ, "হাতওয়ালা" মৃগ বলিতেছে, যদি স্পষ্ট করিয়া "শুঁড়ওয়ালা" বলিত, তবে কোন সন্দেহই থাকিত না। আরও সন্দেহের কারণ এই যে, সংস্কৃতে হাতীর অনেক নাম আছে ঃ—করী, গজ, দ্বিপ, মাতঙ্গ—ইহার একটি শব্দও ঋগ্বেদে নাই, এমন কি ঐরাবতের নাম পর্য্যন্তও নাই। যাহারা কাল হাতীই চিনিত না, তাহারা সাদা হাতী কেমন করিয়া জানিবে?

ঋগ্বেদে হাতীর নাম থাকুক বা না থাকুক, তৈত্তিরীয় সংহিতায় উহার নাম আছে। অশ্বমেধের কথা বলিতে বলিতে, যখন কোন দেবতাকে কোন জানোয়ার বলি দিতে হইবে এই প্রশ্ন উঠিল, তখন প্রথম এগার জন দেবতাকে বন্য জন্তু দিতে হইবে স্থির হইল। কোন কোন মতে এই বন্য জন্তুর ছবি বলি দিলেই হইল; কোন কোন মতে বলিল, "না, যেমন গ্রাম্য জন্তুর বেলায় আসলেরই ব্যবস্থা, বন্য জন্তুর বেলায়ও সেইরূপ।" এই দেবতা ও জন্তুদিগের নাম যথা ঃ—

রাজা ইন্দ্রকে শূকর দিতে হইবে, বরুণ রাজাকে কৃষ্ণসার হরিণ দিতে হইবে, যমরাজাকে ঋষ্য মৃগ দিতে হইবে, ঋষভ দেবকে গবয় বা নীলগাই দিতে হইবে, বনের রাজা শার্দ্দূলকে গৌর মৃগ দিতে হইবে, পুরুষের রাজাকে মর্কট দিতে হইবে, শকুনরাজ বা পক্ষিরাজকে বতক পাখী দিতে হইবে, নীলঙ্গ সর্পরাজকে ক্রিমি দিতে হইবে, ওষধিদের রাজা সোমকে কুলঙ্গ দিতে হইবে, সিন্ধুরাজকে শিংশুমার দিতে হইবে, আর হিমবান্‌কে হস্তী দিতে হইবে।

ঋগ্বেদে হিমবান্ বলিয়া দেবতার কথা নাই। দশম মণ্ডলে একবার হিমবন্ত শব্দ আছে, তাহার অর্থ বরফের পাহাড়—ঐ পাহাড় ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতায় হিমবান্ দেবতা হইয়াছেন এবং বন্য হস্তী, এখন আর্য্যগণ যাহা ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, তাহাই তাঁহার বলি হইয়াছে। হিমবানের দেবতা হওয়া ও বন্য হস্তীর তাঁহার বলি হওয়া, এই দুই ঘটনায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আর্য্যগণ এখন ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন।

হিমবান্ এক কালে দেবতা ছিলেন না, পরে দেবতা হইয়াছেন। ইহার একটা কারণ বিষ্ণুপুরাণে দেওয়া আছে। সে পুরাণে প্রজাপতি বলিতেছেন, "আমি যজ্ঞের উপকরণ সোমলতাদির উৎপত্তির জন্য হিমালয়ের সৃষ্টি করিয়াছি।" তাই দেখিয়াই কালিদাস বলিলেন, "যজ্ঞাঙ্গযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য" ইত্যাদি। অর্থাৎ হিমালয়ের দেবত্ব পরে প্রজাপতি করিয়াছেন এবং যজ্ঞে তাঁহার ভাগও একটু পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে হাতী পোষা খুব চলিত হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের এক হাতী ছিল। তাঁহার ভাই দেবদত্তেরও হাতী ছিল। বুদ্ধদেব কুস্তী করিতে করিতে একটা হাতী শুঁড় ধরিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন, তাহাতে হাতী যেখানে পড়ে সেখানে একটি ফোয়ারা হইয়া গিয়াছিল। উদয়ন রাজার "নলাগিরি" নামে একটি প্রকাণ্ড হাতী ছিল। তাঁহার নিজের ও চণ্ডপ্রদ্যোতের বড় বড় হাতীশালা ছিল, হাতী ধরারও খুব ব্যবস্থা ছিল।

এই যে হাতী ধরা ও পোষমানান, তাহার চিকিৎসা, তাহার সেবা, যুদ্ধের জন্য তাহাকে তৈয়ার করা—এ সব কোথায় হইয়াছিল? এই প্রশ্নের এক উত্তর আছে। আমরা এখন যে দেশে বাস করি, যাহা আমাদের মাতৃভূমি, সেই বঙ্গদেশই এই প্রকাণ্ড জন্তুকে বশ করিতে প্রথম শিক্ষা দেয় যে দেশের এক দিকে হিমালয়, এক দিকে লৌহিত্য ও এক দিকে সাগর--সেই দেশেই হস্তিবিদ্যার প্রথম উৎপত্তি। সেই দেশেই এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি বাল্যকাল হইতেই হাতীর সঙ্গে বেড়াইতেন, হাতীর সঙ্গে খাইতেন, হাতীর সঙ্গে থাকিতেন, হাতীর সেবা করিতেন, হাতীর পীড়া হইলে চিকিৎসা করিতেন, এমন কি এক রকম হাতীই হইয়া গিয়াছিলেন। হাতীরা যেখানে যাইত, তিনিও সেইখানেই যাইতেন। কোন দিন পাহাড়ের চূড়ায়, কোন দিন নদীর চড়ায়, কোন দিন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে, হাতীর সঙ্গেই তাঁহার বাস ছিল। হাতীরাও তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিত, তাঁহার সেবা করিত, তাঁহার মনের মত খাবার জোগাইয়া দিত, ব্যারাম হইলে তাঁহার শুশ্রূষা করিত।

অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ বঙ্গবাসীর সুপরিচিত। তিনি রাজা দশরথের জামাই ছিলেন। তাঁহার একবার সখ হইল, 'হাতী আমার বাহন হইবে। ইন্দ্র স্বর্গে যেমন হাতী চড়িয়া বেড়ান, আমিও তেমনি করিয়া হাতীর উপরে চড়িয়া বেড়াইব।' কিন্তু হাতী কেমন করিয়া বশ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি সমস্ত ঋষিদের নিমন্ত্রণ করিলেন। ঋষিরা পরামর্শ করিয়া কোথায় হাতীর দল আছে, খোজ করিবার জন্য অনেক লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা এক প্রকাণ্ড আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে আশ্রম "শৈলরাজাশ্রিত", "পুণ্য" এবং সেখানে "লোহিত্য সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে।" সেখানে তাহারা অনেক হাতী দেখিতে পাইল এবং তাহাদের সঙ্গে একজন মুনিকেও দেখিতে পাইল, দেখিয়াই তাহারা বুঝিল যে, এই মুনিই হাতীর দল রক্ষা করেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া রাজা ও ঋষিদিগকে খবর দিল। রাজা সসৈন্য সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঋষি আশ্রমে নাই; তিনি হস্তিসেবার জন্য দূরে গমন করিয়াছেন! রাজা হাতীর দলটি তাড়াইয়া লইয়া চম্পানগরে উপস্থিত হইলেন ও ঋষিদের পরামর্শ মত হাতীশালা তৈয়ারী করিয়া সেখানে হাতীদের বাঁধিয়া রাখিয়া ও খাবার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। ঋষি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার হাতীগুলি নাই। তিনি চারিদিকে

খুজিতে লাগিলেন ও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনেক দিন খুজিয়া খুজিয়া শেষে চম্পানগরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার হাতীগুলি, সব চম্পানগরে বাঁধা আছে, তাঁহারা রোগা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের গায়ে ঘা হইয়াছে, নানা রূপ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লতা, পাতা, শিকড়, মাকড় তুলিয়া আনিয়া বাটিয়া তাহাদের গায়ে প্রলেপ দিতে লাগিলেন, হাতীরাও নানারূপে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। অনেক দিন পর পরস্পর মিলনে, তাঁহার ও তাঁহার হাতীদের মহা আনন্দ। রাজা সব শুনিলেন,—তিনি কে, কি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। মুনি কাহারও সহিত কথা কহিলেন না। ঋষিরা আসিলেন, তাঁহাদের সহিতও কথা কহিলেন না; রাজা নিজে আসিলেন, মুনি তাঁহার সহিত কথা কহিলেন না। শেষে অনেক সাধ্য-সাধনার পর মুনি আপনার পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, "হিমালয়ের নিকটে যেখানে লৌহিত্য নদ সাগরাভিমুখে যাইতেছে, সেখানে সামগায়ন নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ও এক করেণুর গর্ভে আমার জন্ম। আমি হাতীদের সহিতই বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পালকাপ্য। আমি হাতীদের পালন করি, তাই আমার নাম পাল। আর কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম, সেই জন্য আমার নাম কাপ্য। লোকে আমায় পালকাপ্য বলে। আমি হস্তিচিকিৎসায় বেশ নিপুণ হইয়াছি।" তাহার পর রাজা তাঁহাকে হাতীদের বিষয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহার উত্তরে তিনি হস্তীর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার শাস্ত্রের নাম "হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ" বা "পাল-কাপ্য"। উহা প্রাচীন সূত্রের আকারে লেখা। অনেক জায়গায় পদ্য আছে,অনেক জায়গায় গদ্যও আছে। আধুনিক সূত্র সকল কেবল বিভক্তিযুক্ত পদ, তাহাতে ক্রিয়াপদ নাই। প্রাচীন সূত্রের যথেষ্ট ক্রিয়াপদ আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে "ব্যাখ্যাস্যামঃ" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা আছে। প্রাচীন সূত্রের সহিত "পালকাপ্যের" প্রভেদ এই যে, এখানে রাজা ও মুনির কথোপকথনচ্ছলে সূত্র লেখা হইয়াছে। ভরত নাট্যশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন সূত্রে এরূপ কথোপকথন নাই। বোধ হয়, কোন একখানি প্রাচীন হস্তিসূত্র পরে পুরাণের আকারে লেখা হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে যে, ঋষি বলিলেন, "কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম।" কিন্তু চেন্তসাল রাও সি, আই, ই, যে "গোত্রপ্রবরনিবন্ধকদম্বম্" সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার শেষে তিনি প্রায় সাড়ে চারি হাজার গোত্রের নাম দিয়াছেন, ইহাতে কাপ্যগোত্র নাই। অর্থাৎ যে সকল গোত্র-প্রবরের গ্রন্থ এ দেশে চলিত আছে, তাহার কোথাও কাপ্যগোত্রের নাম নাই। তবে পালকাপ্য কিরূপে কাপ্যগোত্রের লোক হইলেন, কিরূপেই বা তাঁহাকে আর্য্য বা ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই পুস্তকের প্রথমে লোমপাদ যে সকল মুনিদের আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাপ্য বলিয়া একজন মুনি আছেন, আশ্বলায়নবৌধায়নাদির সূত্রে তাঁহার নাম

পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, তিনি আর্য্যগণের মধ্যে চলিত গোত্রের লোক নহেন, এ গোত্র বোধ হয় বাঙ্গলা দেশেই চলিত ছিল। পালকাপ্য বঙ্গদেশের লোক ছিলেন। লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের ধারে সমুদ্র ও হিমালয়ের মধ্যে তাঁহার জন্মভূমি ও শিক্ষার স্থান। যদিও অঙ্গরাজ্যে চম্পানগরে তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ লেখা ও প্রচার হয়, তিনি আসলে বাঙ্গলা দেশেরই লোক। এই যে প্রকাণ্ড জন্তু হস্তী, ইহাকে বশ করিয়া মানুষের কাজে লাগান, ইহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা—এ সমস্তই বাঙ্গলা দেশে হইয়াছিল। পালকাপ্য পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে মনে হয় যেন, উহা অন্য কোন ভাষা হইতে সংস্কৃতে তর্জ্জমা করা হইয়াছে, অনেক সময় মনে হয় উহা সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে চলিতেছে না। এ গ্রন্থ যে কত প্রাচীন তাহা স্থির করা অসম্ভব। কালিদাস ইহাকে অতি প্রাচীন শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন। রঘুর ষষ্ঠ সর্গে তাঁহার সুনন্দা অঙ্গরাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, বহুকাল হইতে শুনা যাইতেছে যে, স্বয়ং সূত্রকারেরা ইহার হাতীগুলিকে শিক্ষা দিয়া যান, সেই জন্যই ইনি পৃথিবীতে থাকিয়াই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে "হস্তিপ্রচার" অধ্যায়ে হস্তি-চিকিৎসকের কথা আছে। পথে যদি হাতীর কোন অসুখ হয়, মদক্ষরণ হয়, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে চিকিৎসক তাহার প্রতিবিধান করিবেন, ইহার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং কৌটিল্যেরও পূর্ব্বে যে হস্তি-চিকিৎসার একটি শাস্ত্র ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। যে আকারে পালকাপ্যের সূত্র লেখা, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, উহা অতি প্রাচীন। সুতরাং ম্যাক্সমুলার যাহাকে "Suttra period" বলেন, সেই সময়েই পালকাপ্য সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। বিউলার সাহেব বলেন, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সূত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহারও আগে বশিষ্ঠ ও গৌতমের সূত্র লেখা হয়। পালকাপ্যও সেই সময়েরই লোক বলিয়া বোধ হয়।

ভারতের পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, সূত্র-রচনার কাল আরও একটু আগে হইবে, কিন্তু সে কথা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে যদি বাঙ্গলা দেশে হস্তি-চিকিৎসার এত উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়।

দ্বিতীয় গৌরব

নানা ধর্ম্ম-মত

পূর্ব্বে অনেক জায়গায় আভাস দিয়াছি যে, জৈন ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, আজীবক ধর্ম্ম এবং যে সকল ধর্ম্মকে বৌদ্ধেরা তৈর্থিক মত বলিত, সে সকল ধর্ম্মই বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির প্রাচীন ধর্ম্ম, প্রাচীন আচার, প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন রীতি, প্রাচীন নীতির

উপরই স্থাপিত। আর্য্য জাতির ধর্ম্মের উপর উহা ততটা নির্ভর করে না। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়। এরূপ মনে করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। এই সকল ধর্ম্মেরই উৎপত্তি পূর্ব্ব-ভারতে বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির অধিকারের মধ্যে, যে সকল দেশের সহিত আর্য্যগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—সে সকল দেশের বাহিরে। এ সকল ধর্ম্মই বৈরাগ্যের ধর্ম্ম। বৈদিক আর্য্যদের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে গৃহস্থের ধর্ম্ম। ঋগ্বেদে বৈরাগ্যের নাম গন্ধও নাই। অন্যান্য বেদেও যাগযজ্ঞের কথাই অধিক, সেও গৃহস্থেরই ধর্ম্ম। সূত্রগুলিতেও গৃহস্থের ধর্ম্মের কথা। এক ভাগ সূত্রের নামই ত গৃহ্যসূত্র। সূত্রগুলিতে চারি আশ্রম পালনের কথা আছে। শেষ আশ্রমের নাম ভিক্ষুর আশ্রম। ভিক্ষুর আশ্রমেও বিশেষ বৈরাগ্যের কথা দেখা যায় না। এ আশ্রমের লোক ভিক্ষা করিয়াই খাইবেন, এই কথাই আছে। কিন্তু আমরা যে সকল ধর্ম্মের কথা বলিতেছি, তাহাদের সকলেই বলিতেছে গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ কর। গৃহস্থ-আশ্রমে কেবল দুঃখ। গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাহাতে জন্ম, জরা, মরণ—এই ত্রিতাপ নাশ হয় তাহারই ব্যবস্থা কর। আর তাহা নাশ করিতে গেলে "আমি কে?" "কোথা হইতে আসিলাম?", "কেন আসিলাম?" —এই সকল বিষয়ে চিন্তা করিতে হয়। সেই চিন্তার ফলে কেহ বলেন আত্মা থাকে, কিন্তু সে "কেবল" হইয়া যায়, সংসারের সহিত তাহার আর কোন সংস্রব থাকে না, সুতরাং সে জরামরণাদির অতীত। কেহ বলেন, তাহার অহঙ্কার থাকে না; যখন তাহার অহঙ্কার থাকে না, তখন সে সর্ব্বব্যাপী হয়, সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান হয়, মহাকরুণার আধার হইয়া যায়। এ সকল কথা বেদ, ব্রাহ্মণ বা সূত্রে নাই। এ সব ত গেল দর্শনের কথা, চিন্তা-শক্তির কথা, যোগের কথা।

বাহিরের দিক হইতেও দেখিতে গেলে, এই সকল ধর্ম্মের ও আর্য্যধর্ম্মের আচার-ব্যবহারে মিল নাই। আর্য্যগণ বলেন, পরিষ্কার কাপড় পরিবে, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে, নিত্য স্নান করিবে। জৈনরা বলেন, উলঙ্গ থাক, গায়ের ময়লা তুলিও না, স্নান করিও না। মহাবীর মলভার বহন করিতেন। অনেক জৈন যতি গৌরব করিয়া "মলধারী" এই উপাধি ধারণ করিতেন। আর্য্যগণ উষ্ণীষ, উপানহ ও উপবীত ধারণ করিতেন; তাঁহারা খালি মাথায় থাকিতেন, জুতা পরিতেন না, এক ধুতি ও এক চাদরেই কাটাইয়া দিতেন। আর্য্যগণ সর্ব্বদাই খেউরি হইতেন। অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় একেবারে খেউরি হইত না। তাহাদের নখ, চুল কখন কাটা হইত না। আর্য্যরা মাথা মুড়াইলে মাথার মাঝখানে একটা টিকী রাখিতেন। বৌদ্ধেরা সব মাথা মুড়াইয়া ফেলিত। আর্য্যগণ দিনে একবার খাইতেন, রাত্রিতে একবার খাইতেন। বৌদ্ধেরা বেলা ১২টার মধ্যে আহার করিত; ১২ টার মধ্যে আহার না হইয়া উঠিলে তাহাদের সেদিন আর আহারই হইত না। রাত্রিতে তাহারা রস বা জলীয় পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই খাইতে পারিত না।

খাট ছাড়া আর্য্যগণের শয়ন হইত না। বৌদ্ধেরা উচ্চাসন, মহাসন একেবারে ত্যাগ করিত, তাহারা মাটীতেই শুইয়া থাকিত। আর্য্যগণ সংস্কৃতে লেখা-পড়া করিতেন, অন্য সকল ধর্ম্মের লোক নিজ দেশের ভাষাতেই লেখা-পড়া করিত।

ইহারা এত নূতন জিনিস কোথা হইতে পাইল? এ সকল নূতন জিনিস যখন আর্য্যদের মতের বিরোধী, তখন তাহারা আর্য্যদের নিকট হইতে সে সব পায় নাই। উত্তর হইতে তাহারা এই সব জিনিস পাইতে পারে না, কেন না উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত। হিমালয়ের উত্তর দেশের লোকের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতেই পারে না। দক্ষিণ হইতেও ঐ সব জিনিস আসিতে পারে না, কেননা দক্ষিণের সহিত তাহাদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই, বরং বিন্ধ্যগিরি পার হইয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যাহা কিছু উহারা পাইয়াছে, পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই পাইয়াছে এবং পূর্ব্বাঞ্চলেই আমরা এই সকল নূতন জিনিস কতক কতক এখনও দেখিতে পাই।

জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন, তাহার পর কিছুদিন বৈশালির জৈন-মন্দিরে বাস করেন, তাহার পর বার বৎসর নিরুদ্দেশ থাকেন। এ সময় তিনি পূর্ব্বাঞ্চলেই ভ্রমণ করিতেন। বার বৎসরের পর তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া বৈশালিতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহারও পূর্ব্বের তীথঙ্কর পার্শ্বনাথ কাশীতে জন্ম গ্রহণ করেন, ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন, তাহার পর নানাদেশে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণও পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিক। শেষ জীবনে তিনি সমেতগিরিতে বাস করেন—সমেতগিরি পরেশনাথ পাহাড়। তাঁহারও পূর্ব্বে যে ২২ জন তীর্থঙ্কর ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমেতগিরিতেই বাস করিতেন ও সেই খানেই দেহ রক্ষা করেন।

সাংখ্য-মত এই সকল ধর্ম্মেরই আদি। সাংখ্যের দেখাদেখিই জৈনরা কেবলী হইতে চাহিত—কৈবল্য চাহিত। বৌদ্ধরা বলেন, তাঁহারা সাংখ্যকে ছাড়াইয়া উঠিয়া ছিলেন। কিন্তু সাংখ্যমত আর্য্য-মত নহে, উহার উৎপত্তি পূর্ব্বদেশে। কতকগুলি আধুনিক সময়ের উপনিষৎ ও মনু প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্টলোক উহার আদর করায়, শঙ্কর উহার খণ্ডন করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ কথা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার মতে উহা শিষ্টগণের গ্রাহ্য নহে। উপনিষদে যে সাংখ্য-মত আছে, শঙ্কর তাহাও স্বীকার করেন না,—বলেন ও সকলের অর্থ অন্যরূপ। সাংখ্যকার কপিলের বাড়ী পূর্ব্বাঞ্চলে, পঞ্চশিখের বাড়ীও পূর্ব্বাঞ্চলে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব "অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনং" বলিয়া আরম্ভ করিয়া এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছে যে, পঞ্চশিখ জনক রাজার রাজসভায় আসিয়া রাজাকে উপদেশ দেন। সাংখ্য মত যে পূর্ব্বাঞ্চলের, এ কথা অনেক বার বলিয়াছি। তাই আর এখানে বেশী করিয়া বলিব না।

তৃতীয় গৌরব

রেসম

বাঙ্গলার তৃতীয় গৌরব রেসমের কাজ। ইউরোপীয়েরা চীনদেশ হইতে রেসমের পোকা আনিয়াছিলেন এবং অনেক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা রেসমের কারবার খুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের সংস্কার চীনই রেসমের জন্মস্থান, চীনেরাও তাহাই বলে। তাহারা বলে খৃষ্টের ২৩৪০ বৎসর পূর্ব্বে চীনের রাণী তুঁত গাছের চাস আরম্ভ করেন। রেসমের ব্যবসা সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশে অনেক লেখা-পড়া আছে। চীনেরা রেসমের চাস কাহাকেও শিখিতে দিত না। উটি তাহাদের উপনিষৎ বা গুপ্তবিদ্যা ছিল। জাপানীরা অনেক কষ্টে খৃষ্টের তৃতীয় শতকে কোরিয়ার নিকট রেসমের চাস শিক্ষা করে। ইহারই কিছুদিন পরে চীনের এক রাজকন্যা ভারতবর্ষে উহার চাস আরম্ভ করেন। ইউরোপে খৃষ্টের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে স্থল-পথে চীনের সহিত রেসমের ব্যবসা চলিত। অনেকে মনে করেন, এই রেসমের ব্যবসার জন্যই পাঞ্জাবের শকরাজারা বেশী করিয়া সোণার টাকা চালান। ইউরোপে রেসমের চাস ইহার অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু আমরা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বাঙ্গলা দেশে খৃষ্টের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে রেসমের চাস হইত। রেসমের খুব ভাল কাপড়ের নাম "পত্রোর্ণ" অর্থাৎ পাতার পশম। পোকাতে পাতা খাইয়া যে পশম বাহির করে, সেই পশমের কাপড়ের নাম "পত্রোর্ণ"। সেই পত্রোর্ণ তিন জায়গায় হইত— মগধে, পৌণ্ড্রদেশে ও সুবর্ণকুড্যে। নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল আর বটগাছে এই পোকা জন্মিত। নাগবৃক্ষের পোকা হইতে হলদে রঙের রেসম হইত, লিকুচের পোকা হইতে যে রেসম বাহির হইত, তাহার রঙ গমের মত, বকুলের রেসমের রঙ সাদা, বট ও আর আর গাছের রেসমের রঙ ননীর মত। এই সকলের মধ্যে সুবর্ণকুড্যের "পত্রোর্ণ" সকলের চেয়ে ভাল। ইহা হইতেই কৌষের বস্ত্র ও চীনভূমিজাত চীনের পট্টবস্ত্রেরও ব্যাখ্যা হইল।

উপরে যেটুকু লেখা হইল, তাহা প্রায়ই অর্থশাস্ত্রের তর্জ্জমা। অর্থশাস্ত্রের যে অধ্যায়ে কোন্ কোন্ ভাল জিনিস রাজকোষে রাখিয়া দিতে হইবে, তাহার তালিকা আছে, সেই অধ্যায়ের শেষ অংশে ঐ সকল কথা আছে। অধ্যায়ের নাম "কোষপ্রবেশ্যরত্নপরীক্ষা"। এখানে রত্ন শব্দের অর্থ কেবল হীরা জহরৎ নয়, যে পদার্থের যাহা উৎকৃষ্ট, সেইটির নাম রত্ন। এই রত্নের মধ্যে অগুরু আছে, চন্দন আছে, চর্ম্ম আছে, পাটের কাপড় আছে, রেসমের কাপড় আছে ও তূলার কাপড় আছে। যে অংশ তর্জ্জমা হইল, তাহাতে মগধ ও পৌণ্ড্রদেশের নাম আছে, এই দুইটি দেশ সকলেই জানেন। মগধ—দক্ষিণ-বেহার আর পৌণ্ড্র—বারেন্দ্রভূমি। সুবর্ণকুড্য কোথায়? প্রাচীন টীকাকার বলেন,

সুবর্ণকুড্য কামরূপের নিকট। কিন্তু কামরূপের নিকট যে রেসম এখন হয়, তাহা ভেরাণ্ডা পাতায় হয়। আমি বলি, সুবর্ণকুড্যেরই নাম শেষ কর্ণসুবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণও মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল লইয়া। এখানকার মাটী সোণার মত রাঙ্গা বলিয়া, এ দেশকে কর্ণসুবর্ণ, কিরণসুবর্ণ বা সুবর্ণকুড্য বলিত। এখানে এখনও রেসমের চাস হয় এবং এখানকার রেসম খুব ভাল। নাগবৃক্ষ এখানে খুব জন্মায়। নাগবৃক্ষ শব্দের অর্থ নাগকেশরের গাছ। নগকেশর বাঙ্গলার আর কোনখানে বড় দেখা যায় না, কিন্তু এখানে অনেক দেখা যায়। লিকুচ মাদারগাছ। মাদারগাছেও রেসমের পোকা বসিতে পারে। বকুল ও বটগাছ প্রসিদ্ধই আছে। কৌটিল্য যে ভাবে চীনদেশের পট্টবস্ত্রের উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি চীনদেশের রেসমী কাপড় অপেক্ষা বাঙ্গলার রেসমী কাপড় ভাল বলিয়া মনে করিতেন। রেসমী কাপড় যে চীন হইতে বাঙ্গলায় আসিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণই অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। চীনের রেসম তুঁতগাছ হইতে হয়। বাঙ্গলার রেসমের তুঁতগাছের সহিত কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং বাঙ্গালী যে, রেসমের চাস চীন হইতে পাইয়াছে, একথা বলিবার যো নাই। এখন পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে এই কথা বলিতে হইবে যে, রেসমের চাস বাঙ্গলাতেও ছিল, চীনেও ছিল। তবে তুঁতগাছ দিয়া রেসমের চাস চীন হইতেই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র যে, রেসমের চাস ছিল এ কথা চাণক্য বলেন না। তিনি বলেন, বাঙ্গলায় ও মগধেই রেসমের চাস ছিল। কারণ, পৌণ্ড্রও বাঙ্গলায়, সুবর্ণকুড্যও বাঙ্গলায়। চাণক্যের পরে কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থানে রেসমের চাস হইত। কারণ, মান্দাসোরে খৃঃ ৪৭৬ অব্দে যে শিলালেখ পাওয়া যায়, তাহাতে লেখা আছে যে, সৌরাষ্ট্র হইতে এক দল রেসম-ব্যবসায়ী মান্দাসোরে আসিয়া রেসমের ব্যবসা আরম্ভ করে এবং তাহারাই চাঁদা করিয়া এক প্রকাণ্ড সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মাণ করে।

অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা যে সংবাদ পাইলাম, সেটি বাঙ্গলার বড়ই গৌরবের কথা। যদি বাঙ্গালীরা সকলের আগে রেসমের চাস আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তাঁহাদের গৌরবের সীমাই নাই। যদি চীনেই সর্ব্ব প্রথম উহার আরম্ভ হয়, তথাপি বাঙ্গালীরা চীন হইতে কিছু না শিখিয়াই, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে যে রেসমের কাজ আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহারা ত আর তুঁতপাতা হইতে রেসম বাহির করিতেন না, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে সকল গাছ বিনা চাসে তাঁহাদের দেশে প্রচুর জন্মায়, সে সকল গাছের পোকা হইতেই তাঁহারা নানা রঙের রেসম বাহির করিতেন। চীনের রেসম সবই সাদা, তাহা রঙ করিতে হয়। বাঙ্গলার রেসম রঙ করিতে হইত না, গাছ-বিশেষের পাতার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুতা হইত। আর এ বিদ্যা বাঙ্গলার নিজস্ব—ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

চতুর্থ গৌরব

বাকলের কাপড়

বাঙ্গলার চতুর্থ গৌরব বাকলের কাপড়। প্রথম অবস্থায় লোকে পাতা পরিত। কটকের জঙ্গল-মহলে এখনও দু-এক জায়গায় লোকে পাতা পরিয়া থাকে। তাহার পর লোকে বাকল পরিত; গাছের ছাল পিটিয়া কাপড়ের মত নরম করিয়া লইত, তাহাই জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিত এবং কাঁধের উপর এক খানি ফেলিয়া উত্তরীয় করিত। সাঁচী পাহাড়ের উপর এক প্রকাণ্ড স্তূপ আছে, উহার চারিদিকে পাথরের রেলিং আছে, রেলিং-এর চারি দিকে বড় বড় ফটক আছে। দুই-দুইটি থামের উপর এক একটি ফটক। এই থামের গায়ে অনেক চিত্র আছে। এই চিত্রের মধ্যে বাকল-পরা অনেক মুনিঋষি আছেন। তাঁহাদের কাপড় পরার ধরণ দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, কেমন করিয়া সেকালে লোকে বাকল পরিয়া থাকিত। তাহার পর লোকে আর বাকল পরিত না, বাকল হইতে সূতা বাহির করিয়া কাপড় বুনিয়া লইত; শণ, পাট, ধঞ্চে—এমন কি আতসী গাছের ছাল হইতেও সূতা বাহির করিত। এখন এই সকল সূতায় দড়ী ও থলে হয়। সেকালে উহা হইতে খুব ভাল কাপড় তৈয়ার হইত এবং অনেক কাপড় খুব ভালও হইত। বাকল হইতে যে কাপড় হইত, তাহার নাম "ক্ষৌম", উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম "দুকুল"। ক্ষৌম পবিত্র বলিয়া লোকে বড় আদর করিয়া পরিত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে বাঙ্গলাতেই এই বাকলের কাপড় বুনা হইত। বঙ্গে "দুকুল" হইত, উহা শ্বেত ও স্নিগ্ধ, দেখিলেই চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। পৌণ্ড্রেও দুকুল হইত, উহা শ্যামবর্ণ ও মণির মত উজ্জ্বল। সুবর্ণকুড্যে যে দুকুল হইত, তাহার বর্ণ সূর্য্যের মত এবং মণির মত উজ্জ্বল। এই অংশের শেষে কৌটিল্য বলিতেছেন, ইহাতেই কাশীর ও পৌণ্ড্রদেশের ক্ষৌমের কথা "ব্যাখ্যা" করা হইল। ইহাতে বুঝা যায়, বাঙ্গলাতেই বাকলের কাপড় সকলের চেয়ে ভাল হইত এবং "দুকুল" একমাত্র বাঙ্গলাতেই হইত। সুতারাং ইহা আমরা বাঙ্গলার চতুর্থ গৌরবের বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

এখানে আমরা কাপাসের কাপড়ের কথা বলিলাম না। কারণ, চাণক্যের মতে কাপাসের কাপড় যে সুধু বাঙ্গলাতেই ভাল হইত, এমন নয়—মধুরার কাপড়, অপরান্তের কাপড়, কলিঙ্গের কাপড়, কাশীর কাপড়, বৎস দেশের কাপড় ও মহিষ দেশের কাপড়ও বেশ হইত। মধুরা পাণ্ড্যদেশ, মহিষ দেশ নর্ম্মদার দক্ষিণ, অপরান্ত বোম্বাই অঞ্চলে। কিন্তু চাণক্যের অনেক পরে কাপাসের কাপড়ও বাঙ্গলার একটা প্রধান গৌরবের জিনিস হইয়াছিল। ঢাকাই মস্‌লিন ঘাসের উপর পাড়িয়া রাখিলে ও রাত্রিতে তাহার উপর শিশির পড়িলে, কাপড় দেখাই যাইত না। একটা আংটীর ভিতর দিয়া এক থান মস্‌লিন অনায়াসেই টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া যাইত। তাঁতীরা অতি

প্রত্যূষে উঠিয়া একটি বাখারির কাটি লইয়া কাপাসের ক্ষেতে ঢুকিত। ফট্ করিয়া যেমন একটি কাপাসের মুখ খুলিয়া যাইত, অমনি বাখারিতে জড়াইয়া তাহার মুখের তূলাটি সংগ্রহ করিত। সেই তূলা হইতে অতি সূক্ষ্ম সূতা পাকাইত, তাহাতেই মস্‌লিন তৈয়ার হইত। আকবর যখন বাঙ্গলা দখল করিয়া সুবাদার নিযুক্ত করেন, তখন সুবাদারের সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত হয় যে, তিনি বাঙ্গলার রাজস্ব-স্বরূপ বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র লইবেন, কিন্তু দিল্লীর রাজবাড়ীতে যত মালদহের রেসমী কাপড় ও ঢাকার মস্‌লিন দরকার হইবে, সমস্ত সুবাদারকে যোগাইতে হইবে।

পঞ্চম গৌরব

থিয়েটার

প্রাচীন বাঙ্গলার পঞ্চম গৌরব থিয়েটার। থিয়েটারের সেকালের নাম "প্রেক্ষাগৃহ" বা "পেক্‌খা ঘরঅ"। ইউরোপের অনেক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে থিয়েটার ছিল না, থিয়েটারের ব্যাপার গ্রীস হইতে এখানে আসিয়াছে, থিয়েটার রাজাদের নাচ-ঘরে থাকিত। এ কথা একেবারে ঠিক নয়। আমাদের নিজ গৌরবের কথা আলোচনা করিতেছি। পরনিন্দায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, এক সময়ে দেবাসুরের ঘোর দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে জিতিয়া ইন্দ্র এক ধ্বজা খাড়া করিয়া দেন। ধ্বজার নীচে দেবতার দল আমোদ আহ্লাদ করিতে থাকেন। আমোদ করিতে করিতে তাঁহারা দেবাসুরের যুদ্ধ অভিনয় করিয়া বসিলেন। দেবতারা দেখিলেন যে, "বা! ইহাতে ত বেশ আমোদ হয়। যখনই শক্রধ্বজ তুলা যাইবে, তখনই এই রকম অভিনয় করিতে হইবে।" অসুরেরা বলিল, "বা! আমাদের ছোট করিবার জন্য তোমরা একটা নূতন কীর্ত্তি করিবে, ইহা আমরা কিছুতেই হইতে দিব না।" এই বলিয়া তাহারা অভিনয় ভাঙ্গিয়া দিবার যোগাড় কবিয়া তুলিল। ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া এক বাঁশ লইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিলেন। অসুর মারিতে মারিতে বাঁশের ডগাটি ছেঁচিয়া গেল, তাহার নাম হইল "জর্জ্জর"। জর্জ্জর সেই অবধি নাটকের নিশান হইল। প্রেক্ষাগৃহ তৈয়ার করিতে গেলে আগে জর্জ্জর পুতিতে হইত, নাটক আরম্ভ করিতে গেলে আগে জর্জ্জরের পূজা করিতে হইত। জর্জ্জরের ছয়টি পাপ ছয় রকম নেকড়া দিয়া জড়ান থাকিত। ছয় জন বড় বড় দেবতা উহাতে বাস করিতেন। তাঁহাদের ছয়জনেরই পূজা করিতে হইত। থিয়েটারের ঘর তিন রকম হইত ঃ— এক রকম টানা—অর্থাৎ আগা সরু, গোড়া সরু, মাঝখানটা মোটা, ইহা ১০৮ হাত লম্বা, এরূপ ঘর দেবস্থানেই হইত; আর একরূপ ঘর চৌকোণা—৬৪ হাত লম্বা, ৩২ হাত চেটাল—ইহা রাজাদের জন্য; আর সাধারণ ভদ্র লোকেদের বাড়ীতে যে থিয়েটার হইত, তাহা তেকোণা, সমবাহু-ত্রিভুজ—প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ ৩২ হাত।

থিয়েটার করিবার সময় কানা, খোড়া, কুজা, কুরূপ কোন লোককে সেখানে যাইতে দেওয়া হইত না, এমন কি মজুরী করিতেও ঐরূপ লোক লওয়া হইত না, সন্ন্যাসী, ভিখারীকেও সেস্থানে যাইতে দেওয়া হইত না। ঘর করিবার সময় ঠিক মাঝখানে জর্জ্জর পুতিয়া রাখিতে হইত। থিয়াটারের অর্দ্ধেকটা প্রেক্ষকদিগের জন্য, অর্দ্ধেকটা নটদিগের জন্য। থিয়াটারও দোতালা হইত, প্রেক্ষকদিগের জায়গাও দোতালা হইত। দোতালা ষ্টেজ (রঙ্গ) পৃথিবীর আর কোন দেশে এখনও নাই। পৃথিবীর ব্যাপার একতালায় হইত, স্বর্গের ব্যাপার দোতালায় হইত। প্রেক্ষকদিগের যে অর্দ্ধেকটা স্থান থাকিত; তাহার সম্মুখটা ব্রাহ্মণদের জন্য, সেখানকার থাম সাদা। তাহার পিছনে ক্ষত্রিয়দের স্থান, সেখানকার থামগুলি রাঙ্গা। তাহার পিছনে বৈশ্যের ও শূদ্রের অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করিয়া স্থান, সেখানকার থাম কাল ও হল্‌দে। সম্মুখের সারির অপেক্ষা পিছনের সারি ১ হাত উচা—তাহার পিছনে আর ১ হাত উচা—তাহার পিছনে আর ১ হাত উচা—এইরূপে গেলারি করা ছিল। দোতালার অবস্থাও এইরূপ। ষ্টেজের পিছনে সাজঘর ও বাজনার ঘর, তাহার পিছনে বিশ্রামঘর, তাহারও পিছনে দেবতাদের পূজা করিবার স্থান। ষ্টেজে চিত্র থাকিত; কিন্তু সেগুলি নড়ান যাইত না। ষ্টেজের দেওয়ালের গায়ে উজ্জ্বল বর্ণে কোথাও বাগান, কোথাও বাড়ী, কোথাও শোবারঘর, কোথাও নদীতীর, কোথাও পর্ব্বত আঁকা থাকিত। ষ্টেজের উপরে জর্জ্জরের পূজা হইত ও নান্দী পাঠ হইত। ষ্টেজের দুই পাশে দুই দরজা থাকিত, সেইখান দিয়া পাত্রের প্রবেশ হইত।

যাঁহারা অভিনয় করিতেন, তাঁহারা প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণই ছিলেন। ঋষিদের উপর কটাক্ষ করিয়া কয়েকখানি প্রহসন করায় ঋষিরা শাপ দেন—'তোমরা শূদ্র হইয়া যাইবে।' সেই অবধি উহারা শূদ্র হইয়া যান। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে উহাদিগকে শূদ্রই বলা হইয়াছে।

থিয়েটারের কথা বলিতে গিয়া ভরত মুনি উহার.কতকটা ইতিহাস দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, অনেক সম্প্রদায়ের নটসূত্র ছিল। প্রত্যেক সূত্রেরই ভাষ্য ছিল, বার্ত্তিক ছিল, নিরুক্ত ছিল, সংগ্রহ ছিল, কারিকা ছিল। এই সমস্ত সূত্র একত্র করিয়া ভরত-নাট্যশাস্ত্র হইয়াছে। এই নাট্য-শাস্ত্রখানি বোধ হয় খৃষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল। কারণ, উহাতে শক, যবন ও পহ্লব এই তিনটি জাতির নাম একত্র পাওয়া যায়। জার্ম্মান পণ্ডিত নোলকি বলেন, যে কোন পুস্তকে শক, যবন, পহ্লব এই এই তিনটি নাম একত্র পাওয়া যাইবে, সেই পুস্তক খৃষ্টের ২০০ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ২০০ শত বৎসর পর, ইহার মধ্যে লেখা। নাট্যশাস্ত্রে কিন্তু পহ্লব শব্দ উহার অতি প্রাচীন আকারে আছে, অর্থাৎ পাথ্রব এই আকারে আছে। পার্থিব বা পারদ নামে এক জাতি কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণে আজার-বিজানের পাহাড়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। খৃষ্টপূর্ব ২৫০ হইতে খৃষ্টের পর ২২২ বৎসর পর্যন্ত তাহারা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল।

তাহাদের এক দিকে রোম, অন্য দিকে ভারত—দুই দিকেই তাহারা আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিত। ভারতবাসীরা তাহাদের শেষ অবস্থায় তাহাদিগকে পহ্লব বলিত; প্রথম প্রথম উহাদের নাম ছিল পাথ্রব। এখন, ঐ প্রাচীন জাতিকে পুরাণে পারদ বলে। ভরত সূত্র যদি খৃষ্টের ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে লেখা হয় তাহা হইলে তাহারও পূর্ব্বে অনেক নাট্য সম্প্রদায় ছিল। পাণিনিতে আমরা ২ খানি নটসূত্রের নাম পাই, এক খানি শিলালির, অপরটি কৃশাশ্বের। ভাসের নাটকে আছে যে, বৎসরাজ উদয়ন সূত্রকার ভরতকে আপনার পূর্ব্বপুরুষ মনে করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছিলেন।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের প্রবৃত্তির অনুসারে নাটকের প্রবৃত্তি চারি রকম ছিল। সেই চারিটি প্রবৃত্তির নাম—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী, ও ওড্রমাগধী। দাক্ষিণাত্যের লোকে নাটকে নৃত্য, গীত, বাদ্য বেশী বেশী দেখিতে ভাল বাসিত, তাহারা অভিনয়ও ভাল বাসিত, কিন্তু উহা চতুর, মধুর ও ললিত হওয়া আবশ্যক ছিল। এইরূপ পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরও একটা প্রবৃত্তি ছিল, তাহার নাম ওড্রমাগধী। ওড্রমাগধী প্রবৃত্তি যে সকল দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে বঙ্গদেশ প্রধান। কারণ বঙ্গদেশ হইতেই মলচ, মল্ল, বর্যক, ব্রহ্মোত্তর, ভার্গব, মার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুলিন্দ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি দেশ নাটকের প্রবৃত্তি গ্রহণ করিত। এই নাটকের প্রবৃত্তি এই যে, ইহারা প্রহসন ভাল বাসিত, ছোট ছোট নাটক ভাল বাসিত, পূর্ব্বরঙ্গে আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলধ্বনি ভাল বাসিত; কথোপকথন ভাল বাসিত, আর সংস্কৃত পাঠ ভাল বাসিত; স্ত্রীর অভিনয় তাহাদের আদৌ ভাল লাগিত না, পুরুষের অভিনয়ই তাহাদের পছন্দ ছিল। তাহারা নাটকে গান, বাজনা, নাচ—এ সব ভাল বাসিত না। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, অমৃতবাবুর মুখে শুনিতে পাই, এখনও বাঙ্গালীরা নাচ-গান তত পছন্দ করে না। তবে এখনকার থিয়েটারে যে নাচ-গান হয়, সে কেবল বড়বাজারের খাতিরে।

খৃষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও যদি বাঙ্গলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র রীতি চলিয়া থাকে, তবে তাহা বাঙ্গালীর কম গৌরবের কথা নয়।

ষষ্ঠ গৌরব

নৌকা ও জাহাজ

বাঙ্গলায় যেরূপ বড় বড় নদী আছে, তাহাতে বাঙ্গালীরা যে অতি প্রাচীন কালেও নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নৌকাও অনেকরূপ ছিল—দোণা, দুণি, ডিঙ্গি, ভেলা, নৌকা, বালাম, ছিপ, ময়ূরপঙ্খী ইত্যাদি। এ সকলই ছোট ছোট নৌকা, সকল দেশেই আছে। বাঙ্গলার কিন্তু বড় জাহাজও ছিল।

বুদ্ধদেবেরও আগে বঙ্গদেশে বঙ্গনগরে এক জন রাজা ছিলেন, তিনি কলিঙ্গ দেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজার এক অতি সুশ্রী কন্যা হয়; কিন্তু সে অতি

দুষ্ট ছিল। সে একবার পালাইয়া গিয়া মগধ-যাত্রী এক বণিকের দলে ঢুকিয়া যায়। তাহারা যখন বাঙ্গলার সীমানায় উপস্থিত হইল, তখন এক সিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। বণিকেরা উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কিন্তু রাজকন্যা সিংহের পিছু লইলেন। তিনি সিংহকে সেবায় এতদূর তুষ্ট করিলেন যে, সিংহ তাঁহাকে বিবাহ করিল। কালক্রমে রাজকন্যার এক পুত্র ও এক কন্যা হইল। পুত্রের হাত দুইখানি সিংহের মত হইল, এই জন্য তাহার নাম হইল সিংহবাহু। সিংহবাহু বড় হইলে মা ও ভগিনীকে লইয়া সিংহের গুহা হইতে পলায়ন করিল। বাঙ্গলার সীমানায় উপস্থিত হইলে সীমারক্ষক রাজার শালা রাজকন্যা ও তাহার ছেলে মেয়েকে বঙ্গনগরে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে সিংহ গুহায় আসিয়া ছেলে মেয়েদের না পাইয়া বড়ই কাতর হইল। সেও খুজিতে খুজিতে বাঙ্গলার সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যে গ্রামেই যায়, গ্রামের লোক ভয় পাইয়া রাজার কাছে দৌড়িয়া গিয়া বলে সিংহ আসিয়াছে। রাজা ঢেঁটরা দিলেন, যে সিংহ মারিয়া দিতে পারিবে, তিনি তাহাকে যথেষ্ট বক্‌সিস দিবেন। কেহই তাহাতে স্বীকার করিল না। রাজা সিংহবাহুকে বলিলেন, "তুমি যদি সিংহ ধরিয়া দিতে পার, আমি তোমাকে রাজা করিয়া দিব।" সে সিংহ মারিয়া আনিল ও রাজা হইল এবং আপনার ভগিনীকে বিবাহ করিল। তাহার অনেকগুলি ছেলেপিলে হইল। বড় ছেলের নাম হইল বিজয়। সে বড় দুরন্ত, লোকের উপর বড় অত্যাচার করে। লোকে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল, রাজাকে বলিল, "ছেলেটিকে মারিয়া ফেল।" রাজা ৭০০ অনুচরের সহিত বিজয়কে এক নৌকা করিয়া দিয়া সমুদ্রে পাঠাইয়া দিলেন। বিজয়ের ও তাহার অনুচরবর্গের ছেলেদের জন্য আর এক নৌকা দিলেন ও তাহাদের স্ত্রীদের জন্য আরও এক খানা নৌকা দিলেন। ছেলেরা একটা দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নগ্নদ্বীপ; মেয়েরা আর একটি দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নারীদ্বীপ। বিজয় ঘুরিতে ঘুরিতে, এখন যেখানে বোম্বাই, তাহার নিকটে সুপ্পরাক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল, সংস্কৃতে উহার নাম সুপরার্ক, এখন উহার নাম সুপারা। বিজয় সেখানেও অত্যাচার আরম্ভ করিল। লোকে তাহাকে তাড়া করিল, সেও আবার নৌকায় চড়িয়া পলাইয়া গেল ও লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া নামিল। সে যে দিন লঙ্কাদ্বীপে নামে, সে দিন বুদ্ধদেব কুশী নগরে দুই শালগাছের মাঝে শুইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতেছিলেন। তিনি ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ বিজয় লঙ্কাদ্বীপে নামিল। সে সেখানে আমার ধর্ম্ম প্রচার করিবে, তুমি তাহাকে রক্ষা করিও।"

যে তিনখানি নৌকায় সিংহবাহু বিজয় ও তাহার লোকজন, উহাদের ছেলেপিলে ও পরিবারবর্গ পাঠাইয়া দেন, সে তিনখানিই খুব বড় নৌকা ছিল। ৭০০ লোক যে নৌকায় যায়—সে ত জাহাজ। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে ঐরূপ বড় বড় নৌকা তৈয়ার হইত। বিজয় যে জাহাজে লঙ্কা যান, সে জাহাজের এক খানি

ছবি অজন্তা-গুহার মধ্যে আছে। তাহাতে মাস্তুল ছিল, পাল ছিল, ষ্টীম এঞ্জিন হইবার আগে যে সব জিনিস তাহাতে দরকার, সবই ছিল। অনেকে মনে করেন যে, এ সব কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সেই ছবিটা ত এখনও আছে, তাহা ত অবিশ্বাস করা যায় না। সে ছবিও অল্প দিনের নয়, অন্তত ১৪০০ বৎসর হইয়া গিয়াছে। তখনও লোকে মনে করিত, বিজয় এই ভাবে এইরূপ নৌকায় লঙ্কায় নামিয়া ছিলেন।

বুদ্ধের আগেও ভারতবর্ষের অন্যত্র এরূপ অনেক বড় বড় নৌকা ছিল। বোম্বাই-এর কাছে ভরুকচ্ছ বা ভড়ৌচ একটি বড় বন্দর ছিল। সেখান হইতে বড় বড় জাহাজ ববেরু বা বাবিলন যাইত। সুপারা হইতেও জাহাজ যাইত। এক জাহাজে ৭০০ লোক যাইবার কথা অনেক জায়গায় শুনা যায়। কিন্তু তাম্রলিপ্তি বা বাঙ্গলা হইতে এরূপ জাহাজ যাইবার কথা বুদ্ধদেবের আগে বা পরেও অনেক বৎসব ধরিয়া আর শুনা যায় না। তথাপি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন, বুদ্ধের সময়ও তাম্রলিপ্তি একটি বড় বন্দর ছিল। অর্থশাস্ত্রে বলে যে, যিনি রাজার "নাবধ্যক্ষ" থাকিতেন, তিনি "সমুদ্রসংযানের" ও অধ্যক্ষতা করিতেন। সুতরাং তখনও যে বঙ্গ মগধ হইতে সমুদ্রে জাহাজ যাইত, সে বিষয় আর সন্দেহ নাই। বঙ্গ মগধ হইতে জাহাজ যাইতে হইলে, তাম্রলিপ্তি ছাড়া আর বন্দরও নাই।

দশকুমারচরিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। উইলসন সাহেব মনে করেন যে, উহা খৃষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পরে লিখিত। অনেকে কিন্তু মনে করেন, উহা খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। উহাতে তাম্রলিপ্তি নগরের বিবরণ আছে। সেখান হইতে অনেক পোত বঙ্গসাগরে যাইত। দশকুমারের এক কুমার তাম্রলিপ্তি হইতে সেইরূপ এক পোতে চড়িয়া দূর সমুদ্রে যাইতে ছিলেন। রামেষু নামে এক যবনের পোত তাঁহার পোতকে ডুবাইয়া দেয়। 'রামেষু নাডো যবনস্য' পড়িয়া ইজিপ্টের রাজা রামেসিসের কথা মনে পড়ে। দশকুমার যখন লেখা হয়, তখনও বোধ হয় রামেসিসের স্মৃতি কিছু কিছু জাগরূক ছিল।

খৃষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পরে ফাহিয়ান তাম্রলিপ্তি হইতে এক জাহাজে চড়িয়া চীনযাত্রা করিয়াছিলেন। সে জাহাজে নানা দেশের লোক ছিল। চীন-সমুদ্রে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠে, জাহাজ ডুবু ডুবু হয়, ফাহিয়ান বুদ্ধদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ও ঝড় থামিয়া গেল।

তাহার পরও তাম্রলিপ্ত হইতে চীন ও জাপানে জাহাজ যাইত শুনা যায়। কিছু দিন পর হইতেই সুমাত্রা, জাবা, বালি প্রভৃতি দ্বীপে ভারতবাসীরা যাইয়া বাস করেন এবং তথায় শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহারা কলিঙ্গ ও ভরুকচ্ছ হইতেই গিয়াছিলেন, তাম্রলিপ্তি হইতেও যাওয়ার সম্ভব, কিন্তু এখনও তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন বৃত্তান্তে লেখা আছে যে, মগধ হইতে

অনেকবার লোকে যাইয়া ব্রহ্মদেশ দখল করে ও তথায় সভ্যতা বিস্তার করে। ড্রসেল সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ যে, গোপনে বহু পূর্ব্বে মগধ হইতে লোকজন গিয়াছিল ও তথায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল।

কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পালরাজাদের যে যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা থাকিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। খালিমপুরে ধর্ম্মপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মপালের যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা প্রস্তুত থাকিত, এ কথা স্পষ্ট লেখা আছে। রামপাল নৌকার সেতু করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, এ কথা রামচরিতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। ইংরাজী ১২৭৬ সালে তাম্রলিপ্তি হইতে কতকগুলি বৌদ্ধভিক্ষু জাহাজে চড়িয়া গোপনে গিয়া তথাকার বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কার করেন, এ কথাও কল্যাণী নগরের শিলালেখে স্পষ্ট করিয়া বলা আছে।

কিন্তু মনসা ও মঙ্গল-চণ্ডীর পুঁথিতেই আমরা বাঙ্গলা দেশের নৌকাযাত্রার খুব জাঁকাল খবর পাই,—চৌদ্দ, পোনের, ষোলখানি জাহাজ এক জন সদাগর এক জন মাঝীর অধীনে ভাসাইয়া লইয়া গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতেন, সমুদ্র বাহিয়া সিংহলে যাইতেন এবং তথা হইতেও ১৪/১৫ দিন বাহিয়া মহাসমুদ্রের মধ্যে নানা দ্বীপ উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। চাঁদ-সদাগরের প্রধান জাহাজের নাম মধুকর। কোন কোন পুঁথিতে লেখে যে, মধুকরের ১২০০ শত দাঁড় ছিল। দ্বিজ বংশীদাসের মনসার ভাসানে লেখা আছে, সিংহল হইতে ১৩ দিন মহাসমুদ্রে যাওয়ার পর ভীষণ ঝড় উঠিল, তূলারাশির মত ফেনরাশি নৌকার উপর দিয়া চলিতে লাগিল। চাঁদসদাগর কাঁদিয়াই আকুল,—"আমার যথাসর্ব্বস্ব এই নৌকাগুলিতে আছে, ইহাদের এক খানিও দেখিতে পাই না। আমার নিজের প্রাণও যায়।" তিনি মাঝীকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন,—"তুমি ইহার একটা উপায় কর।" মাঝী তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, যখন পারিলেন না, তখন মধুকর হইতে কতকগুলি তেলের পিপা খুলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন, ঢেউ থামিয়া গেল; দূরে দূরে সব জাহাজগুলি দেখা গেল। চাঁদসদাগর ত আহ্লাদে আট খানা। এই সকল বই লেখার পরও যখন কেদাররায় ও প্রতাপাদিত্য খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সর্ব্বদাই নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন, অনেক সময় দূরদূরান্তরও যাইতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের সহায় ছিল পর্ত্তুগীজ বোম্বেটের দল। ইহার পরেও আবার যখন আরাকানের রাজা ও পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা বাঙ্গলায় বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিল, দেশটাকে সত্য সত্যই 'মগের মুল্লুক' করিয়া তুলিল, তখন আবার বাঙ্গালী মাঝী দিয়াই সায়েস্তা খাঁ তাহাদের শাসন করিলেন। বঙ্গসাগরে বোম্বেটেগিরি থামিয়া গেল।

সপ্তম গৌরব

বৌদ্ধ শীলভদ্র

অভিধর্ম্মকোষ-ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণে লেখা আছে যে, গ্রন্থকার বসুবন্ধু দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় বিরাজ করিতেন। এ কথা যদি ভারতবর্ষের পক্ষে সত্য হয়, তাহা হইলে সমস্ত এসিয়ার পক্ষে যুয়াং চুয়াং যে দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় বিরাজ করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চীনে যত বৌদ্ধ পণ্ডিত জন্মিয়া ছিলেন, যুয়াং চুয়াং তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়। তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্য এক সময় জাপান, কোরিয়া, মঙ্গলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল। যুয়াং চুয়াং বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও যোগ শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়া ছিলেন। তিনি যাহা শিখিবার জন্য আসিয়া ছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী শিখিয়া যান। যাঁহার পদতলে বসিয়া তিনি এত শাস্ত্র শিখিয়া ছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালী। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। ইঁহার নাম শীলভদ্র, সমতটের এক রাজার ছেলে। যুয়াং চুয়াং যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তিনি নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ, বড় বড় রাজা এমন কি সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন পর্য্যন্ত তাঁহার নামে তটস্থ হইতেন, কিন্তু সে—পদের গৌরব, মানুষের নহে। শীলভদ্রের পদের গৌরব অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অনেক বেশী ছিল। যুয়াং চুয়াং একজন বিচক্ষণ বহুদর্শী লোক ছিলেন। তিনি গুরুকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, নানা দেশে নানা গুরুর নিকট বৌদ্ধশাস্ত্রের ও বৌদ্ধযোগের গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহার যে সকল সন্দেহ কিছুতেই মিটে নাই, শীলভদ্রের উপদেশে সেই সকল সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার যে সমস্ত সংশয় দূর করিতে পারেন নাই, শীলভদ্র তাহা এক এক কথায় দূর করিয়া দিয়াছিলেন। শীলভদ্র মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পড়া ছিল। এ ত অনেক বৌদ্ধেরই থাকিতে পারে, বিশেষ যাঁহারা বড বড মহাযান বিহারের কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাদের থাকাই ত উচিত, কিন্তু শীলভদ্রের ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল—তিনি ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণিনি তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল এবং সে সময় উহার যে সকল টীকা-টিপ্পনী হইয়াছিল, তাহাও তিনি পড়াইতেন। ব্রাহ্মণের আদি গ্রন্থ যে বেদ, তাহাও তিনি যুয়াং চুয়াংকে পড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ভারতবর্ষেও আর দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি মনের উদারতা ছিল। যুয়াং চুয়াং-এর পাণ্ডিত্য ও উৎসাহ দেখিয়া যখন নালন্দার সমস্ত পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে দেশে যাইতে দিবেন না স্থির করিলেন, তখন শীলভদ্র বলিয়া উঠিলেন, ‘‘চীন একটি মহাদেশ, যুয়াং চুয়াং ঐখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, ইহাতে তোমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। সেখানে গেলে ইঁহার দ্বারা সদ্ধর্ম্মের অনেক উন্নতি হইবে, এখানে বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে

না।" আবার যখন কুমাররাজ ভাস্করবর্ম্মা যুয়াং চুয়াংকে কামরূপ যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং তিনি যাইতে রাজী হইলেন না, তখনও শীলভদ্র বলিলেন, "কামরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখনও প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই, সেখানে গেলে যদি বৌদ্ধ ধর্ম্মের কিছুমাত্র বিস্তার হয় তাহাও পরম লাভ।" এই সমস্ত ঘটনায় শীলভদ্রের ধর্ম্মানুরাগ, দূরদর্শিতা ও নীতিকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার বাল্যকালের কথাও কিছু এখানে বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি সমতটের রাজার ছেলে, তিনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিদ্যায় অনুরাগ ছিল এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তিও খুব হইয়াছিল। তিনি বিদ্যার উন্নতির জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে নালন্দায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মপাল তখন সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি ধর্ম্মপালের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ধর্ম্মপালের সমস্ত মত আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এই সময় দক্ষিণ হইতে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধের রাজার নিকট ধর্ম্মপালের সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। রাজা ধর্ম্মপালকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধর্ম্মপাল যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, "আপনি কেন যাইবেন?" তিনি বলিলেন, "বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদিত্য অস্তমিত হইয়াছে। বিধর্ম্মীরা চারিদিকে মেঘের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে সদ্‌ধর্ম্মের উন্নতি নাই।" শীলভদ্র বলিলেন, "আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি।" শীলভদ্রকে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হাসিয়া উঠিলেন, —"এই বালক আমার সহিত বিচার করিবে?" কিন্তু শীলভদ্র অতি অল্পেই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দিলেন। সে শীলভদ্রের না যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিল, না বচনের উত্তর দিতে পারিল, লজ্জায় অধোবদন হইয়া সে সভা ত্যাগ করিয়া গেল। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে একটি নগর দান করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, "আমি যখন কাষার গ্রহণ করিয়াছি, তখন অর্থ লইয়া কি করিব?" রাজা বলিলেন, "বুদ্ধদেবের জ্ঞানজ্যোতি ত বহুদিন নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, এখন যদি আমরা গুণের পূজা না কবি, তবে ধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা হইবে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।" তখন শীলভদ্র তাঁহার কথায় রাজী হইয়া নগরটি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার রাজস্ব হইতে একটি প্রকাণ্ড সঙ্ঘরাম নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

যুয়াং চুয়াং এক জায়গায় বলিতেছেন যে, শীলভদ্র বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতিতে প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দশ-কুড়ি খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি যে সকল টীকা-টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি পরিষ্কার ও তাহার ভাষা অতি সরল।

যুয়াং চুয়াং-এর গুরু শীলভদ্র বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত অতি বিরল। ইহা বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় কিনা, তাহা আপনারাই বিবেচনা করিবেন।

অষ্টম গৌরব

বৌদ্ধ লেখক শান্তিদেব

আমি মনে করি যে, যিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের কয়েকখানি খুব চলিত পুথি লিখিয়া গিয়াছেন, সেই মহাত্মা শান্তিদেব বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু তারানাথ আমার বিরোধী। তিনি বলেন, শান্তিদেবের বাড়ী সৌরাষ্ট্রে ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, আমি শান্তিদেবের যে অমূল্য জীবনচরিতখানি পাইয়াছি, তাহাতে কে তাঁহার জন্মভূমির নামটি কাটিয়া দিয়াছে,—এমন করিয়া কাটিয়াছে যে, পড়িবার যো নাই। কিন্তু তাঁহার লীলাক্ষেত্র মগধের রাজধানী ও নালন্দা। তিনি যখন বাড়ী হইতে বাহির হন, তাঁহার মা বলিয়া দিয়াছিলেন, "তুমি মঞ্জুজ্ঞান লাভ করিবার জন্য মঞ্জুবজ্রসমাধিকে গুরু করিবে।" সৌরাষ্ট্রে মঞ্জুশ্রীর প্রাদুর্ভাব বড় শোনা যায় না। সেখানে ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবই বড় কম ছিল।

তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করিবার আরও একটি কারণ আছে। নালন্দায় তাঁহার একটি 'কুটী' বা কুঁড়ে ঘর ছিল। লোকে দেখিত, তিনি যখন ভোজন করিতে বসিতেন, তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত, যখন শয়ন করিতেন, তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত, যখন কুটীতে বসিয়া থাকিতেন, তখনও তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত; সেইজন্য ঃ—

"ভুঞ্জানোপি প্রভাস্বরঃ
সুপ্তোপি প্রভাস্বরঃ,
কুটীং গতোপি প্রভাস্বরঃ।"

এই জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল, "ভুসুকু"। তিনি যখন মগধের রাজধানীতে থাকিতেন, তখন তিনি "রাউতের" কার্য্য করিতেন। এমন কতগুলি বাঙ্গালা গান আছে, যাহার ভণিতায় লেখা আছে "রাউতু ভণই কট, ভুসুকু ভণই কট।" এখন এই রাউতু, ভুসুকু ও শান্তিদেব একই ব্যক্তি কিনা, ইহা ভাবিবার কথা। তিন জনই এক, ইহাই অধিক সম্ভব।

আরও এক কথা, শান্তিদেব তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছেন ঃ—

(১) সূত্র-সমুচ্চয়, (২) শিক্ষাসমুচ্চয় ও (৩) বোধিচর্য্যাবতার। শেষ দুইখানি পাওয়া গিয়াছে ও ছাপা হইয়াছে। প্রথম খানি এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ভুসুকুর নামে আমরা আর একখানি বই পাইয়াছি, সেখানি ভুসুকুর লেখা। উপরের দুই খানির মত এই খানিও সংস্কৃতে লেখা, তবে মাঝে মাঝে বাঙ্গলা আছে। উপরের দুই খানির মধ্যেও আবার শিক্ষা-সমুচ্চয়ে অনেক অংশ সংস্কৃত ছাড়া অপর আর এক ভাষায় লেখা। এখন আপত্তি উঠিতে পারে যে, শান্তিদেবের যে দুইখানি পুস্তক ইতিপূর্ব্বেই পাওয়া

গিয়াছিল, সে দুইখানিই মহাযানের বই; শেষে যেখানি পাওয়া গিয়াছে, সেখানি হয় ব্রজযানের; না হয় সহজযানের। এক লোক কি দুই যানের পুস্তক লিখে? এ সম্বন্ধে বেন্‌ডল সাহেব বলেন যে, শিক্ষা-সমুচ্চয়েও তান্ত্রিক ধর্ম্মের অনেক কথা পাওয়া যায়। আমরাও দেখিয়াছি যে, ব্রজযান, সহজযান ও কালচক্রযান মহাযান ছাড়া নয়। এই সকল যানের লোকেরা মনে করিত যে, "আমরা মহাযানেরই লোক, কেবল আমরা মহাযানকে সহজ করিয়া তুলিয়াছি ও উহার অনেক উন্নতি করিয়াছি। এখনও নেপালী বৌদ্ধেরা বলে, "আমরা মহাযান বৌদ্ধ।" কিন্তু তাহারা বাস্তবিক ব্রজযান বা সহজযানের উপাসক।

বোধিচর্য্যাবতারে শান্তিদেব বার বার বিপক্ষদের একটি কথা বলিয়া গালি দিয়াছেন। সে গালিটি কিন্তু বাঙ্গালা ছাড়া আর কোথাও শুনি নাই-সে কথাটি 'গূথ-ভক্ষক'। আমাদের দেশে দিনরাত্রি এই গালিটি শুনা যায়।

আরও কথা, একটি ভুসুকুর গানে আছে,—

"আজ ভুসুকু তু ভেলি বঙ্গালী। নিজ ঘরিণী চণ্ডালী নেলী।"

আজ ভুসুকু তুই সত্য সত্য বাঙ্গালী হইয়াছিস ইত্যাদি।

এই সকল কারণে আমি শান্তিদেবকে আমাদের অষ্টম গৌরব মনে করি। তেঙ্গুর গ্রন্থে লেখা আছে, শান্তিদেবের বাড়ী জাহোর। জাহোর কোথায় জানি না, তবে উহার সন্ধান হওয়া আবশ্যক।

নবম গৌরব

নাথ-পন্থ

আমাদের দেশে এখন যে সব যোগীরা আছেন, তাঁহাদের সকলেরই উপাধি নাথ। তাঁহারা বলেন, "আমরা এ দেশে রাজাদের গুরু ছিলাম, ব্রাহ্মণেরা আমাদের গুরুগিরি কাড়িয়া লইয়াছে।" তাই এখন আবার তাঁহারা পৈতা লইয়া ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টায় আছেন। নাথেদের আচার-ব্যবহার কিন্তু ব্রাহ্মণদের মত নয়। এই জাতি কোথা হইতে আসিল, অনেক বৎসর ধরিয়া আমি অনুসন্ধান করিতেছি। রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্ণালের পুরাণ-পর্য্যায়ে ১৬শ খণ্ডে হজ্‌সন সাহেবের মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন নাথের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমার প্রথম ধারণা হয় যে, নাথ-পন্থ (Nathism) নামে এক প্রবল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বহু শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলায় এবং পূর্ব্ব-ভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সকলেরই ধারণা ছিল যে, গোরক্ষনাথের "হঠযোগ প্রদীপিকায়" যে চৌদ্দ জন নাথের নাম করা আছে, তাঁহারা সকলেই কবীরের সময়ের লোক। কবীরের সঙ্গে গোরক্ষনাথের কথাবার্ত্তা লইয়া কবীর-পন্থীদিগের একখানি বই আছে, সুতরাং গোরক্ষনাথ ও কবীর এক কালের লোক। কিন্তু বাসিলীফ

তিব্বতীয়-গ্রন্থমালা হইতে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, গোরক্ষনাথ খৃষ্টের ষাট শ বছর পরের লোক। নেপালে বৌদ্ধদিগের সংস্কার যে, সব নাথেরাই বৌদ্ধ ছিলেন, কেবল গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ ধর্ম্ম ছাড়িয়া শৈব হন। বৌদ্ধ অবস্থায় তাঁহার নাম ছিল রমণব্রজ কি অনঙ্গব্রজ। ক্রমে খুজিতে খুজিতে "কৌলবিজ্ঞানবিনিশ্চয়" নামে মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মচ্ছঘ্নপাদের "অবতারিত" একখানি তন্ত্র পাইলাম। উহা যে অক্ষরে লেখা, সে অক্ষর খৃষ্টের নয় শত বৎসরের পর উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই। একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থে মীননাথের একটি বাঙ্গলা পদ তুলিয়া বলিয়াছে যে, ইহা পরদর্শনের মত। আরও অনেক কারণ আছে, যাহাতে বেশ বোধ হয় যে, নাথেরা না-হিন্দু, না-বৌদ্ধ এমন একটি ধর্ম্মমত প্রচার করেন।

শিব তাঁহাদের দেবতা। তাঁহাদের বইগুলি হরপার্ব্বতী-সংবাদে তন্ত্রের আকারে লেখা। তাঁহারাই সেইগুলি কৈলাস হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তাঁহারাই হঠযোগ প্রচার করেন। নানারূপ আসন করিয়া যোগ করা তাঁহাদের ধর্ম্ম। তাঁহাদের ধর্ম্মের মূল কথাগুলি এখনও পাওয়া যায় নাই। যা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, তাঁহারা লোককে গৃহস্থাশ্রম ছাড়িতেই পরামর্শ দিতেন। তাঁহাদের ধর্ম্মে স্বর্গ-অপবর্গের দিকে তত ঝোঁক ছিল না। তাঁহাদের চেষ্টা সিদ্ধিলাভ। এই সিদ্ধি পরিণামে ভেল্কী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মূল নাথেরা কি করিতেন, জানা যায় না; কিন্তু এখন অনেক নাথেরা ভেল্কী দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইন্দ্রিয়সেবায় নাথেদের কোন আপত্তি নাই। এখন যোধপুরের মহামন্দির নাথেদের একটি প্রধান স্থান। নাথজী খুব বড় মানুষ। তাঁহার মহামন্দির একটি প্রকাণ্ড সহর, চারিদিকে পাঁচিল দিয়া ঘেরা। নাথজীদের মন্দিরে গিয়া দেখিলাম, নাথজীরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব নাথেদের পদচিহ্ন পূজা করেন। লোকে নাথজীদের দেবতা বলিয়া মনে করে। তাঁহারা বিবাহ করেন না, কিন্তু তাঁহাদের সন্তানসন্ততি হইবার কোন আপত্তি নাই, মদ্যমাংসেও তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই। নাথজীর এক ভাঁটি মদ নামিতে দশ হাজার টাকা খরচ হয়।

নাথেরা যে বাঙ্গলা দেশের বা পূর্ব্ব-ভারতের লোক, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ—মীননাথের একটি পদ পাইয়াছি, সেটি খাঁটি বাঙ্গলা। গোরক্ষনাথের লীলাক্ষেত্র বাঙ্গলাতেই অধিক। তাঁহারই চেলা হাড়িপা আমাদের ময়নামতীর গানের নায়ক। মীননাথ যখন তাঁহার নিজের ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিলেন, গোরক্ষনাথই তখন তাঁহাকে সে কথা মনে করাইয়া দেন। মৎস্যেন্দ্রনাথকে অনেক সময় মচ্ছঘ্ননাথ বলে, অর্থাৎ তিনি জেলের ছেলে ছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার বাঙ্গলা দেশের লোক হওয়াই সম্ভব।

ক্রমে নাথ পন্থ খুব প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধেরা ও হিন্দুরা নাথেদের উপাসনা করিত। মৎস্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নাম গন্ধ না থাকিলেও, তিনিই এখন

নেপালী বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতা। তাঁহার রথযাত্রায় নেপালে যেমন ধুমধাম হইয়া থাকে, এমন আর কোনও দেবতার কোন যাত্রায় হয় না। গোরক্ষনাথের উপর নেপালী বৌদ্ধেরা সকলে খুসী না থাকিলেও অনেক বৌদ্ধেরা এখনও তাঁহার পূজা করে, তিব্বতেও তাঁহার পূজা হয়। এই সকল কারণেই নাথ-পন্থকে আমি বাঙ্গলার নবম গৌরব বলিয়া মনে করি।

দশম গৌরব

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

বাঙ্গলা দেশের দশম গৌরব দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তাঁহার নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমণীপুর। তিনি ভিক্ষু হইয়া বিক্রমশীল বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হন। সে সময় মঠের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সুবর্ণদ্বীপে প্রেরণ করেন। তিনি সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ হন। তখন নালন্দার চেয়েও বিক্রমশীলের খ্যাতি প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। অনেক বড় বড় লোক, অনেক বড় বড় পণ্ডিত, বিক্রমশীল হইতে লেখাপড়া শিখিয়া, শুধু ভারতবর্ষে নয়, তাহার বাহিরেও গিয়া বিদ্যা ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ছিলেন। বিক্রমশীল-বিহারের রত্নাকর শান্তি একজন খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন। প্রজ্ঞাকরমতি, জ্ঞানশ্রী ভিক্ষু প্রভৃতি বহু সংখ্যক গ্রন্থকার ও পণ্ডিতের নাম বিক্রমশীলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল।

এরূপ বিহারের অধ্যক্ষ হওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা। দীপঙ্কর অনেক সময় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও অন্য যানাবলম্বীদিগের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও তাহাতে জয়লাভ করিতেন। এই সময় তিব্বত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রায় লোপ হইয়া আসে ও বনপার দল খুব প্রবল হইয়া উঠে, তাহাতে ভয় পাইয়া তিব্বত দেশের রাজা বিক্রমশীল-বিহার হইতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। দীপঙ্কর দুই একবার যাইতে অসম্মত হইলেও, বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া পরিণামে তথায় যাইতে স্বীকার করেন। তিনি যাইতে স্বীকার করিলে, তিব্বতরাজ অনেক লোকজন দিয়া তাঁহাকে সসম্মানে আপন দেশে লইয়া যান। যাইবার সময় তিনি কয়েকদিন নেপালে স্বয়ম্ভূক্ষেত্রে বাস করেন। তথা হইতে বরফের পাহাড় পার হইয়া তিনি তিব্বতের সীমানায় উপস্থিত হন। যিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার রাজধানী পশ্চিম-তিব্বতে ছিল। যে সকল বিহারে তিনি বাস করিয়াছিলেন, সে সকল বিহার এখনও লোকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করে। ফ্রাঙ্কে সাহেব যে আর্কিয়লজিকাল রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন, তাহাতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশার কর্ম্মক্ষেত্র সকল বেশ ভাল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। অতিশা যখন

তিব্বত দেশে যান, তখন তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর। এরূপ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তিব্বতে গিয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তিব্বতে নানা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছে। তিব্বতে যে কখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের লোপ হইবে, এরূপ আশঙ্কা আর হয় নাই। তিনি তিব্বতে মহাযান মতেরই প্রচার করেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, তিব্বতীরা বিশুদ্ধ মহাযানধর্ম্মের অধিকারী নয় কেন না, তখনও তাহারা দৈত্যদানবের পূজা করিত; তাই তিনি অনেক ব্রজযান ও কালচক্রযানের গ্রন্থ তর্জ্জমা করিয়াছিলেন ও অনেক পূজাপদ্ধতি ও স্তোত্রাদি লিখিয়াছিলেন। তেঙ্গুর ক্যাটালগে প্রতি পাতেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও সহস্র সহস্র লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। অনেকে মনে করেন, তিব্বতীয়দিগের যা কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা—এ সমুদায়ের মূল কারণ তিনিই। এরূপ লোককে যদি বাঙ্গালার গৌরব মনে না করি, তবে মনে করিব কাহাকে?

একাদশ গৌরব

জগদ্দল মহাবিহার ও বিভূতিচন্দ্র

রাইট সাহেব নেপাল হইতে কতকগুলি পুথি কুড়াইয়া লইয়া গিয়া কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটীকে দেন। তাহার মধ্যে শান্তিদেবের শিক্ষাসমুচ্চয় নামে একখানি পুথি থাকে। পুথিখানি কাগজের, হাতের লেখা, অধিকাংশই বাঙ্গলা। বেণ্ডল সাহেব যখন এই পুথিগুলির ক্যাটালগ করেন, তখন তিনি বলেন যে, এ পুথিখানি খৃষ্টের জন্মের ১৪ শ বা ১৫ শ বছর পরে লেখা। তাহার পরে তিনি যখন উহা ছাপান, তখন তিনি ভূমিকায় লিখেন, "না, আর এক শ বছর আগাইয়া যাইতে পারে, কাগজ কি এর চেয়েও পুরাণ হ'বে?" বেণ্ডল সাহেব একজন বড় লোক। তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব ছিল; তিনি ও আমি দুই জনে একবার নেপাল গিয়াছিলাম। তথাপি ও জায়গায় আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। আমি নেপাল-এর চেয়েও পুরাণ কাগজের পুথি দেখিয়াছি এবং দুই একখানি আনাইয়াছি। সুতরাং কাগজ বলিয়া যদি পুথিখানি নূতন হয়, তাহা হইলে আমি তাহাতে রাজি নই। ডাঃ হার্ণলি সম্প্রতি দেখাইয়াছেন যে, অনেক পূর্ব্বে নেপালে 'কায়গদ' ছিল। 'কায়গদ' শব্দটি চীনের। আমরা কাগজ পরে পাইয়াছি, কেন না আমরা উহা সরাসরি চীন হইতে পাই নাই, মুসলমানদের হাত হইতে পাইয়াছি, মুসলমানেরা চীন হইতেই পাইয়াছিল। মুসলমানেরা কায়গদ শব্দটিকে কাগজ করিয়া তুলিয়াছে।

পুথিখানির শেষে লেখা আছে ঃ— "দেয় ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িনো জাগদ্দল পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্রস্য" ইত্যাদি।

বেণ্ডল সাহেব বলিয়াছেন, "মহাযানপন্থী জগদ্দল পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র কে আমি জানি না।" ১৯০৭ সালে আমি আবার নেপালে গিয়া কয়েকখানি পুথিতে জগদ্দল-মহাবিহারের নাম পাই, কিন্তু আমিও তখন সে মহাবিহার কোথায়, কি বৃত্তান্ত জানিতাম না। সেই বারে আমি বিভূতিচন্দ্রেরও নাম পাই। তিনি 'অমৃতকর্ণিকা' নামে 'নামসংগীতির' একখানি টীকা করেন, ঐ টীকা কালচক্রযানের মতে লিখিত হয়।

তাহার পর রামচরিত কাব্য ছাপাইবার সময় জানিতে পারি, রামপাল রামাবতী নামে যে নগর বসান, "জাগদ্দল মহাবিহার" তাহারই কাছে ছিল। উহা গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমের উপরেই ছিল। এখন করতোয়া গঙ্গায় পড়ে না—পড়ে যমুনায়; গঙ্গাও এক সময় বুড়ীগঙ্গা দিয়া যাইত। তাই ভাবিয়াছিলাম, রামপাল নামে মুন্সীগঞ্জে যে এক পুরাণ গ্রাম আছে, হয়ত সেই রামাবতী ও জগদ্দল উহারই নিকটে কোথাও হইবে। আমি এ কথা প্রকাশ করার পর, অনেকেই জগদ্দল খুজিতেছেন, কেহ মালদহে, কেহ বগুড়ায়; কিন্তু খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নাই, পাওয়া কিন্তু নিতান্ত দরকার। কারণ, মগধে যেমন নালন্দা, পেশোয়ারে যেমন কনিষ্ক বিহার, কলম্বোতে যেমন দীপদত্তম বিহার, সেইরূপ বাঙ্গলার মহাবিহার জগদ্দল। তেঙ্গুরে কোথাও লেখে উহা বরেন্দ্রে ছিল, কোন কোন জায়গায় লেখে বাঙ্গলায়, কোন কোন জায়গায় লেখে পূর্ব্ব-ভারতে।

যাহা হউক উহা একটি প্রকাণ্ড বিহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামপালই যে ঐ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। এই বিহারে অনেক বড় বড় ভিক্ষু থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বিভূতিচন্দ্রই প্রধান। বিভূতিচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন। যখন তিব্বত দেশে এই সকল বৌদ্ধগ্রন্থ তর্জ্জমা হইতেছে, তখন তিনি অনেক পুস্তকের তর্জ্জমায় সাহায্য করিয়াছেন এবং নিজেও দুই চারিখানি পুস্তক তর্জ্জমা করিয়াছেন। জগদ্দলের আর একজন মহাভিক্ষুর নাম দানশীল। তিনিও এইরূপ অনেক পুস্তক তর্জ্জমায় সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং তিব্বতওয়ালারা যে এক সময় জগদ্দল-ভিক্ষুদের উপর অনেকটা নির্ভর করিত, সেটা বেশ বুঝা যায়।

সম্প্রতি শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে একখানি কেঙ্গুরের পুস্তক কিনিয়া সাহিত্যপরিষৎকে উপহার দিয়াছেন, 'সোসাইটীর' লামা বলেন, সে পুস্তকখানি হাতের লেখা, কাঠের ছাপা নয়, ১০২৬ বৎসর পূর্ব্বে পুস্তকখানি লেখা হয়, দানশীল উহা তর্জ্জমা করেন। এ দানশীল যদি জগদ্দলের দানশীল হন, তাহা হইলে জগদ্দল বিহারও পুরাণ, বিভূতিচন্দ্রও পুরাণ, আর বেণ্ডল সাহেবের পুথিও, তিনি যে সময় বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আরও তিন চারি শত বৎসর পুরাণ। তাই বলিতেছিলাম, জগদ্দল বিহার ও বিভূতিচন্দ্র বাঙ্গলার গৌরবের জিনিস।

দ্বাদশ গৌরব

লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্য্যগণ

বাঙ্গলার দ্বাদশ গৌরব লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্য্যগণ। লুইপাদের কথা পূর্ব্বে দুই এক বার বলিয়াছি। তিনি আদি-সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। অনেক জায়গায় তাঁহাকে আদি-সিদ্ধাচার্য্য বলিয়াছে। তাঁহার বাড়ী বাঙ্গলায় ছিল। রাঢ়দেশে এখনও তাঁহার নামে পূজা হয়, তাঁহার নামে পাঁটা ছাড়িয়া দেয়। ময়ূরভঞ্জেও তাঁহার পূজা হয়। তিব্বতীরা তাঁহাকে সিদ্ধাচার্য্য বলিয়া পূজা করে। তিনি অনেক বাঙ্গলা গান লিখিয়াছেন, অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনীও লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি একটি সম্প্রদায়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সম্প্রদায় হয় সহজযান হইবে, না হয় সহজযানেরই কোন ভাগ হইবে।

সিদ্ধাচার্য্যগণ এককালে যে বাঙ্গলায় পূর্ব্ব-ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন, তাহার আমরা একটা প্রমাণ পাইয়াছি। খৃষ্টের জন্মের ১৩ শত বৎসর পরে হরিসিংহ নামে একজন রঘুবংশী মিথিলায় রাজা হইয়াছিলেন। তিনি এক সময় নেপাল আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভয়ে বাঙ্গলা ও দিল্লীর মুসলমানেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পরিণামে তাঁহারই বংশের সন্তান নেপালে রাজা হন। হরিসিংহের মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর অনেকগুলি স্মৃতির পুস্তক লেখেন। তাঁহার সভায় একজন কবি ছিলেন, তিনি সংস্কৃতে বেশ প্রহসন লিখিতেন। ইঁহার নাম জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য। ইনি বোধ হয় বাঙ্গলাতেও কবিতা লিখিতেন। ইঁহার আধা-বাঙ্গলা, আধা-সংস্কৃত একখানি অপূর্ব্ব পুস্তক আছে, তাহার নাম বর্ণনরত্নাকর। কবিতা লিখিতে গেলে কাহার কিরূপ বর্ণনা করিতে হয়, সেই বিষয়ে উপদেশ দেওয়া পুস্তকের উদ্দেশ্য। তিনি ঐ পুস্তকে চৌরাশি সিদ্ধের নাম করিতে গিয়া ৭৬ জনের নামমাত্র করিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে লুই-এর অনেকগুলি শিষ্যের নাম আছে। হরিসিংহের সময় পর্য্যন্ত লুই-এর দল যে চলিয়া আসিতেছিল, ইহাতেই বোধ হয় যে, লুই একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন।

তেঙ্গুরে লেখা আছে যে, লুইকে মৎসান্ত্রাদ বলিত, অর্থাৎ—তিনি মাছের পোঁটা খাইতে বড়ই ভাল বাসিতেন। (কোন বাঙ্গালীই বা না বাসেন!) তেঙ্গুরে আবার সেইখানেই লেখা আছে, "তাই বলিয়া লুই মৎস্যেন্দ্রনাথ নহেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ মীননাথের পুত্র, লুই মহাযোগীশ্বর।"

সিদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে লুই, কুক্কুরী, বিরুআ, গুড়রী, চাটল, ভুসুকু, কাহ্নু, কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, শবর, আযদেব, ঢেণ্ঢন, দারিক, ভাদে, তাডক, —এই কয়জনের "চর্য্যাপদ" বা কীর্ত্তনের গান পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল পদ মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বেই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সহজিয়ামতে উহার সংস্কৃত টীকা করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও বহু সংখ্যক দোহাকোষ ছিল। ঐ সকল দোহাকোষেরও সংস্কৃত টীকা ছিল। অনেকগুলি দোহাগীতিকা ছিল, তাহারও সংস্কৃত

টীকা ছিল। এই সমস্তেরই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা আছে। যে কয়জন সিদ্ধাচার্য্যের নাম করিলাম, ইঁহাদের সকলেরই গ্রন্থ আছে, সমস্তই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভুটিয়া ভাষাগ্রন্থ, বিশেষ তেঙ্গুর গ্রন্থ খুজিলে যে শুধু বাঙ্গালীদের ধর্ম্মমত পাওয়া যাইবে এমন নয়, বাঙ্গলা সাহিত্যেরও একটি ইতিহাস পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষের কথা বাঙ্গালী কিছুই জানেন না, কিন্তু তাঁহাদের শিষ্য ভুটিয়ারা বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ রক্ষা করিতেছে। এটা বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা হইলেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বিশেষ গৌরব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সিদ্ধাচার্য্যগণের কথা, তাঁহাদের গানের কথা, তাঁহাদের দোহার কথা, তাঁহাদের ধর্ম্মের কথা, আগেও দুই একবার বলিয়াছি, আবার ত খুলিয়া বলিতে হইবে, তাই এইখানেই এবারকার মত বিশ্রাম।

ত্রয়োদশ গৌরব

ভাস্কর কাজ

বাঙ্গলার ত্রয়োদশ গৌরব ভাস্কর-শিল্প। মহাযান হইতে যতই নূতন নূতন ধর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল, হিন্দুদের মধ্যেও যতই তন্ত্রের মত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই নূতন নূতন দেবতা, নূতন নূতন বুদ্ধ, নূতন নূতন বোধিসত্ত্ব-পূজা আরম্ভ হইল। এক এক দেবতারই নানা মূর্ত্তি হইতে লাগিল, কখন ক্রোধমূর্ত্তি, কখন শান্তমূর্ত্তি, কখন করুণামূর্ত্তি—নানারূপ মুদ্রা বাহির হইতে লাগিল। সে সকল মুদ্রার, সে সকল মূর্ত্তির ও সে সকল দেবতার নাম অসংখ্য। বৌদ্ধদের এক সাধনমালায় ২৫৬ রূপ মূর্ত্তির সাধনের কথা বলা আছে। তেঙ্গুরে ১৭৯ বাণ্ডিলে প্রায় ১৬৬ দেবতার সাধন আছে। নেপালের চিত্রকর জাতির লোকে এখনও এই সকল দেখিয়া মূর্ত্তি আঁকিয়া দিতে পারে। বাঙ্গলায় এরূপ আঁকিয়া দিবার লোক কত ছিল বলা যায় না। পাথর তাহারা মোমের মত ব্যবহার করিত। পাথর দিয়া যে তাহারা কত রকম মূর্ত্তি গড়িয়া দিত, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। এই মূর্ত্তিবিদ্যার ইংরাজী নাম "Iconography"। সে দিন একজন প্রসিদ্ধ Iconographist এক সভায় বলিয়াছেন যে, মূর্ত্তিবিদ্যা শিখিবার একমাত্র জায়গা বাঙ্গলা। বাস্তবিকই হিন্দু ও বৌদ্ধগণের কত মূর্ত্তিই যে ছিল, আর কত মূর্ত্তিই যে পাথরে গড়া হইত, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। বরেন্দ্র-রিসার্চ্চ-সোসাইটী অনেক মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্যপরিষদেও অনেক মূর্ত্তির সংগ্রহ হইয়াছে। সকল মিউজিয়মেই কিছু কিছু মূর্ত্তি সংগ্রহ আছে, তথাপি বনে, জঙ্গলে, পুরাণ গ্রামে, পুরাণ নগরে এখনও গাড়ী গাড়ী মূর্ত্তি পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল মূর্ত্তির এখন আর পূজা হয় না। সুতরাং মিউজিয়মেই তাহাদের উপযুক্ত স্থান। যে সকল মূর্ত্তির এখনও পূজা হয়, তাহাই বা কত সুন্দর! এক একটি কৃষ্ণমূর্ত্তির ভাব

দেখিলে সত্য সত্যই মোহিত হইতে হয়। এখনও ভাস্করেরা নানারূপ সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। দাঁইহাটের ভাস্করদের কথা ত সকলেই জানেন। চৈতন্যের সময়েও চমৎকার চমৎকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইত। পালরাজাদের সময়েই এই ভাস্কর-শিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এখানকার ভাস্করেরা কার্য্য করিত। তাম্রপত্রলেখা, শিলালেখ বারেন্দ্র কায়স্থদিগের যেন একচেটিয়াই হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইত। মহিসুর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশেও নানারূপ মূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে সাজসজ্জাই বেশী—গহনা, ফুল, সাজ—ইহাতেই পরিপূর্ণ, ভাব দেখাইবার চেষ্টা খুব কম। যে ভাবে ভাবুকের মন মুগ্ধ করে, সে ভাব কেবল বাঙ্গলাতেই ছিল, কতক কতক এখনও আছে। অনেক সময় মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় যে, উহা কথা কহিতেছে। অনেক সময় মনে হয় উহা এই নৃত্য করিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণ বাঁশী হাতে দাঁড়াইয়া আছেন, আমরা যেন সে বাঁশীর আওয়াজ শুনিতেছি। শিল্পের এত উন্নতি অল্প সাধনার ফল নয়। বাঙ্গালী এককালে সে সাধনা করিয়াছিল, তাহাতে ফলও পাইয়াছে। শুধু পাথরে নয়, পিতলে, তামায়, রূপায়, সোণায়, অষ্টধাতুতে—যাহাতেই বল, মূর্ত্তিগুলি যেন সজীব।

চৈতন্যদেবের পর গরীব বৈষ্ণবেরা কাঠের ও মাটীর মূর্ত্তি তৈয়ার করিত। মহাপ্রভুর দুই একটি কাঠের মূর্ত্তি দেখিলে সত্য সত্যই মনে হয়, মহাপ্রভু কথা কহিতেছেন, ঠোঁটদুটি যেন নড়িতেছে। চৈতন্যের কীর্ত্তনমূর্ত্তি অনেকেই দেখিয়াছেন, কি সুন্দর! মাটীর মূর্ত্তিতে কৃষ্ণনগরের কুমারেরা এখনও বোধ হয় ভারতে অদ্বিতীয়। একজন ইউরোপের ওস্তাদ কতকগুলি মাটীর গড়া মানুষের মূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহারা সত্য সত্যই অনেক দিন ধরিয়া মানুষের শিরা-ধমনী পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে।"

চতুর্দ্দশ গৌবব

বাঙ্গালায় সংস্কৃত

মুসলমান-আক্রমণের পূর্ব্বে বাঙ্গলায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ভবদেব একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে যাহা কিছু পড়িবার ছিল, তিনি যেন সবই পড়িয়া ছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার প্রশস্তি লিখিয়াছেন। সেই প্রশস্তিতে যাহা লেখা আছে, তাহা যদি চারিভাগের একভাগও সত্য হয়, তাহা হইলেও ভবদেব যে দেশে জন্মিয়াছিলেন, সে দেশ ধন্য। তাঁহার কত পুস্তক ছিল, আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। তবে সামবেদীদের পদ্ধতি ছাড়া আরও তাঁহার দশ বার খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

লোকে বলে বাঙ্গলায় বেদের চর্চ্চা ছিল না, এ কথা সত্য। অন্য জায়গায় যেমন সমস্ত বেদটা মুখস্থ করে, বাঙ্গালীরা তাহা করিত না, তাহারা তত আহম্মুক ছিল না। তাহারা যেটুকু পড়িত, অর্থ করিয়া পড়িত; নিজের কর্ম্মকাণ্ডের জন্য যতখানি জানা

দরকার, সবটুকু বেশ ভাল করিয়া পড়িত। সুতরাং প্রথম বেদের ব্যাখ্যা বাঙ্গলাতেই হয়। সায়ণাচার্য্যের দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে নুগড়াচার্য্য এক নূতন ধরণের বেদব্যাখ্যা সৃষ্টি করেন। নুগড়ের পুস্তক এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ের পুস্তক অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। হলায়ুধ তাঁহার সম্প্রদায়ের, গুণাবিষ্ণু তাঁহার সম্প্রদায়ের। ইঁহাদের ব্যাখ্যা বেশ পরিষ্কার ও বেশ সুগম।

দর্শনশাস্ত্রে বৌদ্ধদের সঙ্গে সর্ব্বদাই তাঁহাদের বিচার করিতে হইত। সুতরাং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মাত্রকেই দর্শনশাস্ত্রের কিছু চর্চ্চা রাখিতে হইত। শ্রীধরের লেখা প্রশস্তপাদের টীকা এখন ভারতবর্ষে খুব প্রচলিত।

স্মৃতিতে গৌড়ীয় মতই একটা স্বতন্ত্র ছিল। কাশী, মিথিলা ও নেপাল দেশের প্রাচীন স্মৃতি-নিবন্ধে অনেকবার গৌড়ীয় মতের নাম করিয়াছে। মনুর টীকাকার গোবিন্দরাজ যে স্মৃতিমঞ্জরী বলিয়া এক প্রকাণ্ড স্মৃতি-নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমবা উহার যে পুথিখানি পাইয়াছি, তাহা খৃঃ ১১৪৫ সালে কপি করা। দায়ভাগকার জীমূতবাহন, জিকন, শ্রীকর প্রভৃতি অনেক স্মৃতি-নিবন্ধকারের ও জোগ্লোক, অন্ধূক ভট্ট প্রভৃতি অনেক জ্যোতিষ-নিবন্ধকারের নাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে যাহা করিয়া তুলিয়াছেন, সেই ত একটি অদ্ভুত জিনিস। সম্পত্তি পূর্ব্বে বংশগত ছিল, তিনি তাহাকে ব্যক্তিগত করিযা গিয়াছেন, এ কাজটি ত ভারতে আর কেহই করিতে পারেন নাই। বল্লালও ত নিজে দুখানি বিরাট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, এক খানি দানসাগর ও আর একখানি অদ্ভুতসাগর। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শুদ্ধির গ্রন্থও ত স্মৃতি ও জ্যোতিষের একখানি ভাল বই।

পঞ্চদশ গৌরব

বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন

ধর্ম্মের গৌরব, বিদ্যার গৌরব ও শিল্পের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া বৌদ্ধগণ ও হিন্দুগণ বাঙ্গলা দেশে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে ছিলেন। বৌদ্ধেরা তিব্বতে গিয়া সেখানে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে ছিলেন, ব্রাহ্মণেরাও বাঙ্গলার নূতন সমাজের সৃষ্টি করিতে ছিলেন। এমন সময় ঘোর বন্যার ন্যায় আফগান দেশ হইতে মুসলমানেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বন্যায় রাজা-প্রজা, বৌদ্ধ-হিন্দু, বজ্রযান-সহজযান, ন্যায়-স্মৃতি, দর্শন-বিজ্ঞান—সব ভাঙ্গিয়া, ভাসিয়া গেল। বাঙ্গালী ও বেহারী শিল্পের ভাল ভাল জিনিসগুলি, বড় বড় অট্টালিকা, বড় বড় মন্দির, দেবমূর্ত্তি, মনুষ্যমূর্ত্তি, ক্রোধমূর্ত্তি, শান্তমূর্ত্তি, হিন্দুমূর্ত্তি, বৌদ্ধমূর্ত্তি, তালপাতের পুথি, ভূর্জ্জপত্রের পুথি, ছালের পুথি, তেড়েতের পুথি, নানারূপ চিত্র, নানারূপ কারুকার্য্য, সব নাশ হইয়া গেল। ওদন্তপুরে মুসলমানেরা সিপাই বলিয়া হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুকে মারিয়া ফেলিল, কেল্লা বলিয়া

মহাবিহারটিকে সমভূম করিয়া দিল, বৌদ্ধমূর্ত্তি ও যাত্রার সাজসজ্জা সব লুটিয়া লইয়া গেল, সোণারূপার মূর্ত্তিগুলি গালাইয়া ফেলিল, পুথিগুলি পুড়াইয়া ফেলিল। প্রতি বিহারেই এইরূপ হইতে লাগিল। ওদন্তপুরের বিহার এখনও চেনা যায়, সে জায়গাটা এখনও তিরিশ ফুট উঁচু; নালন্দার নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে, পাশের একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের নামে তাহার নাম হইয়াছে "বড়গাঁয়ের ঢিবি"; বিক্রমশীলার সন্ধানও পাওয়া যায় নাই, জগদ্দল খুজিয়া মিলিতেছে না; মুসলমানেরা এমনি করিয়া নষ্ট করিয়াছে যে, তাহাদের স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। ভাগ্যে নেপাল ছিল, তিব্বত ছিল, তাই এত দিনের পর তাহাদের স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। ভাগ্যে ইংরাজ রাজা হইয়াছেন, তাই খুড়িয়া খুড়িয়া আমরা আমাদের পূর্ব্বগৌরবের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইতেছি।

পুষ্যমিত্রের ঘোরতর হত্যাকাণ্ডেও যে ধর্ম্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, কুমারিল, শঙ্করের প্রাণপণ চেষ্টাতেও যে ধর্ম্ম পূর্ব্ব-ভারতে অক্ষুণ্ণ ছিল, ব্রাহ্মণদের নিরন্তর বিদ্বেষ সত্ত্বেও যে ধর্ম্ম চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল—এক মুসলমান-আক্রমণেই সে ধর্ম্ম শুধু যে ধ্বংস হইল তাহা নয়, বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া গেল। লাভ হইল মঙ্গলিয়ার, লাভ হইল তিব্বতের, লাভ হইল পূর্ব্ব-উপদ্বীপের, লাভ হইল সিংহলের। তলোয়ারের মুখ হইতে যাহারা অব্যাহতি পাইয়াছিল, তাহারা ঐ সকল দেশে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদিগকে পাইয়া ঐ সকল দেশ কৃতার্থ হইয়া গেল; তাহাদের বিদ্যা বৃদ্ধি হইল, ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইল, জ্ঞান বৃদ্ধি হইল, শিল্প বৃদ্ধি হইল; ক্ষতি যাহা হইবার তাহা বাঙ্গলারই হইয়া গেল!

দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা প্রাণের ভয়ে অস্থির হইয়া আপন দেশে বাস করিতে লাগিল। এই সময় দেশের কি অবস্থা হইয়াছিল, কুলগ্রন্থই তাহার সাক্ষী। দুইশত বৎসর নিরন্তর মারামারি কাটাকাটির পর একবার এক জন হিন্দু বাঙ্গলার রাজা হইয়াছিলেন। অমনি আবার হিন্দুসমাজে সংস্কৃত সাহিত্য, বাঙ্গলা সাহিত্য জাগিয়া উঠিল। যে মহাপুরুষের একান্ত আগ্রহ, একান্ত যত্ন ও দূরদর্শিতার ফলে সংস্কৃত সাহিত্য আবার বাঁচিয়া উঠে, তাঁহার নাম বৃহস্পতি, উপাধি রায়মুকুট। তিনি নিজে অনেক সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়া একখানি স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়া, অমরকোষের টীকা লিখিয়া, অনেক পণ্ডিতকে প্রতিপালন করিয়া, আবার সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন শ্রীকর। ইনিও বৃহস্পতিব ন্যায় নানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং দুই জনে মিলিয়া অমরকোষের আর একখানি টীকা লিখেন। শ্রীকরের পুত্র শ্রীনাথ পুরা এক সেট নিবন্ধ সংগ্রহ করিয়া আবার হিন্দুসমাজ বাঁধিবার চেষ্টা করেন। তিনি বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার শিষ্য রঘুনন্দন সমাজ বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। তাঁহার বাঁধা সমাজ এখনও চলিতেছে। বৃহস্পতি, শ্রীকর,

শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন আমাদের সমাজ বাঁধিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা আজিও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেছি। ইহারা আমাদের পূজ্য, নমস্য এবং গৌরবের স্থল।

ষোড়শ গৌরব

ন্যায়শাস্ত্র

মুসলমান-আক্রমণে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায়, দর্শনশাস্ত্রও লোপ হইয়াছিল। রাজা গণেশের পর হইতে যে আবার সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ হইল, তাহার ফলে ন্যায়ের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। এই চারি শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার ন্যায়শাস্ত্র ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের যেখানেই যাও, যিনি নৈয়ায়িক, তিনি কিছু না কিছু বাঙ্গলা কথা কহিতে পারেন। নবদ্বীপে না আসিলে তাঁহাদের চলে না। সুতরাং তাঁহাদের নবদ্বীপে আসিতেও হয়, বাঙ্গলা ভাষা শিখিতেও হয়। দেশে গিয়া যদিও বাঙ্গলা ভুলিয়া যান, তথাপি বাঙ্গালী দেখিলেই আবার তাঁহাদের দুটা বাঙ্গলা কথা কহিবার ইচ্ছা হয়। কাশ্মীর যাও, পাঞ্জাব যাও, নেপাল যাও, হিন্দুস্থান যাও, রাজপুতানা যাও, মান্দ্রাজ যাও, মহিসুর যাও, ত্রিবাঙ্কুর যাও, নৈয়ায়িকের মুখে দুচারিটি বাঙ্গলা কথা শুনিতেই পাইবে। বাঙ্গালীর এটা বড় কম গৌরবের কথা নয়। ভারতে বাঙ্গালীর এই প্রাধান্য যাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের পূজ্য ও নমস্য। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম বাসুদের সার্ব্বভৌম। তিনি কিন্তু কোন গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই বা তাঁহার কোন গ্রন্থ চলিত হয় নাই। দ্বিতীয় রঘুনাথ শিরোমণি। ইঁহার বুদ্ধি ক্ষুরের ধারের মত সূক্ষ্ম ছিল। তিনি ন্যায় ও বৈশেষিক সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার তত্ত্বচিন্তামণির টীকাই লোকে বেশী জানে। তিনি যে শুধু বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও পক্ষধর মিশ্রের নিকট পড়িয়াছিলেন, এমন নহে,—তিনি মহারাষ্ট্রদেশে যাইয়া রামেশ্বরের নিকটও পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্র যে শুধু বাঙ্গলা দেশেই ছিল, এমন নহে—দ্বারবঙ্গের রাজার পূর্ব্বপুরুষ মহেশ পণ্ডিতও তাঁহার ছাত্র ছিলেন। শিরোমণির পর আমাদের দেশের লোক হরিরাম, জগদীশ ও গদাধরকেই চিনে ও ইঁহাদের টীকা-টিপ্পনী পাঠ করে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে এককালে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের বড়ই আদর হইয়াছিল। মহাদেব পুস্তামকর ভবানন্দের টীকারই টীকা লিখিয়াছেন ও সেই টীকা এখনও দুই চারি জায়গায় চলে। ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থকারদিগের মধ্যে সকলের শেষ বিশ্বনাথ। তিনি কয়েকটি কারিকার মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত দুরূহ সিদ্ধান্তের যেরূপ সমাবেশ করেন, তাহা দেখিয়া সকল দেশেরই লোক আশ্চর্য্য হইয়া যায়। এখনও তাঁহার তিন শত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহার কারিকা ও তাঁহার সিদ্ধান্তমুক্তাবলী চলিতেছে। বাঙ্গলায় তাঁহার টীকাকার কেহ জন্মে নাই—তাঁহার টীকাকার একজন মারহাট্টী, তাঁহার নাম মহাদেব দিনকর। এখন বলিতে গেলে, এই

নৈয়ায়িকগণই এখনও ভারতে বাঙ্গলার নাম বজায় রাখিয়াছেন। কারণ, বাঙ্গলার স্মার্ত্তকে অন্য দেশের লোকের চিনিবার দরকার নাই, কিন্তু বাঙ্গলার নৈয়ায়িকদের না চিনিলে ভারতবর্ষে কাহারও চলে না।

সপ্তদশ গৌরব

চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর

বৌদ্ধ মতগুলি যখন ক্রমে ক্রমে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল, বিলুপ্তই বা বলি কেন, ধ্বংস হইয়া গেল, তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের কি দশা হইল? পাদরী না থাকিলে খৃষ্টানদের যে দশা হয়, ব্রাহ্মণ না থাকিলে হিন্দুদের যে দশা হয়, মৌলবী না থাকিলে মুসলমানদের যে দশা হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঠিক সেই দশা হইল। বাহির হইতে কেহ উহা আক্রমণ করিলে রক্ষা করিবার লোক রহিল না। ভিতরে গোলযোগ হইলে, তাহার সংস্কার করিবার লোক রহিল না। রহিল কেবল মূর্খ পুরোহিতকুল, আর অসংখ্য কৃষক, বণিক ও কারিকর। মুসলমানেরা জোর করিয়া অনেককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। প্রায়ই দেখা যায়, যেখানে বড় বড় বিহার ছিল, অনেক নিষ্কর জমী বিহারওয়ালারা ভোগ করিত। মুসলমানেরা সে সমস্ত জমী বাজেয়াপ্ত করিয়া আফগান সিপাহীদিগকে ভাগ করিয়া দিল। ওদন্তপুর ও নালন্দার জমী লইয়া মল্লিক নামে এক মুসলমানকুলেরই উৎপত্তি হইয়াছে। বাঙ্গলার বিহারের খবর জানি না, তবে একটা খবর জানি বলিয়া বোধ হয়। বালাণ্ডা পরগণায় খুব ভাল মাদুর হয়, তখনও হইত, এখনও হয়। সেখানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল, অনেক ভিক্ষু ছিল, পুথি কাপি হইত, ঠাকুর দেবতার পজা হইত। বালাণ্ডার একখানি 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'' এখনও নেপাল-দরবার-লাইব্রেরীতে আছে, বালাণ্ডার বৌদ্ধ কীর্ত্তির এই মাত্র স্মৃতি জাগরূক আছে। এখন সেই বালাণ্ডায় সব মুসলমান। মুসলমানেই মাদুর খুনে, মাদুর বুনিবার জন্য এক ঘরও হিন্দু নাই। বিহারগুলি এইরূপে শুধু যে ধ্বংস হইল এমন নহে, সেখানে মুসলমান আসিয়া বসিল এবং তাহারা অনায়াসেই চারি পাশের লোককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। তাই আজ বাঙ্গলায় অর্দ্ধেকের উপর মুসলমান।

বাকি যাহারা ছিল, তাহারা হিন্দু হইয়া গেল। তাহাদিগকে হিন্দু করিল কে? ব্রাহ্মণেরা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ত এ বিষয়ে কৃতিত্ব আছেই, সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই দল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহায় হইলেন। এক দলের নেতা চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ। আর এক দলের নেতা গৌড়ীয় শঙ্কর, ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও আগমবাগীশ। একদল বৈষ্ণব, আর একদল শাক্ত।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চৈতন্যদেব একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহার পরিকরও প্রায় সবই বাঙ্গালী। ইঁহারা অনেক সংস্কৃত

গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গলা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রূপ, সনাতন, জীব, গোপালভট্ট, কবিকর্ণপুর, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ হইতে আরম্ভ করিয়া উপেন্দ্র গোস্বামী পর্য্যন্ত কত লোক যে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গলার ত কথাই নাই। বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুনন্দন গোস্বামী পর্য্যন্ত কত কত বৈষ্ণব লেখক বাঙ্গলায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাকে মার্জ্জিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, নূতন জীবন দিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলায় বৈষ্ণবদিগের প্রধান কীর্ত্তি-কীর্ত্তনের পদ। বৌদ্ধদিগের চর্য্যাপদের অনুকরণে এই সকল পদাবলীর সৃষ্টি। পদাবলীর পদকর্ত্তা অসংখ্য। রাধামোহন দাস ৮০০/৮৫০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দুই পুরুষ পরে বৈষ্ণবদাস ৩৩০০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, এখনও সংগ্রহ করিলে ২০০০০ হাজারেরও অধিক হইবে। ভাবের মাধুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে, সুরের বৈচিত্র্যে এই সকল গান সকল সমাজেরই পরম আদরের জিনিস। এই সকল পদ গান করিবার জন্য নানারূপ কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইয়াছে। সেকালে যেমন বাঙ্গলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র 'প্রবৃত্তি' ছিল, এখনও কীর্ত্তনের সেইরূপ নানা প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান। তাতে লেখা আছে যে, শ্রীখণ্ডে যখন প্রথম কীর্ত্তন হয়, তখন স্বর্গ হইতে চৈতন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখনও বোধ হয় ভাল কীর্ত্তন জমিলে সেখানে চৈতন্য সপরিকর আবির্ভূত হন। বাঙ্গলার কীর্ত্তন একটা সত্য সত্যই উপভোগের জিনিস। তাহার জন্য চৈতন্যদেবের ও তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট আমরা সম্পূর্ণরূপে ঋণী।

অষ্টাদশ গৌরব

তান্ত্রিকগণ

তন্ত্র বলিলে কি বুঝায়, এখনও বুঝিতে পারি নাই। বৌদ্ধেরা বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান—সকলকেই তন্ত্র বলে। কাশ্মীর শৈবদের সকল গ্রন্থই তন্ত্র। নাথ-পন্থের সকল গ্রন্থই তন্ত্র। অন্যান্য শৈব সম্প্রদায়ের গ্রন্থও তন্ত্র। আবার শাক্তদের সব গ্রন্থও তন্ত্র। এখন আবার বৈষ্ণবদের পঞ্চরাত্রগুলিকেও তন্ত্র বলিতেছে। বাস্তবিকই বৈষ্ণবদের কয়েকখানি তন্ত্র আছে। এরূপ অবস্থায় তন্ত্র বলিলে হয় সব বুঝায়, না হয় কিছুই বুঝায় না।

অনেক তন্ত্রে বলে, বেদে কিছু হয় না বলিয়াই আমাদের উৎপত্তি। আবার অনেকে বলেন, অথর্ব্ববেদই তন্ত্রের মূল। মূলতন্ত্রগুলি হয় বুদ্ধদেবের মুখ হইতে উঠিয়াছে, না হয় হরপার্ব্বতী-সংবাদরূপে উঠিয়াছে। যেগুলি হরপার্ব্বতী-সংবাদ, সেগুলি কেহ না কেহ কৈলাস হইতে পৃথিবীতে "অবতারিত" করিয়াছেন, না হইলে লোকে তাহা

জানিবে কিরূপে? একজন বৌদ্ধ তন্ত্রকার বলিয়াছেন, "আমরা ব্রাহ্মণদের মত সুশব্দবাদী নহি। আমরা সোজা কথায় লিখি। যে ভাষা সকলে বুঝিতে পারিবে, আমরা এমন ভাষায় লিখি।" মূল তন্ত্রে ব্যাকরণের বড় ধার ধারে না। কিন্তু মূল তন্ত্র বড় একটা পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই সংগ্রহ। একজন তান্ত্রিক পণ্ডিত দুই চারিখানি মূলতন্ত্র ও বহুসংখ্যক সংগ্রহ একত্র করিলেন, আবার তাহার উপর নিজের একখানি সংগ্রহ বাহির করিলেন। তাঁহার দলে সেই সংগ্রহ চলিতে লাগিল। এইরূপে অনেক সংগ্রহ চলিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলায় এই সকল সংগ্রহ-কর্ত্তাদের প্রথম ও প্রধান—গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য। তাঁহার অনেকগুলি সংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার স্তবগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি নানা ছন্দে নানা স্তব লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থ বড় শঙ্করাচার্য্যের বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু বড় শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তিনি তন্ত্র লিখিতে যাইবেন কেন? তন্ত্রের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া একটু নূতন। উহা ব্রাহ্মণদের কোন সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সহিত মিলে না। কিন্তু এখন বাঙ্গলার লোকে ঐরূপ সৃষ্টি-প্রক্রিয়াই জানে। সংগ্রহকারেরা মূলতন্ত্র অনেক পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছেন। মূল তন্ত্রে অনেক প্রক্রিয়া আছে, যাহা সভ্যসমাজে বাহির করা চলে না। সংগ্রহকারেরা উহা মার্জ্জিত করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু মার্জ্জিত করিয়া লইলেও তাঁহাদের গুহ্য উপাসনা বড় সুবিধার নয়। আমার বিশ্বাস তন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা যত কম হয়, ততই ভাল। কিন্তু যে সকল মহাপুরুষেরা এই লোকায়ত তন্ত্রশাস্ত্রকে মার্জিত করিয়া সভ্য সমাজের উপযোগী করিয়া গিয়াছেন এবং এইরূপ করায় অনেক লোক হিন্দু হইয়াছে ও হিন্দু হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারা যে খুব দূরদর্শী ও সমাজনীতিকুশল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক শঙ্করের পর ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়া ছিলেন। ব্রহ্মানন্দের পুস্তকে অক্ষোভ্য, বৈরোচন প্রভৃতি বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। অক্ষোভ্য এখানে ঋষি হইয়াছেন, বৈরোচন দেবতা হইয়াছেন। যে তারামন্ত্র সাধনের জন্য বশিষ্ঠদেবকে চীনে যাইয়া বুদ্ধদেবের শরণ লইতে হইয়াছিল, ব্রহ্মানন্দ সেই তারার পূজারই রহস্য লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ মতে তারা অক্ষোভ্যেরই শক্তি। বৌদ্ধ মতে তারা, একজটা, নীলসরস্বতীর উপাসনা আছে, তারারহস্যেও তাই। বৌদ্ধেরা শূন্যবাদী, তারারহস্যেও শূন্যের উপর শূন্য, তাহার উপর শূন্য, এইরূপে ষষ্ঠ শূন্য পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বৌদ্ধমতে এই সকল দেবীর ধারণী আছে, সাধন আছে, তারা রহস্যে তাঁহাদের গায়ত্রী আছে। বোধ হয় ঐ অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ ছিল বলিয়া, এই উপায়েই ব্রহ্মানন্দ তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ একজন খুব ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সংগ্রহগুলি আরও মাৰ্জ্জিত। তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। তিনি বেশ সংস্কৃত লিখিতে পারিতেন। পূর্ব্ববঙ্গে ও বরেন্দ্রে তাঁহার বংশধরেরাই গুরুগিরি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের শিষ্যশাখা অসংখ্য।

রাঢ়ে আগমবাগীশের সংগ্রহ আরও মার্জিত। তাঁহার গ্রন্থে পঞ্চমকারের কথা নাই বলিলেই হয়, তাই এ দেশে তাঁহার বড়ই আদর। কিন্তু তাঁহারও গ্রন্থে মঞ্জুঘোষের উপাসনার ব্যাপার আছে। মুঞ্জঘোষ যে একজন বোধিসত্ত্ব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তান্ত্রিক সংগ্রহকারেরা হতাবশিষ্ট বৌদ্ধগণকে নানা উপায়ে হিন্দু করিয়া লইয়াছেন, আপনার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা বাঙ্গলা সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন।

তান্ত্রিক মহাশয়েরা বঙ্গ-সমাজের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছেন, সে বিষয় সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা ভাষার সাহিত্য তাহার সাক্ষী। তাঁহাদের দলে বাঙ্গলা বই প্রচুর না হইলেও যথেষ্ট আছে এবং সেগুলি বেশ ভাল। তাঁহাদের শ্যামাবিষয়ক গানগুলি বাঙ্গালার একটি শ্লাঘার বিষয়। আজিও কেহ সংগ্রহ করে নাই, তাই তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। রামপ্রসাদের গান শুনিয়া মোহিত হয় না এমন বাঙ্গালী কি কেহ আছে? দেওয়ানজী মহাশয়ের ও কমলাকান্তের গান অনেক সময় হৃদয়ের নিগূঢ় তন্ত্রীগুলি বাজাইয়া দেয়।

বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে একেবারে বৈষ্ণব-অর্থাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের অপেক্ষা স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসকের দলই অধিক। ইঁহারা যদিও শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত নন, কিন্তু বাঙ্গালীরা জানে হিন্দু হইলেই, হয় তাহাকে বৈষ্ণব, না হয় শাক্ত হইতে হইবে। সেইজন্য যাহারা বৈষ্ণব নহে, তাহারা সকলেই শাক্ত, শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও শাক্ত। কিন্তু এই দলকে বৈষ্ণবের গান অপেক্ষা শ্যামাবিষয়ক গানেই বেশী মাতাইয়া তুলে।

উনবিংশ গৌরব

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, শুধু বাঙ্গলার নয়, সমস্ত ভারতেরই গৌরবের স্থল। বিদ্যা, বুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহারা কোন জাতীয় ব্রাহ্মণ হইতেই ন্যূন নহেন, বরং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচারশক্তিতে তাঁহাদের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু আমরা এখন সে সকল গৌরবের কথা এখানে বলিব না। তাঁহাদিগকে বাঙ্গলার গৌরব বলিয়াছি, বাঙ্গলায় তাঁহারা কি করিয়াছেন, তাহাই দেখাইব এবং সেই জন্য তাঁহাদের গৌরব করিব।

এই যে এত বড় একটা অনার্য্য দেশ, এখানে বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য অব্রাহ্মণ ধর্ম্মের এত প্রাদুর্ভাব ছিল, অথচ এখন এ দেশে জৈন, বৌদ্ধ দেখিতেও পাওয়া যায়

না, তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ পর্য্যন্ত লোকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে,—চারিদিকের লোকে জানে বাঙ্গলা হিন্দুধর্ম্মের দেশ—এটা কে করিল? কাহার যত্নে, কাহার দূরদর্শিতায়, কাহার নীতিজ্ঞানে এই দেশটা আর্য্য আচারে, আর্য্য বিদ্যায়, আর্য্য ধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে? এ প্রশ্নের ত এক উত্তর। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরাই এই কাজটি করিয়াছেন। বাঙ্গলায় রাজশক্তি ত তাঁহাদের অনুকূল ছিল না, বরং অনেক স্থানে অনেক সময় ঘোর প্রতিকূলই ছিল। এই রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করিয়া দেশটাকে হিন্দু করিয়া তুলা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা তাহা সুসিদ্ধ করিয়াছেন, আর এমনি ভাবে সুসিদ্ধ করিয়াছেন যে, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা জানেন না যে, তাঁহাদের আগমনের সময়েই এদেশে হিন্দু ছাড়া আরও একটা প্রবল ধর্ম্ম ছিল। মুসলমানেরা প্রাচীন সমাজ, বিশেষ প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ, একেবারে ধ্বংস করিয়া দিলে, তাহার পর কিরূপে ব্রাহ্মণেরা আবার ধীরে ধীরে সেই সমাজ আবার গড়িয়া তুলিলেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব গৌরবে অনেকটা দেখাইয়াছি। স্মৃতি, দর্শন, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, শাক্ত ধর্ম্ম তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, দেশীয় ভাষায় ছড়া লিখিয়া, দেশীয় ভাষায় গান গাইয়া বৌদ্ধেরা কেমন দেশটাকে মাতাইয়া তুলিত। সুতরাং দেশ মাতাইতে হইলে যে, মাতৃভাষা ভিন্ন হয় না, এ তাঁহাদের বেশ জ্ঞান হইয়াছিল। তাই তাঁহারা প্রথম হইতেই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বাঙ্গলা করা আরম্ভ করিয়া দেন।

এইরূপ করায় তাঁহাদের দুই কাজই হইয়াছিল। লোকের দৃষ্টি বৌদ্ধের দিক হইতে হিন্দুর দিকে পড়িয়াছিল এবং মুসলমানদের হাত হইতে উদ্ধার হইবার একটা বেশ যন্ত্র হইয়াছিল। রাজনীতিজ্ঞ মুসলমানেরাও একথা বেশ অনুভব করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা ঘরের পয়সা দিয়া বাঙ্গলা লেখার সাহায্য করিতেন। বাস্তবিকই স্মৃতি ও দর্শন অপেক্ষা এই সকল বাঙ্গলা তর্জ্জমায় হিন্দু সমাজের বন্ধন বেশ শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ তর্জ্জমার মূলে ব্রাহ্মণ। এ কথাটা প্রথম তাঁহাদেরই মাথায় আসিয়াছিল এবং তাঁহারাই আগ্রহ সহকারে এই কার্য্য করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

বিংশ গৌরব

কায়স্থ ও রাজা

পরে কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এ বিষয়ে কায়স্থদের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। উহারা পূর্ব্বেই বোধ হয় একটু দোটানায় ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের আগে বেশ শ্রদ্ধা ছিল, কেন না, অনেক কায়স্থ অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মপালের সময় হইতে বল্লাল সেনের সময় পর্য্যন্ত তেঙ্গুরে আমরা অনেক কায়স্থের নাম দেখিতে

পাই। পরে, যখন তাঁহারা দেখিলেন বৌদ্ধ ধর্ম্ম আস্তে আস্তে লোপ হইল, তখন তাঁহারা একেবারে ব্রাহ্মণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং ব্রাহ্মণদের হইয়া পুরাণাদি বাঙ্গলা করিতে লাগিলেন। গুণরাজখাঁর কৃষ্ণমঙ্গল ও কাশীদাসের মহাভারত বাঙ্গালীকে অনেক বড় করিয়া দিয়াছে। কাশীদাসের আরও দুই ভাই গদাধর ও কৃষ্ণদাস ভাল ভাল বই লিখিয়া গিয়াছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য সেই এক-বাঙ্গালী হিন্দু হউক। কায়স্থেরা শুধু বই লিখিয়াই সমাজের উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। এ দেশের অনেক জমীই তাঁহাদের হাতে ছিল, জমীদারভাবে ও দেশের ও সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। রাজা গণেশ ও তাঁহার সন্তান-সন্ততি বাঙ্গালার সুলতান না হইলে রায়মুকুট বড় কিছু করিতে পারিতেন না। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন না থাকিলে চৈতন্য সম্প্রদায় গড়িতেই পারিতেন কিনা সন্দেহ। বুদ্ধিমন্ত খাঁ না থাকিলে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজকে অর্থের জন্য বিস্তর কষ্ট পাইতে হইত। এইরূপে কায়স্থ-ব্রাহ্মণে মিশিয়া মুসলমান সত্ত্বেও বাঙ্গলায় একটা প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজ গড়িয়া তুলিলেন।

এমন সময় মোগলেরা বাঙ্গলায় আসিল। মোগলদের সঙ্গে অনেক বিদেশী হিন্দু এ দেশে আসিয়া বড় বড় চাকরী ও বড় বড় জমিদারী পাইতে লাগিলেন। পাঠানের সহায় বলিয়া কায়স্থদের উপর তাঁহাদের বেশ একটু রাগও হইল, অনেক কায়স্থের জমীদারী গেল। তাঁহাদের জায়গায় হয় ব্রাহ্মণ, না হয় কোন বিদেশী আসিয়া বসিলেন। ক্রমে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ও বিদেশী জমীদারই বেশী হইয়া গেল। বিদেশীদের মধ্যে প্রধান হইলেন মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান; ব্রাহ্মণদের মধ্যে হইলেন কৃষ্ণনগর, নলডাঙ্গা, নাটোর ও মুক্তাগাছা। ব্রাহ্মণের ঘরগুলি ক্রমে ভাগ-বাঁটোরারায় ও অন্যান্য কারণে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু মহারাজাধিরাজ এখনও অক্ষুণ্ণ আছেন। তাঁহারা এই তিন শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভসদৃশ হইয়া আছেন। তাঁহারা কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রতিপালন করেন, তাহাদের কাজে কত উৎসাহ দেন, তাহার সীমা নাই। হরিহর মঙ্গলের লেখক মহারাজাধিরাজেরই আত্মীয় ও তাঁহারই উৎসাহে ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঘনরাম মহারাজাধিরাজের যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। ভাল কবি হইলে যত দিন বর্দ্ধমানে মুজরা না পাইতেন, তত দিন তিনি কবি বলিয়াই গণ্য হইতেন না। ভাল কথক বর্দ্ধমানে বৎসরে এক দিন মাত্র কথা কহিতে পারিলে কৃতার্থ মনে করিতেন। ভাল যাত্রার,বর্দ্ধমানে না গাইলে, পসার হইত না। বর্দ্ধমান রাজগণও ভাল জিনিসের যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন, বৃত্তি দিতেন, বার্ষিক দিতেন। এ পর্য্যন্ত মহারাজাধিরাজেরা বাঙ্গলার সাধারণ সভায় কখন যোগ দিতেন না। তাঁহাদের যেরূপ পদমর্য্যাদা ও গৌরব, সেরূপ সাধারণ সভা বোধ হয় হইত না বলিয়াই তাঁহারা যোগ দিতেন না। আমাদের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের সকল গৌরবই বজায় রাখিয়াছেন, তাহার উপর আবার সেদিন বীরের ন্যায় নিজের জীবন দিয়া বঙ্গেশ্বরের জীবন রক্ষা

করিতে গিয়া পূর্ব্বপুরুষের "মহারাজাধিরাজ" এই উপাধির উপর আবার "বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের পথ ত্যাগ করিয়া একটা সৎকার্য্য করিয়াছেন,—তিনি এখন বাঙ্গলার সাধারণ সভায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার দূরদর্শিতা ও নীতিবোধের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে যাইবামাত্র তাঁহারা ইঁহাকে সভাপতি করিয়া লইয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ, এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি দেশের যত হিতকর সভাসমিতি আছে, সর্ব্বত্রই মহারাজাধিরাজ। এত দিনে সত্য সত্যই তিনি বাঙ্গলার মহারাজাধিরাজ হইয়াছেন। বাঙ্গালী সকল কার্য্যেই এখন হইতে তাঁহার মুখাপেক্ষা করিবে। তিনিও বাঙ্গালীকে আপন করিয়া লইবেন। মহারাজ বাঙ্গলার নূতন সাহিত্যের দিকে মন দিয়াছেন, নিজে কবিতা লিখিতেছেন, নাটক লিখিতেছেন এবং মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। আমরা আজ এইখানে দেশসুদ্ধলোক মিলিয়াছি, ইহা সেই মহারাজাধিরাজেরই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের ফল। বাঙ্গলা সাহিত্য যেন কখনও মহারাজাধিরাজের অনুগ্রহে বঞ্চিত না হয়। তিনি আমাদের গৌরবের স্থল, আমরা তাঁহার গৌরবে আমাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি।

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন
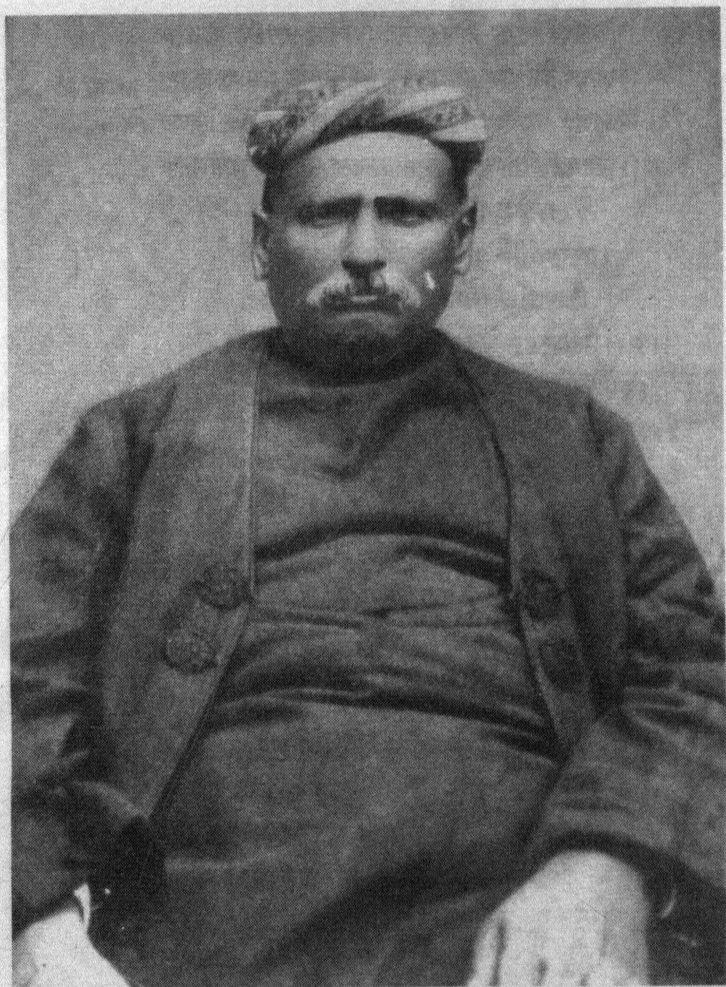
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ., সি. আই. ই.
সভাপতি, অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

পরিশিষ্ট "খ"

স্বস্তিবাদঃ

মাতর্ভারতি দেববন্দিতপদে ব্রহ্মার্ষি-সংসেবিতে
শ্বেতাম্ভোরুহবাসিনি ত্রিজগতাং জাড্যাপহে সারদে।
ভক্ত্যা ত্বাং সমুপাসিতুং তব মহাসম্মেলনে স্বাগতান্
কারুণ্যামৃতধারয়া স্বতনয়ান্-সংরক্ষ সাহিত্যিকান্।। ১।।

নৃমণিবিজয়ধাত্রী বৰ্দ্ধমান প্রসাদা
সুজনবনবিহারিপ্রোল্লসত্ কীর্ত্তিপুষ্পা।
ত্বমসি জননি বঙ্গপ্রাণসম্পত্ প্রদাত্রী
ভবতু করুণয়া তে বিশ্বমেকান্তশান্তম্।। ২।।

শ্রী প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন।
শ্রী প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

বাণীস্তোত্র

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত

(মুলতান—চৌতাল।)

বাণী-গুণ গাও রে সবে
সকল-বিদ্যা-প্রকাশিনী,
ব্রহ্ম-বাদিনী ত্রিলোক-ব্যাপিনী।
যাঁরে পূজে দেবাসুরে
যাঁর নামে আর্ত্তি যায় দূরে,
যিনি শুভ-দায়িনী।
যাঁর গীতে ত্রিলোক-মোহিত,
যে সঙ্গীতে বিশ্ব সৃজিত,
যাঁর দয়া বিনা মানব
কোন কালে হয় না জ্ঞানী।
তাঁ'র চরণ চাহি শরণ,
তাঁর কৃপাতে এ সম্মিলন,
ধন্যা তিনি জগত জননী।।

২

আবাহন

শ্রী সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি, এ, রচিত

(কেদারা—একতালা)

বাণীর মন্দিরে বঙ্গের সন্তান
পূজিতে মায়ের চরণ-কমল,
স্বাগত আজি জ্ঞানদার দ্বারে
অবনত শিরে, ভক্ত সকল।
স্বাগত, ওহে বাণীপুত্রগণ!
বর্দ্ধমানের নব মন্দিরে,
কর আলোকিত নবীন জীবন
জালিয়া প্রদীপ আশার তীরে,
বর্ষিত হ'ক বাণী-শুভাশীষ,
হোক তোমাদের সাধনা সফল।
বহু দিন ধরি' ঘুরিয়া তোমরা
গভীর অপার জ্ঞান-পারাবারে
করেছ সঞ্চয় অমূল্য রতন,
মাতৃপূজার ডালি সাজাবারে,
হউক সফল সেই আহরণ,
দিয়ে যাও কিছু পূজার সম্বল।
এক দিন হেথা কত ভক্তজন
রচিয়া অমৃত-মধুর গাথা,
মুখর করিল জ্ঞান-কুঞ্জবন,
নীরব সকলি আজিকে তথা,
আজি—প্রভাত হইল পুনঃ তমোনিশি,
উদিত নবীন কিরণ বিমল,
তবে জ্বাল জ্বাল সবে শুভ দিনে
জ্ঞানের উজল মঙ্গল-বাতি,
অতুল গরিমা ভুবন ভরিয়া
উঠুক অম্বরে ছড়ায়ে ভাতি,
সফল হউক বাণী-পদ-সেবা, জীবন হউক পুণ্য-উজল।

৩

আবাহন

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, রচিত

মোদর ক্ষীণ ডাকে সুদূর হ'তে ওগো
এসেছ দীন-গৃহে সদয় সুধিজন,
মেঠো ও ভাষা লয়ে শিহরি ভয়ে লাজে
বাণীর সুতগণে করিতে আবাহন।
কলসীভরা জল, নয়ন ছল ছল,
তাজা আমের শাখা, বনের ফুল-ফল,
প্রীতির কোলাকুলি, ভকতি অকপট,
প্রাণের ব্যাকুলতা, করিহে নিবেদন।
মোদের শত ক্রটী করগো করো ক্ষমা
স্নেহেতে ঢেকে নিয়ো দীনতা আমাদের
আনিয়া নব-আশা উজলি মহিমায়
করহে সার্থক এ পূজা-আয়োজন।

৪

অভিনন্দন

শ্রী কালিদাস রায় বি, এ, রচিত

(ঁদ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ভারতবর্ষের' সুর।)

এস সুধিগণ, মানস-মোহন, এসো বাঙ্গালার পুণ্যক্ষেত্রে,
চাহ ভারতীর মিলন-ভবনে প্রেম ছল-ছল উজল-নেত্রে।
হেথা কাশীরাম অমৃত-সমান প্রচারিল মহাভারত-মন্ত্র,
বাঙ্গালী জাতির একাধারে বেদ-সংহিতা-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র।
হেথা মহামতি কবি দাশরথি নবীন গীতার সরল ছন্দে
শাক্ত-বিষ্ণু-উপাসকদলে বাঁধিল মধুর মিলন-বন্ধে।

(২)

বঙ্গ-বাণীর দারু-তরীখানি সোণা করি দিল ভারতচন্দ্র,
কবিকঙ্কণ ধ্বনিয়া তুলিল চণ্ডীর গানে মধুর মন্ত্র;
হেথা রঘুনাথ পিরিত না বারি শ্যামাসঙ্গীত না রচি নিত্য,
হেথা শ্রীধর্ম্মমঙ্গল-গানে দিল ঘনরাম পরম বিত্ত।
এসো সুধিগণ, মানস-মোহন, এসো বাঙ্গলার পুণ্য-ক্ষেত্রে,
চাহ ভারতীর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল নেত্রে।

(৩)

প্রেমের গোঁসাই-ঠাকুর নিমাই লভিল এখানে বিরাগ-দীক্ষা,
লোচন এখানে লোচনের নীরে করে পথে পথে প্রেমের ভিক্ষা,
কবিরাজ আর দাস-গোবিন্দ রসের পাথারে ডুবাল বঙ্গে,
দাস নরহরি সব পরিহরি, হরি-কীর্ত্তনে নাচিল রঙ্গে।
এস সুধিগণ, মানস-মোহন এসো বাঙ্গালার পুণ্যক্ষেত্রে
চাহ ভারতীর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল নেত্রে।

(৪)

সাধক-ভক্ত কমলাকান্ত দিল মার পায়ে জবার মাল্য,
উদ্ধারণের উদ্ধার-পীঠ গঙ্গা সলিলে অমৃত ঢাল্‌ল।
সাধু-দরবেশ কোটী বাউলের পদধূলি হেথা করিল সখ্য,
নরপতি হেথা বিত্তের মাঝে ছাড়েনি নিত্য ধ্রুব সে লক্ষ্য।
এস সুধিগণ, মানস-মোহন এসো বাঙ্গালার পুণ্যক্ষেত্রে
চাহ ভারতীর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল নেত্রে।

(৫)

ছিল একদিন দেবীর চরণে ঝরিত হেথায় রতন-চূর্ণ,
মাঠভরা মণি গোলাভরা সোণা পয়স্বিনীতে গোগৃহ পূর্ণ,
রোগে-শোকে আজি দৈন্যের দাহে দহে রাক্ষসী জীবন-হন্ত্রী,
উর্ণনাভের জালে ভরা তবু বুক হতে আজো ছাড়িনি তন্ত্রী।।
এস সুধিগণ, মানস-মোহন, এসো বাঙ্গালার পুণ্যক্ষেত্রে
চাহ ভারতীর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল নেত্রে।

(৬)

এস হে মনীষি কবি জ্ঞানি ঋষি! ও কর-পরশে জাগায়ে সুপ্তে,
বাঁচায়ে আবার বাহার-মন্ত্রে ভস্মগুপ্তে নিহিত লুপ্তে।
আজিকে কাঙ্গাল বিদুরের গৃহে লভি আতিথ্য নীবার-মুষ্টি,
ভক্ত, বিরাগী, ভিখারীর দেশে লভিতে হইলে পরমা তুষ্টি।
এস সুধিগণ. মানসমোহন এসো বাঙ্গালার পুণ্যক্ষেত্রে।
চাহ ভারতীর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজ্জ্বল নেত্রে।

৫

বাণী-বন্দনা

শ্রী ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ, রচিত

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আজি এসেছে' সুর।)

(আজি), এসেছি, অজি মিলেছি এসেছি মিলেছি
মা গো তব যতেক সন্তান,
(আজি), মোদের যা কিছু আছে এনেছি তোমার কাছে
তোমারে করিতে সব দান।
(আজি), তুলিয়ে হৃদয় হতে ভকতি-কুসুম-ভার,
মালিকা তোমার পদে দিব মাতা উপহার।
(আজি), তোমার চরণে ধরি সকলে অঞ্জলি করি
কর মাগো আশীষ প্রদান
(আজি), হৃদয়ের সব আশা জীবনের সব তৃষা
করিতেছে তোমার সন্ধান।
ঐ ভেসে আসে চিরাদৃত দরশন-সৌরভ,
ভেসে আসে উজ্জ্বল কবিকুল-কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি ইতিহাস ঋজুভাষী
ভেসে আসে নবীন বিজ্ঞান।
(আজি), বিজয়চাঁদের আলো হরের প্রসাদ ভালো
এ মিলন স্বরগ-সমান।
(আজি), সকল সেবক মিলে তোমায় পূজিতে চায়,
তোমার চরণ-ধূলি ললাটে মাখিতে চায়,
তোমার আসন তলে শরণ লভিবে ব'লে
করিয়াছে জীবনের ধ্যান।
(আজি), সব ভাষা সব বাক্ তোমার মহিমা গাক্
হোক সেই চির 'বর্দ্ধমান'।

দীন-ধাম, কলিকাতা, ১৩২১

৬

আবাহন

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি, এ, রচিত

কাশীরাম যেথা গাহিল প্রথম পীযূষবাহিনী গাথা,
শ্রীকৃষ্ণদাস রচিল মধুর চরিতামৃত-কথা,

প্লাবিত যে দেশ পতিতপাবন গোরার প্রেমের বাণে,
যেখানে কোমল কমলাকান্ত মগ্ন আছিল ধ্যানে,
এই সেই দেশ, এস হে ভক্ত-পূজ্য অতিথি-বেশে;
'মুকুন্দ', 'জ্ঞান', 'লোচনানন্দ', 'বৃন্দাবনের' দেশে।

(২)

গঙ্গা-অজয়-সীকরসিক্ত যেথাকার বায়ু সতত বহে,
যেথাকার সাধু 'কমলে কামিনী' হেরে ভীম কালিদহে,
পথে-ঘাটে যার বাউল এবং 'কথের' মধুরগীতে
ভকতি-উৎসব বহাইয়া দেয় নিতি নর-নারী চিতে;
এই সেই দেশ, এস হে ভক্ত পূজ্য অতিথি-বেশে;
'মুকুন্দ', 'জ্ঞান', 'লোচনানন্দ', 'বৃন্দাবনের' দেশে।

(৩)

দাশরথি যেথা তুফান তুলিল মধুর পাঁচালী গানে,
মাঠের রাখালো যাহার গানের মধুরতাটুকু জানে,
ইন্দ্রনাথের শুভ্র-হাস্যে হাসিল যেথায় বাণী,
আনন্দ-ধারা পঞ্চানন্দ যেথায় জোটাল আনি।
এই সেই দেশ, এস হে ভক্ত, পূজ্য অতিথি-বেশে,
'মুকুন্দ', 'জ্ঞান', লোচনানন্দ', 'বৃন্দাবনের' দেশে।

৭

উদ্বোধন

শ্রী.কালীদাস রায় বি, এ, রচিত

(জলদ ভৈরবী—একতালা)

(১)

আজি—স্বাগত ভ্রাতঃ মঙ্গলময়ী বঙ্গ-বাণীর বরণে।
বাজে—দেউল-অঙ্কে শঙ্খ, ডঙ্কা, দুন্দুভি বাজে তোরণে।
কে যাপো জীবন সেবি অনিত্য মিথ্যা অলস বিলাসে,
এস কল্যাণ সত্য-সেবায়, এস শাশ্বত সকাশে।
এসো কমলার সুত সর্ব্বে, এসো ভারতীর স্নেহ-গর্ব্বে,
শঙ্কিত তব কুণ্ঠিত প্রাণ প্রসারিয়া দাও চরণে।

(২)

বঙ্গ-ভাষারে কে করেছে ঘৃণা শিক্ষা লভিয়া বিদেশে,
পালিছ দম্ভ ভোগায়ত তনু শুধু কুবেরের নিদেশে।
ওগো— কমল-কানন ফেলিয়া, নিতি শৈবালে শুধু কেলিয়া,
করো'না আর্য্য-জীবন বিফল বরি লও শেষ শরণে।

(৩)

এস হে কৃষক, এস হে নাবিক, কেহ নও অনধিকারী,
কীর্ত্তনে নাচি এস রে বাউল, একতারা নিয়ে ভিখারি,
এসো সারী-গম্ভীরা গাহিয়া সবে দূর হতে তরী বাহিয়া
এসো এসো সবে পূজ গৌরবে সকল শ্রান্তি-হরণে।

(৪)

এক শুধু মার চরণের তলে উচু নীচু ভেদ নাই গো,
বিপ্র-শূদ্র-মহৎ-ক্ষুদ্র সবারি হেথায় ঠাঁই গো,
ওগো—রাজার পার্শ্বে রাখালে, সে'ত তোমরাই ভবে দেখালে
এসো ওগো চিত্তের সেই গৌরব দিন-স্মরণে।

(৫)

স্নেহের পাত্র এস হে ছাত্র নিবারিতে হৃদি-ক্ষুধা রে,
এস হে কেরাণী—দুঃখের বাণী তাও হবে হেথা সুধা রে,
ঐ ধু ধু করে নদী সরণী, হায়—কোনো খানে নাই তরণী,
মার পদ বিনা সীমাকুলহীনা অশ্রু-তটিনী তরণে।

(৬)

ভক্ত কখনো রিক্ত কি হয়? যাহা আছে তাই আনিও,
কেহ এসো করে তুলসী, বিল্ব কেহ পারিজাত-পাণি গো।
জাগে—হেথায় সাম্য-মৈত্র, হেথা উড়িছে পতাকা-জৈত্রী
প্রেমে আনন্দে সরস জীবন আশীষ পীযূষ ক্ষরণে।

৮

ভাষা-জননী

অধ্যাপক শ্রী কালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী রচিত

(১)

কার বন্দন-গীতি মন্দ পবন-গন্ধে ভাসিয়া আসেরে?
কার অতুল দীপ্তি সুপ্তি মগন-চিত্ত-তমস নাশেরে?

কার অমল-ধবল হাস্য-কিরণ বিশ্ব-মুকুরে ভাসে রে?
কার করুণাসিক্ত ভক্ত-নয়নে মুক্ত সুষমা হাসেরে?
কোরাস— সে যে রে আমার শত কামনার শত সাধনার সিদ্ধি সার।
বঙ্গ জননী ভাষারূপিণী বিশ্ব জুড়িয়া ঋদ্ধি যার।।

(২)

কার অনাদি-অমর বীণার যন্ত্রে মধুর মন্ত্র বাজেরে?
তাহে দৈন্য-দলিত শূন্য-হৃদয়ে পূর্ণ-শান্তি বাজেরে?
পাপ-তাপ-দগ্ধ, নিয়ত মুগ্ধ আনত লাজেরে
কাহার পুণ্য-পরশে ধন্য গণ্য নিখিল মাঝারে,
কোরাস— সে যে রে আমার শত কামনায় শত সাধনার সিদ্ধি-সার।
বঙ্গ-জননী ভাষারূপিণী বিশ্ব জুড়িয়া ঋদ্ধি যার।।

(৩)

কার জাহ্নবী-সম পুণ্য অমৃত-ধারা সতত বহেরে?
কভু ললিত-ছন্দে, গভীরে মন্দ্রে গর্জ্জি কভু বা কহেরে
অতীতের শত কীর্ত্তি-কাহিনী—মূর্ত্তি গলিত স্নেহেরে,
সান্ত্বনাময়ী সন্ততিগণে কান্তিরূপিণী গেহেরে?
কোরাস— সে যে রে আমার শত কামনার শত সাধনার সিদ্ধি-সার।
বঙ্গ-জননী ভাষারূপিণী বিশ্ব জুড়িয়া ঋদ্ধি যার।।

(৪)

কে রিক্ত ভক্তে অতুল বিত্ত? ক্ষীণে বিপুল শক্তি রে?
কার চরণ-প্রান্তে শ্রান্তি রহিত লুটা'য় অযুত ভক্তি রে?
কার করুণা নেত্র-চাহনি মাত্র 'অর্থ' কাম ভুক্তি রে?
কার সেবা ধর্ম্ম, সেবা কর্ম্ম মুক্তি রে?
কোরাস— সে যে রে আমার শত কামনার শত সাধনার সিদ্ধি-সার।
বঙ্গ-জননী ভাষারূপিণী বিশ্ব জুড়িয়া ঋদ্ধি যার।।

৯

বিদায়-সঙ্গীত

শ্রী কালিদাস রায় বি, এ, রচিত

কোথা যাও ভাই! রহ ক্ষণকাল
ঝর ঝর ঝরে আঁখি-জল,
দিতে গো বিদায় হৃদি ফেটে যায়,
ছুটে যায় প্রাণে সব বল।

দু'দিনের দেখা, এত মাখামাখি
কেন এনেছিলে প্রেমভরা আঁখি?
হৃদয় হরিয়া যদি দিবে ফাঁকি
মধুহারা করি ফুলদল।।
যুগ যুগ হতে যেন পরিচিত
জন্ম জন্মান্তরে হয়েছি মিলিত
বাণীর চরণে আছে সঞ্চিত
শত মিলনের শুভ ফল।
মিলনের স্মৃতি বাহিয়া এমনে
বিচ্ছেদ-ব্যথা সহিব কেমনে?
বহিব দীর্ঘঃ শ্বাসের পবনে
ভাঙ্গা হৃদি-তরী টলমল।।
ভারতী-পূজার বিজয়া-দশমী,
বাণী-সুতগণ! শ্রীচরণে নমি,
দাও কোলাকুলী আঁখি-জল চুমি
সারা বরষেরি সম্বল!
অতিথি-সেবার শত শত ত্রুটী,
কুণ্ঠা মলিন অর্ঘ্যের মুঠি,
কণ্ঠে জড়ায়ে তাই বাহু দুটী
ক্ষমা যাচি পায়ে অবিরল।।

কবিতা

অভিনন্দন

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ

১

স্বাগত, সব কোবিদবৃন্দ ধন্য কর এসে,
পঞ্চনন্দ, বন্যা, আর ম্যালেরিয়ার দেশে।
এসো সবে অমল ধবল বিমল বসন প'রে,
বর্দ্ধমানের রাঙা মাটী দেবে রঙিন ক'রে।
স্নেহ-প্রীতির কুঙ্কুম এ যে পরাগ উল্লাসেরি,
যেথায় যাবে সাথে সাথে রইবে সবায় ঘেরি।

এসো আজি সুহৃদ-বেশে এসো মধুর হেসে,
'নরজা' এবং কর্জ্জনা' ও 'গর্দ্দান-মারির' দেশে।

২

দামোদরের উদর দেখ, দেখ বালুর রাশি,
কৃপা ক'রে বাণের সময় দেখো বারেক আসি।
এই দামোদর তিনিই, যিনি গত বরষ-বাণে
প্রলয়েরি বিষাণ-ধ্বনি তুলেছিলেন কাণে,
ভাসাইলেন গ্রাম ও সহর শস্য-নর-নারী,
শুকায়নি'কো আজও লোকের দারুণ নয়ন বারি।
সে দুর্দ্দিনের বন্ধু সবে আজকে এসো হেসে,
'নরজা' এবং 'কর্জ্জনা' ও 'গর্দ্দান-মারির' দেশে।

৩

শুষ্ক রাঢ়ের কাষ্ঠ-ভাষা প্রাণটা ত তার শাদা,
আমাদের এই দীন-আয়োজন ধন্য কর দাদা!
মাছের টক আর কলাই-ডালে উঠবে কি গো মন,
আমাদের যে নারদ ঋষির মতন নিমন্ত্রণ।
মাঠের নামলা মটরসুটি টাটকা মুড়ি গুড়,
রাজা দিবেন সীতাভোগ ও মোহন-মতিচুর।
না পেলেও নিন্দা যেন ক'র না কো শেষে,
'নরজা', এবং 'কর্জ্জনা' ও 'গর্দ্দান-মারির' দেশে।

২

মাতৃ-দর্শন

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল্

কমলাকান্তের কান্তার উজলি
তরল কান্ত আভাতে,
অমল-ধবল ফুটেছে কমল
উজল শান্ত প্রভাতে;
শ্বেত শতদলে শ্বেত পদতলে
হিমে হিমকর হাসি রে;
ধবল-মূরতি, ধবলে যেমতি
শারদ নীরদরাশি রে;

শুভ্র অঙ্গ, পরি শুভ্র দীপ্ত-বাস
অভ্র দীপ্ত করি ভাসে রে;
তুঙ্গ হিম-শৃঙ্গে চন্দ্রিকা-তরঙ্গে
দীপ্তাকাশ যেন হাসে রে।
কমলাকান্তের অজির উজলি
দাঁড়ায়ে আজি কি প্রতিমা;
আখি হতে তার আলোক-সঞ্চার,
দেখাতে ত্রিলোক-মহিমা;
সে যে ভারতের ভাতি মানসের,
প্রাচীন চিন্ময়ী মূরতি;
বেদ-বেদাঙ্গের, জ্ঞান-তরঙ্গের
চিরলীলাময়ী স্ফূরতি;
বঙ্গভাষারূপে আশাময়-ধূপে
বাসিত বাতাসে এসেছে;
সাধকের দীপে দীপিত মণ্ডপে
বাসনার সাজে সেজেছে,
সে যে সাথে ক'রে এনেছে সবারে
স্মৃতির বিস্তৃত বীথিতে;
দ্বিজেন্দ্র হইতে সে চণ্ডীদাসের
চিত্র আঁকা ও অতীতে;
কত সাধকের মহার্ঘ অর্ঘ্যের
রাশি, রাশীকৃত চরণে,
দেখ গুপ্ত-মধু- দীনবন্ধু-হেম
অর্পিত ফুল-চন্দনে,
ঈশ্বর-অক্ষয়- দত্ত বিল্বচয়,
বঙ্কিম-নবীন অঞ্জলি,
রবীন্দ্রের করে অবিরাম ঝরে
নবীন কুসুম-আবলী।
এসেছে জননী পুরাণ এ পুরে,
পুরাতন স্মৃতি লইয়া;
বৌদ্ধ-বিহারের জ্ঞান-প্রবাহের
তরঙ্গ অন্তরে তুলিয়া;

আরো দূরতর সে পঞ্চনদের
তীরেতে যখন কুটীরে
জ্ঞান-সাগ্নিকের জ্ঞানাগ্নি জ্বলিত
সতত ধ্যানের সমীরে,
এসেছে জননী এ পুরাণ পুরে
সে পুরাকাহিনী বহিয়া;
এসেছে জননী পুরাতন পুরে
নূতন জীবন লইয়া।
কমলাকান্তের কুটীর অবধি
অধিপ-প্রাসাদ জুড়িয়া,
স্নেহ-সচঞ্চল মায়ের অঞ্চল
অনিলে যেতেছে উড়িয়া,
কীর্ত্তিচন্দ্রের কীর্ত্তিমণ্ডিত
বংশ আছে যে উজ্জ্বলি,
সে বিজয়চাঁদ মায়ের প্রসাদ
দিতেছে ভরিয়া অঞ্জলি,
আজি সে প্রসাদ পূরাইয়া সাধ
এস তুলে লই সকলে,
ঝেড়ে দেবে ধূলা মরমের মলা
জননী অমল-অঞ্চলে।

৩

আবিরাবীর্ম এধি

(ঋগ্বেদ)

শ্রী জীবেন্দ্র কুমার দত্ত

সহস্র হৃদয় রচি জননীর পূজার মন্দির
সাজাইয়ে স্তরে স্তরে অর্ঘ্যরাজি আনন্দে গভীর
প্রতীক্ষা-ব্যাকুল সবে! সবাকার প্রাণের স্পন্দন
অনন্ত আকাশ পরে জাগাইয়ে অপূর্ব্ব কম্পন
উথলিছে উর্দ্ধ পানে, যেন দিব্য অনাহত-ধ্বনি
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিরচিয়ে সুশাশ্বত মিলন-শরণি
ধ্বনিছে অন্তরাকাশে!

অয়ি বিশ্ব-পূজিতা জননি!
জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী অয়ি! উদ্ভাসিয়া নিখিল অবনী
এস, প্রকাশিত হও! হেথা তুমি হও অধিষ্ঠান!
দূরে যাক্ অন্ধকার, ঘুচে যাক্ বাধা-ব্যবধান,
তোমার চরণ-প্রান্ত হোক্ সত্য-মিলনের স্থান
সন্তানগণের তব! কণ্ঠে কণ্ঠে বন্দনার গান
মুহুর্মুহুঃ পরশিয়া আন্দোলিয়া উদার অম্বর
বরষিয়া দিকে দিকে অফুরন্ত পীযূষ-নির্ঝর
জাগিয়া উঠুক আজি!
হে চিন্ময়ী শ্বেতাব্জবাসিনি!
কে জানে সে কোন্ মহাযুগান্তের বিচিত্র কাহিনী
ধ্যান-রত মহর্ষির বিকশিত চিত্ত শতদলে
অজ্ঞাতে স্থাপিলে তুমি এই রক্ত-চরণ-কমলে
আশীস্-নির্ম্মাল্য হেন, অকস্মাৎ সম্বুদ্ধ-পরাণ
শিহরিয়া হর্ষভরে মাগো, তোমা করিল আহ্বান

২

কি ব্যাকুল ঋক্-ছন্দে! সেইদিন বিশ্ব-জগতের
অস্ফুট হৃদয়-রাজ্যে শুভক্ষণে নব-বসন্তের
পশিল মধুর-বার্ত্তা, হ'ল বিশ্বে প্রভাতে প্রথম
স্নিগ্ধ রবি-করোজ্জ্বল! প্রথম গাহিল বিহঙ্গম
উন্মুক্ত গগনতলে, ত্যজি' সুখে নিশীথ্ আশ্রয়
প্রচ্ছন্ন নীড়ের কোল। সেইদিন প্রথম মলয়
বহিল ভুবন-মাঝে সত্য-শিব-সুন্দর রাজার
আনন্দ সন্দেশ লয়ে, আলিঙ্গিতে মহাপারাবার
লক্ষ পথে লক্ষ নদী লক্ষ বাহু করিয়া বিস্তার
ধাইল প্রথম হায়, প্রেম-গানে মুখরি সংসার
তৃষিত ধরণী প্লাবি!
ধ্যানময়ী, ভক্ত-বৎসলে!
মগ্ন রহি নিশিদিন বসুধার তুচ্ছ কোলাহলে
কোথা হেন ধ্যান-বল পাবে আজি অভাগ্য তনয়
আহ্বানিতে তোমা হেথা!—কোথা হেন মহান্ হৃদয়

বাজায়ে জীবন-শঙ্খ আকর্ষিতে ভগীরথ-সম
পবিত্র জাহ্নবী-ধারা। মাগো! তব কৃপা অনুপম
চির কৃপাময়ী তুমি। তব সেই করুণা-গৌরব
বারেক রাখিতে আজি সঞ্জীবিয়া সবে অভিনব
প্রকাশ করুণা করি। লভি তব শ্রীপদ ধূলায়
সত্য হোক সমুজ্জ্বল, পুণ্য হোক্ সুখদ ধরায়,
সুন্দর হউক আরো সুপবিত্র নির্ম্মল সুন্দর,

৩

মহৎ হউক আরো গ্লানি-হীন মহৎ ভাস্বর,
পূর্ণ হোক্ শূন্য হৃদি!
হে কল্যাণি! হের একবার
জ্ঞানী-গুণী-সুতবৃন্দ অর্চ্চিবারে চরণ তোমার
মিলিলা হেথায় আজি! অয়ি বাণি! অয়ি সরস্বতি!
লহ তুমি সবাকার সুনিভৃত মর্ম্মের আরতি
প্রকাশি সবার প্রাণে জ্যোতির্ম্ময়ী বরাভয়া-বেশে
আশ্বাসিয়া হাস্যমুখে! এ পুণ্যদ-মাহেন্দ্র নিমেষে
হে বীণাবাদিনী মাতঃ! সবাকার হৃদয়-মাঝার
তব ওই সুধা-স্রাবী মধুময় বীণার ঝঙ্কার
মুখরি তুলগো আজি! যার যাহা আছে সাধনার,
যে যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, জীবনের লক্ষ্য যাহা যার,
সব হোক্ মধুময়—সব হোক্ সার্থক শোভন
প্রসাদি-পুষ্পের প্রায়!
পূজার্থীর এই সম্মিলন।
পরস্পর প্রাণে প্রাণে এনে দিক্ নিবিড় বন্ধন
প্রত্যক্ষ প্রকাশে তব! ভুলি সবে পার্থক্য আপন
তোমাতে ডুবিয়া যাই কোটি আত্মা একত্রে গাঁথিয়া
অন্তরবাসিনী অয়ি! ও চরণে অঞ্জলি সঁপিয়া
আজি যেন নত-শিরে বহি তব করুণার দান
অনাবিল শান্তি আর প্রীতিমাখা অক্ষয় কল্যাণ।

৪

স্বাগত

শ্রী ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

স্বাগত ভারত-রতন-মালিকা।
হীরা, মতি, চুনি—বিবিধ সাজে
শোভিত করেছ বঙ্গ-হৃদি আঁকা
সুদীনা, মলিনা,—ধরণী মাঝে।

২

এস বরাভয় লয়ে যুগ্ম করে
কামনা-সাধনা হৃদয়-ভরা
উচ্চ অভিলাষ শিরে শিরে শিরে,
সিদ্ধি অনুগামী আঁচল ধরা।

৩

নব উদ্বোধন এ নব বোধনে
ছুটে এস শত নূতন প্রাণ;
জেগে উঠ প্রাণে সুপ্ত বৃত্তিগণে,
খেল প্রাণে-প্রাণে নূতন তান।

৪

দেশে-দেশে ফিরি আহরি সমিধ্
ঘরে-ঘরে ছবি করিয়া চুরি,
এ নব যাগের হোতা পুরোহিত
মাতার আগার ফেল গো তরি।

৫

নেচে উঠ প্রাণ আনন্দে, আবার
বেজে উঠ প্রাণে পুরাণ-গীতি,
কত যুগ পরে ঘন অন্ধকার
টুটেছে, ফুটেছে বিমল জ্যোতিঃ।

৬

উঠ আশালতা ধূলি-শয্যা ত্যজি
বজ্রাহত শির তুলিয়া ধীরি!
মঞ্জরি' কলিকা কিশলয়ে আজি
ত্যজ খেদ 'গত যাতনা স্মরি'।

৭

স্বাগত, ভাবের অনন্ত নির্ঝর
মানস-সরস-মরাল-দল!
স্বাগত, ভাষার শিল্পী মালাকর,
দীনা জননীর আশার থল।

৮

কল্পতরু-মূলে কর গো সাধনা
একাগ্র-মানসে যুকত করে,
বিজ্ঞান, সাহিত্য, পুরাবৃত্ত, নানা
শাখে শাখে ফল পড়ুক ঝ'রে।

৯

সেখানে মাতার আশীষ অমৃত
ক্ষরিছে,—পিতার করুণাধার,
কোটী কোটী হৃদি তথা একত্রিত
ঢালিছে নিয়ত প্রেম-আসার।

১০

ম্লান আঁখি মেলি কোটী কোটী শব
চেয়ে আছে আশে বদন পানে,
ললাটের স্বেদ সুধাবিন্দু তব
মৃত-সঞ্জীবনী দগধ প্রাণে।

১১

দৃঢ়-আলিঙ্গনে এস গো পাসরি
এ প্রাণের জ্বালা, যাতনা শত;
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজরি;
স্বাগত, ভারত মনের মত!

১২

ধন্য বর্দ্ধমান-নিবাসী যতেক,
ধন্য এ নগরী প্রাচীনা, দীনা;
শুভ-পদার্পণে, বাসনা শতেক
ফুটেছে আশার আলোকে ক্ষীণা।

১৩

ধন্য হে আহূত! ধন্য আবাহক—
এ ক্ষুদ্র প্রাচীনা নগরীপতি;
যতদিন এর রবে অস্থি-ত্বক্
গাবে তোমাদের বিজয়-গীতি।

১৪

দাও হুলু-ধ্বনি পুরনারীব্রজ
সাজায়ে যতনে বরণডালা!
নাচ বায়ুভরে পুরশিরধ্বজ
তোরণ-লগন কুসুম মালা!

১৫

স্বাগত, মনীষী, মানস-বান্ধব
শঙ্খ-ঘণ্টা-রোল মাখিয়া গায়!
স্বাগত, সারদা-সেবকেরা সব
উজলি' নগরী দলিয়া পায়।

১৬

স্বাগত, শীরষ সুদীন সমাজে
ঈশ-জ্যোতিভরা দেহ-আগার!
কর দীর্ঘজীবি এ সুধী-সমাজে
বরষি আশীষ কুসুমাসার!

৫

অভিনন্দন

শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বাগত বঙ্গ-বাণীর দুলাল—'আজি এ বর্দ্ধমানে
লহ' আহ্বান, প্রীতির প্রণাম—জয়মঙ্গল-গানে!
চিত্ত-পীঠেতে লহ' এ আসন
প্রীতি-শোনিমায় আঁকা আলিপন.
পুলকাঞ্চন শিথিল প্রাণের
ঝিরি ঝিরি মধু বায়—
স্বাগত বঙ্গ-বাণীর দুলাল মহীয়ান্ মহিমায়।

২

এই সেই ভূমি কণ্ঠে যাহার কণ্ঠী-গঙ্গা মাই
নূপুরের মত মুখর অজয় দামোদর দু'টি ভাই।
তিলকের মত সারা দেহে যার,
দেব-মন্দির দেউলের ভার,
বাউলের সুরে সরস অর্ঘ্যে
ভারতীরে পূজা করে—
স্বাগত, বঙ্গ-বাণীর দুলাল—এস আজি তারি ঘরে।

৩

এরি প্রান্তর-অশথের মূলে সেদিন পুণ্য-প্রাতে
ন'দের নিমাই নিল কৌপীন ভিক্ষা-ভাণ্ড হাতে;
প্রেমের ধর্ম্ম প্রথমোদগীত
নব-সাহিত্য প্রথম রচিত
ভক্তির সাথে কাব্য জড়িত,
প্রেমে-জ্ঞানে আশ্লেষ—
স্বাগত বঙ্গ-বাণীর দুলাল—এ যে ওগো সেই দেশ।

৪

দ্বিজ কবিরাজ উরিল যেথায় 'অমৃত' পাত্র করে,
কবিকঙ্কন পূজিল যাহারে রস-উপচার ধরে'—
রূপ-সনাতন আদি বৈষ্ণব
দিল যে ভূমিরে এত বৈষ্ণব
কত মহাজনে গীত সহ চিত
সঁপি যারে দেছে প্রাণ—
স্বাগত, বঙ্গ-বাণীর দুলাল—আজি তারি আহ্বান!

৫

দাশরথি আদি যাহারে পুত্র ঝঙ্কার দিল' বীণে,
যেথা বৈষ্ণব-মহা-সাহিত্য গঠিল কত না দিনে!
দিল্লীশ্বরী নুরজাঁহানের
ভাগ্য-বিধাতা যে মহাস্থানের
ধূলায় বসিয়া করেছিল খেলা
সে এই বর্দ্ধমান্—
স্বাগত, বঙ্গ-বাণীর দুলাল-লহ' তার আহ্বান।

৬

কবি-কথা

শ্রী গিরিজাকুমার বসু

১

আমাদের যশোগীতি বাজে নাই ত্রিভুবনে
ভীম রোলে জয়-দুন্দুভির,
বাজিয়াছে তটিনীর মৃদু কলস্বনে

বাজিয়াছে কুঞ্জবনে গুঞ্জন-মুখর
মধুপের মধুময় গানে,
বাজিয়েছে পাপিয়ার তরল ঝঙ্কারে
বসন্তের পিক-কলতানে।

২

আমাদের আবাহনে সাজে নাই নরনারী
মনোহর উৎসব-সজ্জায়,
সাজিয়াছে বিশ্ব-লক্ষ্মী সৌন্দর্য্যের হারে
স্নাত নব কৌমুদী-ধারায়;
সাজিয়াছে তরু-লতা প্রসূনে, পল্লবে
বসুন্ধরা হরিতে হিরণে,
বাণী-বর-চরণের হেমকান্তি—দ্যুতি
মূর্ত্তিমতী, মিহির-কিরণে।

৩

আমাদের যাদুস্পর্শে সহসা উঠেনি জাগি
চিরনিদ্র কোন অভাজন,
নিকুঞ্জে উঠেছে জাগি' নব-দুর্ব্বাদল
কিশলয়ে, মুকুল শোভন,
আমাদের মধুস্পর্শ কুসুমে কুসুমে
মলয় সে বহিছে গৌরবে,
আমাদের মধুস্পর্শ লবঙ্গ-লতায়
মুকুলিত কলিকা-সৌরভে।

৪

আমাদের কীর্ত্তি-কথা হয় নাই প্রচারিত
ঢক্কা-নাদে মানব-শ্রবণে,
হইয়াছে, সাধকের ভাব-সুধা-দ্রব
কাব্যে, গানে কীর্ত্তনে, ভজনে;
চির নিঃস্ব বিশ্বে মোরা, তবু চিরদিন
রসোল্লাসে সুখে দুঃখ বহি,
কৃপার ভিখারী নহি— ঐশ্বর্য্য-কাঙ্গাল.
বিত্তহীন, চিত্তহীন নহি।

৫

আমাদেরি একজন 'মধুর কোমল কান্ত'
"গোবিন্দের" মনোমদ "গীতে",
গেয়েছিল রসতত্ত্ব— অপূর্ব্ব জগতে
অজয়ের উচ্ছ্বসিত চিতে;
আমাদেরি একজন গেয়েছিল সুখে
ভাবোন্মাদে হইয়া বিভোর
"সে যে গেল নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

৬

আমাদেরি একজন সরল ললিত ছন্দে
রামায়ণ রচিল 'ভাষায়',
খুল্লনার দুঃখে গলি' চণ্ডীর মহিমা
আর জন গাহিল ধরায়;
আমাদেরি একজন গাহিল 'ভারত'
"শ্রুতমাত্র রচিয়া পয়ার",
নিগূঢ় আনন্দ-ভরে শুনিল সে গীতি
"অবহেলে, সকল সংসার"।

৭

আমাদেরি একজন "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" গানে
বহাইল ভক্তির প্লাবন,
অন্নদার কৃপা-কথা ভবানন্দ-ধামে
"গুণাকর" করিল কীর্ত্তন,
আমাদেরি একজন অমর 'প্রসাদী' সুরে
শঙ্করীর যাচিল চরণ,
আপনি বাঁধিল বেড়া কাত্যায়নী যার,
সাধনায়, টলিল আসন।

৮

"তিলোত্তমা"-"মেঘনাদে" আমাদেরি একজন
দিল খুলি' ভাষার শৃঙ্খল,
"আনন্দে করিল পান সুধা নিরবধি
গৌড়জন যাহে" নিরমল;

আমাদেরি একজন সাহিত্য-ভাস্কর
প্রতিভার আকর দুলর্ভ
গাহিল, "কেন না তুই যমুনার জল
"হইলিরে, পরাণ-বল্লভ"!

৯

আমাদেরি একজন রচিল বিরহ-গীতি
অশ্রু-জলে, "সারদা-মঙ্গলে,"
কি বিচিত্র অষ্টমূর্ত্তি "বঙ্গ-সুন্দরীর"
দেখাইল মানব-মণ্ডলে;
আমাদেরি একজন বিবুধ-সমাজে
"পদ্মিনীর উপাখ্যান" গানে,
সতীর অতুল-কীর্ত্তি জাগাইল পুনঃ
নবভাবে, নরনারী-প্রাণে।

১০

আমাদেরি একজন গাহিল অমর কাব্যে
দধীচির আত্মা-বিসর্জন,
ঐন্দ্রিলার গর্ব্বকথা ইন্দুবালা-প্রীতি
ইন্দ্রাণীর অসহ বেদনা,
"রৈবতকে" "কুরুক্ষেত্রে" আর এক জন
কৃষ্ণলীলা গাহিল মধুর,
আমাদেরি একজন ভক্ত প্রহ্লাদের
চিত্রিল কি 'চরিত্র' মেদুর।

১১

"পারাবার-স্বয়ম্বরা" হিমালয়-কন্যা গঙ্গা
ত্যজি সবে গেল পিত্রালয়,
আমাদেরি একজন কহিল সে কথা
"সুরধুনী" কাব্য মধুময়;
আমাদেরি একজন উচ্ছ্বসিত প্রাণে
কত রূপে; কত মতে আর,
মহীয়সী মহিলার মহিমার কথা
মধু-ছন্দে করিল প্রচার।

১২

আমাদেরি একজন জগত-কবির দলে
প্রতিভায় প্রতিদ্বন্দ্বিহীন,
যশের বিজয়-মাল্য লইল জিনিয়া
অকলঙ্ক বিশ্বে চিরদিন;
ভারতীর প্রিয়তম আর জন সবে
অগ্নিময়ী উদ্দীপনা-ভরে
গাহিল 'আমার ভাষা' "আমার স্বদেশ"
প্রতিধ্বনি ধ্বনিল অম্বরে।

১৩

আমাদেরি 'কান্ত' কবি ভাবময়ী মধুগীতি
নিবেদিল পরমেশ-পদে,
গাহিল পবিত্র গান "গায়ত্রীর" ছলে
আর জন, মাতি' ভাব-মদে;
আমাদেরি একজন উদার-হৃদয়—
"ভবানীর" যোগ্য বংশধর,
শ্যাম-প্রেমে মাতোয়ারা ললিত সঙ্গীতে
বাণী-কুঞ্জ করিল মুখর।

১৪

চিরদিন বিশ্বে যারা বাঙ্গালার বাঙ্গালীর
বাড়ায়েছে অতুল গৌরব,
তাহাদেরি জ্ঞাতি মোরা, হউক্ সফল
আমাদের এই মহোৎসব!
আমাদেরি সুধাগীতে ভূমানন্দে সদা
বিশ্ব-হৃদি হয়েছে চঞ্চল,
আমাদের বিত্ত নহে, রজত-কাঞ্চন
বীণাপাণি-সাধন সম্বল!

"দেশপ্রকৃতির পূজা"

শ্রী আকিঞ্চন দাস

১

ক্ষান্ত হও! মিছে আর কেন বৃথা খুঁজে মর
পেয়েছি কি একটু সন্ধান?
গ্রন্থ-পাঠে তর্কবাদে দেখি কি করেছ জড়?—
কিছু নয়—বৃথা অভিমান!
অন্ধ করি রুদ্ধ করি দিব্য প্রবেশের পথ, ভ্রান্তি নিয়ে তবু বার বার
বিজ্ঞানের যুক্তি নিয়ে দার্শনিক-মত দিয়ে পেতে চাও কোথা সীমা তার।
অনন্তে অখিলে এনে, অসীমে সীমায় টেনে—ওরে ভ্রান্ত কোথা যা'বি বল্
ফিরে আয় ওরে অন্ধ, দেখ দিব্য-দৃষ্টি মেলি কোথা রবি করে ঝলমল্—
কোথা পথ সহজ সরল!
প্রাণহীন স্পন্দহীন অক্ষরের রেখা-মাঝে পেতে চাস্ প্রাণের সন্ধান,
হায় হায়!—মিছে অভিমান।

২

খুলে ফেল্ সঙ্কোচের পাশ রে অবশ মন
তুই যে রে অমৃত সন্তান
এই লক্ষ নীহারিকা রবি শশী গ্রহ তারা
সুপ্রকাশে নিত্য যার নাম।
জ্যোতি তাঁর ইচ্ছা তাঁর ওতপ্রোত শক্তি তাঁর, তোর মাঝে গুপ্ত নিশিদিন,
রে চির উন্মুক্ত পুত্র! জাগ্ দেখি শক্তি নিয়ে কতকাল রবি হেন দীন,
তোরি' মাঝে সুপ্ত আছে আত্ম-জাগরণ-গাথা শাশ্বত সে অনন্তকালের
মাখা আছে মহামনা তপস্বী ঋষির ব্রত—সে সাধনা অতীত যুগের—
পাতে পাতে তোর জীবনের।
আত্মশক্তি-বোধ নিয়ে খোল দেখি ফিরে আজ এক পাতা সে মহাগ্রন্থের
—পাবি মূল আদি ও অন্তের।

৩

খুলে তবে দেখ্ দেখি কি রয়েছে গ্রন্থে লেখা?
—দেবতার এ চির-বন্দন।
দেখ্ বুঝে মিলে কিনা নিখিলের প্রাণ-সনে
চেতনের প্রাণের স্পন্দন!
দেখ্ দেখি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ওঠে কিনা প্রকৃতির সুমহান্ প্রাণের নিঃশ্বাস

আসা আর চলে-যাওয়া সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্—আছে কি না অখণ্ড-বিশ্বাস ?
মানবের এ হৃদয় শুভ্র-দেবতা-মন্দির; ভক্ত চায় দেবতার পানে
পরিপূর্ণ উপচারে প্রেমে স্নেহে জ্ঞান-গর্ব্বে—ধন্য হতে ধারণায় ধ্যানে
—আপনার নিবেদিত জ্ঞানে।
এই জন্ম এ হৃদয় সত্য হোক্ শান্ত হোক্-হোক্ শুভ্র উজ্জল দ্যোদুল
মানবত' নিবেদিত ফুল।

৪

আজ তবে ফিরে আয় ওরে ভ্রান্ত চিত্ত মোর
দেখ্ চেয়ে একি বসুন্ধরা
এত প্রেম এত স্নেহ একি মিথ্যা বৃথা সবি'
শুধুই কি মায়া দিয়ে গড়া ?
এই খানে বসে কবি রচে মহা প্রেম-গাথা এ বিশ্বের অন্তরের গান,
চিত্রকর আঁকি চিত্র খুলিয়া দেখাতে চায় জননীর পবিত্র সে প্রাণ,
প্রেমিকের প্রেম-পূজা ঋত্বিকের যাগ-যজ্ঞ সন্ন্যাসীর মহাসামগান
গার্হস্থ্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা স্নেহ ক্ষমা ভালবাসা পায় হেথা মানবের প্রাণ
এ কি তবে মিথ্যা মায়াধাম ?
পুত্র-কন্যা ভক্তি করে, মাতা, বধূ ভালবাসে,—আত্ম-ত্যাগে পূর্ণ হয় নর
এই স্বর্গ তোর বিশ্ব-ঘর।

৫

এই ক্ষেত্রে বাজিয়াছে শ্যামের মোহন বাঁশী
একদিন যমুনা-পুলিনে
এই ক্ষেত্রে উঠিয়াছে মহাপ্রেম-নাম-গাথা
দীক্ষাগুরু নারদের বীণে ?
এই ব্রজে গোপকন্যা ছুটিয়াছে আত্মহারা বাঞ্ছিত সে প্রিয় দরশনে
ছায়াম্লান জ্যোৎস্নাতলে আসিয়াছে বিরহিণী ধন্য হতে দেব-পরশনে
দূর বেণুবন হ'তে বাজেরে কানুর বাঁশী, মুগ্ধা ঘরে রহিতে না পারে
বনপথে একাকিনী পুলক বহিয়া বক্ষে যায় বালা শ্যাম-অভিসারে
জ্যোৎস্না-রাতে যমুনার ধারে।
ওরে বিরহিণী-বক্ষ শোন্ দেখি কাণ পেতে কোথা বাজে কানুর বাঁশরী
অভিসারে চল ত্বরা করি।

৬

এইখানে উদেছিল বুদ্ধের উন্নত আত্মা
এইখানে নদীয়া-কিশোর

বর্ণে গন্ধে ফুলে ফলে আছে তারা সমাহিত
আছে জেগে প্রাণ-মাঝে তোর।
এই জন্ম এই আত্মা নহে শুধু এ জন্মের নিত্যতার ব্যক্ত জাগরণ,
চিরমাতা প্রকৃতির এ অমৃত বক্ষমাঝে অণু-কণা লভে না মরণ।
যে নির্ব্বাণ-মন্ত্র কথা শুনেছিল এ ধরণী,—ত্যাগের সে স্বপ্নপূর্ণ ধ্যানে,
যে অমৃত-নাম-মন্ত্রে প্রেমে মেতেছিল ধরা প্রাণ জেগে উঠেছিল গানে
আজো জাগে জগতের প্রাণে।
নহে লুপ্ত নহে সুপ্ত ভোগবতী ফল্গুমত ওরে অন্ধ ওরে ভ্রান্ত চিত
তোর মাঝে জাগিছে সতত।

৭

প্রাণ দাও প্রাণ দাও! হে নীল অনন্ত ব্যোম
শব্দ দাও ভাষা দাও তারে,
তেজ দাও, গতি দাও, শক্তি ইচ্ছা কার্য্য দাও
জল দাও তৃষ্ণা দূরিবারে।
প্রভাতের আলো দাও, সন্ধ্যার আঁধার দাও, দিবসের দাও শত কাজ,
স্থিতি দাও, ক্ষমা দাও, ত্যাগের তপস্যা দাও, বল দাও বহিবারে লাজ।
প্রেমের পুলক দাও জ্ঞানের আলোক দাও বিশ্বাসেতে ভরে দাও বুক
চলিবার পথ দাও জাগিবার মন্ত্র দাও সাধনার প্রাপ্তি দাও সুখ
আঘাতের দাও বজ্রদুখ।
চেতনার স্পন্দ দাও, ত্যাগের গৌরব দাও, জাগুক এ মৌন মূক হিয়া
মিলনের অনুভূতি নিয়া।

৮

সংশয় সঙ্কোচ লাজ দূরে যাক্ ওরে চিত্ত
ধূলি হয়ে যাক্ পথ-মাঝে
ফিরে চেয়ে খুঁজে দেখ্ বিশ্ব প্রকৃতির ছবি
গরীয়সী মাতৃরূপে রাজে!
এই প্রকৃতির শিশু দুর্ব্বাদল-শ্যাম রাম, যশোদার প্রাণের গোপাল
বোধিসত্ত্ব-নামদেব শঙ্কর কবীর মনু—শচীমার গৌরাঙ্গ দুলাল,
এই মহাতীর্থক্ষেত্রে জ্বলিয়াছে যজ্ঞানল, কল্পতরু হইয়াছে নর
ত্যাগ-ব্রতে আত্ম ঢালি এ বিশ্বের দেব শিশু ভুলিয়াছে ভেদ আত্মপর
—সোণা হয়ে গেছে বিশ্বঘর।
হে জননি, হে প্রকৃতি! ঢাল শান্তি-ধারা, দাও চৈতন্যের মহারস সোম—
স্বগ—ধর্ম্ম তুমি।—নমো ওম্।

পরিশিষ্ট "গ"

নবম বার্ষিক সম্মিলন—পরিচালন-সমিতি

কলিকাতা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীয এম্, এ
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল
মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় সি আই ই
রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ
শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্, এ
শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
শ্রীযুক্ত মৌঃ মণিরুজ্জমান
শ্রীযুক্ত মহম্মদ আকরাম খাঁ
শ্রীযুক্ত নূর আহমদ
শ্রীযুক্ত জলধর সেন
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ

২৪ পরগণা

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মৌঃ মহম্মদ কে চাঁদ
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

হুগলী

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এ
শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত
শ্রীযুক্ত কুমার ক্ষিতীন্দ্র দেবরায়
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী
শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীস

বর্দ্ধমান

মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর
রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর সাহেব
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্ এ, বি এল
শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ এল এম্ এস্
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু
শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় বি এল
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বীরভূম

মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র
শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় বি, এ

মেদিনীপুর

কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খাঁ
শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন

বাঁকুড়া

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বি এল
শ্রীযুক্ত রামনাথ মুখোপাধ্যায়

মুর্শিদাবাদ

শ্রীযুক্ত মহারাজ সার্ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর
শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্, এ
শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়

যশোহর

রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্, এ, বি, এল
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ
শ্রী হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বি, এ
কুমার সতীশকণ্ঠ সিংহরায়

নদীয়া

মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়
শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্, এ
শ্রীযুক্ত মৌঃ মোজাম্মেল হক্
শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মজুমদার

খুলনা

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্, এ
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বরিশাল

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এম, এ, বি, এল
শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ফরিদপুর

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়
শ্রীযুক্ত মৌঃ রওশন আলি চৌধুরী

ঢাকা

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্, এ
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার
শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্, এ
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়

ময়মনসিংহ

মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি, এ
শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী
শ্রীযুক্ত রাজা জগৎ কিশোর আচার্য্যচৌধুরী
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার এম্, আর, এ, এস্
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় বি, এল

ত্রিপুরা

কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা
শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়

নোয়াখালী

সম্পাদক নোয়াখালী সম্মিলনী

চট্টগ্রাম

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই
রায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর
শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি, এল্

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী বি, এল্
শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বি, এ

শ্রীহট্ট

শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব বি, এ
শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি, এ
শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী

কাছাড়

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব

গৌহাটী

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ
শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী এম্, এ
শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম্, এ
শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন

গোয়ালপাড়া

রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া
শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি, এল

কুচবিহার

কুমার শ্রীযুক্ত নিত্যেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর
শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ
শ্রীযুক্ত চৌধুরী আমানতুল্লা আহমদ

রঙ্গপুর

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ
শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন কবি-সম্রাট
শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীযুক্ত সেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ
রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর

বগুড়া

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত
শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু

পাবনা

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্, এ
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

দিনাজপুর

মহারাজ সার শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায়
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্
শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন

মালদহ

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল
শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বসু

পূর্ণিয়া

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি, এল
শ্রীযুক্ত রায় নিশিথনাথ সেন বাহাদুর

রাজসাহী

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্
শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ
শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্, এ
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্, এ

মানভূম

শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি, এল
শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ

কটক

রায়সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্, এ

ভাগলপুর

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়

বাঁকীপুর

রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম্, এ, বি, এল
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ
শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি, এ

কাশী

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

দিল্লী

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম সিংহ বি, এ
শ্রীযুক্ত সরোজনাথ বাগচি

মিরাট

শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি, এল
শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় বি, এ

পরিশিষ্ট "ঘ"

অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি ঃ মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর-বর্দ্ধমান

সহকারী সভাপতি

১. শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপূর সাহেব, সি, এস, আই
২. শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, সি, আই, ই; সি, এস, আই
৩. শ্রীযুক্ত জে, এন, রায় আই, সি, এস্
৪. মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল
৫. শ্রীযুক্ত রায় পুলিনবিহারী লাল হাণ্ডে বাহাদুর
৬. শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর
৭. মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর
৮. শ্রীযুক্ত রায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর
৯. শ্রীযুক্ত কুমার প্রমথনাথ মানিয়া

সম্পাদক

১. শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র
২. শ্রীযুক্তদেবেন্দ্রনাথ সরকার

সহকারী সম্পাদক

১. শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু
২. মৌলবী মহম্মদ ইয়াসিন্
৩. শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়
৪. শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার চট্টোপাধ্যায়
৫. শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র
৬. শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ
৭. শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বসু

কোষাধ্যক্ষ

১. শ্রীযুক্ত শ্রীপতি দত্ত

পরিদর্শকগণ

১. শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু
২. শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মিত্র
৩. শ্রীযুক্ত রায় মণিলাল সিংহ রায় বাহাদুর
৪. শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অভ্যর্থনা-বিভাগ

১. শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় (অধ্যক্ষ)
২. শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৩. শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়
৪. শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
৫. শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র
৬. শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য
৭. শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮. শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মণ্ডল
৯. শ্রীযুক্ত মৌলবি আজিজর রহমান

কার্য্যালয়-বিভাগ

১. শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্, এ, বি, এল্ (অধ্যক্ষ)
২. শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়
৩. শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র
৪. শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু
৫. শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র
৬. শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু
৭. শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ

সাজসজ্জা-বিভাগ

১. শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসু (অধ্যক্ষ)
২. শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যানাদি-ব্যবস্থা বিভাগ

১. শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী (অধ্যক্ষ)
২. শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

হিসাব-পরীক্ষক

১. শ্রীযুক্ত রায় সাহেব শ্যামাচরণ রায়
২. মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর

প্রদর্শনী বিভাগ

১. শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় (অধ্যক্ষ)
২. শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়
৩. শ্রীযুক্ত শিবদাস তেওয়ারী
৪. শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত

স্বেচ্ছাসেবক বিভাগ

১. শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (অধ্যক্ষ)
২. শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ

সঙ্গীত-সমিতি বিভাগ

১. শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু (অধ্যক্ষ)
২. শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী
৩. শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার বসু এম, এ
৪. শ্রীযুক্ত জটাধারী বসু
৫. শ্রীযুক্ত ডাক্তার অটলকুমার ঘোষ
৬. শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র দাস
৭. শ্রীযুক্ত ব্রহ্মপদ দত্ত
৮. শ্রীযুক্ত সদানন্দ খান্না
৯. শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১০. শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাস্থ্য বিভাগ

১. শ্রীযুক্ত এস, কে, সেন
২. শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র মিত্র
৩. শ্রীযুক্ত শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়
৪. শ্রীযুক্ত অটলকুমার বসু
৫. শ্রীযুক্ত অহিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমোদ-প্রমোদ বিভাগ

১. শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার (অধ্যক্ষ)
২. শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থসংগ্রাহকগণ

১. শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার চট্টোপাধ্যায়
২. শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়
৩. শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র
৪. শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র
৫. শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু
৬. শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু

বাসস্থান বিভাগ

১. শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২. শ্রীযুক্ত জলধর সেন

কর্ম্মচারী—শ্রীযুক্ত শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সাধারণ সদস্য

শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহান্ত মহারাজ
শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ দত্ত বি, এ
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু বি, এল
শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত রায় সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ এম্ এ, বি, এল
শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বি, এল
শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এল
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত এম্, এ, বি এল
শ্রীযুক্ত ভামিনীরঞ্জন সেন বি, এল
শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল চৌধুরী বি, এল
শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ তেওয়ারী
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্, এ
শ্রীযুক্ত লালা জ্যোতিঃপ্রকাশ নন্দে
শ্রীযুক্ত লালা গতিপ্রকাশ নন্দে
শ্রীযুক্ত লালা মুক্তিপ্রকাশ নন্দে
শ্রীযুক্ত লালা দীপ্তিপ্রকাশ নন্দে
শ্রীযুক্ত লালা শান্তিপ্রকাশ নন্দে
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শেঠ
শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন সিংহ
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল
শ্রীযুক্ত ননিলাল ঘোষ বি, এল
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার বসু এম্, এ, বি, এল
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সিংহ সরস্বতী
মৌলবী সৈয়দ আবদুল আলম্
সৈয়দ আবদুল্লা উল মসাভি
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ
শ্রীযুক্ত সত্যশরণ সরকার বি, এ
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্, এ
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় এম্, এ, বি, এল
শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত পি. এন, সরকার
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়
শ্রীযুক্ত যদুপতি চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু
শ্রীযুক্ত কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী

পরামর্শ-সমিতি

মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর
শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপূর সাহেব
মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার
শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মিত্র
শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেন

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু
রায়সাহেব শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায়
শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র মিত্র
শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত জলধর সেন
শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়
মৌলবী মহম্মদ ইয়াসিন্
শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ সাহা দাঁইহাট
শ্রীযুক্ত অটলকুমার বসু এল, এম, এস্ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ রায় চৌধুরী বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ বসু বি, এল দ্বারভাঙ্গা
শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত অবনিমোহন চট্টোপাধ্যায় বি, এ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হাট শ্রীধরপুর
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দাঁ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র মিত্র বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন দেনুড়
শ্রীযুক্ত অহিভূষণ মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত মৌলবি আজিজর রহমান্ বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত লালা আনন্দলাল হাণ্ডে বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল সিংহ দেবীপুর
শ্রীযুক্ত মৌঃ কাজী মহম্মদ আজি সাহেব কুসুমগ্রাম
শ্রীযুক্ত আবদুল হাফিজ এম্, এ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবদুল আলম বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত আবদুল্লা উল মোসাভি বেহার
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল রাণীগঞ্জ
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেন বি, এল ঐ
শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত উতঙ্কলাল মুখোপাধ্যায় বাগনাপাড়া
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ হাজরা বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত এককড়ি দে মাথরুন
শ্রীযুক্ত মৌলবী এক্রামল হক্ বর্দ্ধমান
মিঃ এ, স্মিথ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ বসু এম্, এ, বি এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত করুণানিধান মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত করুণাময় নাগ বি, এল বর্দ্ধমান

শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষ বি, এল
শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষ চুঁচুড়া
শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ মিত্র এম্, এ, বি, এল কাশ্মীর
শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন নন্দী বন্দীপুর
শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায় খরমপুর
শ্রীযুক্ত কালীদাস রায়, বি এ কড়ুই
শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর কাব্যতীর্থ কুলীনগ্রাম
শ্রীযুক্ত কালীপদ চট্টোপাধ্যায় বি, এল মালদহ
শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার এম, এ খণ্ডঘোষ
শ্রীযুক্ত লালা কুন্দন লাল কপূর বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ মাথরুন
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ চুঁচুড়া
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বর্দ্ধমান
রায় কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর দেয়াসীন
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চন্দ্র আউশগ্রাম
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মৈত্র বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী এল, এম্, এস বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বসু এম, এ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ অধিকারী বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চৌধুরী বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দত্ত বীরভূম
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি, এল ধানবাদ
শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বৈদ্যপুর
শ্রীযুক্ত লালা গতিপ্রকাশ নন্দে বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত গদাধর দাস বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম, এ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মণ্ডল বি, এল রাণীগঞ্জ
শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মিত্র বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ মঙ্গলচাঁদ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দত্ত বনতীর
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত গোবিন্দচাঁদ সাহা কাটোয়া
শ্রীযুক্ত গোবিন্দপদ সিংহ কাটোয়া
শ্রীযুক্ত গোবিন্দবিজয় গোস্বামী বি, এ মাথরুন
শ্রীযুক্ত গোঁরাচাঁদ চৌধুরী ওকর্সা
শ্রীযুক্ত গোলাকবিহারী লাল হাণ্ডে উখরা
শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী মাকড় বি, এ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত গৌরদুলাল দে মীরপুর
শ্রীযুক্ত গৌরপদ রায় বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত ধুলিয়া
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত চাঁদমল মাড়োয়ারী বর্দ্ধমান

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগদীশ্বর ওঝা বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মিত্র এল, এম, এস, ঐ
শ্রীযুক্ত জলধর সেন কলিকাতা
শ্রীযুক্ত জয়লাল মাড়োয়ারী বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসু মুন্সী কাইগ্রাম
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সামন্ত বোগরা
শ্রীযুক্ত মৌঃ জিয়ান্নবী সাহেব কুসুমগ্রাম
শ্রীযুক্ত লালা জ্যোতিঃপ্রকাশ নন্দে বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ কাটোয়া
শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত জি, এন, রায়, আই, সি, এস, বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল দত্ত বি, এল বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি, এল নবাবগঞ্জ
শ্রীযুক্ত তারাপদ রায় বি, এ দিল্লী
শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন চেঙ্গদার গুস্করা
শ্রীযুক্ত তুলসীদাস কর এম্, এ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত দাশরথি কর বি, এল বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী হাওড়া
শ্রীযুক্ত লালা দেবীপ্রসাদ কপূর বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক বি, এল কলিকাতা
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্, এ, বি এল বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মণ্ডল বি, এল বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র মজুমদার কুলীনগ্রাম
শ্রীযুক্ত লালাদীপ্তিপ্রকাশ নন্দে বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ধরণীধর চট্টোপাধ্যায় উখরা
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন মিত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বৰ্দ্ধমান
মৌলবী নসিরুদ্দীন আহম্মদ বি, এল, বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত নটবর দত্ত এল, এম, এস মানকর
শ্রীযুক্ত ননিগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ননিলাল ঘোষ এম্, এ, বি, এল বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি, এল বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসু বি, এ বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র বি, এল বৰ্দ্ধমান
মাননীয় রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন মিত্র, সিমলা
শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল ময়নসিংহ
শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দত্ত, বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র হুই বি, এল বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত নিরঙ্কচন্দ্র বসু বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত নিৰ্ম্মলচন্দ্র মিত্র বি,এল কাটোয়া
শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জামালপুর
শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সিংহ দেবীপুর

শ্রীযুক্ত নৃত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় কাইগ্রাম
শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ চৌধুরী কামারকিতা
শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ রায় মহাশয় চুপী
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বড়বেলুন
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সিংহ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত পরমশুক চন্দ্র শ্রীবাটি
শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায় বি, এ আসানশোল
শ্রীযুক্ত পি, এন সরকার বর্দ্ধমান
রায় পুলিনবিহারী লাল হাণ্ডে বাহাদুর উখরা
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল কাটোয়া
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র অধিকারী বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ শ্রীখণ্ড
শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্ত বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত বি, এল নীলফামারি
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, কলকাতা
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সরকার বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত প্রভাতরঞ্জন মিত্র বি, এল, ঐ
কুমার প্রমথনাথ মালিয়া শিয়ারশোল
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত লালা প্রসাদদাস কপূর বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ নায়েক কুলীনগ্রাম
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন ঐ
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল ঐ
শ্রীযুক্ত পাঁচুষষ্ঠী দাস ঐ
শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র মণ্ডল বি, এল ঐ
শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি, এ কাটোয়া
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রলাল সেন এম্,এ,বি,এল রঘুনাথপুর
মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ অধিরাজ বাহাদুর
রাজা বনবিহারী কপূর সি, এস, আই বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত বক্সীরাম মাড়োয়ারী বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল চৌধুরী বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল হাটি বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বসন্তবিহারী চন্দ্র এম্, এ কাটোয়া
শ্রীযুক্ত বি, এম, মিত্র আই, এম, এস, মীরাট
শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী মন্তেশ্বর
শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল নওগাঁ
শ্রীযুক্ত বিজয়বসন্ত ভট্টাচার্য্য এম্, এ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় কালনা
শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শিক্দার বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য বর্দ্ধমান

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ এম্, এ,
বি, এল ভবানীপুর
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ চৌধুরী বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বসু এল, এম, এস,
কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বিরজাচারণ মিত্র বি, এল বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু আই, সি এস,
বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বৰ্দ্ধমান
রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর বি, এল
সৈদাবাদ
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধান্ত জামালপুর
শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায় বি, এল
বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় শাকনারা
শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র দাসগুপ্ত শাকনারা
শ্রীযুক্ত ভামিনীরঞ্জন সেন বি, এল ঐ
শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় খানাজংশন
শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু বি, এল শাকারি
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্, এ বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষাল বি, এল ঐ
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ, বি, ঈ,
বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দে বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধায় বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সৈয়দ মকবুল এলাহি বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত মঙ্গলপ্রসাদ রায় চৌধুরী বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বন্দ্যোপাধায় বি, এল
বৰ্দ্ধমান

শ্রীযুক্ত মধুসূদন শরণদেব মহান্ত মহারাজ
বৰ্দ্ধমান
রায় মণিলাল সিংহ রায় বাহাদুর চকদিঘী
শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার চট্টোপাধ্যায় এ, এ,
বি, এল, বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ,
বি, এল কাটোয়া
শ্রীযুক্ত মৌঃ মহম্মদ ইয়াসীন বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত মহাবিষ্ণু চোঙ্গদার গুষ্করা
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ
মানকর
শ্রীযুক্ত লালা মুক্তিপ্রকাশ নন্দে বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সৃতচাঁদ বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কলাল মুখোপাধ্যায় বি, এল,
বৰ্দ্ধমান
রায় সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় রাণীগঞ্জ
শ্রীযুক্ত মৃতুঞ্জয় চৌধুরী বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার রায় বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র মাহাতা
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সাই বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সরকার বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ মেমারি
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মল্লিক বি, ঈ,
বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র ঘোষ বৰ্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মল্লিক বি, এল ধানবাদ
শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার কাটোয়া
শ্রীযুক্ত যদুপতি চট্টোপাধ্যায় কাটোয়া
শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এম্, এ,
বি, এল বৰ্দ্ধমান

রায় যামিনীমোহন মিত্র এম্, এ, বাহাদুর কলিকাতা
শ্রীযুক্ত যুগলবিহারী মাকড় এম্, এ, বি, এল রামপুরহাট
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রলাল সাহা কাটোয়া
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ কাটোয়া
শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মিত্র এম্, এ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ বড়বেলুন
রায় রসময় মিত্র বাহাদুর এম্, এ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ সাহিত্যভূষণ
শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দাস বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি, এ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ ঠাকুর শ্রীখণ্ড
শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত রাজরাজেন্দ্র চন্দ্র শ্রীবাটী
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শেঠ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সিংহ সরস্বতী বোরশুল
শ্রীযুক্ত রাজেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মেমারি
শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ মুখোপাধ্যায় কাটোয়া
শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত দাঁইহাট
শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বসু বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোস্বামী বাগনাপাড়া
শ্রীযুক্ত রামায়ণ দত্ত বি, এ ভৈটা
শ্রীযুক্ত সার রাসবিহারী ঘোষ, এম্, এ, বি, এল; সি, এস্, আই; সি, আই, ই, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর, চকদিঘী
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি, এল পুরুলিয়া
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু বি, এ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কালনা
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত লালা শান্তিপ্রকাশ নন্দে বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভকত বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত শিবদাস তেওয়ারী বর্দ্ধমান
শিবরাম গোস্বামী পুটশুরী
শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত রায় সাহেব শ্যামাচরণ রায়
শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি কলিকাতা
শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায় বহরমপুর
শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ তেওয়ারী বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত শ্রীপতি দত্ত বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত শ্রীমোহন সিংহ বি, এল ঐ
শ্রীযুক্ত শ্রীহরি মুখোপাধ্যায় বি, এল রায়গঞ্জ
শ্রীযুক্ত হর্ষ মুখোপাধ্যায় বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সতীনাথ মুখোপাধ্যায় নবদ্বীপ
শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ পাঁজা নবদ্বীপ
শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাটিকুরী

শ্রীযুক্ত সতীপ্রসন্ন সরকার এম্, এ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সতীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম্, এ জামালপুর
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ গোস্বামী কুড়মুন
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সরকার বি, এ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক আই, সি এস, কৃষ্ণনগর
শ্রীযুক্ত সনৎকুমার চৌধুরী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার রায় বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চৌধুরী বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বরকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, কুলীনগ্রাম
শ্রীযুক্ত সিদ্বেশ্বর সিংহ বি, এ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু এম্, বি কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার বসু এম্, এ, বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেন এল, আর, সি, পি বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল কাঁথী
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র পুরী
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু বি, এ ইটাচুনা

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র এল, এম, এস গয়া
শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ বি, এ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু বি, এল কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ ঢাকা
শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত, পি, এচ্, ডি, বি, এল, বার-এ-টল, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত এল, এম, এস, মুঙ্গের
শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন সিংহ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত হরকালী মুখোপাধ্যায় বি, এ চকদিঘী
শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ রেজ কালনা
শ্রীযুক্ত হরিকুমার গুপ্ত বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত কলিগ্রাম
শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত হরিপদ রেজ কুসুমগ্রাম
শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ রায় এম্, এ, বি, এল উলীপুর
শ্রীযুক্ত হাজারীমল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত মৌঃ সৈয়দ হামিদুল্লা বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় বি, এল বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার কালনা
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন বি, এল কলিকাতা
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু বি, এ বর্দ্ধমান

পরিশিষ্ট "ঙ"

বর্দ্ধমান, অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে প্রতিনিধি-প্রেরণকারী সভাসমিতি, পুস্তকাগার ও পাঠাগারের তালিকা

কলিকাতা

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ
সাহিত্য-সভা
চৈতন্য-লাইব্রেরী
রামমোহন লাইব্রেরী
হিন্দি সাহিত্য-পরিষৎ
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা
বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা
জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ
বঙ্গীয় ছাত্র-সম্মিলনী
আর্য্য সাহিত্য-সমাজ
ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতি

সাহিত্য-সংঘ

বঙ্গবাসী-সম্মিলনী
ত্রিপুরা হিতসাধিনী-সভা
নোয়াখালি সম্মিলনী
শ্রীহট্ট-সম্মিলন
শ্রীহট্ট সমাজ-সেবা-সমিতি

দেবালয়

অধ্যাত্ম-পরিষৎ
National Reading Society
Rajanikanta Gupta
Memorial Library
Michael Modhusudan Library
Boy's Own Library

২৪ পরগণা

Panihati Club
Ariadah Association Library

হুগলী ও হাওড়া

উত্তরপাড়া-সম্মিলনী
শিবপুর পাব্লিক-লাইব্রেরী
মাজু পাব্লিক লাইব্রেরী
উলুবেড়িয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল লাইব্রেরী
Friend's Debating Club, Chinsura
শিক্ষা-সমিতি, বালী
শান্তিকুটীর লাইব্রেরী ও অক্ষয় দত্ত স্মৃতি-সমিতি।
হুগলী বার-এসোসিয়েশন
শিবপুর সাহিত্য-সংসদ
জীরাট পল্লী-সমাজ, বলাগড়
জগদ্বল্লভপুর সাহিত্য-সমিতি

বর্দ্ধমান

বর্দ্ধমান শাখা-পরিষৎ
কালনা শাখা-পরিষৎ

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া শাখা-পরিষৎ

টানাদীঘি সারস্বত লাইব্রেরী

বিহার

প্রবাসী বঙ্গবাসী-সংঘ, বাঁকীপুর
প্রবাসী বঙ্গবাসী-সংঘ, মুঙ্গের
ভাগলপুর শাখা-পরিষৎ

মালদহ

সাহিত্য-সভা
জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ
সাহিত্য-সংসদ, কলিগ্রাম

রাজসাহী

বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি
রাজসাহী শাখা পরিষৎ
P. M. Public Library, Naogaon.

জলপাইগুড়ী

যমগ্রাম বীণাপাণি-লাইব্রেরী, বাউরা
উপনচৌকীপল্লী সাহিত্য-সমিতি, বাউরা

পাবনা

পাবনা শাখা-পরিষৎ
সাঁরাইল সারদাচরণ ফ্রি-পাবলিক লাইব্রেরী এবং বিদ্যোৎসাহিনী-সমিতি, হরিপুর।

রঙ্গপুর

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ,
বেলপুকুর পল্লী-পরিষৎ, শ্যামগঞ্জ
কমলা-পাঠাগার, নাওডাঙ্গা

মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর শাখা-পরিষৎ
আশুতোষ লিটারারি সোসাইটি, নিমতিতা

ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজ
ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ

ফরিদপুর

কোহিনূর-সমিতি, পাঁশা
প্রসন্নকুমার লাইব্রেরী-হাবাসপুর

যশোহর

যশোহর বার-এসোয়েশসিন
ব্রাহ্মণডাঙ্গা অমরাবতী লাইব্রেরী রায়গ্রাম

অন্যান্য স্থান

বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতি, হেতমপুর
মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজ
কুমারখালি সাহিত্য-সম্মিলনী
বরিশাল শাখা-পরিষৎ
চট্টগ্রাম শাখা-পরিষৎ
বগুড়া পরিষৎ-শাখা
কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতি
কাছাড় অনুসন্ধান-সমিতি
অষ্টগ্রাম সুনীতি-সঞ্চারিণী-সভা (কুমিল্লা)

পরিশিষ্ট "চ"

সম্মিলনে বিদেশাগত প্রতিনিধি ও দর্শকগণের তালিকা

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দে পাবনা
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল কলিকাতা
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার হাওড়া
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়া
শ্রীযুক্ত অকিঞ্চন দাস কলিকাতা
শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ
শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ ঘোষ ঐ
শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ সাহা দাঁইহাট
শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত অচ্যুতচন্দ্র সরকার চুঁচুড়া
শ্রীযুক্ত অজয়কুমার বড়াল কলিকাতা
শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়া
শ্রীযুক্ত অতুলকিঙ্কর দত্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ দত্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ সিংহ হাওড়া
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুর
শ্রীযুক্ত অনঙ্গরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব ঐ
শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু কর্ম্মকার ঐ
শ্রীযুক্ত অনাদিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র দাস ঐ
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বর্ম্মা ঐ

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার কলিকাতা
শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় হওড়া
শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ দত্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত অবতারচন্দ্র লাহা কলিকাতা
শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন কলিকাতা
শ্রীযুক্ত অবনীনাথ পণ্ডিত পাবনা
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস আজিমগঞ্জ
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সরকার কলিকাতা
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সান্ন্যাল ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত অজয়নাথ পাল কলিকাতা
শ্রীযুক্ত অভয়াপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া
শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস কলিকাতা
শ্রীযুক্ত অমরনাথ কুণ্ডু পাংশা
শ্রীযুক্ত অমরনাথ সিংহ ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ আচার্য্য ঢাকা
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উত্তরপাড়া
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্য দামুন্যা
শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র দত্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত অমূল্যধন ভট্টাচার্য্য বৈদ্যপুর
শ্রীযুক্ত অমূল্যনাথ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর

শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন চট্টোপাধ্যায় পুরুলিয়া
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল হাজরা উলুবেড়িয়া
শ্রীযুক্তা অম্বিকাচরণ চৌধুরী পাবনা
শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত স্মৃতিতীর্থ যশোহর
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার আচার্য্য বগুড়া
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত ত্রিপুরা
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পালিত দেবগ্রাম
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বটব্যাল মাথরুন
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন সেনহাটি
শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার শান্তি নিকেতন
শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় ঢাকা
শ্রীযুক্ত আনন্দরাম চৌধুরী গৌহাটী
মৌঃ আফাজদ্দীন মহম্মদ কুষ্ঠিয়া
আবদুল করিম চট্টগ্রাম
ডাঃ আবদুল গফুর ২৪ পরগণা
আবদুল গণি মালদহ
আদুবল মলাম চট্টগ্রাম
আবদুল মজিদ জলপাইগুড়ি
আবদুলহোসেন চৌধুরী বেলপুকুর
শ্রীযুক্ত আশুতোষ কুণ্ডু পাংশা
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী নিমতিতা
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মালদহ
শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ শিবপুর
শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস ঘোষ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত আশুতোষ বর্ম্মা জেমো
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কামদেবপুর

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুন্সী নিমতিতা
শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায় কাশী
শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বিশ্বাস বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ভাগলপুর
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঢাকা
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চন্দননগর
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত সেনহাটি
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ কালনা
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস শ্রীহট্ট
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মৈত্র রাজশাহী
শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চৌধুরী গৌহাটী
শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত করালীচরণ রায় বরাকর
শ্রীযুক্ত কানাইলাল বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায় খরমপুর
শ্রীযুক্ত কাজী আবদুল আমেদ ফরিদপুর
শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ ভাগলপুর
শ্রীযুক্ত কালিদাস বাগ্চি বহরমপুর
শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় উলিপুর
শ্রীযুক্ত কালীমুদ্দিন সরকার জলপাইগুড়ি
শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস রঙ্গপুর
শ্রীযুক্ত কালকিঙ্কর কাব্যতীর্থ কুলীনগ্রাম
শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর রায় চৌধুরী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত কালীচরণ ত্রিবেদী পুরুলিয়া
শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন গৌহাটি
শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য হাওড়া
শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুর

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় চুঁচুড়া
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন শ্রীরামপুর
শ্রীযুক্ত কালীরঞ্জন লাহিড়ী মালদহ
শ্রীযুক্ত কালীরঞ্জন লাহিড়ী গৌহাটী
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সেন বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল কুণ্ডু কুমারখালি
শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র দাস মালদহ
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু ২৪ পরগণা
শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ইচ্ছাপুর
শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক রাণাঘাট
শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মাথরুন
শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ঢাকা
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চৌধুরী গৌহাটী
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার কলিগ্রাম
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ বসাক কলিকাতা
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ সেন দিনাজপুর
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী ঘোষ ভাগলপুর
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী গোলাঘাট
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় চুঁচুড়া
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মতিহারী
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার রাজশাহী
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেন ময়মনসিংহ

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বসু শ্রীরামপুর
শ্রীযুক্ত কেশবলাল চৌধুরী ঐ
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মেদিনীপুর
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যশোহর
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর রাজশাহী
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনারায়ণ ভূএগ ভবানীপুর
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাবসপুর
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ পুরকায়স্থ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত ধানবাদ
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুর
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ ধর চুঁচুড়া
শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সেন গোয়ালপাড়া
শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বহরমপুর
শ্রীযুক্ত গণদেব গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত গণপতি রায় ঐ
শ্রীযুক্ত গিরিগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় মালদহ
শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু শিবপুর
শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় রাণাঘাট
শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসাদ বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন কলিকাতা
শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ শেঠ ঐ
শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন সান্ন্যাল রাজশাহী

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সেন কলিকাতা
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাস্থবির কলিকাতা
শ্রীযুক্ত গুরুদাস দত্ত, হাওড়া
শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার রাণাঘাট
শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র শীল চুঁচুড়া
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ রঙ্গপুর
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সরকার বগুড়া
শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাশী
শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর সিংহ জেমো
শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন মজুমদার কলিকাতা
শ্রীযুক্ত গোলোকেন্দ্রনাথ দে পাবনা
শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন কলিকাতা
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দাস মালদহ
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চৌধুরী রাজশাহী
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ শর্ম্মা গৌহাটী
শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল শ্রীবাটী
শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু ভাগলপুর
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গা
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন মেদিনীপুর
শ্রীযুক্ত ডাঃ চুনীলাল বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত জগদিন্দু রায় শ্রীরামপুর
শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় নাটোর
শ্রীযুক্ত জগদীশ চট্টোপাধ্যায় ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত জগদীশ বর্ম্মা জেমো
শ্রীযুক্ত জগদীশ বাজপেয়ী কান্দি
শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মোদক কলিকাতা
শ্রীযুক্ত জলধর সেন কলিকাতা
শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু ঐ
শ্রীযুক্ত মৌ জান মহম্মদ ফরিদপুর
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নদীয়া
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বৈদ্যপুর
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন দত্ত মালদহ
শ্রীযুক্ত জীবনকান্ত দাস গৌহাটী
শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ গাঙ্গুলি মালদহ
শ্রীযুক্ত জীবানন্দ প্রামাণিক শান্তিপুর
শ্রীযুক্ত জে এন মিত্র আড়িয়াদহ
শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ কাটোয়া
শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ ত্রিবেদী কান্দি
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ কাব্যরত্ন ঐ
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কোঁয়ার কলিকাতা
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুর
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নিমতিতা
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত নবাবগঞ্জ
শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মিত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস জলপাইগুড়ী
শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ বেলেঘাটা

শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় বহরমপুর
শ্রীযুক্ত তীর্থবাসী সিংহ রায় হুগলী
শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ সিউড়ী
শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ চুঁচুড়া
শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রচন্দ্র ঘটক ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত দীননাথ মুখোপাধ্যায় ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কলিকাতা
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় ভাগলপুর
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় পাবনা
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ চৌধুরী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ রায় বগুড়া
শ্রীযুক্ত দুর্গেশনাথ ভট্টাচার্য্য মুর্শিদাবাদ
শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মিত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী বরিশাল
শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সরকার কলিকাতা
শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ঐ
শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সান্ন্যাল কলিকাতা
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার সরকার ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার সরকার মালদহ
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মালদহ
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ইন্দু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বীরভূম
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুরুলিয়া
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বহরমপুর
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় পাবনা
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো
শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী পাবনা
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল ঐ
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ঐ
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বড়িশা
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চি কলিকাতা
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রমোহন দত্ত দিনাজপুর
শ্রীযুক্ত মৌঃ দৌলত আহম্মদ ত্রিপুরা
শ্রীযুক্ত ধাত্রীদাস ঘোষাল ফরিদপুর
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন ঘটক বগুড়া
শ্রীযুক্ত ধ্রুবকুমার পাল শিবপুর
শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর দত্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বোলপুর
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ধর হুগলী
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সরকার বগুড়া
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন খুলনা
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
শ্রীযুক্ত নবকিশোর মজুমদার মালদহ

শ্রীযুক্ত মৌঃ নবিরদ্দি মহম্মদ জলপাইগুড়ি
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নলিন্‌চন্দ্র গাঙ্গুলী ঐ
শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বিশ্বাস ঐ
শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা
শ্রীযুক্ত নিলনীমোহন রায়চৌধুরী রঙ্গপুর
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মজুমদার হাওড়া
শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দাস শ্রীহট্ট
শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ মৈত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় এথোরা
শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল সাহা পাবনা
শ্রীযুক্ত নিত্যলাল দাস কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ ঘোষ বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত. বরিশাল
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত ঐ
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মালদহ
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধায় লাভপুর
শ্রীযুক্ত নীলকমল ত্রিবেদী জেমো
শ্রীযুক্ত নীলকান্ত রায় যশোহর
নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত চুঁচুড়া
শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু মুর্শিদাবাদ
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন পাল বরাহনগর
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বড়বেলুন
শ্রীযুক্ত পতাকিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাণিহাটি
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য গৌহাটী
শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত পরেশলাল সোম ঐ
শ্রীযুক্ত পশুপতি ঘোষ ঐ
শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত পশুপতি দে পাংশা
শ্রীযুক্ত পশুপতি মুখোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সরকার কলিকাতা
শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায় ঐ
শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য বগুড়া
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মাকড় রামপুরহাট
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী গৌহাটী
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মেমারী
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ দিনাজপুর
শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বরিশাল
শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত রঙ্গপুর
শ্রীযুক্ত প্রতাপেন্দ্র পাঁড়ে পাকুড়
শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ঐ

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ সাহা পাবনা
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মল্লিক ঐ
শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র কুণ্ডু বেলপুকুর
শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বরাহনগর
শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার কুণ্ডু হাবাসপুর
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সান্ন্যাল হাওড়া
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেন ভবানীপুর
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রাহা মালদহ
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চৌধুরী পাবনা
শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মতিহারী
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কুণ্ডু পাংশা
শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রিয়নাথ নন্দী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দে কলিকাতা
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মেদিনীপুর
শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ রায় জগদ্বল্লভপুর
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ দে ঐ
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল ঐ
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বর্ম্মন্ ঐ
শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী পণ্ডিত চুঁচুড়া
শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মজুমদার কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী কুমিল্লা
শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মিত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দত্ত শিবপুর
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী বেলপুকুর
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু বহরমপুর
শ্রীযুক্ত বামাচরণ মজুমদার কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বারাণসী চট্টোপাধ্যায় নদীয়া
শ্রীযুক্ত বিজয়কান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার বর্ম্মন্ জগদ্বল্লভপুর
শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার বর্ম্মন্ রায় ত্রিপুরা
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগণা
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মৈত্র নিমতিতা
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ শাস্ত্রী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ ঘাটেশ্বর
শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বিজয়কান্ত লাহিড়ী ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত কৃষ্ণনগর
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গোস্বামী রাজসাহী
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী চট্টগ্রাম

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী পাইন কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভড় শ্রীরামপুর
শ্রীযুক্ত বিভূতিপদ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বসু বহরমপুর
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বসু উলুবেড়িয়া
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণনগর
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মজুমদার নদীয়া
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র পাতুন
শ্রীযুক্ত বিমলাকন্তি ঘোষ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী কানপুর
শ্রীযুক্ত বিশ্বানন্দ রায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস শান্তিপুর
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর রায় বহরমপুর
শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ঘোষ হাওড়া
শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কাটোয়া
শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন কৃষ্ণনগর
শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন কটক
শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বহরমপুর
শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়া
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চন্দ্র মেদিনীপুর
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী
শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় চুঁচুড়া
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী
শ্রীযুক্ত ভরতারণ সাংখ্য-তন্ত্ররত্ন পাতুন
শ্রীযুক্ত ভবাণীচরণ ঘোষ বড়িষা
শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা পাবনা
শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী বসিরহাট
শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র কাব্যতীর্থ মেদিনীপুর
শ্রীযুক্ত ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত ভূতনাথ চৌধুরী শ্রীরামপুর
শ্রীযুক্ত ভূপতি মুখোপাধ্যায় ঝরিয়া
শ্রীযুক্ত ভূপতি মুখোপাধ্যায় খুলনা
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম
শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী দেনুড়
শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মিত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভাগলপুর
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ পাল কলিকাতা
শ্রীযুক্ত মতিলাল ইন্দ্ রাজশাহী
শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার কলিকাতা
শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত মদেন্দ্রমোহন ঠাকুর মুর্শিদাবাদ
শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য ঢাকা
শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী রায়গ্রাম
শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ খুলনা
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ যশোহর
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দত্ত বহরমপুর
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে বাঁকীপুর

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মজুমদার পাবনা
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চুপী
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় বরাকর
মোঃ মহম্মদ মজাম্মল হক্ শান্তিপুর
শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী পাতুন
শ্রীযুক্ত মহিষচন্দ্র ঠাকুর ত্রিপুরা
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দাস শ্রীহট্ট
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত চন্দননগর
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত ডায়মণ্ডহারবার
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মেদিনীপুর
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি ডায়মণ্ডহারবার
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাস চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন কলিকাতা
শ্রীযুক্ত মিহিরনাথ রায় বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত মৃতুঞ্জয় রায়চৌধুরী রঙ্গপুর
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য বগুড়া
শ্রীযুক্ত মোক্ষদারঞ্জন রায় চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত মোহান্ত ভোগুলি দাস মুর্শিদাবাদ
শ্রীযুক্ত মোহিনীনাথ শর্ম্মা রাজশাহী
শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মালদহ
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দেবগ্রাম
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মল্লিক ঐ
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দাস ঐ
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী চুঁচুড়া
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বগুড়া
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সেনহাটী
শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র ঘোষ ভবানীপুর
শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মিত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ
শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার যশোহর
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার চুঁচুড়া
শ্রীযুক্ত যাদবগোবিন্দ রায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাঁচি
শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত লাহিড়ী ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিনাজপুর
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী বগুড়া
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঢাকা
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় কটক
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মেদিনীপুর
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত ঢাকা
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র সান্ন্যাল কুমারখালি
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ ভাগলপুর
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন মজঃফরপুর
শ্রীযুক্ত রঘুনাথ চৌধুরী গৌহাটি
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ত্রিবেদী কান্দি
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভৌমিক নোয়াখালি
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সান্ন্যাল শ্যামগঞ্জ
শ্রীযুক্ত রত্নকান্ত চট্টোপাধ্যায় গৌহাটী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত সেন বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী মালদহ
শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সেন বহরমপুর
শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সেনগুপ্ত চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চৌধুরী ঐ
শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন সেন ঐ
শ্রীযুক্ত রমণেন্দ্ররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত রমাপতি ত্রিবেদী জেমো
শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বগুড়া
শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ রাজসাহী
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ ঐ
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মালদহ
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত শ্রীহট্ট
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার কলিকাতা
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ বড়বেলুন
শ্রীযুক্ত রসময় লাহা কলিকাতা
শ্রীযুক্ত রাইকিশোর প্রামাণিক মালদহ
শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র মল্লিক কলিকাতা
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীপাশা
শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ কৈকালা
শ্রীযুক্ত রাজমোহন রায় বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত রাজরাজেন্দ্র চন্দ্র শ্রীবাটী
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার সেন ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ রায় ২৪ পরগণা
শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস পাবনা
শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিষতীর্থ ঐ
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ঐ
শ্রীযুক্ত রামগতি মুখোপাধ্যায় ঐ
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র নাগ জিরাট
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় পাবনা
শ্রীযুক্ত রামতারণ মুখোপাধ্যায় রাজসাহী
শ্রীযুক্ত রামরতন সরকার হুগলী
শ্রীযুক্ত রামরাখাল ঘোষ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন বরিশাল
শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ ফরিদপুর
শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বালী
শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সরকার চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত মৌঃ রৌশনআলি চৌধুরী পাংশা
শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র ঐ
শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র রায়চৌধুরী ২৪ পরগণা
শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বাগ্চি মুর্শিদাবাদ
শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দে কলিকাতা
শ্রীযুক্ত ললিতকুমার সরকার ঐ
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু ঐ
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন ঘোষ রায়গ্রাম
শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায় বীরভূম
শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাবনা
শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ সরকার বীরভূম
শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ সরকার বহরমপুর
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ফরিদপুর

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চম্পটি বরাহনগর
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মালদহ
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত জঙ্গিপুর
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পুরকায়েত ২৪ পরগণা
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ঐ
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী বেলপুকুর
শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যাভূষণ লোহাগড়া
শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র বীরভূম
শ্রীযুক্ত শান্তকুমার পাল বরাহনগর
শ্রীযুক্ত শান্তিচরণ বিশ্বাস হুগলী
শ্রীযুক্ত শিবরাম গোস্বামী পুটশুড়ী
শ্রীযুক্ত শিবেন্দুনারায়ণ রায় জেমো
শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র রায় যশোহর
শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সেন কলিকাতা
শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত শ্যামলাল কুণ্ডু ফরিদপুর
শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ রায় জঙ্গিপুর
শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় বহরমপুর
শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয় বলিহার
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস বাঁকুড়া
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নাইয়া ২৪ পরগণা
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সিংহ ২৪ পরগণা
শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র লাহিড়ী পাবনা
শ্রীযুক্ত সতীনাথ মিশ্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সতীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় চকদিঘী
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বরিশালর
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র নিয়োগী বগুড়া
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু পাতুন
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৪ পরগণা
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় পাবনা
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত হুগলী
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত রাণাঘাট
শ্রীযুক্ত সত্যনাথ সেনগুপ্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সতশরণ মুখোপাধ্যায় গুস্তিয়া
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মেদিনীপুর
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ঘোষ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় ঐ
শ্রীযুক্ত সরোজকুমার ঘোষ ঐ
শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা কালনা
শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা গৌহাটী
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ কাব্যতীর্থ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ঐ
শ্রীযুক্ত সারস্বত ভট্টাচার্য্য ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মগরা
শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর শর্ম্মা গৌহাটী

শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সুখনলাল মিত্র বরাহনগর
শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় ঢাকা
শ্রীযুক্ত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস ফরিদপুর
শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন মুখোপাধ্যায় গৌহাটী
শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন ঢাকা
শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ
শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেন দিনাজপুর
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী বগুড়া
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গৌহাটী
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মেদিনীপুর
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মুর্শিদাবাদ
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী রঙ্গপুর
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মজঃফরপুর
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল বগুড়া
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মালদহ
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী বগুড়া
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ঐ
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বগুড়া
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুর
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু হুগলী
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় যশোহর
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত ঐ
শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বগুড়া
শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র আচার্য্য পাবনা
শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষাল কালিকাপুর
শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ ঢাকা
শ্রীযুক্ত সূর্য্যলাল দত্ত বাঁকুড়া
শ্রীযুক্ত সোমনাথ রায় হুগলী
শ্রীযুক্ত সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত মৌঃ হবিবুদ্দি আহম্মদ জলপাইগুড়ী
শ্রীযুক্ত হরকিঙ্কর টহলদার কলিকাতা
শ্রীযুক্ত হরকিঙ্কর দাস শ্রীহট্ট
শ্রীযুক্ত হরলাল দাশগুপ্ত ভাগলপুর
শ্রীযুক্ত হরমোহন দত্ত গৌহাটী
শ্রীযুক্ত হরমোহন দাস গৌহাটী
শ্রীযুক্ত হরলাল মজুমদার কলিকাতা
শ্রীযুক্ত হরলাল মুখোপাধ্যায় হাওড়া
শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য আগরতলা
শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ পুরুলিয়া
শ্রীযুক্ত হরিপদ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস জেমো
শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় জেমো
শ্রীযুক্ত হরিপদ রায় জেমো
শ্রীযুক্ত হরিপদ হালদার ২৪ পরগণা

শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু বোলপুর
শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দত্ত চট্টগ্রাম
শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ চন্দননগর
শ্রীযুক্ত হরিহর ভট্টাচার্য্য যশোহর
শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় হেতমপুর
শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মিত্র বাঁকীপুর
শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মজিলপুর
শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ সাহা কলিকাতা
শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ সাহা বোলপুর
শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মজুমদার কলিকাতা
শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মুস্তফী কলিকাতা
শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহিড়ী রঙ্গপুর
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী উজানবাজার
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস মালদহ
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু মুঙ্গের
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত কলিকাতা
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম্ এ. কলিকাতা
শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় পাবনা
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার মজুমদার কলিকাতা
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কলিকাতা
শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র ঘটক ময়মনসিংহ
শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ কুণ্ডু পাংশা

পরিশিষ্ট "ছ"

স্বেচ্ছাসেবকগণের কর্ম্মবিভাগ, প্রতিনিধিগণে বাসস্থান

১. রেলওয়ে-ষ্টেশন

সহকারী অধ্যক্ষ—শ্রী সুরেশচন্দ্র ঘোষ
অধিনায়ক—শ্রী বিনোদবিহারী চৌধুরী
শ্রী সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১. শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু
২. শ্রীযুক্ত নীলমণিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩. শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ
৪. শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাঁ
৫. শ্রীযুক্ত পঞ্চানন যশ
৬. শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
৭. শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সরকার
৮. শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দে
৯. শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন বসু
১০. শ্রীযুক্ত সাহাদৎ হোসেন
১১. শ্রীযুক্ত সুরথকুমার মজুমদার
১২. শ্রীযুক্ত নকুলচন্দ্র নন্দী
১৩. শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
১৪. শ্রীযুক্ত মহম্মদ আবদুল হক
১৫. শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দে
১৬. শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র মজুমদার
১৭. শ্রীযুক্ত অম্বিকানাথ রায়
১৮. শ্রীযুক্ত সনৎকুমার চৌধুরী
১৯. শ্রীযুক্ত অধীরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২০. শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস
২১. শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ হালদার
২২. শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দ্বিচক্রযান-বাহী

২৩. শ্রীযুক্ত উমাকান্ত রায়
২৪. শ্রীযুক্ত নুরুল আফজার
২৫. শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়
২৬. শ্রীযুক্ত কৃপানাথ নাগ

২. সভামণ্ডপ

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১. শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শেঠ
২. শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৩. শ্রীযুক্ত ত্রিদশেশ্বর মিত্র
৪. শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু
৫. শ্রীযুক্ত সুধাকর দত্ত
৬. শ্রীযুক্ত আমির উল্ ইস্‌লাম
৭. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মহান্তি
৮. শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বিশ্বাস

৩. কার্য্যালয়

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১. শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘোষ
২. শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ সরকার
৩. শ্রীযুক্ত শ্রীধর রায়
৪. শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৫. শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৬. শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
৭. শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রবিজয় ঘোষ
৮. শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায়

দ্বিচক্রবান-বাহী

৯. শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ ভট্টাচার্য্য

৪. প্রদর্শনী

১. শ্রীযুক্ত গতিকৃষ্ণ রায় বি এ
২. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় বি এ
৩. শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার বি এ
৪. শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস বি এ
৫. শ্রীযুক্ত অনাথনাথ দাস বি এস সি
৬. শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বড়াল বি এ
৭. শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়
৮. শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়
৯. শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র
১০. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু
১১. শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ বসু
১২. শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায়

৫. রাজ-কলেজ (বাসস্থান)

অধিনায়ক—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় বি এ

দ্বিচক্রযান-বাহী—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
শ্রী বলাইচাঁদ রায়

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১. শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
২. শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ধর
৩. শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায়
৪. শ্রীযুক্ত মানসকুমার সিংহরায়
৫. শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ গুহরায়
৬. শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ রায়
৭. শ্রীযুক্ত সাতকড়ি পালিত
৮. শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ভঞ্জ
৯. শ্রীযুক্ত সত্যসাধন সরকার
১০. শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১১. শ্রীযুক্ত ভানুপ্রকাশ নন্দী
১২. শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়
১৩. শ্রীযুক্ত জ্ঞানপ্রকাশ চন্দ্র
১৪. শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ চন্দ্র
১৫. শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র ভঞ্জ
১৬. শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায়
১৭. শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল রায়
১৮. শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯. শ্রীযুক্ত হরিহর ভট্টাচার্য্য
২০. শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী
২১. শ্রীযুক্ত গৌরীপদ নাগ
২২. শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল মিশ্র

৬. নির্ম্মল লজ

অধিনায়ক—শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ

দ্বিচক্রযান-বাহী—শ্রীবিভূতিভূষণ দে

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১. শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২. শ্রীযুক্ত সলিলকুমার ঘোষ
৩. শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
৪. শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দে

৭. বালিকা-বিদ্যালয় ও ৺অবনীবাবুর বৈঠকখানা

অধিনায়ক—শ্রীসত্যাংশুকুমার সিংহ বি, এ

দ্বিচক্রযান-বাহী—শ্রীচারুচন্দ্র দাস

১. শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়
২. শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য
৩. শ্রীযুক্ত ত্রিভঙ্গলাল গঙ্গোপাধ্যায়
৪. শ্রীযুক্ত প্রভাকর দত্ত
৫. শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু
৬. শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু
৭. শ্রীযুক্ত রাধিকাপদ গঙ্গোপাধ্যায়
৮. শ্রীযুক্ত রামগুরু মুখোপাধ্যায়

৮. রাজাসাহেবের বড়খণ্ড

অধিনায়ক—শ্রীযুক্ত মোহনলাল ঘোষ

দ্বিচক্রযান-বাহী—শ্রী মাখনলাল দত্ত

শ্রীকর মুখোপাধ্যায়

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১. শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর লালা
২. শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ঘোষ
৩. শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ সাহা
৪. শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু
৫. শ্রীযুক্ত বিনোদগোপাল রায়
৬. শ্রীযুক্ত নির্ম্মলপ্রকাশ ঘোষ
৭. শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র বটব্যাল
৮. শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রবিজয় বসু
৯. শ্রীযুক্ত কাশীনাথ সেন
১০. শ্রীযুক্ত পশুপতি সিংহ
১১. শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১২. শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ চন্দ্র

৯. উইল-বাড়ী

অধিনায়ক—শ্রীজ্ঞানানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিচক্রযান-বাহী—শ্রীরাঘবেশ্বর সরকার

শ্রীরঞ্জনকুমার বসু

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১. শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
২. শ্রীযুক্ত অভয়চরণ ঘোষ
৩. শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু
৪. শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র রায়
৫. শ্রীযুক্ত রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়
৬. শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়
৭. শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ভট্টাচার্য্য
৮. শ্রীযুক্ত চতুর্ভূজ ওঝা
৯. শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী
১০. শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সিংহ
১১. শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
১২. শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চৌধুরী
১৩. শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ মিত্র
১৪. শ্রীযুক্ত অজয়কুমার সেন
১৫. শ্রীযুক্ত অজিতকুমার সেন
১৬. শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর রায়

১০. ৺গোপেন্দ্র মিত্রের বাটী

অধিনায়ক—শ্রীবিনোদীলাল ঘোষ বি, এ

দ্বিচক্রযান-বাহী—শ্রীদুর্ল্লভকিশোর মিত্র

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১. শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
২. শ্রীযুক্ত সুধাংশুবিকাশ ঘোষ
৩. শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪. শ্রীযুক্ত মোহিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
৫. শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র পাল
৬. শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ মিশ্র
৭. শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ চাঁদ
৮. শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র

১১. ৺বক্কেশ্বর তা মহাশয়ের বাটী

অধিনায়ক—শ্রীপ্রফুল্লকুমার পাঁজা
দ্বিচক্রযান-বাহী—শ্রীগোলাম সত্তার

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১. শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ আইচন্দ
২. শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র বসু

১২. নির্ম্মল-বাগ

অধিনায়ক—শ্রীধরণীধর ঘোষাল
দ্বিচক্রযান-বাহী—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বর্ম্মন্
শ্রীসতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

১. শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
২. শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ
৩. শ্রীযুক্ত জগৎরাম চট্টোপাধ্যায়
৪. শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৫. শ্রীযুক্ত শশধর চট্টোপাধ্যায়
৬. শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
৭. শ্রীযুক্ত শশধর ভট্টাচার্য্য

১৩. বিজয়-চতুষ্পাঠী

অধিনায়ক—শ্রীবেণীমাধব কাব্যতীর্থ

১. শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ কাব্যতীর্থ
২. শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
৩. শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ
৪ শ্রীযুক্ত রামনাথ ভট্টাচার্য্য

১৪. ছোট দেউড়ী ও ডেভিস সাহেবের বাটী

অধিনায়ক—শ্রীআলাউদ্দীন মহম্মদ

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১. শ্রীযুক্ত আহম্মদ মোল্লা
২. শ্রীযুক্ত মহম্মদ ইশাক
৩. শ্রীযুক্ত মীর রহমৎ আলি
৪. শ্রীযুক্ত চৌধুরী আবদুল হাকিম

১৫. সাবেক টোল

অধিনায়ক—শ্রীগোলাম মূর্ত্তজা বি, এ

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১. শ্রীযুক্ত আবদার রহমন
২. শ্রীযুক্ত আবদুল কাদের

১৬. শ্রীপতিবাবুর বৈঠকখানা

অধিনায়ক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত
দ্বিচক্রযান-বাহী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সামন্ত

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১. শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন ভট্টাচার্য্য
২. শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য
৩. শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য
৪. ললিতকুমার ভট্টাচার্য্য

১৭. ঘোষ-বাগান

অধিনায়ক—শ্রীসত্যশরণ সরকার বি, এ
দ্বিচক্রযান-বাহী—সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১. শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়
২. শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ
৩. শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৪. শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন সিংহ
৫. শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বিষ্ণু
৬. শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বিশ্বাস
৭. শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮. শ্রীযুক্ত দ্বিজপ্রসাদ দত্ত

১৮. কালিবাজার-কুঠী

অধিনায়ক—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ
দ্বিচক্রযান-বাহী—শ্রীকালীপদ হালদার
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১. শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু
২. শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ বসু
৩. শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
৪. শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
৫. শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৬. শ্রীযুক্ত সুচাঁদ মুখোপাধ্যায়
৭. শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী হাজরা
৮. শ্রীযুক্ত মোহনলাল বিশ্বাস
৯. শ্রীযুক্ত বনজাক্ষ চৌধুরী
১০. শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ভঞ্জ

১৯. টাউন-হল

অধিনায়ক—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিচক্রযান-বাহী—শ্রীঅজয়চন্দ্র হাজরা
শ্রীযুক্ত বিজনচন্দ্র বসু
শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ পাল

স্বেচ্ছাসেবকগণ

১. শ্রীযুক্ত শ্রী অনাথবন্ধু মিত্র
২. শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর মজুমদার
৩. শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু
৪. শ্রীযুক্ত নির্ম্মলপ্রকাশ চৌধুরী
৫. শ্রীযুক্ত রামহরি মুখোপাধ্যায়
৬. শ্রীযুক্ত ভূজঙ্গভূষণ হাজরা
৭. শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সরকার
৮. শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রতিনিধিগণের বাসস্থান

বাসস্থান	ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ
১. নির্ম্মল-বাগ	শ্রী কালীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
	শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	শ্রী মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়
২. রাজ-কলেজ	শ্রী অতুলানন্দ রায় চৌধুরী
	শ্রী সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	শ্রী বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়
৩. বালিকা-বিদ্যালয়	শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	শ্রী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
৪. রাজা-সাহেবের বড়-খণ্ড	শ্রী লালা গুরান্দিত্যা মেহেরা
	শ্রী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
	শ্রী পরাণচন্দ্র সেন

৫. নির্ম্মল-লজ	শ্রী সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	শ্রী যোগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬. উইল-বাড়ী	শ্রী অবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
	শ্রী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৭. ৺গোপেন্দ্র মিত্রের বাটী	শ্রী গোপেশ্বর সিংহ
	শ্রী পরিতোষ ভট্টাচার্য্য
৮. কৃষ্ণসাগর-চাঁদনী	শ্রী নৃসিংহপ্রসাদ রায় মহাশয়
	শ্রী ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়
৯. খোষ-বাগান	শ্রী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
	শ্রী বিভূতিভূষণ বর্ম্মন্
১০. শ্রীপতি বাবুর বাটী	শ্রী শ্রীপতি দত্ত
	শ্রী অখিলচন্দ্র দত্ত
১১. টাউন-হল	শ্রী নেপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	শ্রী গোবিন্দপদ রায়
১২. কালী-বাজার কুঠী	শ্রী অকুলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	শ্রী যতীন্দ্রমোহন হালদার
১৩. ৺অবনী বাবুর বাটী	শ্রী মন্মথনাথ চৌধুরী
	শ্রী ভোলানাথ রায়
১৪. ৺বক্কেশ্বর তা'র বাটী	শ্রী ভূদেব মুখোপাধ্যায়
	শ্রী মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৫. সাবেক টোল	নাজিরুদ্দীন আহম্মদ বেগ
	নেজাবৎ হোসেন
১৬. ডেভিস্ সাহেবের বাটী	ফজলুর হোসেন
	মহাতাবুদ্দীন চৌধুরী
১৭. ছোট-দেউড়ী	সেখনুরুল আয়ান্
	সেখ তোকু
১৮. বিজয়-চতুষ্পাঠী	শ্রী প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন
	শ্রী বীরেশ্বর তর্কতীর্থ
১৯. ৺নির্ম্মল বাবুর বাটী	শ্রী রাজেন্দ্র মিত্র
	শ্রী শৈলেন্দ্র বসু
২০, ২১, ২২ ও ২৩	দীলকুশা, খুর্শেদমহল
	দীলারাম, আরামবাগ,

পরিশিষ্ট "জ"

প্রদর্শিত দ্রব্যের তালিকা

ক. বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্য

১। পিত্তলের বিষ্ণু-মূর্ত্তি ত্রিবিক্রম; ২। পিত্তলের ললিতাক্ষেপ-সংস্থিত বিষ্ণু প্রহরণধারী বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি; ৩। পিত্তলের ষড়হস্তবিশিষ্ট দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি (মস্তকে নাগছত্র ও পৃষ্ঠে খোদিত-লিপি);
প্রস্তর-মূর্ত্তি ঃ ৪। দ্বাদশ-হস্ত অবলোকিতেশ্বর (উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি উপরে সপ্তনাগ-ছত্র); ৫। মুকুট-পরিহিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি (ভূমি-স্পর্শমুদ্রা, চতুষ্পার্শে বুদ্ধের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের প্রধান ঘটনার চিত্র); ৬। মঞ্জুশ্রীবোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি; ৭। কমলা; ৮। শিবের বিবাহ; ৯। পার্ব্বতী; ১০। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন; ১১। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সুবর্ণমুদ্রা; ১২। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথি; ১৩। হ্যালহেডের ব্যাকরণ; ১৪। বত্রিশসিংহাসন; ১৫। অন্নদামঙ্গল ১ম ও ২য় খণ্ড; ১৬। মিলার সাহেবের ব্যাকরণ; ১৭। কথোপকথন; ১৮। আদালত-তিমিরনাশক; ১৯। সমাচার দর্পণ ১২২৫-২৮।

খ. প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের প্রদর্শিত দ্রব্য

১। প্রথম মহীপালের বাণগড় হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন; ২। পটিয়া হইতে আবিষ্কৃত শিবরাজের তাম্রশাসন; ৩। উৎকলের মাদলাপঞ্জী; ৪। (কাশ্মীরের) রাজ-তরঙ্গিণী (৩ শত বর্ষের প্রাচীন হস্তলিপি); ৫। সংস্কৃত কাশীখণ্ড (৯৩৪ শকে তালপত্রে লিখিত বাঙ্গালা পুঁথি); ৬। আরবী শিলালিপি (মালদহ হইতে আবিষ্কৃত); ৭। অট্টহাসের চামুণ্ডা মূর্ত্তি; ৮। দেবগ্রামের বিষ্ণু-মূর্ত্তি; ৯। দেবগ্রামে-প্রাপ্ত ভগ্ন-বিষ্ণু-মূর্ত্তি; ১০। দেবগ্রামে প্রাপ্ত প্রস্তর-স্তম্ভের উপরিভাগস্থ মূর্ত্তিযুক্ত শিলাখণ্ড; ১১। দেবগ্রামের প্রাচীন মাহেশ্বরী-মূর্ত্তিযুক্ত প্রস্তরফলক।

গ. শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রদর্শিত দ্রব্য

১। বর্দ্ধমান জেলার সীতাহাটী গ্রামে আবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসনের প্রতিলিপি; ২। বর্দ্ধমান জেলায় আবিষ্কৃত স্কন্দগুপ্ত ও নরসিংহ গুপ্তের মুদ্রা; ৩। শুভাকর দেবের তাম্রশাসন; ৪। বিনীত তুঙ্গদেবের তাম্রশাসন; ৫। কয়াড় তুঙ্গদেবের তাম্রশাসন।

ঘ. "প্রসূন"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পুঁথি

১। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ; ২। বৃন্দাবন দাস-কৃত আনন্দ-লহরী; ৩। নরোত্তমদাস-কৃত আনন্দ-লহরী; ৪। রায়শেখর-পদাবলী; ৫। বৃন্দাবনদাসকৃত ভক্তি-চিন্তামণি;

৬। রসায়ন (পুরাতন কবিরাজী পুস্তক); ৭। গোবিন্দদাসকৃত পদাবলী; ৮। পদাবলী লোচনদাস-কৃত।

ঙ. আদ্যের গম্ভীরার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের সংগৃহীত পুঁথি

১। কাঙ্গালী দাস লিখিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত; ২। নরোত্তম দাসের প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা; ৩। কবিবল্লভের রস-কদম্ব; ৪। নাড়ী-জ্ঞান; ৫। নরোত্তম দাসের নাম-সংকীর্ত্তন; ৬। লোচনামৃত; ৭। যম পাঁচালী; ৮। কপিলা-মঙ্গল; ৯। শ্রীবৃন্দাবন-রহস্য; ১০। চণ্ডীর মঙ্গল; ১১। ঝাপড় দাস বৈরাগীর "চরিত"; ১২। লক্ষ্মী-চরিত্র; ১৩। শঙ্করদাসের গুরুদক্ষিণা; ১৪। গুণরাজ খাঁর সূর্য্যের ব্রত-কথা; ১৫। শ্রীমদ্ভাগত দশমস্কন্ধের অনুবাদ; ১৬। মালতী-মাধব; ১৭। আদিখণ্ড শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত; ১৮। আদিখণ্ড শ্রীচৈতন্য-ভাগবত; ১৯। অদ্বৈত-কড়চা গ্রন্থা-টীকা; ২০। পরাগলী মহাভারত নিত্যানন্দ ঘোষকৃত; ২১। সৌতিপর্ব্ব মহাভারত; ২২। ভরত পণ্ডিতের জয়-বিজয়-চরিত; ২৩। দ্রব্য-গুণ; ২৪। শ্রীপদ্মপুরাণে যমগীত; ২৫। কৃত্তিবাসের রামায়ণ; ২৬। স্বরূপ দামোদরের কড়চা; ২৭। সুদাম-চরিত; ২৮। লক্ষ্মীর ব্রত-কথা; ২৯। রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেম-তরঙ্গিণী; ৩০। চৈতন্য-মঙ্গল; ৩১। কপিলা-মঙ্গল; ৩২। রাগ-লক্ষ্মণ; ৩৩। গোবিন্দ-লীলামৃত; ৩৪। সামুদ্র-কড়চা; ৩৫। রাম-বিবাহ; ৩৬। লোচনকৃত বৈষ্ণব-তত্ত্ব; ৩৭। কৃষ্ণদাসকৃত আত্ম-জিজ্ঞাসা; ৩৮। দুর্ল্লভ শর্ম্মার "সন্ন্যাস"; ৩৯। ব্রহ্ম-সংহিতা; ৪০। পথ্যাপথ্য-বিধি; ৪১। সরণ-দর্পণ; ৪২। হরিহরাচার্য্যের সময়-প্রদীপ; ৪৩। শ্রীরাধার অষ্টোত্তরশত নাম; ৪৪। সংস্কৃত মহাভারত স্ত্রীপর্ব্ব; ৪৫। গোবিন্দদাসকৃত দুর্জ্জয়মান; ৪৬। মণিহরণ-কথা; ৪৭। মাথর-বর্ণন, ৪৮। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যখণ্ড; ৪৯। গোবিন্দদাসের ব্যঙ্গ-কাহিনী; ৫০। শ্রীশ্যামচাঁদ দেবশর্ম্মাকৃত কামশাস্ত্র; ৫১। কবিকঙ্কণের অম্বিকা-মঙ্গল; ৫২। কর্ণ-পাঁচালী; ৫৩। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস; ৫৪। কাশীরাম দাসের মহাভারত; ৫৫। কাশীখণ্ড; ৫৬। পদ্মাসন-কড়চা; ৫৭। চৈতন্য তত্ত্বসার; ৫৮। রস-কদম্ব; ৫৯। বৈষ্ণব-বন্দনা; ৬০। প্রেমভক্তি; ৬১। সত্য-নারায়ণ কথা; ৬২। স্বরূপ-বর্ণন; ৬৩। গোপাল-বন্দনা; ৬৪। জগৎ জীবনের মানস-মঙ্গল; ৬৫। সপ্তমুঞ্জরী-আহ্বান; ৬৬। শ্যামামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর; ৬৭। সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়; ৬৮। চোর-চক্রবর্ত্তী; ৬৯। মুকুন্দ ভারতী; ৭০। "স্বর্গ-আরোহণ"; ৭১। গুরুভক্তি-তত্ত্ব; ৭২। ভক্তি-চিন্তামণি; ৭৩। কৃত্তিবাসের জগন্নাথ-বন্দনা; ৭৪। ভাগবতগীতা; ৭৫। হর-মেখলা; ৭৬। কালি-মাহাত্ম্য ইত্যাদি শতাধিক পুঁথি।

চ. বর্দ্ধমান-বড়বেলুননিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুঁথি

১। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা; ২। নারদ-সংবাদ; ৩। কৃষ্ণকর্ণামৃত; ৪। চৈতন্য-চরিতামৃত;

৫। লোচনদাসের সূত্র-মত; ৬। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা; ৭। বংশীদাসের ভজন-রত্নাবলী; ৮। জ্ঞানচন্দ্রিকা; ৯। ভট্টিকাব্য (মূল); ১০। কাব্যপ্রকাশ; ১১। দর্পণ-শুদ্ধি; ১২। সাহিত্য-দর্পণ; ১৩। অমরকোষ; ১৪। মুগ্ধবোধ; ১৫। মহাভারত-অশ্বমেধ হইতে মূষলপর্ব্ব; ১৬। দায়-ভাগ; ১৭। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ; ১৮। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী; ১৯। ন্যায় (মূল); ২০। কর্ম্ম-বিপাক; ২১। কাশীখণ্ড; ২২। আয়ুর্ব্বেদ; ২৩। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা; ২৪। জ্যোতিষের গ্রন্থ ২ খানি; ২৫। মহাভারত-বনপর্ব্ব (মূল); ২৬। মহাভারত-সভাপর্ব্ব; ২৭। হরিবংশ; ২৮। মহাভারত-আদিপর্ব্ব; ২৯। মহাভারত-দ্রোণপর্ব্ব; ৩০। তন্ত্র (মূল)।

(উপরি উক্ত পুঁথিগুলির ৫ খানি তালপত্রে লিখিত) প্রস্তর-মূর্ত্তি-১ বিষ্ণু-মূর্ত্তি ২ কূর্ম্ম-মূর্ত্তি।

ছ. শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ ও ভোলানাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়দ্বয় কয়েকখানি পুঁথি, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের হস্তাক্ষর ও ১টি বিষ্ণু-মূর্ত্তি প্রদর্শনীর জন্য দিয়াছিলেন

জ. বৰ্দ্ধমানের ডাঃ শ্রীঅহিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত ১টি প্রস্তরের ক্ষুদ্র বিষ্ণু-মূর্ত্তি

ঝ. শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ৮০ টি বিবিধ মুদ্রা, ২টি বৌদ্ধ স্তূপ ও চৈত্য

ঞ. বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বৰ্দ্ধমান-শাখা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত-চিত্র

১। খাজা আনোয়ারের সমাধি; ২। পীর-বহরামের সের আফগানের সমাধি।

ট. শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় ও শিবদাস তেওয়ারী মহাশয়-কর্ত্তৃক বৰ্দ্ধমান-দামোদরকুণ্ড হইতে সংগৃহীত প্রস্তর-মূর্ত্তি

১। বিষ্ণু-মূর্ত্তি; ২। বরাহ-মূর্ত্তি; ৩। পার্ব্বতী-মূর্ত্তি সহচারীদ্বয় সমেত নিম্নাংশ; ৪। ৮ ফুট দীর্ঘ একটি অষ্টকোণাকার স্তম্ভ; ৫। দ্বারপালের উর্দ্ধাংশ।

ঠ. মণিরামবাটীর ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীকর্ত্তৃক প্রেরিত বুদ্ধমূর্ত্তির নিম্নাংশ

ড. পাতুন (মন্তেশ্বর) যোগাশ্রমের শ্রীযুক্ত ভবতারণ সাংখ্য-তন্ত্ররত্ন মহাশয়-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ঃ

১। অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তি (ষড়ভূজ); ২। কূর্ম্ম-মূর্ত্তি; ৩। বিষ্ণু-মূর্ত্তি।

ঢ. বৰ্দ্ধমানরাজ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

১। গণেশ-মূর্ত্তি; ২। বিষ্ণু-মূর্ত্তি; ৩। বিষ্ণু-মূর্ত্তি; ৪। ভগ্ন দ্বিভুজা দেবীমূর্ত্তি। ৫। বিষ্ণু-মূর্ত্তির পার্শ্বের সিংহ।

ণ. শ্রীমন্মথনাথ রায় এম্ আই এম্ ই মহাশয়কর্ত্তৃক প্রদর্শিত দ্রব্যের তালিকা

১। নিচিতপুর কোলিয়ারির ষ্টীম-কয়লা; ২। রঘুনাথবাটী সিম ষ্টীম-কয়লা; ৩। রঘুনাথবাটী ডিসেরগড় সিম ষ্টীম-কয়লা; ৪। গরোরিয়া ১০ ও ১১ নং সিম ষ্টীম-কয়লা; ৫। গরোরিয়া ১০ ও ১১ নং সিম হার্ড কোক কয়লা; ৬। নওপাড়া খাস কোলিয়ারির ষ্টীম কয়লা; ৭। সাউথ ইষ্ট বাড়াবানি ষ্টীম কয়লা; ৮। বেগুনিয়া ষ্টীম কয়লা; ৯। ইক্‌রা কোলিয়ারির ১১,১২,১৩, ও ১৪ নং সিমের ষ্টীম কয়লা; ১০। চৌরাশী কোলিয়ারির সাকতড়িয়া ষ্টীম কয়লা; ১১। চৌরাশী কোলিয়ারিব ডিসের গড় সিম ষ্টীম কয়লা; ১২। গোলক ডি ষ্টীম কয়লা; ১৩। ঐ সফ্‌ট কোক্; ১৪। ঐ হার্ড-কোক্; ১৫। মাইকা (অভ্র) ছোট আম্বলা ও পচম্বা; ১৬। বাড়াবানি ষ্টীম কয়লা; ১৭। ডিসেরগড় ষ্টীম কয়লা; ১৮। চাঁচ-কোলিয়ারি ষ্টীম কয়লা; ১৯। নিউডামরা কোলিয়ারি ষ্টীম কয়লা; ২০। জিনাগড় ষ্টীম কয়লা; ২১। জিনাগড় সফট কোক; ২২। চরণপুর ষ্টীম কয়লা; ২৩। পোলিয়াটাড ষ্টীম কয়লা চরণপুর সীম; ২৪। সাঁকতোড়িয়া ষ্টীম কোল; ২৫। ছোট ধেমুযা ষ্টীম কোল; ২৬। রামগড় ষ্টীম কোল; ২৭। বরাকর ফায়ার-ক্লে; ২৮। বরাকর টালি ও ইষ্টক; ২৯। বারিরামপুরের লাল-মাটি; ৩০। বারিরামপুরের সাদা মাটি; ৩১। বরাকরের পাথরের টালি; ৩২। বরাকরের পাইপ ক্লে; ৩৩। বেগুণিয়া হার্ড কোক্; ৩৪। বেঙ্গল আয়রণ-ষ্টীল কোং'র পিগ্ আয়রণ্; ৩৫। বেঙ্গল আয়রণ-ষ্টীল কোং'র আয়রণ ষ্টোন; ৩৬। সেকেন্দ্ররাও গ্লাস-ওয়ার্কের কাচের দ্রব্য; ৩৭। বরাকরের সফট্ কোক; ৩৮। বীরসিংহপুর কোল-কোম্পানির ষ্টীম কোল; ৩৯। বীরসিংহপুর কোল-কোম্পানির সফ্‌ট্ কোক; ৪০। ইকুইটেবল কোং'র বেরাডি কোলিয়ারী ৩ নং পিটের মানচিত্র; ৪১। ইকুইটেবল কোং-র ডিসেরগড় কোলিয়ারির ম্যাপ ৪ খানা; ৪২। Analytical & consulting Chemists এর copy ৩ খানা; ৪৩। Agricultural Lodger 1898 no 14; ৪৪। বোরিং যন্ত্রের নক্সা; ৪৫। ভারতবর্ষের মানচিত্র—ইহাতে রেল-লাইন, কয়লা-ভূমি ও অপরাপর ধাতুর স্থান দেখান আছে;

ত. কাঞ্চননগরের প্রসিদ্ধ ছুরি-কাঁচি-নির্ম্মাতা শ্রী প্রেমচাঁদ মিস্ত্রী কৃর্ত্তৃক প্রদর্শিত বিবিধ প্রকারের ছুরি ও কাঁচি।

থ. বৰ্দ্ধমান-বড়বাজারের বস্ত্র-বিক্রেতা শ্রীহংসেশ্বর দত্তকর্ত্তৃক প্রদর্শিত বর্দ্ধমান নগরের আলমগঞ্জ, তেজগঞ্জ প্রভৃতি পল্লীর তন্তুবায়কর্ত্তৃক প্রস্তুত তাঁতের ধুতি-সাড়ী প্রভৃতি।

দ. বৰ্দ্ধমান-রাজবাটী হইতে প্রদর্শিত দ্রব্যের তালিকা

ঁস্বর্গীয় কীর্ত্তিচন্দ বাহাদুরের আমলের ১। দুন্দুভি মায়কাঠি; ২। ঢাল; ৩। সাঁজোয়া; ৪। পিত্তলের কামান; ৫। লোহার গোলা: ৬। তীর-কাঠি; ৭। যুদ্ধক্ষেত্রের ভগ্ন-তীর; ৮। কীরিচ; ৯। কীর্ত্তিচন্দ বাহাদুরের ব্যবহৃত কীরিচ; ১০। কীর্ত্তিচন্দ বাহাদুরকর্ত্তৃক পরাজিত বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের তরবারি। ইহার দুই পার্শ্বে দুই রাজার নাম লিখিত আছে। কীর্ত্তিচন্দ বাহাদুরের ব্যবহৃত; ১১। তরবারি ১২। কীরিচ; ১৩। খড়্গ; ১৪। পারসী অক্ষরে রাজা চিত্রসেনের নামখোদিত ৩ টী কামান উদ্যান-সম্মিলনীতে রাখা হইয়াছিল।

ধ. গভর্ণমেন্টের কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত দ্রব্য

যন্ত্র—১। মেষ্টন-লাঙ্গল; ২। হিন্দুস্থান-লাঙ্গল; ৩। প্লানেট জুনিয়র হ্যাণ্ড্‌হো; ৪। ভুট্টা ছাড়াইবার কল; ৫। ঘাসকাটা কল; ৬। আকমাড়া কল; ৭। গুড়প্রস্তুতের নূতন ধরণের কড়া; ৮। জল তুলিবার কল; ৯। ক্ষেত্রে ঔষধ-প্রয়োগের পিচকারী-বিশেষ।

সার—১। লাইট্রেট অব্ পটাশ; ২। অস্থি-চূর্ণ; ৩। রেড়ির খইল; ৪। সরিষার খইল; ৫। সালফেট অব্ এমোনিয়া; ৬। সালফেট পটাশ; ৭। সুপার ফস্‌ফেট; ৮। সবুজ সারের জন্য ধৈঞ্চা, শণ ও পাটের বীজ।

বিবিধ—১। বৰ্দ্ধমান-বিভাগের ৫০ প্রকার ধান্য; ২। রেশম; ৩। কোন্ প্রণালীর চাষে কোন্ অনুপাতে লাভ হয়, তাহার মাত্রার অনুলিপি (Chart), কৃষিবিষয়ক বহু পুস্তিকা সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

ন. কবিকঙ্কণের জনৈক বংশধর দামুন্যা-নিবাসী শ্রী অমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কবিকঙ্কণের মূল পুঁথি আনিয়াছিলেন।

প. বৰ্দ্ধমানের উকীল শ্রী সুরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি, এল্ মহাশয় একটি দুষ্প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা সভাক্ষেত্রে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট "ঝ"

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে বর্দ্ধমান-রাজবাটীতে আমোদ-প্রমোদ

১. ১৩২১, ২০ শে চৈত্র শনিবার, অপরাহ্ন ৫॥ টা

(প্রাসাদের পশ্চিম-প্রাঙ্গণে উদ্যান-সম্মিলনীতে)

ক) বৈঠকি গান—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রামলাল দত্ত

খ) বালকের গান ও বাজনা—গোপেশ্বর বাবুর ত্রয়োদশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সত্যকিঙ্কর ও নবমবর্ষীয় পুত্র শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র গায়ক এবং বরাহনগর-নিবাসী শ্রীমান্ পঞ্চানন পাল মৃদঙ্গ-বাদক

গ) বাউলের গান

ঘ) কনসার্ট—বর্দ্ধমান মিনার্ভা-কনসার্ট-পার্টি

২. রাত্রি ৯টা হইতে ১২টা, রাজবাটীর রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয়

ক) শিব-শক্তি

ত্রি-চিত্র

চন্দ্রজিৎ

মধ্যে মধ্যে জল-তরঙ্গ

খ) সাহিত্য-সভা-মণ্ডপে চণ্ডীর গান

৩. ২১শে চৈত্র রবিবার সন্ধ্যায় ৬॥ টা হইতে ৮॥ টা

ক) ইতিহাস-সভা-মণ্ডপে আলোক-চিত্র প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা

খ) রাজবাটীর রঙ্গ-মঞ্চে চণ্ডীর গান

গ) রাত্রি ৯টা হইতে ১২টা, রাজবাটীর রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয় চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে (মেরি গোল্ড্ ক্লাব কর্ত্তৃক)

শিব-শক্তি

বরুণা

ঘ) সাহিত্য-সভা-মণ্ডপে কীর্ত্তন

৪. ২২শে চৈত্র সোমবার, রাত্রি ৯টা হইতে ১২টা

ক) রাজবাটীর রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয়

শ্রীকৃষ্ণ

নূরজাহানের নির্ব্বাচিত অঙ্ক

কুব্জ ও দরজী

খ) রাত্রি ৭টা হইতে ১০ টা

সাহিত্য-সভা-মণ্ডপে-কীর্ত্তন

পরিশিষ্ট "ঞ"

আয়-ব্যয়

জমা	
শ্রীমধুসূদন শরণ দেব মহান্ত মহারাজ	৩০০৲
মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর	
(কার্য্যালয়ের খরচের জন্য)	২০০৲
রাজা শ্রীবনবিহারী কপূর সাহেব	২৫০৲
সার শ্রীরাসবিহারী ঘোষ	২৫০৲
লালা শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ নন্দে এবং ভ্রাতৃগণ	১৫০৲
জেলা-জজ শ্রী জি, এন রায় আই সি এস	১০০৲
শ্রীনলিনাক্ষ বসু বাহাদুর	১০০৲
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	১০০৲
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর	৫০৲
শ্রীললিতমোহন সিংহ রায়	৫০৲
বাহাদুর	৫০৲
শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন সিংহ	৫০৲
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সিংহ সরস্বতী	৪৩৲
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার	৩০৲
শ্রীবনোয়ারীলাল হাতী	৩০৲
কুমার শ্রীপ্রমথনাথ মালিয়া	২৫৲
মাননীয় শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	২৫৲
শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু	২৫৲
শ্রীশশিভূষণ বসু	১৫৲
ডাঃ শ্রী এস কে সেন	২৫৲
শ্রী শ্রী হর্ষ মুখোপাধ্যায়	২৫৲
শ্রীভামিনীরঞ্জন সেন	২৫৲
শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	২৫৲
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২০৲
রায় শ্রীপুলিনবিহারীলাল হাণ্ডে বাহাদুর	২০৲
শ্রীআশুতোষ সেন	২০৲
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী	২০৲
শ্রীসনৎকুমার চৌধুরী	২০৲
শ্রীবনোয়ারিলাল চৌধুরী	১৫৲
৭৭ জন সদস্যের ১১৲ হইতে	
৪৲ টাকা করিয়া চাঁদা	৪৭৭৲
২১৬ জন সদস্যের ৩৲ হিঃ চাঁদা	৬৪৮৲
৪৩ জনের ১৲, ২৲ করিয়া দান	৬৪৲
	৩২০৭৲

খরচ	
মুদ্রণ	১০০০৴১৫
টেলিগ্রাম	৮।১০
ডাক-ব্যয়	১৭২।৵ ১০
ষ্টেশনারি	৭৮৸৵৫
অনুসন্ধান ও আলোক-চিত্র	১৫৪।৴০
ট্রেণ ও গাড়ীভাড়া	৫৭।১০
বেতন (কর্ম্মচারীর)	৪৩৸৵৫
প্রদর্শনী	১০৫।৴৫
প্রতিনিধিদিগের কুলিভাড়া	৪৫
বিবিধ	৯৭॥৫
ছায়া-চিত্রের খরচ	১৫৪॥০
	১৯১৭॥৴৫
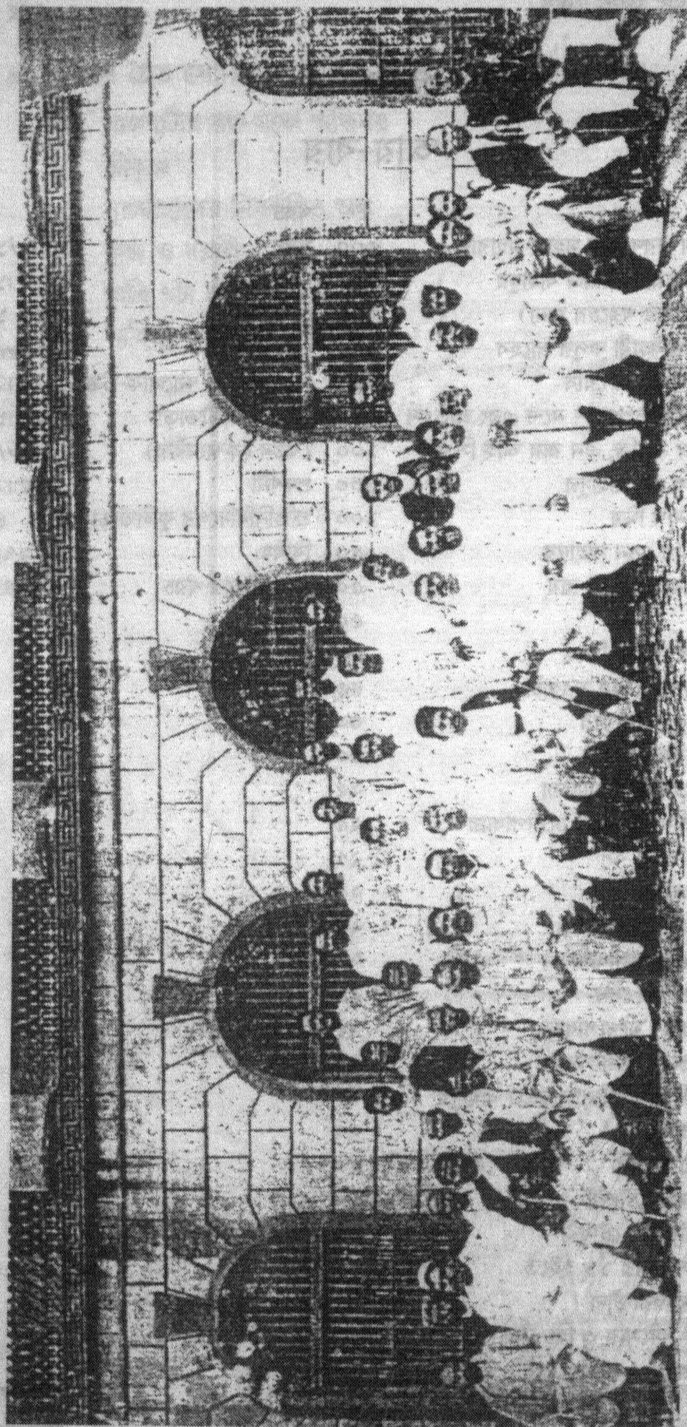
অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ

বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি

পরিশিষ্ট "ট"

বৰ্দ্ধমানের পুরাকথা

ভূমিকা
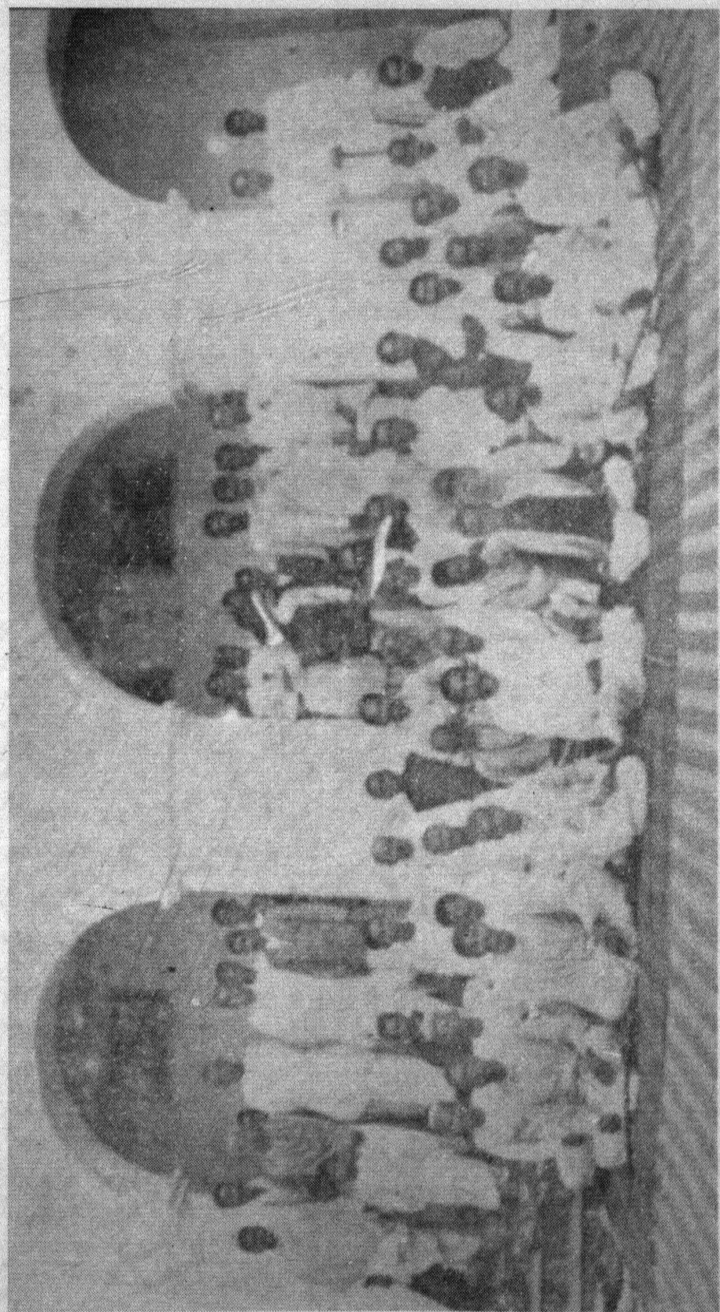
যে বৰ্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছে—এই বর্দ্ধমান কত দিনের? কোন্ সময় হইতে বর্দ্ধমান নামকরণ হইয়াছে? বর্দ্ধমানের কোন্ অংশে সর্ব্বপ্রথম সভ্যতালোক প্রবেশ করে? কোন্ কোন্ স্থান প্রাচীন ও অতীত গৌরবের নিদর্শন? বৰ্ত্তমান সম্মেলনে তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার জন্য বর্দ্ধমানের অভ্যর্থনা-সমিতি আমার উপর ভারার্পণ করেন। আমিও সমিতির আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া প্রথমে বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশ পরিদর্শনে বাহির হই। কিন্তু যে যে স্থান দর্শন করিব আশা করিয়াছিলাম, দৈব, বাধা বিপত্তিতে ও সময়াভাবে তাহার অনেক স্থানই দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। নানা অন্তরায় ও বিপদের মধ্যে সমিতির আদেশ প্রতিপালন-উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র বিবরণী প্রকাশিত হইল। রাঢ় ভূমির হৃদয়স্বরূপ বর্দ্ধমান-ভূভাগের প্রকৃত পরিচয় দান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। সমগ্র বর্দ্ধমান-বিভাগ-পরিদর্শন,—বহুকালসাধ্য অতীত গৌরব-কীর্ত্তি রক্ষার অয়োজন, আমার বা এই অস্থায়ী সামিতির সাধ্যায়ত্ত নহে। সম্মুখে যে অনন্ত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া আছে, আমাদের অতীত গৌরবের স্পর্দ্ধা করিবার নানা সম্পদ্ বর্দ্ধমানের নানা স্থানে যাহা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছ, সেই সকলের পরিচয় দিতে হইলে রাঢ়বাসীর সমবেত উদ্যোগ আবশ্যক। এই মহান্ উদ্দেশ্য সুসাধনকল্পে রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্য এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হয় নাই। আমাদের সর্ব্বজন মান্য অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, আমাদের পূজ্যপাদ সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও সমিতির অধিকাংশ সদস্যই বৰ্ত্তমান সম্মেলন-ব্যাপারে জড়িত আছেন। আশা করা যায়, সম্মেলন-উৎসব সুসম্পন্ন হইবার পরই অনুসন্ধান-সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন।

বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির উৎসাহে গত ৬ই ফাল্গুন হইতে ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দর্শন করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল—

কাঁটোয়া, দাঁইহাট, জগদানন্দপুর, অগ্রদ্বীপ, ঘোড়াইক্ষেত্র, বেগে, দেবগ্রাম, বিক্রমপুর, বিল্বেশ্বর, কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্টহাস। আমার পরিদর্শন-কার্য্য অতি সত্বর সমাধা করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাব্ বাহাদুর এবং অগ্রদ্বীপের জমিদার শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় স্ব স্ব হস্তী দিয়া আমার এই কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন 'প্রসূন' সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয় কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্টহাসে আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং

কাঁটোয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার এই অনুসন্ধান কার্য্যে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই সুযোগে আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সময়াভাবে অপরাপর বহু স্থান দর্শনের যেমন সুযোগ ঘটে নাই, যে যে স্থান পরিদর্শন করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবারও সুবিধা হয় নাই। যে বিবরণ মুদ্রিত হইল, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ পরিচয় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

অভ্যর্থনা-সমিতির অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয়ের লিখিত "বর্ত্তমান বর্দ্ধমান' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির 'উজানী মঙ্গলকোট' ও অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর 'শূরনগর' প্রবন্ধের সারাংশ এই বিবরণীর সহিত প্রকাশিত হইল। অল্পদিনের উদ্যোগের ফল এই অসম্পূর্ণ বিবরণী পাঠ করিয়া কেহ যেন নিরুৎসাহ বা আমাদের উপর অসন্তুষ্ট না হন, ইহাই এই অধমের একান্ত প্রার্থনা।

বিশ্বকোষ-কুটীর
৯ কাঁটাপুকুর বাইলেন, বাগ্‌বাজার,
কলিকাতা।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু
১৫ই চৈত্র, ১৩২১।

বৰ্দ্ধমানের পুরাকথা

শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু

বৰ্দ্ধমান নাম কত দিনের ঃ—

মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৫৮।১৪) ভারতবর্ষরূপ কূর্ম্মের মুখদেশে তাম্রলিপ্ত ও একপাদপদেশের পরই বৰ্দ্ধমানের উল্লেখ আছে। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতাতেও ভারতের পূর্ব্বদিকে তাম্রলিপ্তের সহিত এই বৰ্দ্ধমানের প্রসঙ্গ পাইতেছি।[১] এদিকে মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রের সহিত সুহ্মের উল্লেখ আছে,[২] কিন্তু বৰ্দ্ধমানের উল্লেখ নাই। ভীমের পূর্ব্বদিগ্বিজয় উপলক্ষে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, 'পাণ্ডববীর (ভীম) মোদাগিরিস্থিত অতিবলশালী রাজাকে মহাসমরে বাহুবলে নিহত করিলেন। পরে তীব্রপরাক্রম ও মহাবাহু পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব এবং কৌশিকীকচ্ছনিবাসী রাজা মহৌজা এই দুই নৃপতিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাম্রলিপ্তরাজ, কর্ব্বাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও সাগরবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।'[৩] কালিদাসের রঘুবংশে লিখিত আছে, 'জয়ী রঘু পূর্ব্বদিকে সমস্ত জনপদ আক্রমণ করিয়া মহাসাগরের তালীবনশ্যামল উপকূলে উপনীত হইলেন। সুহ্মগণ বেতলতার মত জড়সড় হইয়া উদ্ধতগণের উন্মুলনকারী রঘুর নিকট নত হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। পরে (রঘুবীর) নৌবলসম্পন্ন বঙ্গদেশীয় ভূপালগণকে বাহুবলে উৎখাত করিয়া গঙ্গাপ্রবাহ-মধ্যবর্ত্তী দ্বীপের উপর

১. বৃহৎসংহিতা ১৪/৭, ১৬/৫।

২. মহাভারত, আদিপৰ্ব্ব ১০৪ অঃ।

৩. "অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেণ নিজঘান মহামৃধে।
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্।।
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নিৰ্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ।
সমুদ্রসেনং নিৰ্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কৰ্ব্বটাধিপতিং তথা।
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ।"(সভাপৰ্ব্ব ৩০/২১—২৪)

জয়স্তম্ভ সকল স্থাপন করিয়াছিলেন।'[৪] পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'বিষয়' শব্দের জনপদ অর্থ-প্রসঙ্গে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্রের একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[৫]

সিংহলের বৌদ্ধ ইতিহাস দীপবংশ ও মহাবংশ হইতে জানিতে পারি, বুদ্ধদেবের সমকালে লালের রাজধানী সিংহপুর হইতে বিজয় নির্ব্বাসিত হইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহা হইতেই সিংহল সভ্যতালোকে আলোকিত হইয়াছিল।

জৈনদিগের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্র পাঠে জানা যায়,—(২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীর বা) বর্দ্ধমানস্বামী 'লাঢ়'দেশে 'বজ্জভূমি' ও 'সুত্তভূমি'র মধ্যে অতিকষ্টে ১২ বর্ষ কাটাইয়াছিলেন। তৎকালে বজ্জভূমিতে কুকুরের বড় উৎপাত ছিল। অনেক সন্ন্যাসী কুকুর তাড়াইবার জন্য দণ্ড লইয়া বেড়াইতেন। জৈন সূত্রকার লিখিয়েছেন যে, লাঢ়দেশে ভ্রমণ করা কঠিন।[৬] জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাসূত্রেও আর্য্য বা পুণ্যভূমিসমূহের মধ্যে কোটিবর্ষ ও রাঢ়দেশের উল্লেখ আছে।[৭]

জৈনদিগের সর্ব্বপ্রাচীন অঙ্গ আচারাঙ্গসূত্রে যে বজ্জভূমি ও সুত্তভূমির উল্লেখ আছে, তাহাই আমাদের পুরাণে বর্দ্ধমান ও সুহ্ম নামে পরিচিতি হইয়াছে এবং সেই সুপ্রাচীন কালে প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সুহ্ম ও বর্দ্ধমান রাঢ়দেশেরই অন্তর্গত ছিল। মহাভারত-টীকাকার নীলকণ্ঠ সুহ্মেরই অপর নাম 'রাঢ়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৮] এদিকে মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও মহাভারতের শ্লোক একত্র পাঠ করিলে সুহ্ম ও বর্দ্ধমান অভিন্ন বলিয়াই যেন মনে হইবে। কিন্তু বরাহমিহির রাঢ়ের উল্লেখ না করিলেও সুহ্ম ও বর্দ্ধমান পৃথক্ ভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। উপরিউক্ত প্রমাণগুলি একত্র আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, বরাহমিহিরের সময়ে যে স্থান সুহ্ম ও বর্দ্ধমান নামে পরিচিত ছিল, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে সেই উভয় স্থানই একত্র রাঢ় বলিয়া পরিচিত হইয়াছে,—

৪. "পৌরস্ত্যানেবমাক্রামং স্তাং স্তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ।।
অনম্রাণাং সমুদ্ধর্ত্তুস্তস্মা সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্।।
বঙ্গানুৎপায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিবাধান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু সঃ।।"(রঘুবংশ ৪/৩৪-৩৬)

৫. "বিবরাভিধানে জনপদে লুব্ বহুবচনবিবরাস্বক্তব্যঃ। অঙ্গনাং বিবরো দেশঃ অঙ্গাঃ। বঙ্গাঃ। সুহ্মাঃ। পুণ্ড্রাঃ।" (মহাভাষ্য ৪/২/১)

৬. আরারঙ্গসুত্ত ১/৮/৩।

৭. "কোড়িবরিসং ব লাঢ়া"—পন্নবণা।

৮. "সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ"—মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৩৩/২৪ নীলকণ্ঠটীকা।

তবে সুহ্ম নাম অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়াই মনে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বকালে সুহ্ম, রাঢ় ও বৰ্দ্ধমান বলিলে সময় সময় এক স্থানই বুঝাইত।

যাহা হউক, আমরা বুঝিতেছি যে, বৰ্দ্ধমান নামটী নিতান্ত আধুনিক নহে, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীরও বহুপূর্ব্বে মার্কণ্ডেয়পুরাণের সময় হইতেই বৰ্দ্ধমান নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ২৪শ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানস্বামী এখানে দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করায় জৈনসমাজে এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বৰ্দ্ধমানস্বামীর পুণ্য সমাগমে এই স্থান বর্দ্ধমান নামে পরে পরিচিত হইয়া থাকিবে।

বর্দ্ধমানের প্রাচীন ভূ-সংস্থান ঃ আচারাঙ্গসূত্রের মতানুসারে বলিতে হয় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাঢ়দেশ বজ্রভূমি ও সুহ্ম এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল, তৎপরে কিছুকাল এক হইয়া যায়। গুপ্ত-সম্রাট্গণের প্রভাব খর্ব্ব হইলে নানা সামন্তগণের স্বাধীনতা-গ্রহণের সহিত খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতে রাঢ়ের অন্তর্গত সুহ্ম ও বৰ্দ্ধমান আবার স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া গণ্য হইতে থাকে।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দশকুমারচরিতে দামলিপ্তকে সুহ্মের অন্তর্গত[৯] বলা হইয়াছে, এ অবস্থায় বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার কতকটা তৎকালে সুহ্ম বা রাঢ় বলিয়া পরিচিত ছিল। গঞ্জাম্ হইতে আবিষ্কৃত ২য় মাধবরাজের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, কোঙ্গোদপতি মাধবরাজ কর্ণসুবর্ণ শশাঙ্করাজকে আপনার অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এ অবস্থায় বলিতে পারা যায় যে, কর্ণসুবর্ণ বা বৰ্দ্ধমানপতি শশাঙ্করাজের সময় সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত[১০] ও উৎকল পর্য্যন্ত রাঢ়দেশ বিস্তৃত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই কারণেই সম্ভবতঃ দক্ষিণরাঢ়ের সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত ময়ূরভঞ্জ অদ্যাপি আধিবাসীগণের নিকট রাঢ় বলিয়া পরিচিত।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এই বর্দ্ধমান জেলায় যে স্থানে সাতশত ঘর ব্রাহ্মণের উপনিবেশ ছিল ও ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য চলিত—সেই স্থানই সাতশতকা বা সাতশইকা পরগণা নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ গৌড়াধিপ প্রদত্ত অধিকাংশ শাসন গ্রাম এই বর্দ্ধমান জেলায় লাভ করিয়া গ্রামীণ বা গ্রামাধিপ হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণ তত্তৎগ্রামীণ বা গাঞী নামেই পরিচিত। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে এই স্থান বিভিন্ন রাজবংশের শাসনে ও সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্যে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় এই দুই খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়। উত্তররাঢ়ে পালবংশের অধিকারে বৌদ্ধপ্রভাব, এবং দক্ষিণরাঢ়ে শূর ও দাস প্রভৃতি বংশের কর্ম্মনিষ্ঠতায়

৯. দশকুমারচরিত, ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

১০. জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ 'পন্নবণা' বা প্রজ্ঞাপনাসুত্রের মতে "তামলিপ্তি বঙ্গায়" অর্থাৎ বঙ্গের মধ্যে তাম্রলিপ্ত। এই প্রমাণে বলা যাইতে পারে যে, কোন সময়ে তাম্রলিপ্ত বঙ্গের মধ্যেও পরিগণিত হইত।

ব্রাহ্মণপ্রভাবের সন্ধান পাই। সম্ভবতঃ এই সাম্প্রদায়িক ও রাজনীতিক পার্থক্য হইতেই রাঢ়দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণীবিভাগ ঘটিয়াছিল।

খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ পাল, বর্ম্ম ও চন্দ্রবংশের শাসনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রভুক্তি, শ্রীনগরভুক্তি ও তীরভুক্তি এই তিনটী ভুক্তি বা Province-এর উল্লেখ পাইয়াছি। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহারাজ বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনে আমরা সর্ব্বপ্রথম বর্দ্ধমানভুক্তির সন্ধান পাই। এখন বর্দ্ধমান বিভাগ বলিলে যতটা বুঝায়, পূর্ব্বকালে ইহার অধিকাংশ বর্দ্ধমানভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। তবে মহাভারত ও রঘুবংশ-রচনাকালে বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগের সর্ব্ব নিম্ন দক্ষিণ অংশের কতকটা সমুদ্রতরঙ্গ বিধৌত বা জাঙ্গলরূপে পরিগণিত ছিল, পূর্ব্বোদ্ধৃত ভীমের দিগ্বিজয় এবং রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গ হইতে তাহার কিছু কিছু আভাস পাইতেছি।

আবার বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনের সমকালে লিখিত ধোয়ী কবির ‘পবনদূত’ কাব্যে সুহ্মের মধ্যে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুর কীর্ত্তিত হইয়াছে। এ অবস্থায় সেনরাজবংশের রাজত্বকালে সুহ্ম বর্দ্ধমানভুক্তির মধ্যেই ছিল বলা যাইতে পারে। যাহা হউক উপরি উক্ত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝিতেছি যে, বর্দ্ধমান নামটীও অতি প্রাচীন ও বহু পূর্ব্বকাল হইতেই একটী স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া গণ্য হইয়া অসিতেছে। তবে রাঢ় বলিলে তদপেক্ষা বৃহৎ জনপদও বুঝাইত। খৃষ্টীয় ১৩ শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ লিখিয়া গিয়াছেন, “গঙ্গার দুই ধারে লখ্‌ নৌতীরাজ্যের দুইটী পক্ষ, পূর্ব্বদিকে রাল (রাঢ়), এই ধারেই লখ্‌নোর নগর এবং পশ্চিম বরিন্দ (বরেন্দ্র) নামে খ্যাত, এই ধারেই দেওকোট নগর।” মিন্‌হাজের এই উক্তি হইতে মনে হয় বর্ত্তমান বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগণা ও হুগলী জেলা তৎকালে রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল।

বর্দ্ধমানের পূর্ব্ব আয়তন ঃ উপরে বর্দ্ধমানের যে সীমা দিলাম, তাহা ঠিক কতটা ছিল তাহা বলা কঠিন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রেনেল সাহেব যে বাঙ্গালার মানচিত্র প্রকাশ করেন, সেই মানচিত্রে বর্দ্ধমানের উত্তরে বীরভূম, দক্ষিণে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা, পূর্ব্বে হুগলী, কৃষ্ণনগর ও রাজসাহী জেলা এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট, বিষ্ণুপুর ও মেদিনীপুর জেলা পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে রচিত—ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড[১১] নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—‘পুণ্ড্রদেশ সপ্ত প্রদেশে বিভক্ত—গৌড়, বরেন্দ্র, নিবৃত্তি, নারীখণ্ড, বরাহভূমি, বর্দ্ধমান ও বিন্ধ্যপার্শ্ব। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমান মণ্ডল ২০ যোজন।’[১২] খৃষ্টীয়

১১. হ হ উইলসন্ সাহেবের মতে এই গ্রন্থ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের পর রচিত হয়। Indian Antiquary, 1891, Vol. XX. p. 419 দ্রষ্টব্য।

১২. ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ৬/২

১৬শ শতাব্দীতে রচিত দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থের মতে—'অজয়নদের দক্ষিণভাগে, শিলাবতী নদীর উত্তরে, গঙ্গার পশ্চিমপারে এবং দারিকেশি নদীর পূর্ব্বে দৈর্ঘ্য ১১ যোজন ও প্রস্থে ৮ যোজন পরিমিত বর্দ্ধমান দেশ।'[১৩] 'ইহার মধ্যভাগে দামোদর প্রবাহিত হইতেছে, পূর্ব্বদিকে যে সমস্ত নদী আছে, তন্মধ্যে মুণ্ডেশ্বরী, বকুলা ও সরস্বতী নদীই প্রধান। দক্ষিণেও বড় নদী আছে।' ব্রহ্মখণ্ডের মতে, 'বর্দ্ধমানের মধ্যে বহু সংখ্যক নগর ও গ্রাম আছে, তন্মধ্যে এই কয়টী প্রধান—খাটুল, দারিকেশি নদীর পার্শ্বে জানাবাদ, মায়াপুর, শঙ্কর-সরিৎপার্শ্বে গরিষ্ঠ গ্রাম, মুণ্ডেশ্বরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণনগর (খানাকুল), এখানে অভিরাম প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর, দামোদরের পার্শ্বে রাজবল্লভ, ভাগীরথীর পার্শ্বে বিদ্যাস্থান নবদ্বীপ—গৌরাঙ্গের জন্মস্থান, নালাজোর, একলক্ষক, রাঘববাটিকা, অম্বিকা, বালুগ্রাম, মীরগ্রাম, ভূরিশ্রেষ্ঠিক, সেনাপি, জনায়ি, স্ফুরণ, আক্কন,তট, স্বর্ণটীক, বর্দ্ধমানের দক্ষিণে পারুল, কুমারবীথিকা, কুলক্ষিপ্তা, কপল, লৌহপুর, গোবর্দ্ধন, হস্তিক, শ্রীরামপুর, বেলুন, অগ্রদ্বীপ, পাটলি, কর্ণগ্রাম, জোতিবনি, চন্দ্রপুর, বলিহারিপুর, বচ্ছিকবালা, কুশমান, গঙ্গাচারি, জাবট, চন্দ্রলেশ ও জাঙ্গলের নিকট রসগ্রাম। এ ছাড়া ৮টী পত্তনের নাম যথা—বৈদ্যপুর, পাটলি, শিলাবতী নদীর পার্শ্বে লোহদা, দামোদরের নিকট চন্দ্রবাটী, বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশে বৃশ্চিকপত্তন, ত্রিবক্রসরিৎপার্শ্বে হাটকনগর, ভাগীরথীর পশ্চিমে বিল্বপত্তন এবং বর্দ্ধমানের ত্রিশক্রোশ দূরে সামন্তপত্তন।'[১৪]

উদ্ধৃত গ্রাম ও নগরাদির অবস্থান আলোচনা করিলে বলিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলা ব্যতীত বর্ত্তমান হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, পাবনা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কতকাংশ পূর্ব্বে বর্দ্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

বর্দ্ধমানের সভ্যতা ঃ পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, জৈন আচারাঙ্গসূত্রের মধ্যে বজ্জভূমির পথে কুকুরের উৎপাত উল্লেখ পাইয়া কেহ কেহ বলিতে চান যে, ২৪ শ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর সময় বজ্জভূমি বা বর্দ্ধমান জনপদ বন্যজন্তুর বিহারক্ষেত্র ও অসভ্য লোকের বাসস্থান বলিয়াই গণ্য ছিল। বাস্তবিক সে সময় বর্দ্ধমান সেরূপ বন্য ও অসভ্য ছিল না। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই এ অঞ্চলে উচ্চ সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়বীরগণের বাস ছিল, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরেও যে তাঁহারা স্ব স্ব বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, মহাভারতেই তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। মহাবীর স্বামীর সময়েই শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাব। সিংহলের পালিমহাবংশেই প্রকাশ যে, তৎকালে

১৩. বিশ্বকোষ, ১৭শ ভাগ ৬১২-৬২৮ পৃষ্ঠায় মূল বচন দ্রষ্টব্য।

১৪. ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড, ৭ম অধ্যায়।

সিংহপুরে রাঢ়ের রাজধানী ছিল এবং তথায় সিংহবাহু রাজত্ব করিতেছিলেন। দুষ্কর্ম্মের জন্য তিনি আপন প্রিয় পুত্র বিজয়কে তাঁহার সাত শত অনুচরসহ নির্ব্বাসন করেন। তৎকালেও রাঢ়বাসী যে, সমুদ্রগামী নৌকা ব্যবহার করিতেন এবং মহাসমুদ্রের ঊর্ম্মীমালা ভেদ করিয়া সমুদ্রান্তরে ভিন্ন দেশে যাতায়াত করিতে সমর্থ ছিলেন, ঐ মহাবংশ হইতেই তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

তৎকালে বর্দ্ধমান, রাঢ় বা সুহ্মপ্রদেশের পার্শ্ব ভূভাগ সমুদ্র-তরঙ্গ বিচুম্বিত ছিল। বর্দ্ধমানস্বামীর আগমনকালে যে স্থান বজ্জভূমি নামে পরিচিত ছিল, তাহাই মার্কণ্ডেয়পুরাণে ও বরাহমিহিরের গ্রন্থে 'বর্দ্ধমান' নামে সম্ভবতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে গ্রীকরাজদূত মেগাস্থিনিস্ Gangaridae নামে একটী বৃহৎ ও সমৃদ্ধশালী জনপদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'যে বিস্তৃত জনপদের রাজধানী পাটলিপুত্র সেই প্রাচ্য জনপদের পূর্ব্বদিকে উক্ত 'গঙ্গারিডি' জনপদ।'[১৫] প্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক দিওদোরস্ মেগাস্থিনিসের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন,—'গঙ্গানদী গঙ্গারিডির পূর্ব্ব সীমা হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে।' আবার প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমীর মতে 'গঙ্গার মোহনার অদূরস্থিত প্রদেশে গঙ্গারিডিগণের বাস। এখানকার রাজা 'গঙ্গে' নগরে বাস করেন।'[১৬] সুপ্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকের উক্তি হইতে বেশ মনে হইবে যে, বর্ত্তমান ভাগীরথীর পশ্চিম কূল হইতে প্রাচীন মগধের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত রাঢ়দেশই 'গঙ্গারিড়ি' নামে পরিচিত ছিল। প্লিনি লিখিয়াছেন,—'গঙ্গার শেষাংশ গঙ্গারিড়ি-কলিঙ্গির মধ্য দিয়া গিয়াছে।'[১৭] প্লিনির এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, কলিঙ্গের উত্তরাংশ বা উৎকলের কতকটা তৎকালে রাঢ়দেশের অন্তর্গত ছিল। কাহারও মতে গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গালীই গ্রীক্‌ভাষায় গঙ্গারিডি হইয়াছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক দিওদোরাস্ বলিতেছেন,—'গঙ্গারিডিগণের অসংখ্য রণদুর্ম্মদ হস্তী থাকায় কখন কোন বিদেশীয় রাজা তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারে নাই। কারণ অপর দেশের লোকেরা সকলেই সেই হস্তীকে ভয় করে।' প্লিনি লিখিয়াছেন—'সর্ব্বদা ৬০০০০ পদাতি, ১০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০ হস্তী সুসজ্জিত থাকিয়া সেই রাজ্যের নরপতির দেহরক্ষা করিতেছে। রাজধানীর নাম পর্থলিস্ পরতালিস্'। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে পেরিপ্লস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'গঙ্গে বন্দর হইতে শ্রেষ্ঠ মস্‌লিন, প্রবাল, ও নানা দ্রব্য রপ্তানী হইত।' রোমের মহাকবি ভার্জ্জিল খৃষ্টপূর্ব্ব

১৫. McCrindle's Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, p. 58.

১৬. McCrindle's Ptolemy, p. 172.

১৭. McCrindle's Megathenes. p.135.

১ম শতাব্দীতে উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, 'তিনি জন্মস্থানে ফিরিয়া যাইবেন, তথায় মর্ম্মরের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন, তন্মধ্যে রোমসম্রাটের মূর্ত্তি রাখিবেন,—মন্দিরের দ্বারদেশে স্বর্ণ ও গজদন্তের গঙ্গারিডিগণের অপূর্ব্ব যুদ্ধের চিত্র ও সম্রাট্ কুইরিনাশের লাঞ্ছন আঁকিবেন।'[১৮] সিংহলের কবি-ঐতিহাসিকের মহাবংশ ও গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাঢ়দেশ সভ্যতার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিল।

বর্দ্ধমান বা রাঢ়ের প্রাচীন রাজধানী ঃ সিংহলের মহাবংশে পাইতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে 'সিংহপুর' নামক স্থানে রাল বা রাঢ়ের অধীশ্বর সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। তৎকালে এখানে সিংহের বড়ই উৎপাত ছিল, তাহা হইতে অথবা সিংহবাহুর বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিবার জন্য মহাবংশকার রাঢ়াধীশ্বরকে সিংহীর দুগ্ধে প্রতিপালিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সেরগড়পরগণায় সিংহারণ নামে নদী আছে, কেহ কেহ মনে করেন ঐ নদীর তীরে সিংহপুর রাজধানী ছিল,—এখানে সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। সিংহপুর ধ্বংস হইলে এই স্থান 'সিংহারণ্য' নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই সিংহারণ্য হইতেই 'সিংহারণ' নদীর নামকরণ হইয়া থাকিবে।

তৎপরে গ্রীক্ ও রোমকদিগের বিবরণী হইতে পাইতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ হইতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যে বর্দ্ধমান প্রদেশে পরতালিস্ (Portalis) গঙ্গে (Gangai) ও কাটাদপা (Katadupa) নামে তিনটা প্রধান নগর বা বন্দর ছিল। ফরাসীপুরাবিদ্ সেন্টমার্টিন বর্ত্তমান বর্দ্ধমান সহরকেই Parthalis বা Portalis স্থির করিয়াছেন। এই নামটী দেশীয় 'পরতাল' শব্দের বিকৃত রূপ বলিয়া মনে হয়। দিগ্বিজয়প্রকাশে সপ্তজাঙ্গলের বিবরণের পর বঙ্গাল-পরতালের প্রসঙ্গ আছে। এই প্রসঙ্গ অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান রাঢ় ও পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যস্থলে 'পরতাল' বলিয়া কোন প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং বিক্রমপুরে সেই পরতালরাজের প্রমোদভবন ছিল।[১৯] যদি দিগ্বিজয়প্রকাশের 'পরতাল' এবং গ্রীক ঐতিহাসিকগণের Parthalis বা Portalis এক হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সহরকে Protails বলিয়া ধরিয়া লইতে সন্দেহ হয়। যাহা হউক এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক।

'গঙ্গে বন্দর কোথায় ছিল, তাহা এখন স্থির করা কঠিন। তৎকালে যেখানে গঙ্গাসাগরসঙ্গম ছিল, সেই স্থানেই 'গঙ্গে বন্দর হওয়া সম্ভবপর। কণ্টকদ্বীপ বা কাঁটাদীয়ার অপ্রভংশে 'কাটাদপা' হইয়া থাকিবে, এখন কাঁটোয়া নামেই পরিচিত।

১৮. Georgics, Ili 27

১৯. "বিদ্বজ্জনানাং বাবশ্চ বিক্রম্পুর্য্যাশ্চ ভুরিশঃ।
পরতালভূমিপস্য তোষিস্থলং বিদুধুবাঃ।।" (দিগ্বিজয় প্রকাশ ৯২)

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতেই চীনপরিব্রাজক রাঢ়দেশে আগমন করেন। তিনি এখানকার সমৃদ্ধির কথা উজ্জ্বল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে সুহ্ম, রাঢ় বা বর্দ্ধমানভুক্তি কর্ণসুবর্ণ নামে পরিচিত ছিল। তৎকালে এই স্থান বহু জনাকীর্ণ, বহু ধনকুবের ও বিদ্যানুরাগী জনগণের বসবাস ছিল। তৎকালে এখানকার রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ১০টী মাত্র বৌদ্ধ সঙঘারাম, কিন্তু নানা সম্প্রদায়ের ৫০টী দেবমন্দির ছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, এখানে বৌদ্ধসম্প্রদায় অপেক্ষা অপর সম্প্রদায়ের লোকই বেশী ছিল। তখনকার এই কর্ণসুবর্ণ বা রাঢ়ের রাজধানী লইয়া মতভেদ আছে। কেহ বলেন, বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঙ্গামাটী বা কাণসোণা নামক স্থানে, আবার কেহ বলেন যে, বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী কাঞ্চন-নগরেই কর্ণসুবর্ণের প্রাচীন রাজধানী ছিল। বলা বাহুল্য এই দুইটী স্থানই এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও রাঢ়ীয় সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল এবং এখনও উভয় স্থানেই সেই অতীত কীর্ত্তির নিদর্শন বিদ্যমান। উক্ত উভয় স্থান ব্যতীত এই বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে সিংহারণ, প্রদ্যুম্নপুর, শূরনগর, মন্দারণ, ভূরসুট প্রভৃতি শত শত স্থানে পূর্ব্ব-ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার যথেষ্ট নিদর্শন ছড়াইয়া রহিয়াছে। আশা করি, রাঢ়-অনুসন্ধান সমিতি সেই সকল কীর্ত্তির তত্ত্বোদ্ধারে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে সমগ্র রাঢ় দেশ শূরবংশীয় নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। তৎপরে পালরাজগণের প্রভাববিস্তারের সহিত তাঁহাদের অধিকারভুক্ত স্থান উত্তররাঢ় এবং শূর ও দাসবংশের অধিকারভুক্ত স্থান দক্ষিণরাঢ় নামে পরিচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশে ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অদ্যাপি উত্তররাঢ়ীয়দিগের আদি সমাজস্থান এবং বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণাংশে এবং হুগলী জেলা ও ২৪ পরগণার মধ্যে দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের সমাজস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বর্দ্ধমানজেলাস্থ ভুরসুট নামক স্থানে দাসবংশের ও তৎপরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ রাজবংশের রাজধানীর চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

ধর্ম্মপ্রভাব ঃ পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, জৈনদিগের প্রজ্ঞাপনাসূত্র নামক উপাঙ্গে রাঢ়দেশ পুণ্যভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কল্পদ্রুমকালিকা নামে জৈন কল্পসূত্রের টীকায় পাওয়া যায় যে, মহাবীর স্বামী এখানকার কেবল সুসভ্য জাতি বলিয়া নহে, অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও ধর্ম্মালোক বিতরণ করিয়াছিলেন। এই বর্দ্ধমানস্বামীর পুণ্য-সংস্রবে সম্ভবতঃ অতি পূর্ব্বকাল হইতেই জৈনসমাজে বর্দ্ধমান পুণ্যভূমি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবও রাঢ়দেশে অল্পদিন হয় নাই। বশিষ্ঠের সিদ্ধিস্থান তারাপীঠ ও কিরীটেশ্বরী বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার বাহিরে হইলেও বর্দ্ধমানভুক্তি বা রাঢ়দেশের মধ্যেই অবস্থিত। রাঢ় বা বর্দ্ধমানপ্রদেশ এক সময়ে শৈব ও শাক্তগণের লীলাস্থান বলিয়া গণ্য ছিল, তাহার কারণ ৫১টী পীঠের মধ্যে এই

রাঢ়দেশেই ৯টী ডাকার্ণব পীঠ অবস্থিত। কুব্জিকাতন্ত্রে ৭ম পটলে কর্ণস্বর্ণ বা কর্ণসুবর্ণ, ক্ষীরগ্রাম, বৈদ্যনাথ, বিল্বক, কিরীট, অশ্বপ্রদ বা অশ্বতীর্থ, মঙ্গলকোট ও অট্টহাস এই আটটী সুপ্রাচীন সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, মুসলমান-আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই ঐ সকল স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[২০] ঐ সকল স্থান বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে এখনও প্রাচীন কীর্ত্তির বহু নির্দশন বাহির হইতে পারে।

আরও কত শাক্তস্থান আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ অসম্ভব। এইরূপ যে সকল শৈব-কীর্ত্তি আছে তন্মধ্যে বৈদ্যনাথ ও বক্রেশ্বর সর্ব্বপ্রাচীন ও প্রধান। এইরূপ ভক্তপ্রবর জয়দেবের লীলাস্থলী কেন্দুবিল্ব—বৈষ্ণবজগতে আজও প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। রাঢ়দেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ধর্ম্মপূজার অল্প-বিস্তার প্রচার আছে। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয় এই ধর্ম্মপূজাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ নিদর্শন বলিয়া বহুদিন প্রমাণ করিয়াছেন। তাহা অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। মুসলমান প্রভাবকালে সাধু ও ভক্ত প্রভাবে যে সকল উল্লেখ অসংখ্য পীঠ ও পাটের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত পুরাতত্ত্ব মধ্যে সে সকলের আর উল্লেখ করিলাম না। "বর্ত্তমান বৰ্দ্ধমান" প্রসঙ্গে তাহার কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে।

২০. তন্ত্রচূড়ামণি নামক পরবর্ত্তী সংগ্রহ গ্রন্থে (রাঢ়দেশের মধ্যে) বহুলা, উজানী, ক্ষীরখণ্ড, কিরীট, নলহাটী, বক্রেশ্বর, অট্টহাস ও নন্দিপুর এই ৯টীকে মহাপীঠ স্থান বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু তৎপরে রচিত শিব-চরিতসংগ্রহ গ্রন্থে অট্টহাস, নলহাটী ও নন্দিপুর উপপীঠ মধ্যে গণ্য এবং তৎপরিবর্ত্তে সুগন্ধা, রণখণ্ড ও বক্রনাথ এই তিনটী মহাপীঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপ মতভেদস্থলে অতিপ্রাচীন কুব্জিকাতন্ত্রের মতই গ্রহণীয়।

বৰ্ত্তমান বৰ্দ্ধমান

শ্রী রাখালরাজ রায়

অবস্থান ঃ বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বে ভাগীরথী। ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে নবদ্বীপের চতুঃপার্শ্বস্থ কিঞ্চিৎ ভূভাগ ভিন্ন নদীয়া জেলার সমস্ত অংশ ভাগীরথীর পূর্ব্ব-তীরে অবস্থিত। দক্ষিণে হুগলী জেলা, পশ্চিমে বাঁকুড়া ও মানভূম। উত্তরে সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ। পূর্ব্বের সীমা-রেখা যেমন ভাগীরথী, উত্তরে তেমনই কোন কোন স্থানে অজয় এবং পশ্চিমে দামোদর ও বরাকর।

আয়তন ও লোক-সংখ্যা ঃ বর্দ্ধমান জেলার আয়তন ২৬৯১ বর্গ-মাইল। লোকসংখ্যা ১৫৩৮৩৭১। সদর, আসানশোল, কাঁটোয়া ও কালনা এই চারিটি মহকুমা। ৬টি মিউনিসিপালিটি, ১৭টি থানা এবং ২৭৬৯টি গ্রাম আছে। জেলার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ১২২০৫৫১ ও মুসলমানের সংখ্যা ২৯০৩৮১।

জেলার সমস্ত লোকের মধ্যে শতকরা ১০ জন শিক্ষিত। শিক্ষায় বাঙ্গলার জেলার মধ্যে বর্দ্ধমান ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। সমস্ত বাঙ্গলায় শতকরা ৩.১ ইংরাজী শিক্ষিত, বর্দ্ধমান জেলায় ৩।

বর্দ্ধমান জেলায় ২৭ টি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে ৩টি বর্দ্ধমান নগরে। তদ্ভিন্ন বর্দ্ধমান নগরে একটি ২য় শ্রেণীর কলেজ ও একটি টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে।

বিভিন্ন জাতি ঃ বর্দ্ধমান জেলায় ৯৪টি জাতি আছে। ইহার মধ্যে বাগ্‌দির সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। ব্রাহ্মণ, বাউরি ও সদ্‌গোপদিগের সংখ্যা প্রত্যেকের এক লক্ষের অধিক। তদ্ভিন্ন উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ, ডোম, গোয়ালা, হাড়ি, কৈবর্ত্ত, কলু, মুচি ও তিলি জাতির সংখ্যা ২০০০০-এর অধিক।

সমস্ত বাঙ্গলার উগ্রক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শতকরা ৭৭.৫ জন বর্দ্ধমান জেলায় বাস করে। তদ্ভিন্ন বাগ্‌দি, বারুই, ভুঁইয়া, ডোম, গন্ধবণিক, কলু, কোরা, মুচি, ও সাঁওতাল জাতির সংখ্যা বাঙ্গলার অন্যান্য জেলা অপেক্ষা বর্দ্ধমানে অধিক। কেবল মেদিনীপুরে ব্রাহ্মণ ও সদ্‌গোপ জাতির সংখ্যা বর্দ্ধমান অপেক্ষা অধিক।

নাম ঃ অধুনা বিভাগ, জেলা ও প্রধান নগরের নাম বর্দ্ধমান। মুসলমানদিগের আমলে বর্দ্ধমান নামে নগর, মহাল, পরগণা ও চাকলা ছিল। হিন্দুদিগের সময়ে নগর ও ভুক্তি বর্দ্ধমান নামে অভিহিত হইত। রাজ্যের এক এক বৃহৎ ভাগকে ভুক্তি বলিত। সেকালের ৬টি ভুক্তির নাম পাওয়া যায়—বর্দ্ধমান, দণ্ড, তীর, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, জেজা ও শ্রীনগর। এক সময়ে সমস্ত মগধ ও বাঙ্গলা দেশ কোন রাজা বা সম্রাট্‌বিশেষের অধীনে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

প্রাকৃতিক বিবরণ ঃ দামোদর, অজয় ও ভাগীরথী ভিন্ন বৃহৎ নদ-নদী আর নেই। বরাকর, সিংহারণ, খড়ি, বাঁকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদীও জেলার মধ্যে আছে। খড়ি ও বাঁকার উৎপত্তি স্থান দেখিয়া বোধ হয়, এগুলিও কাণানদীর ন্যায় এককালে দামোদরের শাখা ছিল। বল্লুকা ও গাঙ্গুড় নদীর শুষ্ক খাত বৰ্দ্ধমানের সন্নিকটে বৰ্ত্তমান আছে। ধৰ্ম্মমঙ্গলে প্রথমটির ও মনসামঙ্গলে দ্বিতীয়টির উল্লেখ আছে।

বৰ্দ্ধমানে পাহাড়-পৰ্ব্বত নাই, তবে পশ্চিমাংশে প্রস্তরময় ভূমি আছে, যাহা হইতে বৰ্দ্ধমানের 'রাঙ্গামাটী' নাম। এই অংশে "লেটারাইট"-প্রস্তর ও তজ্জাত ভূমি আছে। নিম্নে কয়লার খনি। এখানকার ভূমিতে যথেষ্ট লৌহ আছে। সদর, কালনা কাঁটোয়া মহকুমার ভূমি পল্বলময় ও যথেষ্ট উৰ্ব্বরা।

উৎপন্ন দ্রব্য ঃ ধান্য ও কয়লা বৰ্দ্ধমানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাণীগঞ্জে কাগজ ও বার্ণ্ কোম্পানির মৃন্ময় দ্রব্যের কারখানা আছে। জেলায় কয়েকটি তেলের ও চাউলের কল আছে। কাঞ্চননগরের ছুরী-কাঁচি, বনপাশের পিত্তলনিৰ্ম্মিত দ্রব্য ও বামের দেশীধূতি বিখ্যাত। মিহিদানা ও সীতাভোগ নামক মিষ্টান্নের জন্য বৰ্দ্ধমান নগর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন ঃ রাঢ়প্রদেশে বৰ্দ্ধমান-ভুক্তির কতদূর বিস্তৃতি ছিল, জানিবার উপায় নাই। আইন্-ই-আকবরী গ্রন্থে শরিফাবাদ সরকারে বৰ্দ্ধমান একটি মহাল বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭২২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলা দেশকে ২৩ চাকলায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে বৰ্দ্ধমান এক চাকলা। ১৭৪০ খৃঃ অব্দে বৰ্দ্ধমানের রাজা চিত্রসেন রায় এই বৰ্দ্ধমান চাকলার রাজরূপে দিল্লীর বাদশাহের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। মীরকাশিম নবাব হইয়া ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বৰ্দ্ধমান চাকলা ইষ্ট কোম্পানীকে দান করেন। তখন বৰ্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার সমস্ত এবং বীরভূম ও হুগলী জেলার কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। ১৮২০ খৃঃ অব্দে বাঁকুড়া ও ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে হুগলী জেলা পৃথক্ হইয়া যায়।

প্রাকৃতিক উৎপাত ঃ ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে রেলওয়ে খুলিবার পরে বৰ্দ্ধমান স্বাস্থ্যনিবাস হয়। কিন্তু ১৮৬২-৭৫ খৃঃ অব্দ পৰ্য্যন্ত ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর অত্যাচারে বৰ্দ্ধমানের পল্লী ও নগর প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। এখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সেরূপ না থাকিলেও বাঙ্গলার কোন অংশ অপেক্ষা অত্যাচার এখানে কম নয়।

দামোদরের বন্যায় মধ্যে মধ্যে লোকের সৰ্ব্বনাশ হয়। ১৭৭০, ১৭৮৭, ১৮২৩, ১৮৫৫ ও ১৯১৩ খৃঃ অব্দে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বৰ্দ্ধমান ও হুগলী জেলার বহু স্থান প্লাবিত হয়। ইহাতে বহু সম্পত্তি নষ্ট হয় এবং বহু লোক ও গবাদি পশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পরগণা ঃ বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান জেলায় বহু পরগণা আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি নাম মুসলমান-যুগে প্রদত্ত; যথা—শাহাবাদ, হাভেলি, মজঃফরশাহী, আমিরাবাদ, আজমতশাহী, জাহাঙ্গীরাবাদ, শেরগড়, শিলামপুর প্রভৃতি। আর কতকগুলি হিন্দু যুগের নাম; যথা—বর্দ্ধমান, সাতশইকা, খণ্ডঘোষ, গোপভূম, সেনভূম, শিখরভূম, সেনপাহাড়ী, চম্পানগর, ইন্দ্রাণী ইত্যাদি।

প্রবাদ ঃ এই চম্পানগরে চাঁদসদাগরের বাটী ছিল। গাঙ্গুড় বা বেহুলা নদী দিয়া বেহুলা লখিন্দরের শবদেহ কলার মান্দাসে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। গোপভূম এককালে সদ্‌গোপদিগের রাজ্য ছিল। বর্দ্ধমান জেলার মানকরের সন্নিকটে গোপরাজ মহেন্দ্রনাথের গড় ছিল। ইহা উমরার গড় নামে প্রসিদ্ধ। সেনপাহাড়ীতে লাউসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ইছাইঘোষের রাজধানী ছিল। সেনভূম সম্ভবতঃ লাউসেনের পিতা কর্ণসেনের বা তদীয় বংশধরগণের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

গড় ঃ বর্দ্ধমান জেলায় বহু প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কতকগুলি হিন্দুযুগের আর কতকগুলি দুর্গ মুসলমানেরা নূতন নির্ম্মাণ করে অথবা হিন্দু-নির্ম্মিত গড়গুলিই নিজেরা ব্যবহার করিত। কয়েকটি গড়ের নাম নিম্নে লিখিত হইল, —

(১) তালিতগড় বা মহবৎ গড়—বর্দ্ধমানের এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহারই নিকটে নবাবের হাটে ১০৮ শিবমন্দির অবস্থিত, (২) খাঁজাহানা খাঁর গড়—বর্দ্ধমানের দক্ষিণস্থল উচালনের নিকট, (৩) শক্তিগড়—ই, আই, কোম্পানীর ষ্টেশন (৪) রামচন্দ্রগড়—ভাঁটাকুলের নিকট, ৫) নরপালগড়—কামারকিতার নিকট, (৬) উমরারগড়—মানকরের নিকট, (৭) শেরগড়—রাণীগঞ্জের নিকট, (৮) সমুদ্রগড়, (৯) পানাগড় (১০) রাজগড় ও আরও দুই একটি গড়ের চিহ্ন কাঁকসার নিকটে আছে, (১১) কুলীনগ্রামের গড়, (১২) মঙ্গলকোট, (১৩) গড় সোণাডাঙ্গা, (১৪) ও (১৫) দিঘা ও চুরুলিয়ার গড়, (১৬) কোলনার গড়।

সম্ভ্রান্তবংশ ঃ (১) বর্দ্ধমান-রাজবংশ, (২) শিয়ারশোল-রাজবংশ, (৩) চকদীঘির সিংহরায়, (৪) বৈদ্যপুরের নন্দী. (৫) দেবীপুরের সিংহ, (৬) শ্রী বাটীর চন্দ, (৭) কাইগ্রামের মুন্সী, (৮) বর্দ্ধমানের তেওয়ারি এবং ৯, কুসুমগ্রাম, বোহার প্রভৃতি স্থানের মিএগবংশ জেলার মধ্যে সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত।

বর্দ্ধমান-রাজবংশ ঃ বর্দ্ধমান-রাজবংশের স্থাপয়িতা সঙ্গমসিংহ প্রথমে বর্দ্ধমান হইতে ২।।০ ক্রোশ দূরে বৈকুণ্ঠপুরে বাস করিতেন। বল্লুকানদী তীরস্থ বৈকুণ্ঠপুর তখন বাণিজ্যের স্থান ছিল। এখনও এই রাজবংশের গড়খাই করা বৃহৎ বাটীর ভগ্নাবশেষ বৈকুণ্ঠপুরের প্রান্তে দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গমরায়ের পুত্র বঙ্কুবিহারী রায়। তৎপুত্র আবুরায় ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান চাকলার ফৌজদারের অধীনে বর্দ্ধমান নগরের অর্ন্তগত পেকাবে

বাগান বা রেখাবে বাজারের কোতোয়াল ও চৌধুরী নিযুক্ত হন। তৎপুত্র বাবুরায় বর্দ্ধমান পরগণা ও অন্য তিনটি মহালের অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ঘনশ্যাম রায় ও তৎপুত্র কৃষ্ণরাম রায়। ইনি কয়েকটি নূতন মহাল হস্তগত করিয়া বাদশাহ আওরঙ্গজেবের নিকট প্রথম সনন্দ প্রাপ্ত হন (১৬৮৯ খৃঃ অব্দ)। ইঁহারই সময়ে ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে চিতুয়া বরদার জমীদার শোভাসিংহ পাঠান-সর্দ্দার রহিম খাঁর সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া ইঁহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। তৎপুত্র জগৎরাম রায় দিল্লীর বাদশাহের নিকট ২য় সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ১৭০২ খৃঃ অব্দে শত্রুকর্ত্তৃক কৃষ্ণশায়র পুষ্করিণীতে নিহত হন। ইঁহারই পুত্র বিখ্যাত যোদ্ধা কীর্ত্তিচন্দ্র। তিনি চন্দ্রকোণা, বর্দ্দী, বালিগড়ি ও বিষ্ণুপুরের রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য হস্তগত করেন। পরে বিষ্ণুপুরের রাজার সহিত সন্ধি করিয়া নবাব আলিবর্দ্দীর পক্ষে মার্হাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৭৪০ খৃঃ অব্দে তৎপুত্র চিত্রসেন রায় বাদশাহের ৩য় সনন্দে প্রথম রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে রাজ্যলাভ করেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে তিনি দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদশাহের নিকট ৪র্থ সনন্দ প্রাপ্ত হন ও কিয়দ্দিন পরে মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার আমলে বর্দ্ধমান চাকলা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত হইলে ইনি বীরভূমের রাজার সহিত বিদ্রোহী হন। দুইবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া তৃতীয় বার স্বয়ং পরাজিত হন। তৎপরে ১৭৬০ ও ১৭৬১ খৃঃ অব্দে তিনি কোম্পানীকে স্বয়ং রাজস্ব প্রদান করেন। ১৭৬২ হইতে ১৭৭৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানী বর্দ্ধমান জমিদারী খাস দখলে রাখিয়া বর্দ্ধমানরাজকে মালিকানা প্রদান করিতেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে মহারাজ তিলকচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র তেজচন্দ্র রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৭৭১-১৮৩২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহারাজ তেজচন্দ্র রাজত্ব করেন। বর্দ্ধমান জমীদারীর রাজস্ব আদায়ের জন্য মহারাজ নবকৃষ্ণ সাঁজোয়াল হইয়া ১৭৮০-১৭৮২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলেন। মহারাজ তেজচন্দ্রের সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বর্দ্ধমানরাজ-কর্ত্তৃক পত্তনী-প্রথার প্রচলন হইলে ১৮২৯ খৃঃ অব্দে পত্তনী-আইন বিধিবদ্ধ হয়। মহারাজ তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু হইলে মহতাবচন্দ পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হন। মহারাজ মহতাবচন্দ ১৮৩৩-১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি মহাভারত ও হরিবংশ বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া বিতরণ করেন। তিনি নামের পূর্ব্বে হিস্ হাইনেস্ (His Highness) লিখিবার অধিকার পাইয়াছিলেন ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কবি

বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঠিক করিয়াছেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের ৫৬ গাঁই এর মধ্যে ২৪টি গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়ায় সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ড, কুলীনগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বহু বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমান জেলাকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। কড়চা-প্রণেতা গোবিন্দদাস বর্দ্ধমানের কাঞ্চননগর পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ঝামটপুরে, চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দ আমাইপুরে ও চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা লোচনদাস কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অভয়ামঙ্গল বা চণ্ডী-প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও কাশীরামদাস বর্দ্ধমানের দামুন্যা ও সিঙ্গিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা ঘনরাম চক্রবর্ত্তী খণ্ডঘোষ থানার অধীন কৃষ্ণপুরে জন্মগ্রহণ করেন ও মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। মহারাজ তেজচন্দ্রের গুরু সাধক কমলাকান্ত অম্বিকায় জন্মগ্রহণ করিয়া চান্নায় বাল্যকাল অতিবাহিত করেন ও শেষ বয়সে বর্দ্ধমান নগরে বাস করিয়াছিলেন। রামরসায়ন-প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী মানকরের সন্নিকটে সাড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ বর্দ্ধমান জেলার লোক ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, দাশরথি রায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, মতিলাল রায়, চিরঞ্জীব শর্ম্মা ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর জন্মস্থানও বর্দ্ধমান জেলায়।

বিখ্যাত গায়ক দেওয়ান মহাশয় ও "সখি! শ্যাম না আইল" গানের রচয়িতা রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান রাজ-সংসারে চাকরী করিতেন।

বর্দ্ধমান নগরের কথা

শায়র বা পুষ্করিণী ঃ নগরে প্রবেশ করিতেই যে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়, তাহা রাণীশায়র, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জননী রাণী ব্রজসুন্দরী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ ঘাটে শিলালিপি আছে। ইহার পশ্চিমে শ্যামশায়র, ঘনশ্যাম রাম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার পশ্চিমে কৃষ্ণশায়র, কৃষ্ণরাম রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

পল্লী ঃ কাঞ্চননগর পল্লীই পুরাতন বর্দ্ধমানের বাণিজ্যের স্থানন ছিল। এই কাঞ্চননগরের ছুরী-কাঁচি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে রথযাত্রার সময়ে মেলা হয়। মহারাজাদিগের দুইটি কাঠের বৃহৎ রথ আছে। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে রাস্তার উপর বারদ্বারী নামে একটি ফটক আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বিষ্ণুপুর-রাজকে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তি-চিহ্ন স্বরূপ এই ফটক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে ইদিলপুর। বর্দ্ধমান খাসে থাকিবার সময় এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছারী ছিল।

কাঞ্চননগরের উত্তরে বাঁকা নদীর পরপারে রাজগঞ্জের মহন্ত-মহারাজের "অস্থল"। এই সন্ন্যাসিগণ নির্ব্বাক সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্ত্তমান মহন্ত-মহারাজ আনুমানিক দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ইহার উত্তর-পশ্চিমে লাকুর্ডি। এখানে জলের কল আছে, ১৮৮৪-৮৫ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। নিকটেই বর্দ্ধমানের উত্তর-মশানস্থিত দুর্ল্লভাকালীর মন্দির। দামোদরের তীরে ও ইদিলপুরের পূর্ব্বে দক্ষিণ-মশান-স্থিত তেজগঞ্জের কালীর মন্দির। ইহাতেই অনুমান হয়, পুরাতন বর্দ্ধমান ইহারই মধ্যে অবস্থিত ছিল।

লাকুর্ডির পূর্ব্বে টিকরহাট ও কোটালহাট। টিকরহাটের দামোদরকুণ্ড নামক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় বহু দেবমূর্ত্তি ও স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল। কোটালহাটে সাধক কমলাকান্ত বাস করিতেন।

টিকরহাটের পশ্চিমোত্তরে কাজীর বেড় ও কাজীর হাট। তাহার পশ্চিমে মুসলমান প্রধান গোদাপল্লী। প্রবাদ এইরূপ, পাঠানগণ প্রথমে গোদার রাজাকে পরাজিত করিয়া বর্দ্ধমান অধিকার করে। প্রথমে মুসলমানগণ পরাজিত হয়, পরে কৌশলে 'জীওতকুণ্ড' নষ্ট করিয়া জয় লাভ করে। যে স্থানে প্রথমে মুসলমান নিহত হইয়াছিল, তাহা সহিদতলা নামে বিখ্যাত। সেখানে একটি পুরাতন মস্‌জিদ আছে। নিকটে গোদা-রাজার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। গোদার উত্তর-পূর্ব্বে প্রান্তর মধ্যে মহারাজের দিলকুশা বা গোলাপবাগ অবস্থিত।

রাজবাড়ীর উত্তর-পূর্ব্বাংশে বোরহাটে মহারাজাদিগের পুরাতন জেলখানা ছিল। অপরাধীর কারাবাসের ব্যবস্থা ১৭৯০ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বয়ং গ্রহণ করেন ও এই স্থানেই বহু দিন কোম্পানীর কাছারী ছিল। ইহারই সন্নিকটে মহারাজ নবকৃষ্ণ দুই বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তেওয়ারীদিগের বসত বাটী ইহারই সন্নিকটে।

রাজবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজ-কলেজ। ইহা প্রথমে বাঙ্গলা ও ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে ১৮১৭ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ইহা ২য় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। সন্নিকটে রাধাবল্লভ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি ৩টি দেবায়তন আছে।

পীর বহরাম ঃ রাজ-কলেজের পূর্ব্বে পুরাতন চক। ইহার উত্তরাংশে আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুশ্বানের চারি বৎসর বর্দ্ধমানে অবস্থিতির সময় তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত জুমা-মস্‌জিদ আছে। পুরাতন চকের দক্ষিণে পীর বহরাম, শের আফ্‌গান ও কুতুব উদ্দীনের সমাধি আছে। বহরাম সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গুরুর আদেশে মক্কায় পিপাসিত তীর্থযাত্রীদিগকে সুশীতল বারি পান করাইতেন, তজ্জন্য শক্কা উপাধি পান। তিনি বাদশাহ আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বর্দ্ধমানে কিছুদিন অবস্থান করেন। যোগী জয়পালকে অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া তাঁহার আশ্রম প্রাপ্ত হন। তাঁহার রচিত কবিতার অনুলিপি বর্ত্তমান

মাতোয়ালির নিকটে আছে। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার লোকান্তর হয়। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর শের আফ্‌গানকে মারিবার জন্য নিজের দুধ-ভাই কুতুবউদ্দীনকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। রাজমহলে শের আফ্‌গানকে মারিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পরে শের বর্দ্ধমানে আসিয়া বাস করেন। এখানেও কুতুবউদ্দীন আগমন করিলে শের সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে কুতুবের সঙ্গি-গণ তাঁহাকে অপমান করেন। শের কুতুবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কুতুবকে হত্যা করিলে কুতুবের অনুচরগণ শের আফ্‌গানকে একযোগে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন (১৬০৬ খৃঃ অব্দে)। কাহারও মতে এই ঘটনা স্বাধীনপুরে (সাধনপুর) সংঘটিত হয়। সাধনপুর পল্লী বর্দ্ধমান ষ্টেশনের উত্তরে।

এই পুরাতন চকের দক্ষিণাংশে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপের খিলানের উপরিভাগকে লোকে সুন্দরের সুড়ঙ্গ বলিয়া দেখায়। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তাহা বোধ করি এখন সকলেই স্বীকার করিবেন।

রাজবাড়ীর পূর্ব্বাংশ আঞ্জমান বা কাছারী, মধ্যাংশ অন্তঃপুর ও পশ্চিমাংশ প্রাসাদ। এই পশ্চিমাংশের দক্ষিণ-ভাগে খক্কর সা নামক ফকীরের সমাধি আছে। এই অংশের পূর্ব্বে বরহান বাজার ছিল।

রাজবাড়ীর পূর্ব্বে শ্যামবাজারে হাস্যরসের অবতার স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথের বাসবাটী আছে। ইহারই নিকটে জনৈক রাজপুরোহিত কর্ত্তৃক ১১৬৮ সালে স্থাপিত বহু শিব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে।

শ্যামবাজারের পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বমঙ্গলার সুবৃহৎ মন্দির অবস্থিত।

রাজবাড়ীর ঠিক পূর্ব্বে বড়বাজার ও তৎপূর্ব্বে রাণীগঞ্জ বাজার। বড়বাজার রাস্তার পার্শ্বে চার্চ্চ মিশনারি সোসাইটীর প্রথম মিশনারি ওয়েটব্রেট সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন রূপে একটি হল ও মহারাজ আফ্‌তাবচাঁদ কর্ত্তৃক স্থাপিত "বর্দ্ধমানরাজ ফ্রি পাব্‌লিক লাইব্রেরী" অবস্থিত। ইহারই পূর্ব্বে "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" গেট। লর্ড কার্জ্জনের বর্দ্ধমানে আগমনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ইহা বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইহার পূর্ব্বদিকে ১৮২০ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত গৃহ। দক্ষিণে মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাবচাঁদের জনকবংশ গোপালবাবুর সম্পূর্ণ ব্যয়ে নির্ম্মিত সুবৃহৎ টাউনহল। টাউনহলের দক্ষিণে বীরহাটা নামক পল্লী। ভারতচন্দ্রের "আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার" এর মধ্যে ৫টি হাট বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। রাজবাড়ীর পূর্ব্বাংশ সমস্তই মুরাদপুর নামে পরিচিত ছিল। বাঁকানদীর উত্তরে বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের অধিকাংশ অবস্থিত। তেজগঞ্জের উত্তর-পূর্ব্বে ও বাঁকার দক্ষিণ তীরে খাজানর বেড়, জগৎ বেড় ও মিঞার বেড় অবস্থিত। বেড় সম্ভবতঃ গড়খাইকার

স্থানের নাম। ১৭৪০-১৭৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মার্হাট্টাগণ বর্দ্ধমানে অত্যন্ত উপদ্রব করে। সেই সময়ে এই বেড়গুলি নির্ম্মিত হয়।

খাল ও নদী ঃ বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের মধ্যে কেবল কাঞ্চননগর, ইদিলপুর, তেজগঞ্জ ও সদরঘাট পল্লী দামোদরের সন্নিকটে অবস্থিত। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক দামোদরের বাঁধ প্রস্তুত হইলে দামোদরের শাখা কাণা নদীর মুখ বন্ধ হওয়ায় কাণা নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামে জলকষ্ট উপস্থিত হয়। তন্নিবারণকল্পে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে একটি সাময়িক খাল কাটা হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ইডেন খাল কাটা হয়। ইহা জুজুতি হইতে নির্গত হইয়া জলের কলের নিকট বাঁকায় মিলিত হইয়াছে, তৎপরে দামোদরের বাঁধের উত্তর পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

বাঁকা নদীর উপর ৩টি পুল আছে। প্রথম রাধাগঞ্জের পুল। ইহা ১৮২১ খৃঃ অব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ২য় পুল সর্ব্বমঙ্গলার ঘাটের নিকট, মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক অল্পদিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। ৩য় বীরহাটার পুল। ইহা ১৮০২ খৃঃ অব্দে কোম্পানি কর্ত্তৃক গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোডের উপর ২০০০০্ ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়।

বাঁকার দক্ষিণ-তীরস্থ পল্লী

খাজা আনোয়ার ঃ খাজানর বেড় খাজা আনোয়ার শব্দের অপভ্রংশ। খাজা আনোয়ার আজিমুশ্বানের মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। রহিম খাঁ চাতুরী করিয়া সন্ধির অছিলায় খাজা আনোয়ারকে ৪ জন অনুচর-সহ সাক্ষাৎ করিতে বলিলে, খাজা আনোয়ার যেমন রহিম খাঁর নিকটে আগমন করিলেন, অমনই অসতর্কভাবে বহু সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন। আজিমুশ্বানের পুত্র ফরোখশিয়ার বাদশাহ হইয়া খাজা আনোয়ারের সমাধির জন্য দুই লক্ষ মুদ্রা ও কয়েকখানি গ্রাম ব্যয় স্বরূপ প্রদান করেন। তাহাতেই খাজা আনোয়ারের ও তাঁহার ৪ জন অনুচরের সমাধি সমন্বিত বেড়ের নবাববাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বাটীর সমস্ত গৃহগুলি খিলানে নির্ম্মিত। ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত জালায়নগুলি দ্রষ্টব্য। গম্বুজ ব্যতীত এখানে হস্তিপৃষ্ঠের ন্যায় ২টি খিলান আছে। বৃহৎ গজগিরি পুষ্করিণীতে ১টি জলটুঙ্গি আছে।

খাজানর বেড়ের সন্নিকটে রম্‌পুর, গোলাহাট ও ভাতশালা নামক তিনটি মুসলমান-প্রধান পল্লী। খাজানর বেড়ের পূর্ব্বে জগৎ বেড় ও তাহার পূর্ব্বে নীলপুর। এই নীলপুরের সন্নিকটে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোডের পার্শ্বে কানাই নাটশালের দুইটি কুঠী আছে। যেটি মিউসিপ্যাল সীমানার বাহিরে, সেটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠী ছিল। নিকটেই বাম নামক পল্লীতে কোম্পানীর আমলে বহু তন্তুবায় বাস করিত। এখনও বামে সুন্দর দেশী ধুতি প্রস্তুত হয়। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে বা তাহার পূর্ব্বে কোম্পানী ব্যবসা বন্ধ করিলে

সুকলের কুঠীর ম্যানেজার টীপ সাহেবের স্থাপিত ডেভিড্ আর্স্কিন কোম্পানী এই কুঠী ক্রয় করিয়া নীলকুঠীতে পরিবর্ত্তিত করে। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে ইহাদের ব্যবসা ফেল হইলে, এই কুঠী বিক্রীত হয়। ইহার বর্ত্তমান অধিকারী চকদীঘির সুপ্রসিদ্ধ জমীদার রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহরায় বাহাদুর।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জনৈক কর্ম্মচারী কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট ১৮১৬ খৃঃ অব্দে চার্চ্চ মিশন সোসাইটী স্থাপন করেন। এই মিশন কর্ত্তৃক এই সময়ে ২টি বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া পরে ১০টি পর্য্যন্ত হয়, ইহাতে ছাত্রসংখ্যা ১০০০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর পশ্চিম পার্শ্বে এই মিশনের একটি আড্ডা ছিল। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে ছাত্র-সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া যায়।

অন্যান্য বিবরণ ঃ বর্দ্ধমান নগরের দৈর্ঘ্য ৩.৮ মাইল ও বিস্তার ২.৩ মাইল; আয়তন ৮.৭১৬ বর্গমাইল ; লোক সংখ্যা ৩৫৯২১, তন্মধ্যে হিন্দু ২৬৫৩১ ও মুসলমান ৯১৫৮।

বর্দ্ধমান নগর বিষুবরেখার ২৩° ১৪′ ১০″ উত্তরে অবস্থিত। বর্দ্ধমান নগরের কিঞ্চিৎ উত্তর দিয়া জেলার মধ্যে মকরক্রান্তি গিয়াছে। গ্রীনিচের অক্ষরেখা হইতে পূর্ব্বদিকে ৮৭° ৫৩′ ৫৫″ দূরে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০৪ ফুট উচ্চ।

বর্ত্তমান গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোড নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন কালনা, কাঁটোয়া, বাঁকুড়া ও জাহানাবাদ যাইবার বড় রাস্তা বর্দ্ধমান হইতে বাহির হইয়াছে। কাঁটোয়ার রাস্তার সহিত গৌড় হইতে বাদশাহী রাস্তা মিলিত হইয়া বর্দ্ধমান নগরের মধ্য দিয়া জাহানাবাদ অঞ্চলে গিয়াছে।

মুসলমান-যুগের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ ঃ পাঠানেরা বঙ্গ-বিজয়ের প্রথম অবস্থায় বর্দ্ধমান জেলা অধিকার করে। তজ্জন্য ইহার অধিকাংশ শরিফাবাদ সরকারের অন্তর্গত বলিয়া আইন্-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা দাউদ খার পরিবারবর্গ বর্দ্ধমান নগরে ধৃত হয়। বর্দ্ধমান শের আফ্গানের জায়গীর ছিল। সাহাজাদা খুরম বিদ্রোহী হইয়া বর্দ্ধমান অধিকার করিয়াছিলেন। শোভাসিংহের বিদ্রোহের পর আরঙ্গজেবের আদেশে সাহাজাদা আজিমুশ্বান বিদ্রোহ দমন ও পরে শান্তি স্থাপনের জন্য বর্দ্ধমানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় ৪ বৎসর বাস করেন। সুফী বায়াজিদ নামক ফকীর বর্দ্ধমানে বাস করিতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য তিনি স্বীয় পুত্র ফরোখশিয়ার ও করিম উদ্দীনকে প্রেরণ করেন। ফরোখশিয়ার স্বীয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ফকীরের পাদ বন্দনা করিলে ফকীর আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তুমি দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিবে।" আজিমুশ্বান বাদশাহী

লাভের আকাঙ্ক্ষা নাই জানাইলে ফকীর স্বীয় আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না বলিয়া অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন।

ফকীরের ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসের পাঠক জানেন। ফরোখশিয়ারের ব্যয়ে নির্ম্মিত মস্‌জিদ ও ফকীরের সমাধি কালনা রোডের পার্শ্বে খাঁপুকুরের সন্নিকটে অবস্থিত।

বর্দ্ধমান নগরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে নবাবের হাট নামক স্থানে মহারাজ তেজচন্দ্রের জননী মহারাণী বিষ্ণুকুমারী কর্ত্তৃক কয়েকটি মন্দির ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হয়। মন্দিরগুলি আয়ত-ক্ষেত্রাকারে অবস্থিত।

কালনার ১০৮ শিব মন্দির বৃত্তাকারে দুই পংক্তিতে অবস্থিত। কালনায় কীর্ত্তিচন্দ্রের পরবর্ত্তী কয়েকজন মহারাজের "সমাজ" আছে। দাঁইহাটে কীর্ত্তিচন্দ্রের ও পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজদিগের "সমাজ" আছে।

উজানি ও মঙ্গলকোট

শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী হরিদাস পালিত, শ্রী মণীন্দ্রমোহন বসু

উজানি নগর ঃ উত্তর-রাঢ়ভূমি পরিদর্শনপূর্ব্বক লুপ্ত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার ও প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার জন্য আমরা মঙ্গলকোট ও উজানি-ভ্রমণে গমন করিয়াছিলাম। উজানি ও মঙ্গলকোট প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। ধনপতি দত্ত ও শ্রীমন্ত দত্ত এবং খুল্লনা সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যে সবিশেষ উল্লেখ আছে, তাঁহাদের বাসভবন উজানি নগরে ছিল। উজানি বা মঙ্গলকোটে বিক্রমকেশরী নামক এক রাজা ছিলেন।

উজানি একটি পীঠস্থান। তথায় দেবী ভগবতীর কনুই পতিত হইয়াছিল। দেবী মঙ্গলচণ্ডী এবং ভৈরব কপিলাম্বরের অবস্থান জন্য উজানি বা মঙ্গলকোট হিন্দুমাত্রেরই তীর্থস্থান। এই উজানিতে লোচনদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাকে বড়াইবুড়ীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত পরগণা আজমৎসাহীর মধ্যে উজানি নগর অবস্থিত। 'উজানি নগর' বলিলে এখন আর সাধারণে বুঝিতে পারিবেন না। উজানির সে গৌরবস্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে। উজানির সম্পদ্ বাণিজ্য ও জনবহুলতা এক্ষণে কল্পনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যখন গৌড় বঙ্গের রাজধানী ছিল, তখন উজানির গৌরব ছিল। গৌড়ের ধ্বংস হইয়াছে, উজানিও সেই সঙ্গে মহিমাচ্যুত হইয়াছে। যখন ধনী বণিক্গণের বাণিজ্যপোতগুলি ভ্রমরার ঘাটে বাঁধা থাকিত, তখন এই স্থানের নাম ছিল উজানি ; মুসলমান বাদশাহী দপ্তরে উজানির নাম হয় 'সুগ্রাম'। চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা লোচনদাস (ত্রিলোচনদাস) তাঁহার জন্মভূমির নাম 'কোগ্রাম' বলিয়াছেন। তাঁহার ভার্য্যা পতিসহবাসে বঞ্চিতা হইয়া এই গ্রামের নাম 'কুগ্রাম' রাখিয়াছিলেন। গ্রামবাসীরা সতীর সম্মান রক্ষার জন্য 'কুগ্রাম' এবং লোচনদাসের সম্মানের জন্য 'কোগ্রাম', এই উভয় নামই ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাদশাহী 'সুগ্রাম' নামের ব্যবহার আর নাই।

মঙ্গলকোটের পুলিশ-ষ্টেশন হইতে উত্তর-পূর্ব্বাংশে উজানি অবস্থিত। এই উন্নত স্থানে দাঁড়াইয়া উজানি নগর দেখিতে বড়ই সুন্দর বোধ হয়। কুণুর নামক কেদারবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বাঁকিয়া বাঁকিয়া কোগ্রামের দক্ষিণ ও পূর্ব্বপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া অজয়নদে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কুণুরের উত্তরে ক্ষুদ্র প্রান্তর, পার্শ্বে 'আড়ওয়াল (আড়াল)'

নামক ক্ষুদ্র পল্লীর ঘন পাদপশ্রেণী, দূরে উজানিকে আবৃত করিয়া ছোট ছোট গুল্ম হইতে অশ্বত্থ ও বট তরুগুলি নিবিড় ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে জটাজূটধারী তালতরুগুলির শীর্ষদেশ দেখা যাইতেছে, দূর হইতে উজানি যেন একটি বনভূমি বলিয়া মনে হইয়াছিল।

মঙ্গলকোট হইতে স্বল্পতোয়া কুণুর নদী পার হইয়া উত্তরমুখে কিঞ্চিৎ গমন করিলেই নাতিবৃহৎ এক অশ্বত্থ তরুতলে কতিপয় বন্যবৃক্ষলতাচ্ছাদিত ধ্বংসপ্রায় একটি প্রাচীন মস্‌জিদ্ দেখা যায়। এখন সেটি প্রায় ইষ্টকস্তূপ, তন্মধ্যে মস্‌জিদের ভগ্নপ্রায় কিয়দংশ আজিও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে মস্‌জিদ্‌টি ইষ্টক ও চূণ দিয়া গাঁথা হইয়াছিল। ইহা দুই হইতে তিন শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহার কি নাম, স্থানীয় লোকে তাহা অবগত নহে। এই মস্‌জিদের অতি নিকটে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, গ্রামের নাম 'আড়ওয়াল'। তথায় যে কয়েক ঘর অধিবাসী আছে, তাহারা মোসলমান। এই ক্ষুদ্র আড়ওয়াল গ্রামটি দুই ভাগে বিভক্ত; মধ্যভাগে একটি শুষ্ক কেদারবাহিনী নদীর গর্ভ বৰ্ত্তমান রহিয়াছে। এই শুষ্ক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর গর্ভ অতিক্রম করিয়া আড়ওয়ালের উত্তর অংশ দিয়া গ্রামান্তরে যাইবার পথ প্রসারিত রহিয়াছে। গ্রামের এই অংশে আর একটি মস্‌জিদের চিহ্ন মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। কুণুর নদীতীরে এক অজ্ঞাতনাম কাজির বাটীর ধ্বংসাবশেষ আছে। আজিও কাজির সানবাঁধা রোয়াক ও গৃহের মেঝের কিয়দংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিংকাংশ গৃহচিহ্ন কুণুর-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কুণুরনদীর শুষ্কপ্রায় সামান্য জলধারা ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। নদীগর্ভ ইষ্টকস্তূপে প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই স্থানের নদীর 'আড়ানী' বড় উচ্চ। নদীগর্ভে অবতরণ করিয়া আড়ানী-গাত্রে কোন প্রকার প্রাচীন চিহ্ন বৰ্ত্তমান আছে কি না, অনুসন্ধান করা হইল। ইষ্টকময় গৃহভিত্তি এবং মৃত্তিকাপাত্রের চূর্ণরাশি নদীপ্রবাহে মৃত্তিকা হইতে উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, দেখা গেল। ক্রমে উত্তর অংশে মৃত্তিকাপাত্রচূর্ণপরিপূর্ণ একটি ডাঙ্গা পার হইয়া দু-চারিটি বাব্‌লাগাছের পার্শ্ব দিয়া কোগ্রাম-সীমায় উপস্থিত হওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, মহাশয় ও তাঁহার কতিপয় বন্ধুবর্গ বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ঘনবন্যবৃক্ষসমাকীর্ণ নিবিড় বনভূমির মধ্যস্থ একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। গ্রামটিও বনভূমি। সম্মুখে এক সুবৃহৎ বটবৃক্ষের পশ্চিম পার্শ্বে ভগ্নপ্রাচীর-বেষ্টিত প্রাঙ্গণ মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নবনির্ম্মিত ইষ্টকগৃহ দেখা গেল। ইহাই বৰ্ত্তমান কালের চণ্ডীর দেউল। এই স্থানেই মঙ্গলচণ্ডীর অবস্থান। ইহারই পার্শ্বে ধনপতি দত্ত সদাগরের বাসভবন ছিল।

মঙ্গলচণ্ডিকার মন্দির : মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হইলে, পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া পূৰ্ব্বমুখে প্রবেশ করিতে হয়। বৰ্ত্তমান মন্দিরটি দক্ষিণদ্বার। দীর্ঘে ২২ ফিট্ ৬ ইঞ্চি, প্রস্থে ২১ ফিট্। মন্দির মধ্যে কাঠের সিংহাসনের উপরে পিত্তলময়ী দশভূজা মহিষমৰ্দ্দিনী

সিংহবাহিনী চণ্ডিকা দেবী বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার সিংহাসনের পুরোভাগে একটি প্রস্তরের বৃষ। বামে প্রস্তরের পলতোলা কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ মূর্ত্তি—ইহারই নাম কপিলেশ্বর। তাঁহার বামে পদ্মাসনোপরি অবস্থিত ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, তাঁহার বামে গৃহের কোণে একটি বৃহৎ খড়গ। বুদ্ধমূর্ত্তিটি উর্দ্ধে ১'-৯", প্রস্থে ১১" পুরু ৩"। উজানির মঙ্গলচণ্ডিকা পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং উজানি একটি পীঠস্থান মধ্যে গণা

"উজানিতে কফোনি মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যাঁরে সেবি।।"

—পীঠমালা।

তন্ত্রচূড়ামণি নামক তন্ত্রের মতে উজানি নামক স্থানে ভগবতীর কুর্পরদেশ পতিত হইয়াছিল এবং দেবী মঙ্গলচণ্ডীকা ও ভৈরব কপিলাম্বর তথায় নিয়ত অবস্থান করেন; কুব্জিকাতন্ত্রে মঙ্গলকোটে উক্ত পীঠস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শিবচরিত নামক সংগ্রহ-পুস্তকে উজানিতে পীঠস্থানের কথা লিখিত আছে।

লোচনদাসের পাট ঃ মঙ্গলচণ্ডিকা দেবীর দেউল হইতে গ্রামের মধ্য দিয়া কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্ব্বকোণে গমন করিলে 'লোচনদাসের পাটে' উপস্থিত হওয়া যায়। লোচনদাসের সমাধি-গৃহটি ক্ষুদ্র ও ইষ্টক-নির্ম্মিত। সমাধিগৃহের প্রাঙ্গণে দক্ষিণ মুখে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরটি দক্ষিণদ্বারী। এই সমাধি-গৃহটি দীর্ঘে ১৫' ফিট্ ৩" ইঞ্চি, প্রস্থে ১২' ফিট্ ১" ইঞ্চি। গৃহের মধ্যে লোচনদাসের পিরামিডাকৃতি (Pyramidal) সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। সমাধির উত্তরাংশে শ্রী শ্রী গৌর-নিতাই-এর মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সমাধিগৃহপ্রবেশের দ্বারের উভয় পার্শ্বে ভিত্তিগাত্রে সংবদ্ধ প্রস্তরের দুইটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি আবদ্ধ রহিয়াছে। মূর্ত্তিদ্বয় অতি সুন্দর ও অনুমান একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

সমাধিমন্দিরের বাহিরে পূর্ব্বভাগে মাধবীলতার তলে ছোট বড় দশটি পিরামিডাকৃতি সমাধিচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণভাগে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টক-নির্ম্মিত স্থান, তাহার তিনটি অংশ। উহার দুই পার্শ্বে দুইটি দেড় বা দুই হস্ত উচ্চ ছাদযুক্ত অতি ক্ষুদ্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহ, মধ্যস্থল উন্মুক্ত। এই ক্ষুদ্র গৃহের পূর্ব্বপার্শ্বে উয়দচাঁদ মহান্তের সমাধি এবং পশ্চিমে বীরচাঁদ অবধূত গোসাঞির ও তাঁহার প্রসূতির সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দুই সমাধিস্থানের মধ্যস্থিত অংশে একটি সুন্দর কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্ম্মিত জৈন তীর্থঙ্করমূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। এই মূর্ত্তিটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য সংগৃহীত হইয়া কলিকাতায় আনিত হইয়াছে.

তীর্থঙ্করমূর্ত্তি-পরিচয় ঃ মূর্ত্তিটি দিগম্বর, কাল প্রস্তরের উপর খোদিত, প্রস্তরটি উচ্চতায় ২৩।।০ ইঞ্চি, প্রস্থে ১৪।।০ ইঞ্চি, স্থূলতায় ৩ ইঞ্চি। মূর্ত্তির মস্তকে একটি ছত্র বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি ঢক্কা কোন অদৃশ্য বাদক কর্ত্তৃক ধ্বনিত

হইতেছে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, দুন্দুভিনিনাদ হইতেছে। তন্নিম্নে মালাহস্তে দুটি উড্ডীয়মান অপ্সরামূর্ত্তি, তাহাদের নিম্নে, মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটি দেবমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটির বদন শ্মশ্রুবিমণ্ডিত, তাহার এক হস্তে গদা, অন্য হস্তে অভয়মুদ্রা। দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি ধ্যানমুদ্রায় অবস্থিত। তৃতীয়টির দক্ষিণ হস্তে গদা আর বামহস্তে জানুদেশ সংস্থাপিত। চতুর্থ মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা, বামহস্তে বরদ-মুদ্রা এবং তাহার শ্মশ্রুও বিদ্যমান রহিয়াছে। বামদিকের পাঁচটি মূর্ত্তির মধ্যে প্রথমটির দক্ষিণ হস্তে পদ্ম, বামহস্তে ঘট। দ্বিতীয় মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে পদ্ম এবং বামহস্তে গদা, তন্নিম্ন মূর্ত্তির দুই হস্তেই পদ্ম বিরাজিত রহিয়াছে। চতুর্থটি পুরুষের উর্দ্ধাঙ্গের মূর্ত্তি, তাহার দুই হস্ত অস্পষ্ট, মস্তকে আভামণ্ডল রহিয়াছে। সর্ব্বনিম্ন মূর্ত্তির উপরার্দ্ধ কোন স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি এবং নিম্নার্দ্ধ সর্পপুচ্ছবৎ, তাহার দক্ষিণ হস্তে অসি ও বামহস্তে চর্ম্ম বিদ্যমান। এই নয়টি মূর্ত্তিই আসনে উপবিষ্ট। বিশেষ পরীক্ষার পর স্থির হইয়াছে যে, এই মূর্ত্তি নয়টি নবগ্রহের। ইঁহাদের নিম্নে তীর্থঙ্করের দুই পার্শ্বে দুইটি চামরধারী পুরুষ-মূর্ত্তি, তাহারই ন্যায় দুইটি পদ্মের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার পরই পাদপীঠ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার মধ্যভাগে তীর্থঙ্করের ঠিক পদতলে একটি শায়িত মৃগমূর্ত্তি, এই লাঞ্ছন দেখিয়া মূর্ত্তিটিকে ষোড়শতম তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ অবধৃত বলা হইয়াছে।[১] মৃগের দক্ষিণ পার্শ্বে নির্ম্মতার কল্পিতমূর্ত্তি আর পাদপীঠে দুই ধারে দুইটি নৈবেদ্য।

লোচনদাসের পাটের বর্ত্তমান মহান্তের নাম হরিদাস মহান্ত, তিনি বাউলপন্থী, সমাধি-প্রাঙ্গণের পূর্ব্বভাগে উক্ত বাবাজীর আখড়াবাড়ী।

অজয়নদ ঃ কুগ্রাম বা কোগ্রামের উত্তর পার্শ্বে অজয়নদ। লোচনদাসের বাটী হইতে অজয় অতি নিকটে। আমরা অজয়তীরে এক অশ্বত্থমূলে গিয়া উপবেশন করিলাম। অজয় অতি বৃদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, বালুকাস্তূপের অন্তরালে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত। উদ্যম নাই, চঞ্চলতা নাই। অজয়ের এই অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, ঘনরাম যে অজয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, এ অজয় বুঝি সে অজয় নহে। ঘনরামের অজয় যথার্থই অজয় ছিল।

"প্রলয় দারুণ বাণ আইল হেন কালে।
তরল তরঙ্গ তেজে দুকূল উথলে।।
কুল কুল কুবর কখন কানে কান।
দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল বাণ।।"

—ঘনরাম-ধর্ম্মমঙ্গল, অষ্টাদশ সর্গ।

১. Ind. Ant. Vol II p.138

বর্ত্তমান কালে অজয় কুগ্রাম গ্রাস করিতেছেন। কোগ্রামের তীরভূমি সুউচ্চ আড়ানী। এই স্থানের সমতল ক্ষেত্রে লোচনের স্মরণার্থ উজানির মেলা বসিয়া থাকে।

কুণুর-সঙ্গমস্থল ঃ এই স্থান হইতে পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইলে, অজয় ও কুণুরের সমঙ্গস্থল। অজয় ও কুণুর-সঙ্গমের পশ্চিমেই উজানির মহাশ্মশান-ভূমি।

এই উজানির মহাশ্মশানের এক পার্শ্বে 'খড়্গামোক্ষণ' নামক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। ইহার পার্শ্বেই 'খাড়গড়া', তৎপরেই নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের দক্ষিণপার্শ্বে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীকাব্যোক্ত 'ভ্রমরার দহ'। প্রাচীন 'ভ্রমরার দহ' উপস্থিত বালুকাস্তূপ ও পলিমাটী পড়িয়া কৃষিভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

খড়গমোক্ষণ ঃ সম্বন্ধে যে দুইটি প্রবাদ এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

প্রথম—বিক্রমাদিত্য নামে কোন নরপতি বেতালসিদ্ধি ব্যাপারে খড়্গাঘাতে জনৈক সন্ন্যাসীর শিরশ্ছেদন করেন। ব্রহ্মহত্যাপরাধে সেই খড়্গ সেই রাজার হস্তে সংলগ্ন হইয়া থাকে। বহুতীর্থ-ভ্রমণের পর উজানির এই মহাশ্মশানে অজয়নদতীরে খড়্গ হস্ত হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে এবং মহারাজ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

দ্বিতীয়—এক ব্যক্তি খড়্গদ্বারা তাহার ভ্রাতার মস্তক ছেদন করে। এই ভ্রাতৃহত্যারূপ মহাপাপে সেই খড়্গ তাহার হস্তে সংলগ্ন হইয়া যায়। এই 'খড়্গমোক্ষণ' বলিয়া খ্যাত প্রান্তরে আসিলে তাহার সেই মহাপাপ-বিমোচনের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ হস্তসংবদ্ধ খড়্গ স্খলিত হয়। এই উভয় প্রবাদবশতঃ এই খড়্গামোক্ষণের মাঠ তীর্থরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। অদ্যাপি পৌষসংক্রান্তির দিনে এই স্থানে স্নানার্থ বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে এবং এই স্থানে একটি মেলা বসে।

মাড়গড়া ঃ খড়গমোক্ষণ-এর পার্শ্বেই মাড়গড়া নামক স্থান। এই স্থানটির নাম 'মাড়গড়া' কেন হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় বলিলেন, এই স্থানে অজয়ের ধারে ধনপতি দত্ত সদাগরের দ্বিতীয়া স্ত্রী খুল্লনা ছাগী চরাইবার সময় বিশ্রাম করিতেন। প্রবাদ এই যে, খুল্লনা এই স্থানে ভাত রাঁধিয়া ভাতের মাড় গালিয়া ফেলিতেন।

ভ্রমরার দহ ঃ খড়্গামোক্ষণ ও মাড়গড়ার অনতিপূর্ব্বভাগে কুণুর ও অজয়সঙ্গম-পার্শ্বে ভ্রমরার দহ। উজানি যখন বণিক্-সমাকুল ছিল, তখন এই ভ্রমরার দহে তাঁহাদের বাণিজ্য তরণী লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া শোভা পাইত। ধনপতি এই ভ্রমরার দহে ডিঙ্গায় চাপিয়া সিংহলে বাণিজ্য করিতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত দত্ত এই ভ্রমরার দহে সাতখানি সমুদ্রগামী পোত ভাসাইয়া সিংহলে পিতার অনুসন্ধানে গমন করেন।

"প্রথমে ভ্রমরাজলে শ্রীমন্ত নৌকায় চলে,
পূজিয়া মঙ্গলচণ্ডিকায়।
এড়ায় ভ্রমরা-পাণি, সম্মুখেতে উজানি,
নিজ-গ্রাম এড়াইয়া যায়।।"—কবিকঙ্কণ

বণিকেরা যখন সফরে বাহির হইতেন না, তখন তাঁহাদের ডিঙ্গাগুলি ভ্রমরার জলে নিমগ্ন থাকিত। বাণিজ্য-গমনের পূর্ব্বে জল হইতে নৌকাগুলি তুলিয়া মেরামত ও গাবকালী করাইয়া ব্যবহার করিতেন। ভ্রমরার দহ তখন খুব গভীর ছিল। ডুবুরী নামাইয়া ডিঙ্গাগুলি তুলিতে হইত।

"পূর্ব্ব হইতে ছিল ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে।
ডুবুরী লইয়া সাধু গেল তার কূলে।।
ঘাটে জলদেবতার করিল পূজন।
জলেতে ডুবুরী গিয়া নামে দুই জন।।" —কবিকঙ্কণ

এই ভ্রমরার জলে ধনপতির মধুকর, দুর্গাবর, শঙ্খচূড়, চন্দ্রবাল, ছোটমুখী, গুয়ারেখী ও নাটশালা নামক সাতখানি সুবৃহৎ নৌকা নিমগ্ন ছিল।

শ্রীমন্তের ডাঙ্গা ঃ মঙ্গলচণ্ডীর দেউল হইতে পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই দক্ষিণভাগে একটি সুবৃহৎ উন্নত ডাঙ্গার উপর বৃহৎ অশ্বত্থতরু বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্থানটি প্রাচীন কালে লোকবাস ভূমি ছিল বলিয়া বিবেচনা হয়। বর্ত্তমান কালে এই স্থানটি বনাবৃত অবস্থায় রহিয়াছে। এই স্থানের অনতিপূর্ব্বভাগে একটি উন্মুক্ত উচ্চ ভূখণ্ড বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে আকন্দ পুষ্পের ক্ষুদ্র গাছ হইয়াছে, এই স্থানের নাম শ্রীমন্তের ডাঙ্গা। ডাঙ্গার অনতি উত্তরে অজয়নদ এবং পূর্ব্বভাগে ক্ষীণ কুণুরনদী প্রবাহিত। শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে সিংহলে যাইবার জন্য মঙ্গলচণ্ডীর দেউলে মহামায়াকে পূজা ও প্রণাম করিয়া যাত্রা করেন এবং গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমে এই ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া অনতিদূরস্থ ভ্রমরার দহের পোতগুলি দেখিয়াছিলেন। শ্রীমন্ত যাত্রা করিয়া এই স্থানে প্রথমে দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'শ্রীমন্ত-ডাঙ্গা" হইয়াছে। এই স্থানে জননী খুল্লনা শ্রীমন্তকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, —

'খুল্লনা বলেন ছিরা শুন মোর বাণী।
বিপদে রাখিবে তারা নগেন্দ্রনন্দিনী।।" —কবিকঙ্কণ

বর্ত্তমান কালে কোগ্রামনিবাসী নরনারীগণ বিজয়াদশমীর দিবস দেবীর ঘট-বিসর্জ্জনের পর মঙ্গচণ্ডীর দেউলে গমন করিয়া মহামায়ার চরণে প্রণাম করিয়া, এই শ্রীমন্ত ডাঙ্গায় আগমন করিয়া যাত্রা করেন। শ্রীমন্ত এই স্থানে যাত্রা করিয়া সিংহলে গমনপূর্ব্বক সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের প্রতি সাধারণের যথেষ্ট ভক্তি ও বিশ্বাস রহিয়াছে।

মঙ্গলকোটের বর্ত্তমান দর্শনীয় স্থান

মঙ্গলকোট-পরিক্রমণ ঃ মঙ্গলকোটের পুলিশ-ষ্টেশনটি অতি উচ্চ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত, কুণুর নদীতীরস্থ সমতলক্ষেত্র হইতে এই স্থানের উচ্চতা পঁচিশ হইতে ত্রিশ ফিট্ হইবে। অতি সুন্দর স্থান। যখন মঙ্গলকোট সজীব ছিল, তখন এই স্থান কোন দেবালয় বা ধনী জনগণের হর্ম্ম্যাবলীতে পরিশোভিত ছিল বলিয়া মনে হয়। স্থানটির চতুর্দ্দিক্ ইষ্টক-সমাকীর্ণ ও ভূপরি ইষ্টক-নির্ম্মিত বহু গৃহভিত্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই স্থানটির দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর-ভাগে নিম্নভূমি। পুলিশ-ষ্টেসনটি যেন একটি অন্তরীপের নাসাগ্রে অবস্থিত। এই স্থান হইতে চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর। এই স্থানের পশ্চিমাংশে অশ্বত্থ, খেজুর ও বিবিধ বন্যবৃক্ষে একটি কুঞ্জবাটিকার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই স্বভাবজাত কুঞ্জবনের মধ্যে কয়েকটি ইষ্টক-নির্ম্মিত সমাধি ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

গোলাম পঞ্জতন ঃ এই স্থানে গোলাম পঞ্জতন নামক পাঁচ জন গাজী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। তাঁহারা মঙ্গলকোট অধিকার করিতে আসিয়া জনৈক হিন্দু নরপতির হস্তে নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মৌলবী মহম্মদ ইস্‌মাইল সাহেব আমাদিগকে মঙ্গলকোটের মোসলমান অধিকারকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বহু কাহিনী সংগ্রহ করিয়া দেন। উক্ত মৌলবী সাহেব মঙ্গলকোট-পরিক্রমের প্রধান পাণ্ডা হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে মঙ্গলকোটের দর্শনীয় স্থানগুলি অনায়াসে দর্শন এবং প্রত্যেক স্থানের প্রাচীন কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি।

গোলাম পঞ্জতনের সমাধিস্থান হইতে পূর্ব্বমুখে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি গ্রাম্য পথের সহিত আমাদের গন্তব্য পথ মিশিয়া গেল। এই স্থানের ঠিক পূর্ব্বদিকে চতুর্দ্দিকে ইষ্টক-বিক্ষিপ্ত ভগ্ন প্রাচীর-বেষ্টিত একটি নূতন মস্‌জিদ্ দেখা গেল। মস্‌জিদ্‌টির বাহিরের প্রাঙ্গণে পূর্ব্বমুখে প্রবেশ করিয়া মূল মস্‌জিদ-প্রাঙ্গণে উত্তরমুখে প্রবেশ করিতে হয়। এই মস্‌জিদের নাম কোয়ার সাহেবের মস্‌জিদ্।

কোয়ার সাহেবের মস্‌জিদ্ ঃ প্রাচীন এই মস্‌জিদটি ভগ্ন হইবার পর উহার স্থানে এই মস্‌জিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মস্‌জিদের সম্মুখে একখানি খোদিত শিলাফলক সংবদ্ধ রহিয়াছে। ইহা হইতে হিঃ ১২২৫ সালে ইহা সংস্কৃত হইয়াছে বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

মস্‌জিদের উত্তর অংশ প্রাচীর-বেষ্টিত। তথায় কয়েকটি প্রাচীন ধরণের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে চারিটি প্রস্তরগ্রথিত পয়ঃপ্রণালী বিদ্যমান রহিয়াছে।

মৌলবী সাহেব ফকিরের মস্‌জিদ্ ঃ কোয়ার সাহেবের মস্‌জিদ্ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বমুখে খানিক পথ অতিবাহিত করিলেই ডাহিন ভাগে একটি প্রাচীন ভগ্ন মস্‌জিদ্ নয়নগোচর হয়। এই মস্‌জিদের দ্বার পূর্ব্বমুখে।

মসজিদটি প্রাচীন ধরণের ও বহির্দ্দেশ বাঙ্গলা ঘরের আকারে নির্ম্মিত। গৌড়ের কদমরসুল মস্‌জিদ্ যে ধরণের, ইহার আকার ও গঠন কতকটা সেই প্রকার। অনেকে এই মস্‌জিদের নাম বলিতে পারিলেন না। কেহ বলিলেন, "মৌলবী সাহেব ফকিরের মস্‌জিদ্।"

মঙ্গলকোটের হাট ঃ উক্ত মস্‌জিদের নিকট হইতে পূর্ব্বমুখে আন্দাজ এক রশি গমন করিলে বামে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং তাহারই পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্ন স্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ভগ্ন স্তূপের উত্তরে একটি ক্ষুদ্র হাট, সেই দিন বসিয়াছিল।

মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের মস্‌জিদ্ ঃ মঙ্গলকোটের হাটের দক্ষিণেই দুই শত পঞ্চাশ বর্গ ফিট্ পরিমাণ ভূখণ্ডের উপর একটি বাসভবনের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই বাসভবন তিন ভাগে বিভক্ত,—সর্ব্ব পশ্চিমের অংশে মস্‌জিদ্ ও সমাধিক্ষেত্র, তৎপরে দুই খণ্ড দুই জনের সদর ও অন্দর বিশিষ্ট বাসভবন ছিল। হাটের উপর দিয়া দক্ষিণমুখে উক্ত প্রাচীন বাসভবনে প্রবেশ করা যায়। যে স্থান দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, সেই স্থানটি উক্ত বাটী-প্রবেশের প্রধান দ্বার।

নাকারাখানা ঃ উক্ত মসজিদের দ্বারের উপর ছিল নাকারাখানা। উক্ত নাকারাখানা ১৮ বর্গ ফিট্ পরিমাণ ভূমির উপর নিৰ্ম্মিত ছিল। এই দ্বার দিয়া দক্ষিণমুখে কয়েক হস্ত অগ্রসর হইলেই একটি কাঠকাঁপা বৃক্ষ দেখা যায়। এই স্থানের পশ্চিমাংশেই একটি নবনির্ম্মিত মস্‌জিদ্। মস্‌জিদ্-প্রাঙ্গণে পশ্চিমমুখে প্রবেশ করিতে হয়। প্রাঙ্গণটি বাঁধান। প্রাচীন ভগ্ন মস্‌জিদ্‌টির ইষ্টকরাশি অপসারিত করিয়া সেই স্থানে সেই প্রাচীন মস্‌জিদ্ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকারের এই মস্‌জিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছে। অদ্যাপি সেই প্রাচীন মস্‌জিদের কোণের একটি স্তম্ভ বা মিনার বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নতুন মস্‌জিদে একখানি তোগড়া—অক্ষরমালা খোদিত শিলাফলক আবদ্ধ রহিয়াছে। এই শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, ১৬০৫ হিজরিতে সম্রাট্ সাজাহানের রাজত্বকালে প্রাচী মস্‌জিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধি ঃ উক্ত মস্‌জিদের দক্ষিণপার্শ্বে কারুকার্য্য খচিত বাঙ্গালা ধরণের একটি ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধি। ইহার দ্বারদেশ কাষ্ঠের খুপ্‌রিকাটা কপাটদ্বারা বদ্ধ রহিয়াছে। সমাধিগৃহটি দীর্ঘে ২২ ফিট্ ২ ইঞ্চি। এই সমাধিগৃহের সম্মুখভাগে মৃত্তিকোপরি বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা সুলতান হোসেন সাহের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিযুক্ত একখানি প্রস্তর পতিত রহিয়াছে। এই প্রস্তরের খোদিত লিপিটি বাঙ্গালার সুলতান আলাউদ্দীন্ হোসেন সাহের রাজত্বকালে ৯১৬ হিজিরিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মৌলানা দানেশমন্দের সমাধির দক্ষিণে আর একটি ক্ষুদ্র সমাধিগৃহ বৰ্ত্তমান রহিয়াছে।

মিঞা হজ্জৎ উল্লাশাহ ঃ উক্ত ক্ষুদ্র সমাধিগৃহে মিঞা হজ্জৎ উল্লাশাহ্ নামক জনৈক ব্যক্তি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন। ইহার সম্মুখে তাঁহার স্ত্রী সাহেলা বিবির সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানের দক্ষিণভাগ বহু সমাধি-চিহ্নে চিহ্নিত রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণে একটি চতুষ্কোণ পুষ্করিণী। একদিন এই পুষ্করিণীটির চারিদিক্ সোপান-শ্রেণীতে শোভিত ছিল, তাহার চিহ্ন বৰ্ত্তমান রহিয়াছে। পুষ্করিণীটির নাম মাইনে পুকুর।

মাইনে পুকুর ঃ মাইনে পুকুরে স্নান করিয়া মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধি প্রাঙ্গণে দেহ লুণ্ঠন করিলে বহুপ্রকার চৰ্ম্মরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে, এ প্রকার বিশ্বাস এতদঞ্চলে বিশেষভাবে বদ্ধমূল রহিয়াছে। এই পুষ্করিণীর পশ্চিম পাহাড়ে সুবৃহৎ বহু ইষ্টকগৃহ-শোভিত কাজি খোদা নওয়াজ সাহেবের বাসভবন ছিল।

কাজি খোদা নওয়াজ ঃ এক্ষণে উক্ত বাস ভবনের বহু অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কাজি সাহেব একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।

বাঁধাপুকুর ও হামামখানা ঃ মৌলানা হাজি দানেশমন্দের ও মিঞা শা হজ্জৎ উল্লার বাসভবনের উত্তরে প্রায় ৭৫ ফিট্ দীর্ঘ এবং ৫০ ফিট্ প্রস্থ জলভাগময় একটি সুন্দর পুষ্করিণী রহিয়াছে। যখন এই সকল স্থান সৌধমালায় শোভিত ছিল, তখন এই পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্ব ইষ্টক-গ্রথিত সোপানাবলীতে পরিশোভিত ছিল। আজিও তাহার চিহ্ন বৰ্ত্তমান রহিয়াছে। আজিও জলের উপর ৩০ টি সোপান বৰ্ত্তমান রহিয়াছে। এই বাঁধা পুষ্করিণীর বিশেষ কোন নাম নাই। দেশের লোকে বাঁধাপুকুর বলিয়া থাকে। ইহার পূৰ্ব্বদিকে সুন্দর ইষ্টকময় হাউজখানা বা হামাম্খানা বিদ্যমান ছিল। এখন তাহার কতক চিহ্ন বৰ্ত্তমান রহিয়াছে। এই পুষ্করিণীর জল নলপথে উক্ত গৃহে প্রবেশ করিত। এই পুষ্করিণীর জল অন্য এক প্রকাণ্ড বাঁধান সুরঙ্গপথে মৃত্তিকা অভ্যন্তর দিয়া আট দশ রশি দূরে জল সরবরাহ করিত।

ফুলবাগ ঃ প্রবাদ,—মাইনে পুকুর, বাঁধাপুকুর ও ফুলবাগের পুকুর এই তিনটি পুষ্করিণীতে মৃত্তিকাভ্যন্তর দিয়া নলপথে জলের সংযোগ ছিল। বাঁধাপুকুর হইতে পূৰ্ব্বভাগে "ফুলবাগে" যাইবার পথ। বৰ্ত্তমানকালে ফুলবাগে আর ফুলগাছ নাই, ইক্ষুক্ষেত্র, আলুর ক্ষেত্র ইত্যাদিতে শোভিত রহিয়াছে। ফুলবাগে একটি ছোটখাট পুষ্করিণী আছে। তাহার উত্তর দিকের ঘাটটি বাঁধান ছিল। ঘাটটি প্রস্থে ৭১ ফিট্ ৬ ইঞ্চি। পুষ্করিণীর পশ্চিম ধারে একটি সুন্দর ইষ্টকগৃহ ছিল। সাধারণে সেই গৃহটিকে ফুলবাগের হাউজঘর বলিয়া থাকে। ফুলবাগের হাউজ ঘর ইহা অতি প্রাচীন। এই হাউজঘরটি দীর্ঘে ৫০ ফিট্ এবং প্রস্থে ৪০ ফিট্ মাত্র। পুষ্করিণীর দিকে হাউজগৃহের মধ্যগত একটি বাঁধান 'ইঁদারা' দেখা যায়। ইহা ইষ্টক ও লতাপাতায় বুজিয়া গিয়াছে।

ইদারার ব্যাস ৫′ পাঁচ ফিট্ ৮″ আট ইঞ্চি। হামামখানার পশ্চিমে ভিত্তিগাত্রে তিনটি মৃত্তিকানলের ছিদ্রমুখ পর পর উপরি উপরি বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখা যায়। উক্ত নল দিয়া হাউজঘরে ফোয়ারার জল উঠিত এবং তথা হইতে ফুলবাগে বিতরিত হইত। উক্ত নলের মুখের ব্যাস ৬″ ইঞ্চি।

গ্রামের পূর্ব্ব-দক্ষিণভাগ বেষ্টন করিয়া আসিবার সময় আমরা একটি নামহীন ভগ্ন মস্‌জিদ্ দেখিতে পাই। তথায় কয়েকটি বাঁধান কবর ছিল। তৎপরে পুনশ্চ, পুলিশ ষ্টেশনে আসিয়া বিশ্রামের পর অপরাহ্নে মঙ্গলকোটের উত্তরাংশ পরিভ্রমণে গমন করা গেল। কোয়ার সাহেবের মস্‌জিদ্‌রে উত্তর পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বমুখে সুউচ্চ ভূভাগের উপর দিয়া গমনকালে বহু বাসভবনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সম্মুখে একটি উন্মুক্ত উন্নত ক্ষেত্র, তথায় বৃক্ষাদি নাই। খোলামকুচি, ইটের কুচিতে সেই স্থানটি বিছান রহিয়াছে। ডাঙ্গার মধ্যস্থলে বৃষ্টির জলপরিমাণ-জ্ঞাপক যন্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে। এই স্থানটির নাম বিক্রমাদিত্যের ডাঙ্গা বা বিক্রমজিতের বাড়ী।

বিক্রমাদিত্যের ডাঙ্গা বা বিক্রমজিতের বাড়ী ঃ বিক্রমাদিত্যের রাজভবনের আর কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। চিহ্নগুলি বিবিধ কারণে কালের স্রোতে ধুইয়া মুছিয়া লইয়া গিয়াছে। কেবল স্মৃতি জাগাইবার জন্য নামটি বর্ত্তমান আছে। পতিত উন্নত ভূমিটির পরিমাণ আন্দাজ কুড়ি-পঁচিশ বিঘা হইবে। ইহার আয়তন আরও বৃহৎ ছিল, এই স্থলের অবস্থা দর্শনে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বিক্রমাদিত্যের বাসভবনের অধিকাংশ অংশ সাধারণের বাসভবনে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অনেক উদ্‌বাস্তু হইয়া পড়িয়া আছে। চতুর্দ্দিক্ ঘুরিয়া দেখিলে বোধ হয়, অনুমান দুই শত বিঘা লইয়া একটি বাড়ী ছিল। গ্রামবাসীর অধিকারে আসিতে আসিতে এই সামান্য মাত্র স্থান পতিত রহিয়াছে। এই স্থানের উত্তর-পশ্চিমাংশ আরও উচ্চ, তথায় ইষ্টক-মণ্ডিত কতকগুলি সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে নাকি গজন্‌বী গাজী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন।

গজন্‌বী গাজী ঃ উক্ত স্থানে গজন্‌রী গাজী ও তাঁর পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ সমাহিত করা হইয়াছে। ইহাও বিক্রমাদিত্যের গড়ের এক অংশ। এই বিক্রমাদিত্যের বাড়ী নামক ডাঙ্গাটি মঙ্গলকোটের অর্থাৎ প্রাচীন গড়বেষ্টিত স্থানের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে রাজার প্রাসাদ ছিল। এই রাজপ্রাসাদ মঙ্গলকোট নামক দুর্গ দ্বারা অভিরক্ষিত ছিল।

“উজানি নগর অতি মনোহর
বিক্রম কেশরী রাজা।”

এই সেই উজানিনগব বিক্রমকেশরীর রাজবাড়ীতে আমরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। উজানির “মঙ্গলকোট” নামক দুর্গ অধিকার করিবার জন্য সপ্তদশ গাজী বা পীরের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে মঙ্গলকোট মোসলমানের হস্তগত হয়।

সপ্তদশ গাজী বা পীর ঃ মঙ্গলকোটের অধিবাসিগণ বর্ষাকালে বা খুব এক পসলা বৃষ্টি হওয়ার পর এই রাজবাড়ীর উপর, পথে-ঘাটে সোণা খুঁজিয়া বেড়ায়। অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণকণা প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে অনেকে অনেক প্রকার ধাতব দেব-দেবী-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই স্থান হইতে বা মঙ্গলকোটের বহু স্থান হইতে অনেকে অনেক অর্থও প্রাপ্ত হইযাছে। এই বিক্রমাদিত্যের ডাঙ্গা বা বাড়ী খনন করিলে বহু প্রাচীন নিদর্শন প্রাপ্তির সম্ভব রহিয়াছে। উচ্চ ভূখণ্ড হইতে জল গড়াইযা নিম্নভূমিতে পড়াতে অনেক স্থানের মৃত্তিকা কর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। উন্নত ডাঙ্গা কাটিয়া একটি পথও নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই পথের ধারে ডাঙ্গার একাংশে প্রাচীন প্রথায় গ্রথিত ইষ্টকের সুবৃহৎ স্তূপের নিম্নভাগ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, দেখা গিয়াছে। এই স্থানের সুবৃহৎ ইষ্টকালয় থাকার ইহাই একটি চিহ্ন বলিতে হইবে। এই ডাঙ্গাটি অন্য জমি হইতে বিশ ফিট্ উচ্চ হইবে এবং যে অংশে কবর রহিয়াছে, সেই অংশের উচ্চতা ত্রিশ ফিটের কম হইবে না।

মজলিসদীঘি ঃ বামে 'ভাদুপাড়' দৃষ্ট হয়। উত্তর মুখে রশি পথ অতিক্রম করিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তীর্ণ একটি প্রকাণ্ড দীঘি দেখা গেল। তাহা যথেষ্ট জলচর পক্ষীতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই দীঘির নাম মজলিসদীঘি।

এই মজলিসদীঘির পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া উত্তরমুখে দীঘি অতিক্রম করিলেই সম্মুখে উন্নত ভূখণ্ডের উপর সুবৃহৎ একটি ভগ্ন মস্‌জিদ্ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মস্‌জিদের উপর বটতরু বিরাজ করিতেছে। এই মস্‌জিদের নাম বড়বাজারের মস্‌জিদ্ বা হোসেনশাহী মস্‌জিদ্।

বড়বাজারের মস্‌জিদ্ বা হোসেনশাহী মস্‌জিদ্ ঃ প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ফিট্ উচ্চ ভূখণ্ডোপরি লোহিতবর্ণের এক বৃহৎ মস্‌জিদ্ ছাদহীন প্রায় ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণের মস্‌জিদ্‌গাত্র ধূলিতে মিশাইয়া গিয়াছে।

রাজদীঘি ঃ উক্ত মস্‌জিদের সম্মুখে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে রাজদীঘি নামক একটি চতুষ্কোণ বৃহৎ পুষ্করিণী বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া কাটোয়া গমনের পাকা রাস্তা প্রসারিত রহিয়াছে। মস্‌জিদ্‌টি যে স্থলে নির্ম্মিত হইয়াছে এই স্থানটি উন্নত করিবার জন্য রাজদীঘির কর্ত্তনকালে সমুদায় মাটী পশ্চিম পাহাড়েই জমা করা হইয়াছিল। অন্য তিনটি পাড়ে আদৌ মাটীর স্তূপের চিহ্ন নাই।

মস্‌জিদ্‌টি চতুষ্কোণ, সম্মুখে ও পশ্চাতে পাঁচটি করিয়া খিলান বিদ্যমান রহিয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তরদিকের দেওয়ালে দুইটি করিয়া দ্বার ছিল। সম্মুখভাগের দেওয়ালের বাহির দিকে বিবিধ প্রকারের খোদিত ইষ্টক-সমবায় আম্রশাখা ও লতা-পুষ্প-পাতার আকৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে। মস্‌জিদের এই সব অলঙ্কার এখন একে একে খসিয়া পড়িতেছে। গত ভীষণ ভূমিকম্পে এই মস্‌জিদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

প্রত্যেক খিলানের অধোদেশে পাথরের "হাসকল" ও কবাট পরাইবার স্থান-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কপাট দ্বারা মস্‌জিদের প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া রাখা হইত।

খিলানগুলি প্রায় ১৫ ফিট্ উচ্চ। উত্তরদিকের খিলানটি পড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যেক খিলানের অভ্যন্তরদেশ সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট। অভ্যন্তরদেশ ইষ্টক দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহার উৰ্দ্ধে প্রস্ফুটিত পদ্ম খোদিত রহিয়াছে। দুই খিলানের মধ্যস্থিত প্রাচীরগাত্রের স্তম্ভ প্রস্তর দ্বারা গঠিত। স্তম্ভের পাদদেশে একখানা প্রশস্ত প্রস্তর. তাহার উপরে তদপেক্ষা আকৃতিতে ছোট আর একখানা প্রস্তর। এইরূপ পরস্পর প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত প্রস্তরের সমষ্টিতে সমস্ত স্তম্ভগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তম্ভসকলের পাদদেশের প্রস্তরগুলি গৃহতলের উপর স্থাপিত এবং তাহার সমসূত্রে আর একসারি প্রস্তর ভিত্তিগাত্রে সংবদ্ধ থাকিয়া গৃহতলের চতুৰ্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এইরূপভাবে আর এক সারি প্রস্তর স্তম্ভসকলের শিরোদেশস্থ প্রস্তরের সমান্তরালে চতুর্দ্দিকের প্রাচীরের গাত্রে বিদ্যমান ছিল। ভিত ৭' সাত ফিট্ ৩" ইঞ্চি পুরু। এই মসজিদ্‌টি দীর্ঘে ৯১' ফিট্ ও প্রস্থে ৪১' ফিট্; চারি কোণে চারিটি মিনারেট ছিল। মস্‌জিদের অভ্যন্তরভাগে দেওয়ালগাত্রে কয়েকটি ফুলুঙ্গী ছিল।

এই মস্‌জিদে যে সমুদায় প্রস্তর ব্যহৃত হইয়াছে, তাহা এক শ্রেণীর নহে এবং সমস্ত প্রস্তরগুলি সমানভাবে মসৃণ করা হয় নাই। প্রস্তরগুলির আকৃতি ও গঠন দেখিলেই মনে হইবে, ইহা এই মস্‌জিদের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। পূর্ব্বে এই সমুদায় প্রস্তর অন্য কোন গৃহে ব্যবহার করা হইয়াছিল। তথায় বিভিন্ন উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ প্রস্তরসমূহের ব্যবহার হইয়াছিল। এ স্থানে আনিয়া মস্‌জিদের উপযোগী করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা যথাযথস্থানে সংবদ্ধ করা হয় নাই।

চন্দ্রসেন রাজাব নামাঙ্কিত শিলাফলক ঃ মস্‌জিদের সম্মুখভাগের অভ্যন্তরদিকে, মধ্যপ্রবেশদ্বারের বামদিকের স্তম্ভের পাদদেশের প্রস্তরখণ্ডে "শ্রীচন্দ্রসেন নৃপতি"র নাম প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। এইরূপ অক্ষরমালা-খোদিত আর চারিখানি প্রস্তর উক্ত মস্‌জিদ্-অভ্যন্তরের দেওয়ালস্থিত প্রস্তরে দেখা গিয়াছে। বোধ হয় একখানা প্রকাণ্ড প্রস্তরে শ্রীচন্দ্রসেন রাজার একটি খোদিত লিপি পূর্ব্ববর্ত্তী কোন দেবালয়ের কোন প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ ছিল। মোসলমানগণ তাহা ভাঙ্গিয়া. কয়েক খণ্ডে বিভাগ করিয়া বর্ত্তমান মস্‌জিদ্ নিৰ্ম্মাণ কালে ব্যবহার করিয়াছিল। এই অক্ষর মালাখোদিত প্রস্তরখণ্ডগুলি মস্‌জিদের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য শিল্পিগণ পল তুলিতে গিয়া অক্ষরমালার অধিকাংশ কৰ্ত্তন করিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে। যাহা সামান্য অবশিষ্ট আছে, তাঁহা হইতেই শ্রীচন্দ্রসেন নৃপতির নাম উদ্ধার হইয়াছে।

মিহ্‌রাব ঃ পশ্চাদ্ভাগের দেওয়ালের ভিতরদিকে তিনটি মিহ্‌রাব আছে। মিহ্‌রাবের কতক অংশ প্রস্তরে ও কতক অংশ ইষ্টকে নির্ম্মিত। ইহা একার্দ্ধ কর্ত্তিত গম্বুজের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং ইষ্টকময় প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প দ্বারা সুশোভিত। নীচে এক সারি কল্‌কা ও তন্নিম্নে দুই সারি চৌখুপী কাজ করা আছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকের মিহ্‌রাব দুইটি সম্পূর্ণভাবে ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত এবং পূর্ব্ববৎ কারুকার্য্যে শোভিত।

গাড়ার গাঁথুনি ঃ মস্‌জিদের দেওয়ালের মধ্যভাগ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইষ্টকরাশি দিয়া পূর্ণ করা হইয়াছিল এবং উক্ত অংশের গাঁথুনির জন্য 'খোলাম্‌কুচি'-বিশিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবহার হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে উক্ত অংশে চিত্রবিচিত্র করা পূর্ণ ও সমস্থল ইষ্টকও দেখা যায়।

এই মস্‌জিদে আরবী ও পারসী ভাষায় লিখিত কোন লিপি দৃষ্ট হয় না। মঙ্গলকোটের বৃদ্ধ মৌলবী মহম্মদ ইস্‌মাইল সাহেব বলেন যে, এই মস্‌জিদের শিলালিপিটি সাজাহানের সময়ে নির্ম্মিত মস্‌জিদে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত শিলালিপির কথা বলা হইয়াছে। উহা সুলতান্ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে ৯১৬ হিজরিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মস্‌জিদ্‌টির নির্ম্মাণ প্রণালী দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, উহা বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান্‌গণের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহা হোসেন শাহ বা নসরৎ শাহ এতদুভয়ের রাজত্বকালে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় দেখা যায় যে, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ব্লকম্যান কর্ত্তৃক মঙ্গলকোট হইতে একটি শিলালিপি সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে লিখিত আছে যে, ৯৩০ হিজরিতে মহম্মদ নসরৎ শাহের রাজত্বসময়ে মিএগ্রা মুয়জ্জম কর্ত্তৃক একটি মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খোদিত লিপি ঃ মঙ্গলকোটের প্রান্তস্থিত বড়বাজার বা নূতন হাটের মস্‌জিদের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই মস্‌জিদ্‌মধ্যে চন্দ্রসেন নামক জনৈক রাজার নামাঙ্কিত খোদিত লিপিযুক্ত কয়েকখণ্ড প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। মস্‌জিদের প্রত্যেক খিলানের পার্শ্বে যে দুইটি স্তম্ভ আছে, তাহা ইষ্টকনির্ম্মিত, তবে যে স্থানে খিলানের ইষ্টক শেষ হইয়াছে, সেই স্থানে এক এক খণ্ড প্রস্তর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রস্তরগুলিতে স্থানে স্থানে খোদিত লিপি আছে। খোদিত লিপিগুলির অধিকাংশই অস্পষ্ট; অনুমান হয়, যে স্থানে মস্‌জিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই স্থানে পূর্ব্বে কোন দেবালয় ছিল, *তাহারই খোদিত শিলাফলকখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া মস্‌জিদ্-নির্ম্মাণকালে ব্যবহার* হইয়াছে। নূতন হাট বা বড়বাজারের মস্‌জিদ্‌টি একটি উচ্চ মৃৎপিণ্ডের উপরে নির্ম্মিত, চতুঃপার্শ্বস্থিত সমতল হইতে বিংশতি হস্ত উচ্চে ইহার ভিত্তি অবস্থিত। ইহার সম্মুখে

ও দক্ষিণ পার্শ্বে অনেকগুলি উচ্চ মৃৎপিণ্ড ও বৃহৎ বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। তিন খণ্ড প্রস্তরের খোদিত লিপি এখনও পাঠ করা যায় ঃ—

(ক) ১। .... শ্রীচন্দ্রসেন নৃপ ত (?) রণ সেন্ নাম্না

২। ... ... শ্রী [... ... ...

বাঙ্গালার ইতিহাসে চন্দ্রসেন রাজার নাম নূতন। ইতিপূর্ব্বে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বা খোদিত লিপি হইতে চন্দ্রসেনের নাম পাওয়া যায় নাই। নতুন হাটের মস্‌জিদের খোদিত লিপি হইতে তাঁহার অস্তিত্বমাত্র প্রমাণিত হইতেছে, তাঁহার বংশ-পরিচয় ও তারিখ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার উপায় নাই। ভরতমল্লিক-প্রণীত "চন্দ্রপ্রভা" নামক বৈদ্যকুলগ্রন্থে চন্দ্রসেন নামক একজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়—

"ধন্বন্তরিকুলে বীজী রাজা বিমলসেনকঃ।
তস্য বংশাবলী বক্ষ্যে সেনভূমিনিবাসিনঃ।।
একো বিমলসেনস্য পুত্রোঽভূৎ পরমেশ্বরঃ।
পরমেশ্বরতো জজ্ঞে বাসুদেবো গুণিপ্রিয়ঃ।।
চিকিৎসাকার্য্যনৈপুণ্যাৎ শিখরেশাশ্রয়ং গতঃ।
সম্মানপূর্ব্বকং তেন স্থাপিতোঽয়ং মহীভূজা।।
বাসুদেবস্য তনয়োঽনন্তসেন ইতি স্মৃতঃ।
উভাভ্যাং শস্ত্রশাস্ত্রাভ্যাং পণ্ডিতো রাজপূজিতঃ।।
তস্যৈবানন্তসেনস্য নাথসেনঃ সুতোঽজনি।
বাঙ্গকুমারসংসর্গাদস্ত্রবিদ্যাবিশারদঃ।
তস্যাস্ত্রবিদ্যামালোক্য প্রীতোঽভূৎ শিখরেশ্বরঃ।
হরিশ্চন্দ্রো দদৌ তস্যৈ তদ্দেশস্যৈকরাজতাম্।।
ততঃ পূর্ব্বার্জ্জিতং দেশং বিহায় খণ্ডসাধিতম্।
পাহাড়দেশখণ্ডে চ নাথসেনোঽভবন্নৃপঃ।।
তদীয়াঃ পূর্ব্বপুরুষাঃ রাজানস্তত্র চ স্থিতাঃ।
ইতি মত্বাভবদ্রাজা নাথসেনোঽতিষত্নতঃ।।
নৃপতের্নাথসেনস্য পুত্রো বিজয়সেনকঃ।
স এব সর্ব্বসংগ্রামে মহারাজোঽভবদ্বলী ।।
রাজ্ঞো বিজয়সেনস্য তনয়ৌ দ্বৌ বভুবতুঃ।
চন্দ্রবচ্চন্দ্রসেনোঽ ভূদ্‌বুধসেনো বুধোপামঃ।।"

বাঙ্গালা বিশ্বকোষে তিন জন চন্দ্রসেনের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একজন হোমচার্য্য সুরির শিষ্য, দ্বিতীয় অশ্বত্থমার হস্তে নিহত হন এবং তৃতীয় পরশুরামের সমসাময়িক।

খোদিত লিপির অক্ষরগুলি খৃষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষরমালার অনুরূপ।

(খ) ১। ... গ ... ন্যায়সঃ (?) ি... বাগ ... ... তে ম ...

২। ... সু ... ম্যান্তিথৌ যাব

৩। স্রী ... করকে ঠী

খোদিত লিপির এই অংশে তারিখ ছিল, প্রস্তরখণ্ডকর্ত্তনকালে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(গ) ১। ... ষ্য নি ...

২। ... ষাং পমি ...

৩। চর্য্য সহি ...

(ঘ) ১। ... মণ্ডলপদ্ধতি ...

২। ... মায়াব (?) হেতুম ...

নূতন হাটের মস্‌জিদের সম্মুখে যে দীঘি আছে, তাহার অপর পার্শ্বে একটি দরগা আছে। এই দর্‌গার সোপানে খোদিত লিপিযুক্ত একখণ্ড প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

(ঙ) ১। ... দ আ

২। নী

মৌলনা হামিদ দানেশমন্দের সমাধির সম্মুখে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন্ হোসেন সাহের রাজ্যকালে হিজরি ৯১৬ অব্দের খোদিত লিপির অনুবাদ;

"ঈশ্বর বলিয়াছেন ... ... সৎ ...

মাননীয় আলাউদ্দুনিয়া ও অদ্দিন আবুল মজফ্‌ফর হুসেন শাহ সুলতান, হংসেনবংশীয় সৈয়দ আস্‌রফের পুত্র, ভগবান্ তাঁহার রাজত্ব ও গৌরব চিরস্থায়ী করুন। ৯১৬ সালে নির্ম্মিত হইল।"

মৌলনা হামিদ দানেশমন্দের সমাধির পার্শ্বে একটি পুরাতন মস্‌জিদের ভিত্তির উপরে মৌলবী মহম্মদ ইস্‌মাইলের যত্নে যে নূতন মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার দ্বারের উপরে পুরাতন মস্‌জিদের খোদিত লিপিটি গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে।

খোদিত লিপির অনুবাদ,—

"ঈশ্বরের প্রেরিত (তাঁহার উপরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হউক) বলিয়াছেন—যে কেহ ঈশ্বরের নিমিত্ত কোনও মস্‌জিদ্ (উপাসনাস্থান) নির্ম্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার জন্য স্বর্গে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন। এই মস্‌জিদ্ দ্বিতীয় সাহেব করাণ সম্রাট্ সাহেব-উদ্দীন মহম্মদ শাহজহান বাদশাহ গাজির রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। যদি ইহার নির্ম্মাণের তারিখ তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে উহাকে বয়তুল আতিক বলিবে বলিয়া সম্বোধন করিবে, হিঃ ১০৬৫।"

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পুরাতন মস্‌জিদ্‌টি ১০৬ হিজরি অর্থাৎ ১৬৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ডাক্তার এইচ্ ব্লকম্যান মঙ্গলকোটে আর একখানি খোদিত লিপি আবিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।[২] আমরা অনেক সন্ধান করিয়াও এই খোদিত লিপির সন্ধান পাই নাই।

খোদিত লিপির অনুবাদ,—

ঈশ্বরের প্রেরিত (তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন হউন) বলিয়াছেন,—"যে কেহ ঈশ্বরের নিমিত্ত কোনও মস্‌জিদ্ (উপাসনাস্থান) নির্ম্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার নিমিত্ত সেই প্রকারেব একটি গৃহ স্বর্গে নির্ম্মাণ করিবেন। এই জামেমস্‌জিদ্ হুসেন সাহের পুত্র প্রশংসিত সুলতান্, সুলতানের পুত্র সুলতান্ নাসের উদ্দুনিয়া ও অদ্দিন আবুল মজফ্‌ফর নসরৎ শাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত। ঈশ্বর তাঁহার রাজত্ব ও প্রাধান্য চিরস্থায়ী করুন। ইঁহার নির্ম্মাণকারী খান্ মিয়া মুয়জ্জম, মোরাদ হায়দর খানের পুত্র, তাঁহার সম্ভ্রম বৃদ্ধি হউক, নয় শত ত্রিশ সালে নির্ম্মিত।"

বন্ধুবর মৌলবী শ্রীযুক্ত আবুল মজফ্‌ফর জামালুদ্দিন মহম্মদ অনুগ্রহ করিয়া আরবীতে খোদিত লিপিগুলির অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন।

২. A.S.B., 1896 pt.I.P. 296

শূরনগর

শ্রী অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী

রাঢ়দেশে (বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অধীন "শূড়রো" গ্রামে) ভাগীরথীতীর সন্নিকটে "শূরনগর" নামে একটী সমৃদ্ধিশালী নগরে আদিশূরের এক রাজধানী ছিল। স্থানীয় জনপ্রবাদ ও বর্ত্তমান কালে উক্ত শূরনগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও সেই গত স্মৃতি উজ্জ্বল রাখিয়াছে। এই শূরনগর দৈর্ঘ্যে প্রায় আট মাইল এবং প্রস্থে ৪।৫ মাইল বিস্তৃত ছিল।

এক্ষণে ধ্বংসাবশিষ্ট শূরনগরে ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। শূরনগরে যে স্থানে আদিশূরের রাজপ্রাসাদ ছিল, সেই স্থানটী এক্ষণে শূরো বা শূড়রো নামে, যে স্থানে ধনাগার ছিল তাহা গড় সোণাডাঙ্গা নামে, যে স্থানে কারাগৃহ বা ভাটের বাস ছিল তাহা বোঁদপুর (বন্দীপুর) নামে, যে স্থানে নগরের প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল তাহা দ্বারী; বা দুয়ারি নামে, যে স্থানে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বংশধরগণকে সঙ্গে আনিয়া প্রথম অবস্থান করাইয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মপুর নামে, এইরূপে কান্যকুব্জাগত ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষপুত্র বরাহ রাইগ্রাম নামক যে গ্রামখানি পাইয়াছিলেন, তাহা এখনও রাইগ্রাম নামে পরিচিত। (এই রাইগ্রামেই আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত শ্রী শ্রী ঁবরাহগোপাল দেবের অতুলনীয় মন্দির ছিল।) এতদ্ব্যতীত শূরনগরের সীমার মধ্যে হাজরাপুর ও মথুরা নামক দুইখানি গ্রাম আছে এবং রাউৎগ্রাম নামক একখানি গ্রামে আদিশূরের শ্রী শ্রী ঁসর্ব্বমঙ্গলা দেবী আছেন। গোকর্ণ গোহালবাটী বা গোরু থাকিবার স্থান এবং মনোহরগঞ্জে বাজার[১] ছিল। ভাতশালা গ্রামে অতিথিশালা ছিল। এই শূড়রো গ্রামে আদিশূরের রাজপ্রাসাদের ভিত্তিচিহ্ন, প্রাসাদ-অভ্যন্তরস্থিত কয়েকটী কূপ এবং শ্রী শ্রী ঁহনুমানজী দেবের ভগ্ন শ্রীবিগ্রহ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। গড়-সোণাডাঙ্গায় একটী গড়ের চিহ্ন আছে। শূড়রো হইতে এক মাইল দূরে "শালিটা" "শালকোন" দীঘি অদ্যাপি রাজা আদিশূরের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দীঘি দুইটী এত বৃহৎ যে, লোকে তাহাদিগকে "বিল" বলিয়া থাকে। শালিটা দীঘির চারিদিকের পাহাড় এখনও রীতিমত বাঁধা আছে। এক স্থানে একটী বাঁধা ঘাটের

১. এই মনোহরগঞ্জ ও গোহালবাটীতে পরে দিল্লীর বাদশাহের মুন্সি ঁঅতিরামবসু বাসভবন ও গোহালবাটী করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি ব্রহ্মপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধর মুন্সি মহাশয়েরা এখনও এই ব্রহ্মপুরে বাস করিতেছেন।

চিহ্নও দেখা যায়। এই প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খননকালে খননকারী মজুরগণ (কোঁড়ারা) যে স্থানে বাস করিয়াছিল তাহা অদ্যাপি "কোঁড়াপুর" নামে পরিচিত। সম্প্রতি কাঁটোয়ার উত্তরে সীতাহাটী ও নৈহাটির নিকট প্রাপ্ত বল্লালসেনের তাম্রশাসন[২] পাঠ করেন এবং পরে তাঁহারা তাঁহাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভবিষ্যতে অন্য কোন মুসলমান যাহাতে সেইরূপ ভ্রমে পতিত না হয়, তজ্জন্য মন্দিরটী ধ্বংস করিয়া ফেলেন এবং মন্দিরশীর্ষে সংলগ্ন উক্ত ভানুপ্রভ প্রস্তরখানি লইয়া যান। মুসলমানগণ মন্দির ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করিলে ৺বরাহগোপালদেবের সেবাইত ব্রাহ্মণ গোপনে কোনরূপে শ্রীবিগ্রহটী লইয়া রাইগ্রামের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত কাইগ্রামে পলায়ন করেন। সেই ব্রাহ্মণের বংশধরগণ আজ পর্য্যন্ত কাইগ্রামে সেই দেবসেবা করিতেছেন।

এই রাইগ্রামে এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলায় মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বরাট মহাশয়ের জমিদারীর অন্তর্ভূত। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, সম্প্রতি এই দেবমন্দিরের পবিত্র ধ্বংসাবশেষের উপর মুসলমানেরা তাহাদের মৃতদেহ কবর দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশা করি, বৈকুণ্ঠবাবু স্থানীয় অতীত কীর্ত্তি উদ্ধারকল্পে মনোযোগী হইবেন।

রাইগ্রামনিবাসী মুসলমানদের নিকট এই মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহারা বলেন, আমরা বংশানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছি যে, "উহা আওউল রাজার গোপালমুন্দির।" ("আউল" অর্থে আদি বা প্রথম।)

এই রাইগ্রামে এক্ষণে পীর গোরাচাঁদ সাহেবের একটী প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির আছে। কথিত আছে, অদিশূরের ভগ্ন মন্দিরের অনেক উপাদান দ্বারা এই সমাধিমন্দির আকবরের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের দ্বারের উপরিভাগে স্থাপিত একখানি প্রস্তরফলকে পার্শি ভাষায় কিছু লিখিত আছে। উপযুক্ত মৌলবীর অভাবে পাঠোদ্ধার করাইতে পারি নাই। পূর্ব্বে যে স্থানে শূরনগর ছিল, তাহার মধ্য দিয়া এক্ষণে "খড়ী" বা "খড়োশ্বরী" নামে একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নদী ছিল না। রাইগ্রামের প্রান্তবাহিনী নদী এবং বেহুলা নদী মজিয়া যাওয়ায়, আনুমানিক ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মানকর-মাড়ো হইতে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র জলস্রোত এই খড়োশ্বরী বা খড়ী নদীতে পরিণত হইয়াছে।

২. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৭শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

স্থান-পরিচয়

শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু

কাঁটোয়া

কাঁটোয়া বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে একটী অতি প্রাচীন বন্দর। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক আরিয়ানের গ্রন্থে কাঁটাদীয়া বা কন্টকদ্বীপের অপভ্রংশে 'কাঁটাদুপা' (Katadupa) নামে এই স্থান পরিচিত হইয়াছে। গঙ্গা ও অজয়-নদের সঙ্গমে অবস্থিত বলিয়া পূর্ব্বকালে দূরদেশ হইতে সমুদ্রপোত বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া এখানে আগমন করিত। যদিও এখানে এখনও জেলার মহকুমা থাকায় এই স্থান এককালে শ্রীহীন হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বকালের তুলনায় প্রাচীন সমৃদ্ধির কিছুই নাই। পূর্ব্বতন কীর্ত্তিরাশির অধিকাংশই গঙ্গা ও অজয়ের গর্ভশায়ী। পূর্ব্বে এই স্থান 'কাঁটাদীয়া' নামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের একটী প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। মুসলমান-বিপ্লবে সেই সমাজ ভঙ্গ হয়। এই স্থানের সমৃদ্ধি ও অবস্থান লক্ষ্য করিয়া নদীয়া-বিজয়ের পরই মুসলমানেরা এখানে আসিয়া কেন্দ্র স্থাপন করেন। তজ্জন্য ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনেকে পূর্ব্ববঙ্গ আশ্রয় করেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়কালে এই স্থানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের আশ্রম ছিল। মহাপ্রভু এই কাঁটোয়ায় আসিয়া কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষিত হন। তাহার স্মৃতি লইয়া বর্ত্তমান কাঁটোয়া সহরে 'মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের বাড়ী' বলিয়া একটী বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরটি বেশীদিনের প্রাচীন না হইলেও তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন স্মৃতি এখনও বিদ্যমান। এই গৌরাঙ্গ-বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই পশ্চিমদিকে মহাপ্রভুর মস্তকমুণ্ডনের স্থান। এখানে অনেক বৈষ্ণব ভক্ত আসিয়া মাথা মুড়াইয়া কেশ দিয়া যান। এই মুণ্ডন স্থানের পূর্ব্বদিকে মহাপ্রভুর কেশ-সমাধি ও গদাধর দাসের সমাধি রহিয়াছে। গদাধর দাস জাতিতে কায়স্থ, বাটী আঁড়িয়াদহ। তিনি চৌষট্টি মোহন্তের মধ্যে একজন। ভক্তিরত্নাকরে তাঁহার পরিচয় আছে। তিনিই এখানকার গৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গদাধর দাসের সমাধি ছাড়াইয়া বামদিকে ঘেরা প্রাচীর মধ্যে কেশব ভারতীর সাধনা ও সিদ্ধি-স্থান। তথায় মহাপ্রভুর দীক্ষার আসন, গুরু-শিষ্যের পদচিহ্ন ও তাহার সম্মুখে মধু নাপিতের সমাধি আছে। দীক্ষা-স্থানের পশ্চিমে এখানকার গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবাইত বেণীমাধব ঠাকুরের সমাধি। তৎপরে বাড়ীর ভিতর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে গদাধর দাস-প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুব মূর্ত্তি। তাঁহার পার্শ্বে পরবর্ত্তী কালে প্রতিষ্ঠিত নিত্যানন্দের মূর্ত্তি আছেন। মহাপ্রভুর প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গত ১২৮৮ সালে সেই প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে।

ইহার সম্মুখে নাটমন্দির ও পার্শ্বে ভোগমন্দির। গদাধর দাস তাঁহার প্রিয় শিষ্য যদুনন্দন ঠাকুরকে-গৌরাঙ্গের সেবার ভার দিয়া যান। এই যদুনন্দন ঠাকুরই প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব-গ্রন্থরচয়িতা। যদুনন্দন ঠাকুরের বংশধর রাঢ়ীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণগণই এখানকার সেবাইত। ভেট দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা চলে, কোন দেবোত্তর নাই। গৌরাঙ্গ -বাড়ী ছাড়াইয়া কিছু দূর গেলে গঙ্গা-অজয়-সঙ্গম। এই সঙ্গম ছাড়াইয়া কিছু দূর আসিয়া গৌরাঙ্গ-ঘাট, এখন সেই প্রাচীন স্থান গঙ্গা-গর্ভে। এই খানেই কেশব ভারতীর আশ্রম ছিল। এই স্থান ছাড়াইয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে মাধাই-তলা।

কাঁটোয়া সহর মধ্যে বড়-প্রভুর আখড়া, ফরুখ্‌শিয়ারের মস্‌জিদ ও গড়খাই[১], পলাশী যাইবার সময় ক্লাইব যেখানে শিবির করিয়াছিলেন, সেই স্থান এবং কেরি সাহেবের কুঠী—এই গুলি দেখিবার জিনিস।

দাঁইহাট

কাঁটোয়া সহরের সাড়ে চারি মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে দাঁইহাট। এক সময় কাঁটোয়া হইতে দাঁইহাট পর্য্যন্ত একটী বৃহৎ সংলগ্ন সহর ছিল ও লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল। অদ্যাপি সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির ক্ষীণ স্মৃতি বর্ত্তমান দাঁইহাট হইতে কাঁটোয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমান। এক সময় যে এই স্থান মধ্যে কত হাট, কত মন্দির, কত ঘাট ছিল, অদ্যাপি সেই সমুদায়ের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের অদূরে কাঁটোয়া হইতে দাঁইহাট যাইবার রাস্তার ধারে পড়িয়া রহিয়াছে। এক সময় এই স্থানেই ইন্দ্রাণী পরগণার কেন্দ্র ছিল। তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে কবি কাশীরাম এই ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।।"

এই দ্বাদশ তীর্থের মধ্যে অধিকাংশ কাঁটোয়া হইতে দাঁইহাট আসিবার রাস্তার ধারে অবস্থিত ছিল, এখন সেই তীর্থের ঘাট বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে, গঙ্গা তাহার এক মাইলেরও বেশী দূরে সরিয়া গিয়াছেন। কাঁটোয়া হইতে আসিবার সময় ঘোষহাটে ঘোষেশ্বর, পাতাই-হাটে পাতাই-চণ্ডী ও একাই-হাটে একাই চণ্ডী প্রথমে নয়নগোচর হয়। ইন্দ্রাণী পরগণার রাজা ইন্দ্রেশ্বর গঙ্গাতটে যে সুবৃহৎ শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মুসলমান হস্তে তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছে। যেখানে সেই শিব-মন্দির বা রাজবাটী ছিল, সেই স্থান আজও "রাজার ডাঙ্গা" নামে পরিচিত। তাহার নিকটে একটি মজ্‌জিদ রহিয়াছে। এই মস্‌জিদের সম্মুখে ইন্দ্রেশ্বরের দ্বারের চৌকাটের মাথার

১. গেজেটিয়ারে উক্ত গড় ও মস্‌জিদ মুর্শিদকুলী খাঁর (ওরফে জাফর খাঁর) কীর্ত্তি বলিয়া ধরা আছে। (Burdwan District Gazetteer, 1910, p. 200) কিন্তু কাটোয়াবাসী ইহাকে ফরুখ্‌শিয়ারের কীর্ত্তি বলিয়াই জানে।

প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। এই সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে দেড় ফুট, ইহার মধ্য ভাগে এক দ্বিভুজ গণেশ মূর্ত্তি। এই সুন্দর ও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইন্দ্রেশ্বরের প্রস্তরমন্দির কত বৃহৎ ও কিরূপ সুন্দর ছিল! উক্ত মসজিদের ভিত্তি ও প্রাঙ্গণে এখনও পূর্ব্বতন প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন-স্বরূপ কত কাটা-পাথর রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই ইন্দ্রেশ্বরের অতীত গৌরবের কতকটা সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। ঐ স্থানের পার্শ্ব দিয়া যে ভাগীরথী বহিতেন—এখন তিনি প্রায় এক মাইলেরও বেশী দূরে সরিয়া গিয়াছেন। মস্‌জিদ হইতে ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জনসাধারণে'ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট' দেখাইয়া থাকেন। এখানে প্রাচীন ইষ্টক-স্তূপ রহিয়াছে। আজও কেবল 'ইন্দ্রদ্বাদশীর দিন ইন্দ্রেশ্বরের ঘাটে বহু যাত্রী স্নান করিতে আসেন। মস্‌জিদ, তাহার নিকটস্থ 'রাজার ডাঙ্গা' এবং 'ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট' পুরাবিদ্‌গণের অনুসন্ধেয় প্রাচীন স্থান।

ইন্দ্রেশ্বরের ঘাটের নিকট সিদ্ধেশ্বরী-তলার মধ্যে রামানন্দের পাট। সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের উত্তরে রামানন্দ সিদ্ধি লাভ করেন। এখানে তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে। এই রামানন্দই "শ্যামা দিগম্বরি রণমাঝে নাচো গো মা!" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গান-রচয়িতা। মন্দিরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে "কেশেগ'ড়ে"। এখানকার কেহ কেহ এই কেশেগ'ড়কে কাশীরাম দাসের স্মৃতি-জ্ঞাপক মনে করেন, কিন্তু কাশীরামের জন্মস্থান সিঙ্গি গ্রাম এই স্থান হইতে বহু দূর।

বর্ত্তমান দাঁইহাটের উত্তরাংশে দেওয়ানগঞ্জ। পূর্ব্বে এখানে বহুলোকের বসতি ও একটী বৃহৎ হাট ছিল। এখনও এখানে অনেক বড় বড় ভাঙ্গা বাড়ী পড়িয়া আছে। হাটও দাঁইহাট গ্রামের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে। গঙ্গাও এখান হইতে ১ মাইলের উপর সরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেওয়ানগঞ্জের হাটের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা বহিতেন এবং এই স্থানে বহুলোকের বাস ও যথেষ্ট জাঁকজমক ছিল। বিজয়রাম বিশারদের তীর্থমঙ্গল গ্রন্থ হইতে তাহার বেশ পরিচয় পাইয়াছি। সে সময়ে এখানে 'মাণিকচাঁদের ঘাট' প্রসিদ্ধ ছিল।[২] এখানকার স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায় যে, এখানে 'পাতালঘর' আছে। পূর্ব্বে বড় বড় পাথরের মন্দির ছিল, তাহারই কতক অংশ লইয়া বর্ত্তমান 'বদরশার কবর' প্রস্তুত হইয়াছে। এই দরগার সম্মুখ-দ্বারে প্রাচীন দেবমন্দিরের শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত প্রস্তর বিদ্যমান, তাহা দেখিলেই প্রাচীন হিন্দু মন্দিরেরই নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়। একটী বৃহৎ-স্তূপের উপর বদরশার দরগা উঠিয়াছে। ইহার নিকট এখনও বহু পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে। ঐ দরগার সেবাইত আমায় জানাইলেন যে, বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান মাণিকচাঁদ বদরশাই আউলিয়াকে এই স্থান দান করেন।

২. তীর্থমঙ্গল ১০১১ শ্লোক (সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ)।

সুতরাং যে সময়ে দেওয়ান মানিকচাঁদ ছাড় দেন, তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুর এই দেবস্থান ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। দেওয়ান মাণিকচাঁদ হইতেই 'দেওয়ানগঞ্জ' নাম হইয়াছে।

দাঁইহাটের পূর্ব্ব গৌরবের শেষ চিহ্ন ভাস্করবংশ এখনও বিদ্যমান। ভাস্কর শিল্পনৈপুণ্যে এখানকার ভাস্করবংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। দাঁইহাটের পার্শ্বে জগদানন্দপুরে উত্তররাঢ়ীয় ঘোষচৌধুরীবংশের প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ রাধাগোবিন্দের মন্দির আছে। কাশী, মৃজাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে নানা বর্ণের পাথর আনাইয়া তদ্দারা এই সুন্দর মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এরূপ ভাস্কর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত চমৎকার বৈষ্ণব-মন্দির রাঢ়দেশে বিরল। কএকটী প্রাচীন নির্দশন ব্যতীত দাঁইহাটের পাইকপাড়ার পার্শ্বে জঙ্গল শাহের গড়ের চিহ্ন এবং প্রাচীন গঙ্গা-গর্ভের অদূরে বর্দ্ধমানরাজের সমাজবাড়ী বিদ্যমান। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুরায় হইতে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানাধিপগণের ঐ সমাজ-বাড়ী মধ্যে অস্থিসমাধি আছে।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, গঙ্গা দাঁইহাট হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু গত বর্ষ হইতে গঙ্গাপ্রবাহ ধীর মন্থর গতিতে আবার যেন পূর্ব্ব গর্ভে ফিরিয়া আসিতেছেন।

বিশ্বেশ্বর ও কুলাই

কাঁটোয়া সহর হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয়ের তীরে প্রাচীন কুলাই গ্রাম। কাঁটোয়া হইতে ২।।০ ক্রোশ দূরে কুলাই যাইবার পথে বিশ্বেশ্বর। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতে দেখা যায়—অট্টহাসে যে ফুল্লরা শক্তি আছেন, বিশ্বেশ্বর বা বিশ্বনাথ তাঁহারই ভৈরব। বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির নষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে শিবরাত্রি ও চড়ক সংক্রান্তির সময় বহু জনতা হয়। এই বিশ্বেশ্বর হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে কুলাই। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা মহাপ্রভুর পার্ষদ বাসুদেবঘোষ ঠাকুরের জন্মস্থান বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এই স্থান প্রসিদ্ধ। ঘোষঠাকুরের পিতামহ গোপাল ঘোষ ফতেসিংহ পরগণাস্থ রসোড়া হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র বল্লভ ঘোষ বাইশটী করণ করিয়া উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

"রসোড়া ছাড়িয়া গোপাল কুলায়ে বসতি।
বাইশ বল্লভঘোষ নাম হইল খ্যাতি।।" —কুলপঞ্জী

এই বল্লভঘোষের ৯ পুত্র—১ম পক্ষে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব, ২য় পক্ষে দনুজারি, কংসারি ও মীনকেতন এবং ৩য় পক্ষে জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দ। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ চৈতন্যদেবের অনুবর্ত্তী হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। এই গোবিন্দ ঘোষই অগ্রদ্বীপের সু-প্রসিদ্ধ গোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। অগ্রদ্বীপ-প্রসঙ্গে তাঁহার

কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কংসারি ঘোষের সন্তানেরা অদ্যাপি কুলাই গ্রামে বাস করিতেছেন। এই ঘোষবংশেই দিনাজপুরের মহারাজ সর্ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এবং রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর জন্মলাভ করিয়াছেন।

কুলাইগ্রামে অজয়ের তীরে গৌরাঙ্গের বিশ্রামস্থান ও উহার এক পোয়া উত্তরে গ্রামের মধ্যে বাসুদেব ঘোষঠাকুরের সাধনার স্থান এবং বাসুদেব, গোবিন্দ, মাধব প্রভৃতির বাসচিহ্ন আছে। এখানে বাসুদেবঘোষ যে নিম্ববৃক্ষতলে বসিয়া সাধনা করিতেন, সেই নিম্ববৃক্ষ লইয়া গিয়াই মহাপ্রভুর বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রস্তুত হয়। কাহারও মতে সেই বিগ্রহ কাঁটোয়ায়, কাহারও মতে শ্রীখণ্ডে বর্ত্তমান।

কেতুগ্রাম

বহুলাপুর ঃ কুলাই হইতে দেড় ক্রোশ দূরে কেতুগ্রাম। কেতুগ্রামের পটী বহুলাপুরে বহুলাদেবী একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি এই স্থান হইতে এক মাইল দূরে মরাঘাটে ছিলেন, পরে তাঁহাকে সেখান হইতে আনিয়া গ্রাম মধ্যে রাখা হয়, অল্প দিন হইল বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, বহুলা এই গ্রাম মধ্যেই বরাবর ছিলেন, তাঁহারই দেবসেবার জন্য বহুলাপুরে নির্দিষ্ট ছিল, তাঁহার নাম হইতেই কেতুগ্রামের পটী বহুলাপুরের নামকরণ হইয়াছে। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতের মতেও এই স্থানের নাম 'বহুলা' এবং এখানে ভগবতী বামবাহু পতিত হওয়ায় এই স্থান মহাপীঠ মধ্যে ধরা হইয়াছে। বাস্তবিক বহুলাদেবী এবং তাঁহার বর্ত্তমান মন্দিরের পার্শ্বস্থ পুষ্করিণীর ঘাটে যে সকল পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলেই এই স্থান যে বহুদিনের পুরাতন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। বহুলার পুরোহিত মহাশয়ের নিকট শুনা গেল, এই গ্রামের পশ্চিমে ভূপাল-রাজার পাথরের দালান ছিল, বহুলার পুষ্করিণীর ঘাটে যে সকল কাটা-পাথর পাওয়া যায়, তাহা উক্ত দালানের ধ্বংসাবশেষ হইতে আনা হইয়াছে।

এখানে প্রবাদ আছে যে, কেতুগ্রামে চন্দ্রকেতু রাজা রাজত্ব করিতেন, এই চন্দ্রকেতু হইতেই কেতুগ্রাম নামের উৎপত্তি। চন্দ্রকেতুর রাজপ্রাসাদের নিকট এক পুষ্করিণী সহিত অপর এক পুষ্করিণীর মধ্যে যাতায়াতের সুড়ঙ্গ ছিল। রাজবাটী পাথরের ছিল। তাঁহার সময়ে এখানে বিস্তর অট্টালিকা ও পাকা রাস্তা ছিল। এখনও এ অঞ্চলে সর্ব্বত্র মৃত্তিকা মধ্যে পুরাতন ইট পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কেতুগ্রাম থানার নিকট পুরাতন ভাঙ্গা ইটের ঢিবি আছে এবং তাহার চারিদিক খনন করিলেই বহু পুরাতন ইট বাহির হয়।

বহুলাদেবীর (বহুলাক্ষীর) পরিমাপ উচ্চতায় ৩।।০ হাত, কালপাথরে গড়া, অতি সুন্দর মূর্ত্তি—দেখিলে নয়ন-মন মুগ্ধ হয়। দেবীর ডান পার্শ্বে গণেশ ও বাম পার্শ্বে শক্তিধর। মূল মূর্ত্তি সর্ব্বদাই কাপড়ে ঢাকা থাকেন। বহু অনুরোধের পর মূল মূর্ত্তি

দেখিবার সুযোগ ঘটিলেও ছবি তুলিবার সময় পুরোহিত মহাশয় এককালে কাপড় সরাইতে রাজী হইলেন না। এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির ধ্যান—

"ধ্যায়েচ্ছ্রীবহুলাং নগেন্দ্রতনয়াং পদ্মাসনস্থাং শুভাম্।
দোর্ভিঃ কঙ্কতিকাং বরাভয়যুতাং (ত্রিনয়নাং) বামে স্বপুত্রান্বিতাম্।।

*　　*　　*　　*

গৌরাঙ্গী মণিহারকণ্ঠনমিতাং চিন্ত্যাং সুখাং কামদাম্।।"

অর্থ—হিমালয়সুতা পদ্মাসনস্থিতা মঙ্গলা শ্রীবহুলাকে ধ্যান করিবে। (তাঁহার চারি হাতের মধ্যে এক হাতে) কাঁকুই, (অপর দুই হাতে) বর ও অভয়, বাম পার্শ্বে নিজ পুত্র। গৌরাঙ্গী, মণিহার দ্বারা নমিত কণ্ঠ, আনন্দময়ী, কামদাকে চিন্তা করিবে।

এই ধ্যানের মাত্র তিনটী চরণ পাওয়া যাইতেছে। ধ্যানে তিনটী হস্তের বর্ণনা আছে, বাকি চতুর্থ হস্তের কোন কথা নাই। কিন্তু মূর্ত্তির চতুর্থ হস্তে দর্পণ আছে। ধ্যানে আছে, 'বামে স্বপুত্রান্বিতাম্'। কিন্তু পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, মূর্ত্তির এক পার্শ্বে কার্ত্তিকেয় ও এক পার্শ্বে গণেশ আছেন। ধ্যানের অপ্রাপ্ত চরণটী পাওয়া গেলে এই সকল গোল মিটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়।

পুরোহিত মহাশয় উক্ত অসম্পূর্ণ-ধ্যানেই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। স্থানীয় লোকেরা শ্রীখণ্ডের ভূতনাথকে বহুলাক্ষীর ভৈরব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবরচিত উভয় গ্রন্থের মতেই বহুলাক্ষীর ভৈরবের নাম ভীরুক।

মরাঘাট ঃ স্থানীয় আধুনিক লোকের বিশ্বাস, এখানকার বহুলাক্ষী ও অট্টহাসের ফুল্লরা এই উভয় লইয়া যুগ্মপীঠ। বাস্তবিক তাহা নহে। যাঁহাকে তাঁহারা এখন বহুলাক্ষী বলিতেছেন, তাঁহার প্রকৃত নাম বহুলা, উদ্ধৃত ধ্যানেই প্রকাশ। বহুলা ও বহুলাক্ষী দুই ভিন্ন দেবীমূর্ত্তি। শিবচরিতে বহুলা ও বহুলাক্ষী দুইটী বিভিন্ন পীঠশক্তি বলিয়া ধরা হইয়াছে। শিবচরিত-মতে যেখানে ভগবতীর ডান কুনুই পড়িয়াছিল, সেই স্থানের নাম রণখণ্ড, সেখানকার শক্তির নাম বহুলাক্ষী ও ভৈরবের নাম মহাকাল। আর যেখানে ভগবতীর বামবাহু পড়িয়াছিল সেই স্থানের নাম বহুলা, শক্তির নামও বহুলা, ভৈরবের নাম ভীরুক। বহুলা ও বহুলাক্ষী উভয় লইয়াই যুগ্মপীঠ। শিবচরিতে যে স্থান 'রণখণ্ড' নামে উক্ত হইয়াছে, সেই স্থানই এখন মরাঘাট নামে পরিচিত। পূর্ব্বোক্ত বহুলা দেবীর মন্দির হইতে এক মাইল মধ্যে এখানে বহুলাক্ষী ছিলেন, এখন সেই মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে শক্তির ভৈরব মহাকাল এখানে নূতন গৃহে বিদ্যমান। এই মরাঘাটে উত্তরবাহিনী 'কাঁদড়' আছে, ব্রহ্মখণ্ডে এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীই 'বকুলা' বা 'বহুলা' নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অদ্যাপি এই মহাশ্মশানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী আগমন করিয়া থাকেন।

অট্টহাস

পূর্ব্বোক্ত মরাঘাট হইতে ১ মাইল দূরে অট্টহাস। এই মহাপীঠ অতি প্রাচীন। কুব্জিকাতন্ত্রের মতে, এই পীঠে চামুণ্ডা ও মহানন্দা দেবী অবস্থান করিতেছেন। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিত-মতে এখানে ভগবতীর ওষ্ঠাংশ পতিত হয়, এখানকার শক্তি ফুল্লরা ও ভৈরব বিশ্বেশ ও বিল্বনাথ। অদ্যাপি অট্টহাস মহাজাগ্রৎ মহাপীঠ বলিয়া পরিচিত। এই স্থানের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কিছুই নাই। ভগবতীর মূর্ত্তিও নাই। মুসলমান-বিপ্লবে সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। মূলপীঠস্থানে কিছুদিন পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র কুঠরী ছিল, অল্পদিন হইল তাহারই উপর খেড়ুয়ার জমিদার দেবীদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী পাকাঘর ও রান্নাঘর প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। ইহার অদূরে একটী উচ্চ স্তূপ রহিয়াছে, স্থানীয় লোকেরা এখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু এই স্তূপটী এখানকার পুরাকীর্ত্তির ধংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়। ইহার উপর ও চারিপাশে বহু পাতলা ও ভাঙ্গা পুরাতন ইট পাওয়া যায়। এই স্তূপের নিকট শিবানন্দের সিদ্ধিস্থান ও রটন্তীর ভগ্ন মন্দির আছে।

এই পীঠে প্রত্যহই শিবাবলি হয়। দেবীর পূজার পর ভোগ লইয়া ডাকিলেই দলে দলে শিবা আসে। শনি ও মঙ্গলবারে এখানে বহুলোক পূজা দিতে আসেন। দেবীর কৃপায় অনেকেরই অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, শুনা যায়। পীঠের পশ্চিম ধারে উত্তরবাহিনী 'কাঁদড়' বা স্রোতস্বতী আছে।

এখানকার পীঠদেবী ফুল্লরার জয়দুর্গার ধ্যানে পূজা হয়। যথা—

> "কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
> শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
> সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
> ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।।"

কিন্তু কুব্জিকাতন্ত্র-বর্ণিত চামুণ্ডা বা মহানন্দার সাহিত এই ধ্যানের কোন সম্বন্ধ নাই।

দেবালয়ের বামপার্শ্বে একটী অতি পুরাতন পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণী হইতে একটী ভগ্ন দেবী-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটী ভাঙ্গা হইলেও এমন সুন্দর ও অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত দেবীমূর্ত্তি আমরা বড় একটা দেখি নাই। রাঢ়ে—বর্দ্ধমান-জেলায় ভাস্করশিল্পের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটী তাহার অতীত সাক্ষীর সামান্য নিদর্শন। ইহা কোন্ দেবীর মূর্ত্তি তাহা এখনও তন্ত্রশাস্ত্র খুঁজিয়া বাহির করিবার সুযোগ ঘটে নাই। দেবীর পাদদেশে একটী গর্দ্দভের আকৃতি থাকায় কেহ কেহ ইঁহাকে রাসভস্থা শীতলা মূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শীতলার ধ্যানের সহিত অপর কোন অংশে এই দেবীর মূর্ত্তির মিল নাই। দেবীর পাদদেশে যে অস্পষ্ট মূর্ত্তি আছে, তাহা শিবারও রূপ হইতে পারে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ভগবতীর যে জরতীবেশের উল্লেখ আছে, ঐ

মূৰ্ত্তি যেন সেই ভাবের চণ্ডীদেবী বলিয়া মনে হয়। কুব্জিকাতন্ত্রে যে চামুণ্ডা বা মহানন্দার উল্লেখ আছে—এই সুপ্রাচীন মূৰ্ত্তিটী তাহার অন্যতর হইতে পারে।

অট্টহাসের সেবার জন্য বৰ্দ্ধমাঁরাজ হইতে ১০ বিঘা বাগাঁ ও ২০ বিঘা চাষের জমি দেওয়া আছে।

অগ্রদ্বীপ

অগ্রদ্বীপ কাঁটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম ও বৰ্দ্ধমান জেলার মধ্যে একটী প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। পূৰ্ব্বতন অগ্রদ্বীপ বৰ্ত্তমান অগ্রদ্বীপের প্রায় অৰ্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে ছিল, গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত গ্রামও ক্রমে সরিয়া আসিয়াছে। মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূৰ্ব্ব হইতেই অগ্রদ্বীপ সুপ্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য। দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে, বারাণসীতে গঙ্গাস্নান করিলে যেরূপ ফল হয়, বারুণীর দিন অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিলে সেইরূপ ফল হয়। এখানকার ফল মাহাত্ম্যের জন্য রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। আজও বারুণী উপলক্ষে এখানে ১৫ দিনব্যাপী বড় মেলা হয়, তাহাতে প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

অধুনা গোপীনাথ-বিগ্রহের জন্যই এই স্থান প্রসিদ্ধ। কুলাই গ্রামের বিবরণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, উত্তরাঢ়ীয় কায়স্থ ঘোষবংশে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব প্রভৃতি নয় ভাই জন্মগ্রহণ করেন। কাশীপুর বিষ্ণুতলায় সিংহ-বংশে গোবিন্দঘোষের বিবাহ হয়। পত্নীর মৃত্যুর পর সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি অগ্রদ্বীপের নিকট গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। এক দিবস মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া ভাগীরথীসলিলে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নবীন সন্ন্যাসীর তেজোময় অপূৰ্ব্ব মুখশ্রী দেখিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইলেন, মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "প্রভো! আমি সংসার চাই না, ধন মান ঐশ্বর্য্য চাই না, আত্মীয় স্বজন চাই না, কেবল তোমার ঐ চরণকমল সেবা করিতে চাই।"

এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গদেব গোবিন্দকে সংসারে নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে সংসারে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গোবিন্দ কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন, "ধন মান ঐশ্বর্য্য সমস্ত দূর হউক, উহারা আমাকে আর জ্বালাইতে পারিবে না। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিন্।" এই বলিয়া তিনি চৈতন্যের পা জড়াইয়া ধরিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও গোবিন্দকে প্রকৃত ভক্ত জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, "যদি নিষ্কাম ব্রত পালন করিতে পার, তাহা হইলে আমার সহিত থাকিতে পাইবে।" গোবিন্দ ইহা শুনিয়া মহানন্দে চৈতন্যের পদরেণু গ্রহণ করিলেন এবং নিষ্কাম ব্রত পালনে সম্মত হইলেন। পরে কিছুদিন তিনি মহাপ্রভুর সহিত মহানন্দে কাটাইলেন।

একদিন মহাপ্রভু আহারান্তে মুখশুদ্ধি না পাইয়া ভক্তগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ আর মুখশুদ্ধি হইল না।" শিষ্যগণ নীরব রহিলেন। গোবিন্দ অমনি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুর সম্মুখে যাইয়া কহিলেন, "প্রভো! আমার নিকট একটী হরীতকী আছে; যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আপনার সেবার জন্য অর্পণ করি।" এই কথায় শ্রীচৈতন্য হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "গোবিন্দ! তোমার ভক্তির সামগ্রী আমি অহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।" গোবিন্দের মস্তকে যেন অকস্মাৎ বজ্রঘাত হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেব! দাস এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্য এ কঠোর আদেশ করিলেন?" চৈতন্যদেব কহিলেন, "গোবিন্দ! তুমি যথার্থ ভক্ত ও হরিপূজার অধিকারী। কিন্তু নিষ্কাম ব্রত পালনে উপযুক্ত নও, এখনও তোমার বিষয়-বাসনা দূর হয় নাই, এখনও তোমার সঞ্চয়-স্পৃহা আছে। তাই বলিতেছি, গৃহে ফিরিয়া যাও, হরির আরাধনা করিও, তাহাতেই মুক্তি হইবে।" "আমি কিছু চাই না, সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছি, আর সংসারে ফিরিব না"—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে গোবিন্দ এই ক-একটী কথা বলিলেন।

চৈতন্যদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ! তুমি যথার্থই সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু এখনও তোমার সম্মুখে বিষম কণ্টক রহিয়াছে। আজ একটী হরীতকী সঞ্চয় করিয়াছ, কাল আবার আর একটী সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইবে, পরশ্ব আর একটী। এইরূপ কামনাই নিষ্কাম ব্রত-পালনের ঘোর অন্তরায় জানিবে। সেই জন্য বলিতেছি, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। যেদিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিবে, সেই দিন আবার আমার দর্শন পাইবে। যদি কোন অলৌকিক দ্রব্য পাও, যত্নসহকারে রাখিয়া দিও। তোমার আশা পূর্ণ হইবে।" মহাপ্রভু এই প্রকারে গোবিন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে আসিয়া "আবার কবে প্রভুর দর্শন পাইব"—এই আশায় নির্ভর করিয়া রহিলেন।

এইরূপে বহুদিন গত হইল। শুভ মধুমাস আসিল। এক দিন ভক্তপ্রবর গোবিন্দ জাহ্নবীসলিলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কি একটা জিনিস আসিয়া তিনবার তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। তিনি চাহিয়া দেখেন, শবদাহের এক খণ্ড ক্ষুদ্র কাষ্ঠ। তিনি সেই কাঠখানি তীরে তুলিয়া রাখিলেন। কিন্তু তুলিবার সময় বুঝিলেন যে, ঐ কাঠখানি স্বাভাবিক গুরুত্ব অপেক্ষা শতগুণ ভারী। একি হইল! বিস্ময়ে গোবিন্দের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি কুঠীরে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু মনের সেই অপার্থিব ভাব কিছুতেই দূর হইল না—এই চিন্তায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, শঙ্খচক্রগদাধর যেন তাঁহাকে

বলিতেছেন, "গোবিন্দ! ভুল না ভুল না, সেই কাঠখানি তুলিয়া আনিয়া গৃহে রাখ। মহাপ্রভু আসিতেছেন, আসিলে তাঁহাকে দিও।"

গোবিন্দের নিদ্রা ভাঙ্গিল, দেখিলেন চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। তিনি সেই নিবিড় অন্ধকারে যেন কোন কুহকের বলে আকৃষ্ট হইয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন, এখানে আসিয়া দেখিলেন, সেই কাঠখানি যথাস্থানে পড়িয়া আছে। গোবিন্দ অতি যত্নে কাঠখানি স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে কুটীরে আনিয়া রাখিলেন। সে রাত্রি আর তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। ক্রমে প্রভাত হইল। গোবিন্দ অরুণের আলোকে দেখিতে পাইলেন, সেখানি শবদাহের কাষ্ঠ নয়—এক খানি সমুজ্জল কৃষ্ণ-প্রস্তর। গোবিন্দ চমকিয়া উঠিলেন। চৈতন্যদেবের কথাগুলি তাঁহার স্মরণ হইল।

বেলা দ্বিপ্রহর সময়ে গোবিন্দ গ্রাম-মধ্যে ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইলেন। ভিক্ষান্তে কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, কুটীর-দ্বারে চৈতন্যদেব। ভক্তপ্রধান গোবিন্দ চৈতন্যদেবকে দেখিয়া পুলকে পূরিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের ভক্তিদর্শনে চৈতন্যেরও প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কিছু হইয়াছে? গোবিন্দ সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন। তখন চৈতন্যদেব বলিলেন, "গোবিন্দ! তোমার আর কোন চিন্তা নাই। ভগবান্ তোমার মঙ্গলের জন্য ঐ শিলা পাঠাইয়াছেন। কল্য এক ভাস্কর আসিয়া ঐ শিলা হইতে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবে। সেই বিগ্রহ আমি প্রতিষ্ঠা করিব ও তুমি তাঁহার সেবাইত হইবে।"

পর দিন যথাকালে এক অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত ভাস্কর আসিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সকলের অসাক্ষাতে চলিয়া গেল। সকলেই দেখিলেন—নবদুর্ব্বাদলশ্যাম বঙ্কিম কৃষ্ণবিগ্রহ প্রস্তুত হইয়াছে। চৈত্যদেব তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং গোবিন্দ ঘোষ তাঁহার পূজক নিযুক্ত হইলেন। ঐ কৃষ্ণবিগ্রহের নামই গোপীনাথ। গোবিন্দ ঘোষই পরে 'ঘোষ-ঠাকুর' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

গোপীনাথ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পর ঘোষ-ঠাকুর বহু দিন জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি বহুসংখ্যক শিষ্য ও বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমি চলিলাম, আজ আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তোমরা যথারীতি প্রভুর সেবা করিও। মহাপ্রভুর আজ্ঞা—আমার প্রাণ বাহির হইলে যথাসময়ে গোপীনাথদেব যেন আমার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। আমার দেহ দাহ করিও না, গ্রামের এক পার্শ্বে সমাধি দিও।" এই বলিয়া ভক্তবর গোবিন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। প্রবাদ এইরূপ, সেই দিন গোপীনাথের চক্ষেও বিন্দু বিন্দু জল দেখা দিয়াছিল। চৈত্রমাসে কৃষ্ণা একাদশীতে গোপীনাথ শ্রাদ্ধীয় বাস ও কুশাঙ্গুরী পরিয়া

সেবকের পুত্ররূপে শ্রাদ্ধ করিলেন। এখনও প্রতি বৎসর ঐ দিনে গোপীনাথ কর্ত্তৃক ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গোপীনাথ দর্শন করিবার জন্য বহু দূরদেশ হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ এখানে আগমন করিতেন। তাহাতে যথেষ্ট আয় হইত। ঘোষ ঠাকুরের ভ্রাতৃবংশধরগণ আসিয়া সেবা চালাইতেন। ক্রমে তাঁহাদের প্রভাব রাঢ় ছাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গে পঁহুছিল। পূর্ব্ববঙ্গের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের কাহারও কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তাঁহারাও শিষ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য অনেকে পূর্ব্ববঙ্গ আশ্রয় করিলেন। এই সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ে গোপীনাথ-বিগ্রহ লইয়া যাইবার আশা বলবতী হইল। কিন্তু তাঁহাদের যে সকল সরিক রাঢ়ে ছিলেন, তাঁহারা গোপীনাথকে ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। পূর্ব্ববঙ্গগামী ঘোষবংশীয়গণ একদিন গোপনে গোপীনাথকে লইয়া চলিলেন, জ্ঞাতিগণ সংবাদ পাইয়া পথ আট্‌কাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে বেশী লোকজন থাকায় জ্ঞাতিগণ ফিরিয়া আসিলেন এবং তৎকালের পাটুলীর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থরাজের নিকট বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পাটুলীর রাজারা তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য পাঠাইয়া কুষ্ঠিয়ার নিকট হইতে গোপীনাথকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং পাটুলীর রাজবাটীতেই কিছুকাল রাখিয়া দিলেন। এইরূপে গোপীনাথ ঘোষবংশের হাতছাড়া হইলেন। পাটুলীর রাজা অগ্রদ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী জমিদারী গোপীনাথের সেবার জন্য অর্পণ করেন এবং চৈত্র-একাদশীর দিন অগ্রদ্বীপে গোপীনাথকে পাঠাইয়া পূর্ব্ববৎ শ্রাদ্ধাদি উৎসব নির্ব্বাহ করিতেন। একবার মেলায় বহু লোকের জনতায় কতকগুলি লোক মারা যায়। এ সংবাদ পাইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব স্থানীয় জমিদারকে কারণ দর্শাইতে হুকুম দেন। মুর্শিদাবাদসরকারে পাটুলীর পক্ষে যিনি উকীল ছিলেন, তিনি নিজ প্রভুর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া ভয়ে কিছুই বলিলেন না। মোকদ্দমার ডাক হইলে নদীয়া-রাজের উকীল উঠিয়া বলিলেন, 'হুজুর! সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হয়। এত ভিড়ের মধ্যে দুই চারি জন মরিবে, তাহা কিছু অসম্ভব নহে। তবে আমার প্রভু নবদ্বীপরাজ ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হইবেন।' উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া নবাব সন্তুষ্ট হইলেন। নবদ্বীপের উকীলের কৌশলে সেই দিন হইতে গোপীনাথসহ অগ্রদ্বীপ-জমিদারী নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত হইল। যেখানে গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি ছিল, তাহারই পার্শ্বে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোপীনাথের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

ভূকৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ১১৭১ সালে ত্রিস্থলী করিয়া ফিরিবার সময় অগ্রদ্বীপে নামিয়াছিলেন। সহযাত্রী কবি বিজয়রাম তীর্থমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

"অগ্রদ্বীপ আসি নৌকা হৈল উপস্থিত।। ১০১২
সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর।
অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ বাটী দেখিতে সুন্দর।।১০১৩
রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী আছেন গোপীনাথ।
দর্শন না পায়্যা যাত্রী মাথে মারে ঘাত।।"১০১৪

কলিকাতার শোভাবাজার-রাজবাটীতে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধে অথবা তাঁহার গোবিন্দজী প্রতিষ্ঠাকালে রাঢ়বঙ্গে যত বিষ্ণুবিগ্রহ ছিলেন, রাজা নবকৃষ্ণ সে সকলকেই নিজ প্রাসাদে আনাইয়া ছিলেন। কার্য্যান্তে সকল দেবই ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু গোপীনাথের মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি আর তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন না। এই বিগ্রহ লইয়া নবদ্বীপাধিপতির সহিত মহারাজ নবকৃষ্ণের বিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু অগ্রদ্বীপে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবকৃষ্ণ গোপনে গোপীনাথ বিগ্রহ কলিকাতায় লইয়া যান। সমসাময়িক ইংরাজলেখক ওয়ার্ডসাহেব কিন্তু লিখিয়াছেন—

"গোপীনাথের অধিকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবকৃষ্ণের নিকট তিন লক্ষ টাকা ধারিতেন। সেই জন্য রাজা নবকৃষ্ণ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে লইয়া যান। অবশেষে কৃষ্ণনগরপতি মোকদ্দমা করিয়া সেই মূর্ত্তি উদ্ধার করেন।"[৩] মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে গোপীনাথের সেবার জন্য প্রত্যহ ৫০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তৎপরে ২৫৲ টাকা হয়, ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়া এখন দৈনিক।।০ আনা ব্যবস্থা হইয়াছে।

তীর্থমঙ্গলে গোপীনাথের যে "অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ বাটী"র উল্লেখ আছে, ভীষণ ভূমিকম্পে তাহার অধিকাংশই ভগ্ন হইয়াছে। সংস্কারাভাবে মূল-মন্দিরের উভয় পার্শ্বে নাটমন্দির ও ভোগগৃহ ধ্বংসপ্রায়। মূল-মন্দির সামান্য সংস্কারের ফলে এখনও দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত সংস্কার না হইলে শীঘ্রই ধ্বংসমুখে পতিত হইবে।

অগ্রদ্বীপ গ্রামে বাগানের মধ্যে মেলা হয়। গ্রামের মধ্যে ও মেলাস্থানের নিকট বৰ্দ্ধমানরাজদত্ত মহাপ্রভুর সেবা আছে। তাহারই নিকট রাধাকান্তজী আছেন, নাটোররাজদত্ত বৃত্তিতে তাঁহার সেবা চলে। এখানে সকল জাতির বাস আছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

ঘোড়াইক্ষেত্র

অগ্রদ্বীপ হইতে ৩ মাইল উত্তরে ঘোড়াইক্ষেত্র নামক প্রাচীন স্থান। বিজয়রামের তীর্থমঙ্গল পাঠে জানিতে পারি যে, দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে এই ঘোড়াইক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন।—

৩. Ward's History of the Hindoos. Vol. I. pp. 205-206.

"কাশীপুর ঘোড়াইক্ষেত্র কন্যা গাজীপুর।
ডাহিনে রাখিয়া চলে ঘোষাল ঠাকুর।।
সন্ধ্যার সময় সবে আইলা গোটপাড়া।
গুড় গুড় গুড় গুড় দামায় পড়ে সাড়া।।
সেই স্থানে কালুরায় মহাশয়ের ঘর
সোয়ারীতে কৃষ্ণচন্দ্র গেলা শীঘ্রতর।।"

তীর্থমঙ্গল ১০১৭-১০১৯ শ্লোক

বর্ত্তমান ঘোড়াইক্ষেএ হইতে গঙ্গা প্রায় ১ ক্রোশ দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছেন। ঘোড়াইক্ষেত্রের বর্ত্তমান কালীতলার পার্শ্ব দিয়াই গঙ্গা বহিতেন। গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত এই স্থান নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়, অল্পদিন হইল জঙ্গল কাটা হইয়াছে। ইহার অপর পারে নোহাসায় কালুর ঘাট। এখানকার নোহাসার বিল প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের পরিচয় দিতেছে। এই বিল বরাবর গোটপাড়ায় গিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে।

বহু পূর্ব্ব হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র তান্ত্রিকপ্রধান স্থান। কুব্জিকাতন্ত্রে যে অশ্বতীর্থ বা অশ্বপদ পীঠের উল্লেখ আছে, কালীতলার নিকট সেই প্রাচীন পীঠ ছিল, বহু কাল হইল গঙ্গা সেই স্থান আপনার কুক্ষিগত করিয়াছেন। তৎপরেও এখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। কিন্তু গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত ইহার মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে এখনও পীঠস্থান ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে।

দেবগ্রাম[৪]

দেবগ্রামের অবস্থান ঃ বর্ত্তমান নদীয়া জেলার উত্তরাংশে রাণাঘাট মুর্শিদাবাদ রেলপথের দেবগ্রাম ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে এবং অগ্রদ্বীপ হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে দেবগ্রাম অবস্থিত।

৪. এই প্রাচীন স্থানের পরিচয় পূর্ব্বে বড় প্রকাশ ছিল না। ইহার প্রাচীনত্বের সন্ধান পাইয়া আমি ক্রমান্বয়ে চারিবার ঐ স্থানে গিয়াছিলাম। প্রথম দুইবারে ঐ স্থানের প্রাচীন অধিবাসী কৃষকদিগের নিকট এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বারে গ্রামবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট স্থানীয় কিংবদন্তী শুনিয়া প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও পুরাকীর্ত্তিগুলি দেখি। ৪র্থ বারে (গত ১৩ই চৈত্র) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও পুরাতত্ত্বানুরাগী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার সঙ্গে ঐ সকল স্থান ও বিক্রমপুর পরিদর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলেন। এই ক-এক বারের অনুসন্ধানের ফলে এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মজুমদার প্রভৃতি গ্রামবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে যেরূপ কিংবদন্তী সংগৃহীত হইয়াছে এবং আমরা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিত হইল।

বর্ত্তমান দেবগ্রাম বাগড়ীবিভাগের মধ্যে পড়িয়াছে, ইহার আয়তন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ হাজার বিঘা। এই ভূভাগের উত্তরসীমা পাণিঘাটা ও গোবিন্দপুর, দক্ষিণে সাতবেগে, ভাগা, চাঁদপুর ও বনপলাসী, পূর্ব্বে বরেয়া ও দিক্‌বরেয়া, পূর্ব্ব-দক্ষিণে জয়নগর এবং পশ্চিমে সেওড়াতলা ও হাটগাছা। উত্তরসীমার মধ্যে লুপ্ত গঙ্গার খাত পাগলাই চণ্ডীর দহ বা পাণিঘাটার দহ, পাণিঘাটার দক্ষিণে ও দেবগ্রামের উত্তর পশ্চিম সীমায় দেবগ্রামের পাড়া পাথরজলা বা নূতনগ্রামের গড়। গ্রামবাসী বৃদ্ধ ভদ্রমহোদয়গণের বিশ্বাস যে, গোবিন্দপুর ও গড়ের পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্ব কালে গঙ্গা প্রবাহিত হইতেন, গঙ্গার খাদের উপরই বর্ত্তমান মীরেগ্রাম। এখানে শুকইআরা, ডোখলঘাট, ধোবাঘাট প্রভৃতি স্থান আছে। দেবগ্রামের উত্তর ও পূর্ব্বে যেখানে গঙ্গার গর্ভে জল থাকে, সেই স্থান অদ্যাপি দহ বা বিল নামে পরিচিত। শুষ্ক গঙ্গাগর্ভ বর্ষাকালে ডুবিয়া যায়। দেবগ্রামের পূর্ব্বে (বর্ত্তমান দেবগ্রাম ষ্টেশনের পার্শ্বে) দুর্গাপুর, তাহার পার্শ্বে গহড়াপোতা, ইহার মধ্যে নৌকাঘাটা বা 'নাঘাটার মাঠ'—এখানে বর্ষাকালে ৮।১০ হাতের উপর জল চলে।

দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব ঃ দেবগ্রাম অতি পূর্ব্বকাল হইতে একটী মহাসমৃদ্ধিশালী লোকালয় বলিয়া পরিচিত ছিল। পূর্ব্বকালে যখন ইহার পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত ছিল, তৎকালে বর্ত্তমান সাঁওতার পূর্ব্বোত্তরে নাঘাটা বা নৌকাঘাটা নামক স্থানে বড় বড় বাণিজ্যপোত আসিয়া লাগিত। সাঁওতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই তৎকালে বহু লোকের বাস ছিল, দক্ষিণে বিক্রমপুর ও উত্তরে মীরে বা মীরগ্রাম[৫] এবং পশ্চিমে কালীগঞ্জ হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান সাতবেগে[৬] এই বিস্তীর্ণ নগরীর মধ্যেই ছিল। এই ভূভাগের মধ্যে এখনও স্থানে স্থানে বহু প্রাচীন ইষ্টকাদির নিদর্শন ও বহু সংখ্যক সুপ্রাচীন মজা পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। দেবগ্রামের সর্ব্বপ্রাচীন স্মৃতি সম্ভবতঃ মঞ্জুশ্রী।[৭] এখন ইনি কুলুইচণ্ডী নামে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীরূপে পূজা পাইতেছেন। এখানে যে এক সময় বৌদ্ধপ্রভাব ছিল, এই মঞ্জুশ্রীই তাহার নিদর্শন।

৫. ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে দেবগ্রামের উল্লেখ না থাকিলেও এই মীরগ্রামের উল্লেখ আছে।

৬. পূর্ব্বকালে একটী বেগেই ছিল, কিছু দিন হইল উহার সাতভাগ হইয়াছে। এই সাতবেগের নাম পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যথাক্রমে ১ চিনিমিনি বেগে, ২ স্থাপন বেগে, ৩ চক বেগে, ৪ গড়ের বেগে, ৫ আড়ার বেগে, ৬ খোরদ বেগে ও ৭ পালিত বেগে।

৭ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মুর্ত্তিটীকে "মহারাজলীল মঞ্জুশ্রী" বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধ তন্ত্রে মঞ্জশ্রীর যেরূপ সাধন লিখিত আছে, তাহার সহিত মিল নাই। তবে মূর্ত্তিটী যে সহস্রাধিক বর্ষের প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেবকুণ্ড ঃ দেবগ্রামে যত পুষ্করিণী আছে, তন্মধ্যে দেবকুণ্ড সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্ববৃহৎ—পূর্ব্বে প্রায় দেড়শত বিঘায় জল থাকিত। তাহার পশ্চিমে ফুলবাগান এবং অপর তিন দিকে লোকের বাস ও মধ্যে মধ্যে দেবালয় ছিল। এখন দেবকুণ্ডের অধিকাংশই ভরাট হইয়াছে, যেটুকু জল আছে, তাহা তিনটী পুষ্করিণী, ৪টী জোল এবং দক্ষিণে একটী লম্বা জোলে বিভক্ত রহিয়াছে। উত্তরাংশ অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে এখন অনেক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন ফুলবাগান এখন নামমাত্র—একটী পাড়া হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান দেবকুণ্ড-সংস্কারকালে ইহার মধ্য হইতে নানা লোকে নানা দেবমূর্ত্তি পাইয়াছে, তাহার কতকগুলি দেবকুণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ-গৃহে আছে, কতক কতক স্থানান্তরে গিয়াছে। কিছুদিন হইল, এই দেবকুণ্ড হইতে কষ্টিপাথরের একটী অতি সুন্দর বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া যায়। সেই মূর্ত্তিটী দেবগ্রামের স্বনামধন্য ডাক্তার উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনার কলিকাতার বাসায় আনিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সাহিত্যসম্মেলনে প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি্ উহা আমায় অর্পণ করিয়াছেন। এই মূর্ত্তির শিল্পনৈপুণ্য ও গঠন দেখিলে ৬।৭ শত বর্ষের প্রাচীন মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইবে।

পচা-দীঘী ঃ গ্রামের উত্তরাংশে 'লালদীঘী' নামে একটী প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, পূর্ব্বে ইহার 'পচাদীঘী' নাম ছিল। ১২৮০ সালে এই দীঘীর সংস্কার-কালে ব্রহ্মাণী বা মাহেশ্বরী মূর্ত্তিযুক্ত একখণ্ড পাথর, হাতীর মাথা এবং ইষ্টকস্তূপ বাহির হয়।[৮] এই স্তূপ হইতে এত পুরাতন ইট উঠিয়াছিল যে, তাহাতে ইহার নিকট একটী পাকা কোটা প্রস্তুত হইয়াছে। ওরূপ দেবীমূর্ত্তিশোভিত প্রস্তরফলক সাধারণতঃ দেবমন্দিরের বহির্গাত্রে সংলগ্ন থাকে এবং তাহা হইতে মূল মন্দির কত বড় ছিল, তাহাও কতকটা বুঝা যায়।

দেবগ্রামের গড় ঃ দেবগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং উত্তরে এখনও সুপ্রাচীন গড়ের চিহ্ন বিদ্যমান। উত্তরের গড়টী প্রায় দৈর্ঘ্যে ১ মাইল, প্রস্থে প্রায় দুইশত ফুট এবং ইহার বর্ত্তমান উচ্চতা ৬ ফুট হইতে ১৫ পর্য্যন্ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ইহার দুই পার্শ্বেই পরিখার চিহ্ন রহিয়াছে। দক্ষিণপশ্চিমাংশের গড়টী 'বেগের গড়' বা 'গড়বেগে' নামে পরিচিত। প্রবাদ—এই গড়ে পাতালঘর আছে। তাহাতে এখানকার পূর্ব্বতন নৃপতির গুপ্তধন রক্ষিত আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

দেবগ্রামের অবস্থান দেখিয়া প্রাচীন লোকেরা মনে করেন যে, ইহার দুই পার্শ্বে গড় ও দুই পার্শ্বে স্রোতস্বতী এই স্থানকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিল। এখন এইস্থান

৮. এই মূর্ত্তির বাহন ও লাঞ্ছন অস্পষ্ট হওয়ায় ইনি ব্রহ্মাণী কি মাহেশ্বরী তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

বাগড়ীর মধ্যে পড়িলেও যে সময়ে ইহার পূর্ব্ব দিয়া গঙ্গা বহিতেন, সেই সময় এইস্থান রাঢ়দেশেরই সামিল ছিল। রামচরিতে পাইয়াছি—

"দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ বসুধাচক্রবাল-বালবলভী তরঙ্গ বহল-গলহস্ত প্রশস্তহস্তবিক্রমো বিক্রমরাজঃ"।

রামচরিতের বিক্রমরাজ যে, বর্ত্তমান দেবগ্রাম অঞ্চলে আধিপত্য করিতেন, তাহার আলোচনা পরে করিব। তবে এখানে বলিয়া রাখি, রামচরিত হইতে আমরা পাইতেছি যে, পালবংশের অধিকারকালে খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে এই দেবগ্রাম একটী প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে—

"দেবগ্রামভবা ধন্যা দেবীসু তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতরূপা।
দেবকীব তস্মাদ্‌গোপালপ্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমম্।।"

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুরবমিশ্রের মাতুলালয় ছিল বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন।

বল্লালের ভিটা ঃ পূর্ব্বোক্ত গহড়াপোতার নিকট (বর্ত্তমান দেবগ্রামের পূর্ব্বভাগে) দমদমা। এখানে একটী উচ্চ স্তূপ বা ঢিবি আছে—স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সাবেক অধিবাসিমাত্রই ঐ ঢিবিকে 'বল্লালের ভিটা' বা 'বল্লালসেনের বাড়ী' বলিয়া থাকে। এই স্থানে এবং ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে ভীষণ জঙ্গল ছিল, অনেকে এখানে আসিয়া বাঘ শীকার করিত। অল্প দিন হইল জঙ্গল পরিষ্কার হইয়াছে। ইহারই পার্শ্বে সাঁওতার দীঘী। ইহার উপর দিয়া ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের যত্নে বহরমপুররোড হইবার পূর্ব্বে বল্লালের ভিটা ও সাঁওতার দীঘী পাশাপাশি ছিল, এই জন্য প্রাচীন লোকেরা ঐ দীঘী বল্লালের অন্তঃপুরস্ত দীঘী বলিয়া মনে করেন।

বল্লালসেনের জাঙ্গাল ঃ দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের অনেক বনিয়াদী লোকের মুখে এই দীঘীর অপর নাম "বল্লাল-দীঘী" শুনা গিয়াছে। এই সাঁওতা হইতে দুইটী প্রাচীন জাঙ্গাল বা রাস্তা বাহির হইয়া একটী পশ্চিমদিক্ দিয়া বরাবর ভাগা, চাঁদপুর, বল্লালসেনের জাঙ্গলি বরগাছী হইয়া বিক্রমপুরের 'জিতের মাঠ' দিয়া যথাক্রমে ভবানীপুর, সুখপুকুর, রাজাপুর হইয়া বিল্বগ্রামের দক্ষিণ দিকে নবদ্বীপ অভিমুখে গিয়াছে। অপর জাঙ্গাল বা প্রাচীন রাস্তা পূর্ব্বদিক্ দিয়া চাঁদপুর, কালীনগর, ধুবী ও সেনপুর হইয়া ঘূনীর দক্ষিণ ও মালুমগাছার পার্শ্ব দিয়া গবীপুর পর্য্যন্ত গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। গবীপুরের প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ জাঙ্গাল পূর্ব্বে বহুদূর

পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ক্রমে কৃষকগণের কৃপায় সে সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত উভয় জাঙ্গালই 'রাজার জাঙ্গাল' বা 'বল্লালসেনের জাঙ্গাল' নামে স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট পরিচিত। ঐ জাঙ্গালের ধারে ধারে ৩, ৪ ক্রোশ অন্তর বড় বড় পুরাতন পুষ্করিণী দেখা যায়, তন্মধ্যে সাঁওতা, ভাগা, বরগাছী, বিক্রমপুর, ভবানীপুর, রাজাপুর, বিল্বগ্রাম ও নবদ্বীপের পুষ্করিণী প্রসিদ্ধ। ভবানীপুর ও নবদ্বীপের পুষ্করিণী আজও "বল্লালের দীঘী" নামেই পরিচিত। আজ কেহ্ কেহ্ অপর স্থানের মজা পুকুরগুলিকে বল্লালসেনের নামের অপভ্রংশে 'বল্‌লামসেনের কীর্ত্তি' বলিয়া মনে করেন।

পূর্ব্বে এই স্থান বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার অধীন ছিল। প্রায় ৫০ বর্ষ হইল, কাঁটোয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ঁঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় কার্য্যগতিকে দেবগ্রামে আসিয়া কিছু দিন অবস্থান করেন। সেই সময়ে তিনি স্থানীয় জমিদার ঁবামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহায্যে "বল্লালের ভিটা" খনন করাইয়াছিলেন। দেবগ্রামের প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন—খননকালে ঐ স্তূপ হইতে বহুতর কাটা-পাথর, ভগ্ন পাথরের মূর্ত্তি, ভাস্কর কার্য্যযুক্ত পাথরের চৌকাট, পদ্ম ও নরনারী মূর্ত্তিযুক্ত পাথর, ৪।৫ হাত লম্বা পাথরের থাম, পাথরের মকরমুখ নর্দ্দমা, দৈর্ঘ্যে তিন হাত ও প্রস্থে দুই হাত লিপিযুক্ত একখণ্ড প্রস্তরফলক এবং কটি হইতে জানু পর্য্যন্ত মালকোচা করিয়া কাপড়পরা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। ঁঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিপিযুক্ত প্রস্তরফলক ও কতকগুলি ভাঙ্গা মূর্ত্তি মিউজিয়ামে পাঠাইবার জন্য কাঁটোয়ায় লইয়া যান। বামনদাস বাবু অনেক পাথর তাঁহার একডালার কাছারীতে পাঠাইয়া দেন। সে সময়ে এখানকার মডেল স্কুলের শিক্ষক ঁদীননাথ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় তাঁহার স্বগ্রাম সালুগাঁ দোগাছিয়া গ্রামে এখান হইতে মকরমুখ নর্দ্দমা ও ক-একটী মূর্ত্তি লইয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামস্থ নানা লোকে সেই সকল কাটা পাথর স্ব স্ব গৃহে আনিয়া নানা কাজে ব্যবহার করিতেছেন। মালকোচা করিয়া কাপড়পরা ভগ্নমূর্তিটী বহুদিন কুলাইচণ্ডীতলায় পড়িয়াছিল। উহা ওজনে প্রায় ২ মণ হইবে। অনেক বলবান্ ব্যক্তি সেই ভগ্ন মূর্ত্তিটী তুলিয়া স্ব স্ব বলপরীক্ষা করিত। স্থানীয় লোকের নিকট তাহা, "বল্লালসেনের বুক" বা "বল্লালসেনের ধড়" বলিয়া পরিচিত ছিল। কিছুদিন হইল বৈরামপুর গ্রামে সেই ধড়টী লইয়া গিয়াছে। এই ধড়টীর অনুসন্ধান আবশ্যক। এখনও "বল্লালের ভিটা" রীতিমত খনন করিলে অনেক পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। যখন 'বহরমপুর রোড' প্রস্তুত হয় নাই, তখন এই ভিটার ধ্বংসাবশেষ সাঁওতার দীঘীর উত্তর পাড় হইতে অরম্ভ হইয়া বরাবর প্রায় অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত ছিল। এখনও ঐ অংশে খনন করিলেই মধ্যে মধ্যে পুরাতন ইট বাহির হয়। পূর্ব্বে এই সাঁওতার দীঘী প্রায় ৪০ বিঘা ছিল, ইহার উপর দিয়া 'বহরমপুর-রোড' গিয়াছে। কিন্তু এখন ইহার অধিকাংশই শুষ্ক গোচারণ মাঠ হইয়া পড়িয়াছে। বল্লালভিটার সংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়ার পশ্চিমাংশে যে

পুরাতন পুষ্করিণী আছে,[৯] তাহার উত্তর পার্শ্বে দেবগ্রামের বয়োবৃদ্ধগণ ৪০ বর্ষ পূর্ব্বেও চারি হাত মোটা চৌকা থামের গোড়া দেখিয়াছিলেন, এখন তাহা চাপা পড়িয়াছে।

দেবগ্রামের প্রাচীন লোকের বিশ্বাস, সাঁওতার উচ্চ জমিতে পূর্ব্বকালে বহু লোকের বাস ছিল—নানা নৈসর্গিক কারণে ও মুসমানবিপ্লবে তাঁহারা পূর্ব্ব স্থান ছাড়িয়া উত্তরে দেবকুণ্ডতীরে আসিয়া বাস করেন।

বিক্রমপুর

বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম দেবগ্রামের ৪ মাইল দক্ষিণে ও সোণাডাঙ্গা হইতে ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই বিক্রমপুর প্রাচীন বিক্রমপুরের অংশমাত্র। এখানকার জমিদারের কাগজ হইতে জানা যায় যে, পার্শ্ববর্ত্তী বরগাছী, কালীনগর, বিক্রমপুরহাটা, বিক্রমপুরকুঠী প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুর মৌজারই সামিল। দেবগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী ডিঙ্গেলগ্রামের দক্ষিণে যে জোল বা নিম্নভূমি আছে, বিক্রমপুরের উত্তরপূর্ব্ব-সীমা ততদূর বিস্তৃত।

বিক্রমপুরের মধ্যে যে 'জাঙ্গীর খাল' আছে, সেই খাল দিয়া পূর্ব্বে ভাগীরথীর স্রোত বহিত। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের পশ্চিমে একটী প্রকাণ্ড মাঠ আছে, উহার নাম 'জিতের মাঠ'। এখানে 'জিতের পুষ্করিণী' নামে একটী সুপ্রাচীন ও বৃহৎ পুষ্করিণী রহিয়াছে! প্রবাদ—উক্ত জিতের মাঠে বহু পূর্ব্বে সহর ছিল। পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে এখনও লোকাবাসের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া ছিল। এখানে অল্প মাটী খুঁড়িলেই বহু পুরাতন লৌহমল এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রাদি 'কুমারের সাজ' পাওয়া যায়। এই স্থান দেখিলেই মনে হইবে যে, বিলুপ্ত সহরের পূর্ব্ব দিয়া এক সময়ে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তিরাজির সমস্তই ভাগীরথীর তরঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান বিক্রমপুরের ষষ্ঠীতলায় ক-এক খণ্ড পাথর পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একখানিতে সামান্য খোদাই কাজ আছে। সাঁওতার বল্লালের ভিটা হইতে যেরূপ কাটা-পাথর বাহির হইয়াছে—এখানকার পাথর সেই ধরণের। নিকটবর্ত্তী গবীপুরে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। প্রবাদ—পুরাকালে এখানে এক রাজার বাড়ী ছিল।

বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্ত্তী সেনপুর ও ঘূর্ণীর মধ্যে অতিপ্রাচীন 'ট্যাংড়ার পুষ্করিণী' আছে। প্রবাদ—উহা বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত।

৯. অল্প দিন হইল গ্রামের কলুরা এই পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করায় ইহার নাম 'কলুপুকুর' হইয়াছে।

'বল্লালসেনের জাঙ্গালের' কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তাহাও সাঁওতা হইতে আরম্ভ হইয়া এই বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া গিয়াছে।[১০]

বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব ঃ পূর্ব্বেই রমিচরিতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, গৌড়াধিপ রামপালের সময় বিক্রম নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ তরঙ্গবহুল বালবলভী প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত অগ্রদ্বীপে শুনিয়া আসিয়াছি যে, বিক্রম নামে এক রাজা প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। বর্দ্ধমানের নূতন গেজেটিয়ারেও লিখিত হইয়াছে যে, উজানি হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে আসিয়া স্নান করিতেন।[১১] পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, দেবগ্রাম ও বিক্রমপুর কাঁটোয়া মহকুমার মধ্যেই ছিল। বিক্রমপুর ও দেবগ্রামের প্রাচীন ভূসংস্থান ও ভাগীরথীর গতি হইতে বেশ মনে হইবে যে, বর্ত্তমান অগ্রদ্বীপের মত দেবগ্রাম এবং বিক্রমপুরও এক সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে অর্থাৎ রাঢ়দেশের মধ্যেই ছিল। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর হইতে মঙ্গলকোট পর্য্যন্ত প্রায় ১২ ক্রোশ ভূভাগ বিক্রম নামক নৃপতির শাসনাধীন থাকা কিছু বিচিত্র নহে। দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাজই সম্ভবতঃ উজানি-মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের পার্শ্বে যে সুবিস্তীর্ণ 'জিতের মাঠ' বা 'জিতের পুষ্করিণী' বিদ্যমান, তাহা 'বিক্রমজিতের মাঠ' বা 'বিক্রমজিতের 'পুষ্করিণী' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার নিকট যে সুপ্রাচীন বিক্রমপুর সহর ছিল, তাহা যে রাজা বিক্রমজিতের প্রতিষ্ঠিত বা তাঁহার নামানুসারেই বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত, তাহাও অসম্ভব নহে।

বিজয়সেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, তিনি বিক্রমপুরের প্রাসাদ হইতে 'শাসন' প্রদান করিতেছেন। এদিকে বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনে তৎপিতা বিজয়সেনের পরিচয় নিবদ্ধ হইয়াছে—

> "তস্মাদভূদখিলপার্থিবচক্রবর্ত্তী নির্ব্যাজবিক্রমতিরস্কৃত সাহসাঙ্কঃ।
> দিক্‌পালচক্রপুটভেদনগীতকীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতির্বিজয়সেনপদপ্রকাশঃ।।"

১০. বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

১১. Burdwan District Gazetter by J.C. Peterson, 1913, p. 183 এখানে সাহেব ভ্রমক্রমে উজানিকে রাজপুতানায় লইয়া ফেলিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার অধীন উজানি-মঙ্গলকোটের বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ উক্ত প্রবাদের নায়ক বলিয়া বোধ হয়।

'তাঁহা (হেমন্তসেন) হইতে অখিল পার্থিব চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অকপট বিক্রমে সাহসাঙ্ক অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যকেও লজ্জিত করিয়াছিলেন এবং (দিক্) পালচক্রের নগরে তাঁহার কীর্ত্তি গীত হইত।'

অন্যত্র দেখিয়াছি যে, একে একে পালরাজগণের সামন্তচক্র নষ্ট করিয়াই মহারাজ বিজয়সেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল।[১২] রামচরিতে দেবগ্রাম-বালবলভীপতি বিক্রমরাজও রামপালের সামন্তচক্র মধ্যেই কথিত হইয়াছেন। রাঢ়ের একাধিপত্য লাভের জন্য বিজয়সেনকে বিক্রম রাজের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই বিক্রমরাজও এক জন অতিবিক্রমশালী নৃপতি ছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ প্রশস্তিকার ভারত প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুল্যজ্ঞান করিয়া 'সাহসাঙ্ক'[১৩] নামেই পরিচিত করিয়া থাকিবেন। বিজয়সেনের প্রশস্তিসম্বলিত তাম্রশাসন বিক্রমপুরের রাজবাটী হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। বল্লালসেনের তাম্রশাসনে 'দিক্‌পালচক্র-পুটভেদনগীতকীর্ত্তিঃ'-প্রসঙ্গে যেন তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে প্রায় ৫৷৷০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত সীতাহাটী গ্রামে ভূমি খননকালে বল্লালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। বল্লালসেন এই তাম্রশাসন লিখিয়া যে ভূভাগ দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ভূভাগ সীতাহাটী হইতে বেশী দূর নয়।[১৪] এই তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈর্ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ"—

অর্থাৎ যে সেনবংশ প্রৌঢ় রাঢ়দেশকে অতুল প্রভাব দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং বল্লালসেনের তাম্রশাসন হইতেই মনে হয় যে, রাঢ়দেশই সেনবংশের পূর্ব্বলীলাস্থল। এই তাম্রশাসনখানি "শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার" হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ণিত বল্লালের ভিটা, বল্লালের দীঘী ও বল্লালের জাঙ্গাল সম্বন্ধীয় প্রবাদ এবং দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান হইতে মনে হয় যে, বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনবর্ণিত "বিক্রমপুরজয়স্কন্ধাবার" বর্ত্তমান দেবগ্রাম বিক্রমপুরের মধ্যেই ছিল।

১২. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা।

১৩. জটাধরের সুপ্রাচীন সংস্কৃত কোষ অভিধানতন্ত্রে 'সাহসাঙ্ক' বিক্রমাদিত্যের নামান্তর বা পর্য্যায় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১৪. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩১৭, ৪র্থ সংখ্যা, ২৩২ পৃষ্ঠা।

চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত আনন্দভট্টের বল্লালচরিতেও লিখিত আছে—বল্লালসেন কখন গৌড়ে, কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন।[১৫] চারিশত বর্ষের এই প্রবাদ বাক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেন্দ্রের মধ্যে গৌড় নগরে, রাঢ় দেশে বিক্রমপুরে এবং বঙ্গদেশে সুবর্ণগ্রামে বল্লালসেন রাজকার্য্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে যে যে স্থানে হিন্দুরাজের রাজধানী ছিল, আজকাল সেই সেই স্থানেই অধিকাংশ মুসলমানের বাস দেখা যায়। বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রামে বা মৌজায় হিন্দুর বাস বেশী নাই, শতকরা ৯০ জন মুসলমান। কেবল ভাগীরথীর তরঙ্গাঘাত নহে—মুসলমান হস্তেও যে এখানকার সমুদয় হিন্দুকীর্ত্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম ও বিক্রমপুর হাটের কতকগুলি পুরাতন ও ভগ্ন দরগাই পূর্ব্বতন মুসলমান-প্রভাবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন[১৬]।

১৫. "বসতিস্ম নৃপঃ শ্রীমান্ পুরা গৌড়ে পুরোত্তমে।
কদাচিদ্বা যথাকামং নগরে বিক্রমে পুরে।
স্বর্ণগ্রামে কদাচিদ্বা প্রাসাদে সুমনোহরে।
রমমাণঃ সহ স্ত্রীভির্দিবীব ত্রিদিবেশ্বরঃ।" —বল্লালচরিত, ১ম অধ্যায়

১৬. দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, সেই জন্য এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না।

সংযোজন

সম্পাদক

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন শুরুর প্রায় দেড় মাস পূর্বে মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাবের উদ্যোগে রাঢ় অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয় এবং শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে শ্রী রাখালরাজ রায়, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী প্রমুখেরা বর্ধমান জেলার কাটোয়া, দাঁইহাট, জগদানন্দপুর, অগ্রদ্বীপ, ঘোড়াইক্ষেত্র, বেগে, দেবগ্রাম, বিক্রমপুর, বিল্বেশ্বর, কুলাই, কেতুগ্রাম, অট্টহাস প্রভৃতি স্থানগুলি পরিদর্শন করেন এবং বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন। ঐ সময় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মঙ্গলকোট ও উজানি অঞ্চল পরিদর্শন করেন। ঐ সমস্ত অঞ্চলে তাঁদের সংগৃহীত তথ্য এবং অনুমান বিভিন্ন প্রবন্ধে লিখিত হয়। সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত এবং সংগৃহীত ছবিগুলি ছায়াচিত্রযোগে (স্লাইড) দেখানো হয়। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে এ ধরনের উদ্যোগ নিশ্চিতভাবে পরবর্তী প্রজন্মকে ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রেরণা জোগায়।

তাঁরা যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদান সাধারণভাবে সংগ্রহ করেছিলেন এবং যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্থানে উৎখননকার্যের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। অজয় নদের তীরে বর্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট এবং পাণ্ডুরাজার ঢিবি নামক স্থান দুটিতে বিংশ শতাব্দীর যাটের দশকে উৎখননের ফলে রাঢ় বঙ্গের বেশ প্রাচীন জনবসতির নানা গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই সমস্ত স্থানগুলিতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একাধিকবার অনুসন্ধান চালানো হয় এবং পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে পাওয়া নিদর্শনগুলি তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পৃক্ত বলে মনে করা হয়েছে যা প্রায় তিন হাজার বছরের প্রাচীন। তাছাড়া বর্ধমান জেলার বীরভানপুর গ্রামে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে উৎখননের ফলে যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি প্রাগৈতিহাসিক মানব গোষ্ঠীর সংস্কৃতির স্বাক্ষর বলে মনে করা হয়েছে। দামোদরের অনতিদূরে বুদবুদ থানায় ভরতপুর গ্রামে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে খনন কার্য চালানো হয়। এখানেও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ক্ষুদ্রাশ্মীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন মিলেছে। বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত বড়বেলুন গ্রাম নিকটবর্তী বাণেশ্বরডাঙ্গায় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উৎখনন কার্য চালানো হয় এবং সেখান থেকে যে সমস্ত প্রত্নবস্তুর সন্ধান মিলেছে সেগুলি পাণ্ডুরাজার ঢিবির সমসাময়িক সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন বলে মনে করা হয়েছে। এছাড়া বর্ধমান

জেলায় প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থানের সন্ধান মিলেছে বহু। অজয়, কুনুর, দামোদর নদীর অববাহিকা অঞ্চল ঘিরে জেলার যে ভৌগোলিক অবস্থান সেটিই হয়তো জেলাকে এক্ষেত্রে আরও সমৃদ্ধ করেছে। উৎখনন কার্য চালানোর অপেক্ষায় রয়েছে বহুস্থান। কাঁকসা থানায় বনকাটি গ্রাম, শিউলিবুড়ীরডাঙ্গা; ভাতার থানায় এরুয়ার, ফরিদপুর থানায় গোপালপুর; মঙ্গলকোট থানায় ধনটিকুরি; মেমারি থানায় সাতদেউলিয়া, মণ্ডলগ্রাম; মন্তেশ্বর থানায় রাইগ্রামের কাছে হাতীপোতার ডাঙ্গা; কেতুগ্রাম থানায় পাচুন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানসমূহে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো সম্ভব হলে ইতিহাসের বহু তথ্য উদ্ধার হতে পারে বলে অনেকেই মনে করেছেন।

এক কথায় বলা যায় প্রায় শতবর্ষ পূর্বে অষ্টম বঙ্গীয় সম্মেলনের সময়কালে রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির সদস্যগণ যে ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং মাটির উপর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে অনুমান তাঁরা করেছিলেন তা মাত্র কয়েকটি প্রত্নক্ষেত্রে উৎখনন কার্যের ফলে এ পর্যন্ত যা আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে তাঁদের অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আরও বলা যায় কোন কোন স্থানে একাধিকবার (চারবার পর্যন্ত) উৎখননকার্য চালিয়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন মাটির নীচে থেকে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। বিগত প্রায় একশত বৎসরে এ ধরনের কাজে সরকারিভাবে অথবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উদ্যোগ খুবই সীমিত ক্ষেত্রে হয়েছে, তবুও এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তা কম গৌরবের বিষয় নয়।

ঋণ স্বীকার ঃ

১. বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম খণ্ড)—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।
২. দুর্গাপুরের ইতিহাস প্রসঙ্গে—মধু চট্টোপাধ্যায়।
৩. বর্ধমানের গুপ্তমুদ্রা—শৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত, প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজীবকান্তি শর্মাধিকারী।
৪. The Excavations of Pandu Rajar Dhibi–Paresh Chandra Das Gupta.

চিত্রাবলী

পীর বহরামের কবর ও জলমধ্যস্থিত ঘর
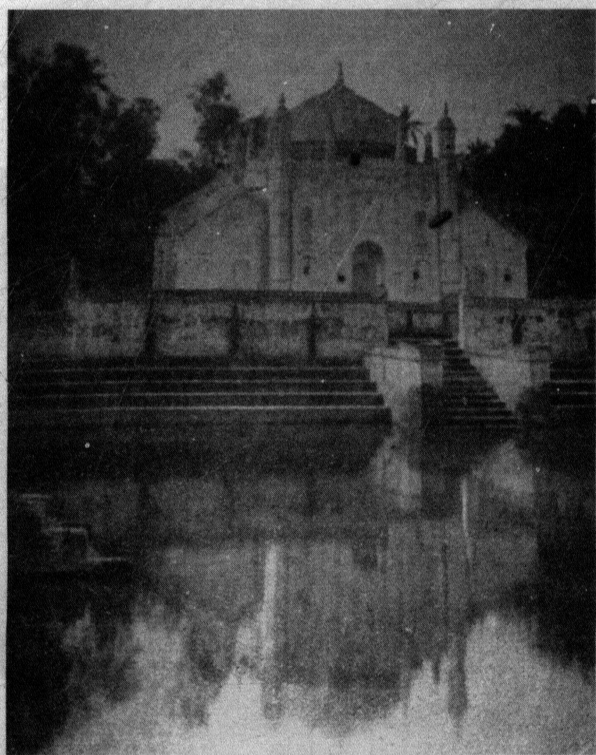
খাজা আনোয়ারের কবর
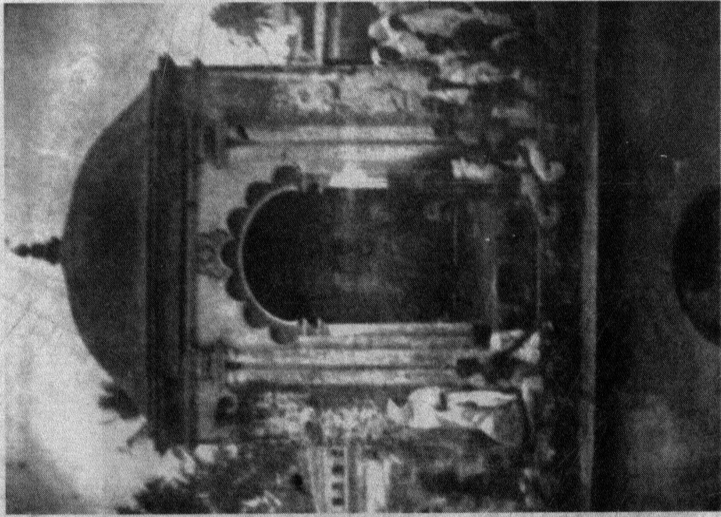
কাটোয়া—গদাধর দাস প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গদেব

কাটোয়া—গৌরাঙ্গবাড়ীর সম্মুখ
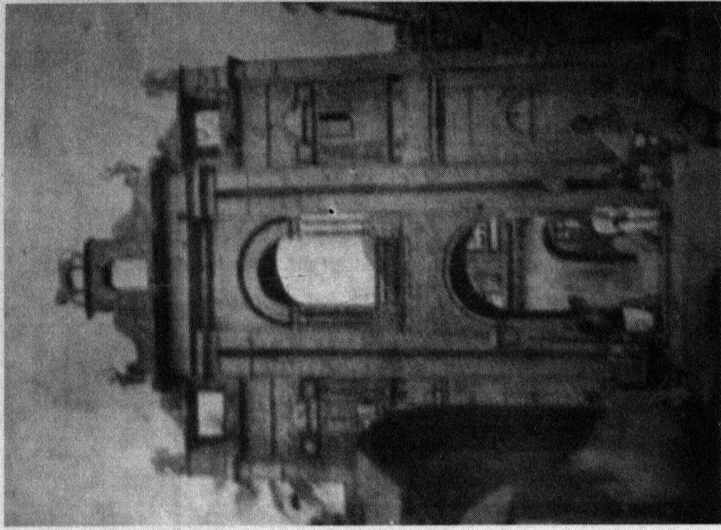
মহাপ্রভুর দীক্ষাস্থান (কেশব ভারতী ও মহাপ্রভুর আসন)

দাঁইহাটের নিকটবর্তী সিদ্ধেশ্বরীর ভগ্ন মন্দির ও রামানন্দের সিদ্ধিস্থান

দাঁইহাট—বর্ধমানরাজের সমাজবাড়ী
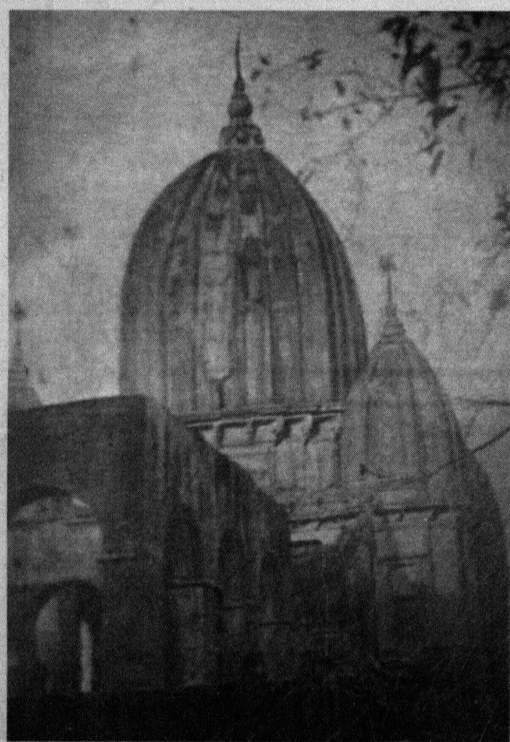
জগদানন্দপুর—রাধাগোবিন্দের প্রস্তরমন্দির

অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ

কেতুগ্রামের বহুলাক্ষী

অট্টহাসের চামুণ্ডা বা মহানন্দা

অট্টহাসের বর্তমান মন্দির

দেবগ্রাম—দেবকুণ্ড হইতে প্রাপ্ত বাসুদেব

দেবগ্রাম—কুলাই চণ্ডী (প্রাচীন মঞ্জুশ্রী)
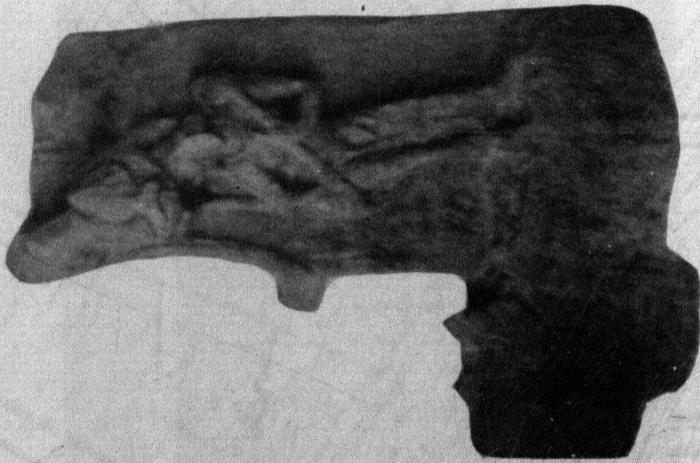
বল্লালের ভিটা থেকে প্রাপ্ত বিষ্ণুর সহচরী

দেবগ্রাম থেকে প্রাপ্ত মাহেশ্বরী (?) মূর্ত্তিযুক্ত প্রস্তর

ইতিহাস শাখা

ইতিহাস-শাখার কার্য্য-বিবরণ

২১এ চৈত্র রবিবার (৪ এপ্রিল ১৯১৫) প্রাতে ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত এবং বৈকালে ৩ হইতে ৫টা পর্য্যন্ত এবং তৎপর দিন প্রাতে ১১টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত এই শাখার অধিবেশন হয়। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের প্রস্তাবে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়কে সভাপতির পদে নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা হয়। সভাপতির অভিভাষণ পাঠের পর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মৈত্র (কাশিমপুর, রাজশাহী) রচিত "প্রত্নাবিষ্টের মর্ম্মচারিণী দেবতার প্রতি সম্বোধন" নামক সুললিত ক্ষুদ্র কবিতা আবৃত্তি করিয়া প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ হয়।

প্রবন্ধের নাম

ক. স্থান-বর্ণনাবিষয়ক

১. রাজার পোতা ও বারাসত—শ্রী সুরেন্দ্রনাথ রায়, এম্‌এ, বিএল, বর্দ্ধমান
২. আওরঙ্গাবাদ—মৌলবী আফ্‌সর্‌উদ্দীন আহমদ্‌, ফরিদপুর
৩. শ্যামরূপার গড়—কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, হেতমপুর
৪. খাজা আনোয়ার—মৌলবী আবদুল্‌ লতিফ, বর্দ্ধমান

খ. জীবনী-বিষয়ক

৫. গুল্‌বদন বেগম—শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা
৬. পীর বহরাম—মৌলবী খুন্দকার ঘুলাম্‌ আহমদ্‌, বর্দ্ধমান
৭. গোরাচাঁদ শাহ
৮. আবেদা খাসবিবি } ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, কলিকাতা

গ. আলোচনা-বিষয়ক

৯. হিন্দুর মুখে আওরংজেবের কথা—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, কলিকাতা
১০. ধীমান্‌ ও বীতপাল—শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র কুমার, কলিকাতা
১১. তারকেশ্বরের তীর্থতত্ত্ব—শ্রী রামকুমার বেদতীর্থ, কৈকালা, হুগলী
১২. সবঙ্গ ও লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন—শ্রী ব্রজনাথ চন্দ, মেদিনীপুর
১৩. কৈবর্ত্তজাতি ও ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণ—শ্রী সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস, ফরিদপুর
১৪. বেদের সরমা—শ্রী শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ত্রিপুরা
১৫. শুক্লী জাতির বিররণ—শ্রী ব্রজনাথ চন্দ, মেদিনীপুর

ঘ. ঐতিহাসিক প্রবন্ধ

১৬. শ্যামে হিন্দুধর্ম্ম—শ্রী গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ, কলিকাতা
১৭. ভারতের সহিত চীনের সম্বন্ধ—শ্রী গুণালঙ্কার মহাস্থবির, কলিকাতা
১৮. ভারতের পণ্য ও ভারতে বৈদেশিক জাতি—গ্রীক যুগ—শ্রী সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, আড়িয়াদহ
১৯. বঙ্গীয় স্থাপত্যের ধারা—শ্রী ননীগোপাল মজুমদার, ভবানীপুর, কলিকাতা
২০. ভারতীয় স্থাপত্য-বিজ্ঞান—শ্রী মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা

ঙ. অর্থনীতি-বিষয়ক

২১. বাজার-দর ও বর্ত্তমান সমস্যা—শ্রী কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম্ এ, কলিকাতা
২২. নগদ-বাকী—শ্রী ক্ষীরোদচন্দ্র পুর-কায়স্থ, এম্ এ, শ্রীহট্ট
২৩. ভারতীয় শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা—শ্রী মন্মথনাথ ঘোষ, এম্ সি, ই, যশোহর

ক. স্থান বর্ণনাবিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে "রাজার পোতা" প্রবন্ধ পাঠ করিবার পর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় গুপ্ত সম্রাটদিগের স্বর্ণ মুদ্রাটি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিলেন। এই শ্রেণীর প্রবন্ধগুলির সংশ্রবে সভাপতি বলিলেন—"দেশের বড় ইতিহাস গাঁথিবার পূর্ব্বে প্রথমে ইট কাঠ সংগ্রহ করা চাই। অর্থাৎ দেশে যেখানে যে পুরাতন কীর্ত্তি, মাটির উপরেই হউক আর মাটির নীচেই হউক, বর্ত্তমান আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া তাহার ঠিক বর্ণনা ও ছায়াচিত্র প্রকাশ করা আবশ্যক. কারণ এগুলি বড় দ্রুত নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আর স্থানীয় প্রবাদগুলি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করা উচিত। প্রবাদ ইতিহাস নহে সত্য, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক সেগুলি পরীক্ষা করিয়া কখন কখন তাহা হইতে পুরাতন সত্য নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হন। স্থানীয় লোকেরা তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যমান কীর্ত্তিচিহ্ন বা প্রবাদ সম্বন্ধে যে অতিরঞ্জিত বিবরণ দেন তাহা গ্রাহ্য নহে। নিরপেক্ষ পণ্ডিতেরা তাহা যাচাই করিয়া লইবেন। আমাদের দেশে এখন অনেক 'জেলার ইতিহাস' লেখা হইতেছে। এ কাজটি উচিত কাজ, এবং এইরূপে সংগৃহীত ঘটনা, স্থান বর্ণনা ও প্রবাদ হইতে ভবিষ্যতে কোন মহাঐতিহাসিক সমস্ত বঙ্গের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিতে সক্ষম হইবেন। বিলাতে এইরূপ পণ্ডিতগণের যত্নে Victoria series of County Histories বাহির হইতেছে, তাহাতে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান আছে। আমরাও যেন সেইরূপ যত্ন ও সত্যনিষ্ঠা সহকারে নিজ নিজ জেলার বর্ণনা ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ করি।"

খ. জীবনী-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পাঠের পর, সভাপতি লেখকদিগের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, ইতিহাস জীবনচরিতের সমষ্টি মাত্র। এ মত সত্য না হইলেও মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ ভিন্ন ঐতিহাসিক পূর্ণ সত্য উপলব্ধি

করা যায় না, এবং দেশের ইতিহাসও লেখা যায় না। স্থানীয় তাপস ও সাধুগণের জীবনী হইতে আমরা দেশের উপর দিয়া প্রাচীন বিশ্বাসের ও ধর্ম্মের অগ্রসর হইবার পথ চিনিতে পারি এবং তাহার ইতিহাস রচনা করিতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি যে, জ্ঞানরাজ্যের বর্ত্তমান কোন্ অতীত হইতে উদ্ভুত হইয়াছে।"

গ. আলোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে "হিন্দুর মুখে আওরংজেবের কথা"—শাস্ত্রীমহাশয় স্বয়ং আসিয়া এই প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহার পর শাখা-সভাপতি বলিলেন, —"পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গের জীবিত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অগ্রণী। তিনি আমাদের সকলের গুরুস্থানীয়। সুতরাং তাঁহার মুখে প্রশংসা লাভ করিয়া আমি নিজের পরিশ্রম সফল মনে করি। কিন্তু আমার রচিত ইংরাজী "আওরাংজীবের ইতিহাসের" ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট পড়িলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, আমি শুধু মুসলমান লেখকগণের উক্তির উপর নির্ভর করি নাই। প্রথমতঃ, সমসাময়িক যে সমস্ত গ্রন্থ ও চিঠি ব্যবহার করিয়াছি তাহা ফার্সী ভাষায় লিখিত হইলেও তাহার অনেকের লেখক হিন্দু। তদ্ভিন্ন হিন্দু-রচিত আসামী, হিন্দী ও মারাঠী ভাষার বুরঞ্জী, বখর ও কাব্যাদি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। সে সব সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ তৎকালীন ভারতের ইতিহাসের সাক্ষী ছিলেন, তাঁহাদের বৃত্তান্তও আমার কাজে লাগিয়াছে।"

(দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রবন্ধ পড়িবার পূর্ব্বেই এই কার্য্য-বিবরণীর পরিশিষ্টের জন্য ছাপা হইয়াছিল, সুতরাং অন্যান্য প্রবন্ধের মত ইহাতে পাঠের পূর্ব্বে যে অংশগুলি বর্জ্জন বা পরিবর্ত্তন করা হয় তাহা এখন টীকা দ্বারা নির্দ্দেশ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। পাঠকগণ এই প্রবন্ধের ৭ম পত্রে যে সংশোধন ও মন্তব্যগুলি ছাপা হইয়াছে তাহা পড়িবেন, প্রার্থনা করি।)

"ধীমান ও বীতপাল"—এই প্রবন্ধের একস্থলে লেখা ছিল যে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি বিনা প্রমাণে রাজশাহীতে সংগৃহীত মূর্ত্তিগুলি ধীমানের খোদিত বলিয়া জগতে প্রচার করিতে চান, কারণ ওগুলি তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক জনৈক ভদ্রলোকের জমীদারীতে পাওয়া গিয়াছিল। সভায় কেহ কেহ এই ব্যক্তিগত শ্লেষে আপত্তি উত্থাপন করেন। শাখা-সভাপতি তাঁহাদের পক্ষে মত দিয়া বলিলেন, "এই প্রবন্ধ অনেক পূর্ব্বে মূল সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয়কে দেওয়া হয়। তিনি ইহা সাহিত্যশাখার কাগজ-পত্রের মধ্যে রাখিয়া ইতিহাস-শাখা বসিবার পূর্ব্বরাত্রে আমার হস্তে দেন। শাস্ত্রীমহাশয় কর্ত্তৃক সাহিত্যশাখার প্রবন্ধগুলির সহিত ইহাও পরীক্ষিত ও মার্জ্জিত হইয়াছে এই বিশ্বাসে আমি নিজে ইহা পড়িয়া দেখি নাই। সেই জন্য এই আপত্তিজনক কথাটি ইহাতে রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমি সে কয়েক পংক্তি এখনই কাটিয়া দিলাম. এবং তাহা ছাপা হইবে না। লেখক যে অভিপ্রায় আরোপণ করিয়াছেন তাহা কাল্পনিক।

কিন্তু প্রবন্ধটিতে অনেক সত্যকথা আছে। (১) তারানাথ নামক লামা ১৬০০ খৃষ্টাব্দে যে গ্রন্থ লেখেন তাহা ৭০০—১১০০ খৃষ্টাব্দ সম্বন্ধে সমসাময়িক বা প্রামাণিক তথ্যের আকর বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দেখা গিয়াছে যে, অনেক স্থলে উৎকীর্ণ লিপি তারানাথের সপক্ষে, কোন কোন স্থলে বিপক্ষে; সুতরাং যে স্থলে তারানাথ আমাদের একমাত্র অবলম্বন, সে স্থলে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করা নিরাপদ নহে; আমরা তথায় কোন মতই পোষণ করিব না। (২) একটি মূর্ত্তি বা চিত্র কোন বিশেষ শিল্পীর রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে, হয় তাঁহার নাম উহার উপর উৎকীর্ণ বা লিখিত থাকা উচিত, না হয় তাঁহার রচিত বলিয়া অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত অনেকগুলি মূর্ত্তি বা চিত্র দেখিয়া তাঁহার কলা-পদ্ধতি প্রকাশক চিহ্নগুলি আমাদের নিকট সুপরিচিত হওয়া উচিত। রাজশাহীতে সংগৃহীত মূর্ত্তিগুলিতে এ দুইয়েরই অভাব, সুতরাং তাহা যে ধীমানের রচিত এই মত কল্পনামাত্র, বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রতিপাদিত সত্য নহে।"

"তারকেশ্বরের তীর্থতত্ত্ব"—এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল না, কারণ ইহাতে যে তথা কথিত ফরাসী ভ্রমণকারীর মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাঁহার ঠিক নাম ও গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠা লেখক জানেন না, তিনি অপর একজন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের প্রবন্ধ হইতে এই যুক্তি নকল করিয়াছেন, এরূপ বলিলেন। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ইতিপূর্ব্বে কিয়ৎ পরিমাণে মুদ্রিত হইয়াছিল।

"সবঙ্গ ও লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন"—প্রবন্ধে উদ্ধৃত শীলালিপির পাঠগুলি অতি পুরাতন ও বর্ত্তমানে অনেক স্থলে অশুদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত। ইহা সভার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, লেখকের মতের চুম্বকমাত্র পড়া হয়।

এখানে প্রবন্ধটি মুদ্রিত করা গেল না।

"শুক্লীজাতির বিবরণ" নামক প্রবন্ধেরও সংক্ষিপ্তসার সভার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। লেখকের মতটি বিচার করিবার বিষয়, কিন্তু গ্রহণের উপযোগী প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত নহে।

ঘ. ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে "শ্যামে হিন্দুধর্ম্ম" পাঠের পর সভাপতি বলিলেন, শ্যাম ও কোচিন-আনাম (বর্ত্তমান ফরাসী অধিকৃত "ইণ্ডোচায়না" প্রদেশ) এক সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ স্বরূপ অনেক কীর্ত্তি, বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও শব্দ এখনও তথায় বিদ্যামান আছে। এ গুলির চর্চ্চা করিবার জন্য ফরাসী গবর্ণমেন্ট ঐ প্রদেশের প্রধান শহর Hanoi তে একটি উচ্চ বিদ্যালয় (French School of the Extreme Orient) স্থাপন করিয়াছেন, এবং তথায় একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী পণ্ডিত (Mons. Ohavanues) কে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণার ফল ফরাসী ভাষায় (Bulletin of the Fr. School of the extreme নামক পত্রিকায়) প্রকাশ হয়, তাহার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনিও

বঙ্গদেশে আমাদের কর্ণে পৌঁছে না। গণপতি বাবু এই নূতন জ্ঞানরাজ্যের আভাস প্রদান করিয়া আজ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিলেন।"

"ভারতের পণ্য ও ভারতে বৈদেশিকজাতি" নামক প্রবন্ধ পাঠের পর, সভাপতির আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার বলিলেন, "এই বিষয়ে ইউরোপের আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার ফল এই প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয় নাই। লেখক অনেক সেকেলে ইংরাজী গ্রন্থের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে আর এখন গ্রাহ্য করা হয় না। তিনি Periplus of the Erythraean Sea নামক অতি প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থের Schoff কর্ত্তৃক রচিত নব অনুবাদ ও তাহার মূল্যবান টীকাগুলি ব্যবহার করিলে অনেক অধিক ও বিশুদ্ধ তথ্য পাইতে পারিতেন।"

"ভারতীয় স্থাপত্য-বিজ্ঞান" প্রবন্ধের যে অংশে তর্কবিতর্ক, পৌরাণিক কাহিনীকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ এবং লেখকের মতের বিরুদ্ধবাদীদিগকে 'ইউরোপীয় লেখক-দিগের উচ্ছিষ্টভোজী' বলা প্রভৃতি অসংযত ভাষা ছিল, তাহা পরিবর্জন করিয়া, প্রবন্ধের প্রকৃত মূল্যবান অংশটুকু পাঠ করা হয়, এবং তাহাই এখানে ছাপান হইল।

ঙ. অর্থনীতিবিষয়ক প্রবন্ধগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত রচিত "বাজার দর ও বর্ত্তমান সমস্যা" পাঠের পর সভা একবাক্যে সাধুবাদ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সভাপতি বলিলেন, "একজন সাহেব অর্থনীতিকে **'কটমট বিদ্যা'** (the dismal science) বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যদি এই প্রবন্ধ শুনিতেন তবে নিশ্চয়ই নিজের মত ভুল বলিয়া স্বীকার করিতেন। কালীপ্রসন্ন বাবু অর্থনীতির তত্ত্বগুলি এত সহজ ও সরস ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই সভায় উপস্থিত বালকবৃদ্ধ সকলেই সেগুলি বুঝিতে পারিয়াছেন। এরূপ যত্ন ও দক্ষতার সহিত লিখিত প্রবন্ধ আরও বেশী পাইলে আমাদের ভবিষ্যত সম্মিলনে একটি স্বতন্ত্র 'অর্থ-নীতি-শাখা' খুলিতে হইবে।"

প্রথম দিন বৈকালে "বর্দ্ধমানের পুরাতত্ত্ব" নামক পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। ইহাতে দেবগ্রাম যে সেনরাজাদিগের বিক্রমপুর ছিল এরূপ দাবী করা হয় নাই, শুধু ঐ সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে মাত্র। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, যতীন্দ্রনাথ রায় এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করিবার পর সভাপতি তর্ক থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই পুস্তিকা অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে আপনাদিগকে প্রীতি-উপহার স্বরূপ বিতরণ করা হইল। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে এখানে সমবেত ঐতিহাসিক ব্রাহ্মণেরা সম্মতি দিলেন যে দেবগ্রামই সেই ঐতিহাসিক বিক্রমপুর। ফলতঃ নগেন বাবু বলিতেছেন যে, ঢাকায় বিক্রমপুর ছিল এই প্রাচীন মতের ভিত্তি পরীক্ষা করা আবশ্যক হইয়াছে। সে সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে না। বৃথা বাকবিতণ্ডা অপেক্ষা খনন কার্য্যে অধিক ফল হইবে।

বর্দ্ধমানাধিপতি এই দেবগ্রাম খনন কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সম্মত হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন। কোন্ জেলায় বিক্রমপুর বল্লালসেনের ঐতিহাসিক বিক্রমপুর ছিল এ সম্বন্ধে আমরা এখন এক মত হইতে পারি না, হয়ত কখনও পারিব না, কিন্তু দেবগ্রামের তথাকথিত "বল্লালসেনের ভিটা" উৎখাত করার প্রস্তাবে কোন প্রত্নতত্ত্ব-সেবকই অমত করিবেন না।"

দ্বিতীয় দিবস সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া শাখা-সভার কার্য্য শেষ করা হইল।

অভিভাষণ

শ্রী যদুনাথ সরকার

এই যে দেশময় ইতিহাস-চর্চ্চার একটা প্রবৃত্তি জাগরুক হইয়াছে, এই যে কেহ কেহ দুঃখ ক'রে বলিতেছেন 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছোটগল্পকে বাঙ্গালা মাসিকের পৃষ্ঠা হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছে' এ সু-খবর যদি সত্য হয়, তবে জাতীয় মনের এই বিকাশ সম্বন্ধে সাহিত্য-নেতা ও পরিষৎগুলির এক গুরুতর কর্ত্তব্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর বেশীদিন অবহেলা করিলে চলিবে না। আমাদের কর্ত্তব্য, এই নবজাগ্রত ইতিহাসসেবার চেষ্টাকে সমবায় সূত্রে বাঁধি, এই উদ্যমকে উপদেশ দ্বারা সংযত ও উচিতপথে চালিত করি, যেন বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যয় না হয়, যেন শ্রমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন হয়, যেন যন্ত্রের বা প্রণালীর দোষে ঐতিহাসিক কারিগরের প্রস্তুত দ্রব্যগুলি অঙ্গহীন বা ভঙ্গুর আকার ধারণ না করে। সুধীমণ্ডলীই এই কাজ করিতে পারেন। ব্যক্তিবিশেষ একাকী এই কাজ করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহার অধিকারও সাধারণে স্বীকার না করিতে পারে। সকলেই জানেন যে কারিগর যেরূপ যন্ত্র হাতে পায় এবং যেরূপ প্রণালীতে কাজ করে, তাহার প্রস্তুত দ্রব্যও তেমনি হয়। মহামেধাবীর সুদীর্ঘ পরিশ্রমের ফলও যন্ত্রের দোষে বিশ্রী ও অকার্য্যকর হয়। আর উচিত প্রণালী অবলম্বন না করিলে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ইতিহাস-চর্চ্চার যাহা শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা বৈজ্ঞ.নিক পন্থা। দেশকালভেদে বা বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে এই পন্থাটি ভিন্ন হয় না, কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রের সকল বিভাগেই ইহা সমান কার্য্যকর, এবং সর্ব্ববিধ সত্যের অন্তরে ইহা নিহিত রহিয়াছে। আমরা যদি জাতীয়তার অভিমানে মত্ত হইয়া, এই প্রথা নব্য ইউরোপীয়গণ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে অবহেলা করি, তবে আমাদেরই ক্ষতি হইবে। জগৎ অগ্রসর হইবে ; শুধু আমরা মধ্যযুগে পড়িয়া থাকিব; আমাদের রচিত ইতিহাস বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ সুতরাং অশুদ্ধ হইবে ; এবং বিদেশীরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে ইতিহাস রচনা করিয়া যাইতেছেন, তাহাই সত্যের বলে বলীয়ান্ হইয়া কিছুদিন পরে আমাদের প্রাচীন ধরণের ঐতিহাসিক জল্পনা কল্পনাকে পরাস্ত করিবেই করিবে। কারণ ঋষিবাক্য মনে রাখিবেন —"সত্যই জয় লাভ করে, অসত্য করে না!"

ঐতিহাসিকের কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝিলে ইতিহাস লিখিবার শ্রেষ্ঠ প্রণালী জানিতে পারা যায়। প্রকৃত ইতিহাস অতীতকে জীবন্ত করিয়া চোখের সাম্‌নে উপস্থিত করে; আমরা যেন সেই সুদূর কালের লোকদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ভাবে

ভাবি, তাহাদের সুখ দুঃখ আশা ভয় আমাদের হৃদয়ে অনুভব করি। এইরূপে অতীতকাল সম্বন্ধে অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ সত্য উপলব্ধি করাই ইতিহাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির উপর ইতিহাস দাঁড়াইয়া থাকে। যদি সেই সত্য নির্দ্ধারিত না হইল, যদি অতীতের একটা মনগড়া ছবি খাড়া করি অথবা আংশিক ছবি আঁকিয়াই ক্ষান্ত হই, তবে ত কল্পনার জগতেই থাকিলাম। তারপর সে বিষয়ে যাহাই লিখি বা বিশ্বাস করি তাহা বালুকার ভিত্তির উপর তেতলা বাড়ী নির্ম্মাণের চেষ্টা মাত্র।

সত্য-নির্দ্ধারণের প্রণালী কি? সর্ব্বপ্রথমে নিজের মনকে এই কার্য্যের উপযোগী করিয়া তোলা। যশ, ধন, বা প্রতিপত্তি লাভের লালসা দূর করিয়া, নিজের অন্তরের অনুরাগ বিরাগ দমন করিয়া, সব পূর্ব্ব-সংস্কার ত্যাগ করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে;

মোরা সত্যের পরে মন
আজি করিব সমর্পণ!
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্যধন!

সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। আমার স্বদেশ-গৌরবকে আঘাত করুক আর না করুক, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিব না। সত্য প্রচার করিবার জন্য, সমাজে বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয়, সহিব; কিন্তু তবুও সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব। ইহাই ঐতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা। ভারতের অতি প্রাচীনকালের কথা, মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতির রাজকাহিনী যদি কাল্পনিক বলিয়া ধরি, তবে হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি হইবে, এই যে আমাদের একটি স্বাভাবিক ধারণা আছে, তাহা উচ্ছেদ করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে প্রমাণ না পাইলে কিছুই বিশ্বাস করিব না।

প্রামাণিক ঘটনা হইতেই ইতিহাসের আরম্ভ। এই জন্য ইউরোপে ইতিহাস রচনায় এক ক্রমোন্নতির ধারা দেখিতে পাই। জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত পুরাতন মত, পুরাতন গ্রন্থ ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়া হইতেছে। আইনের পুস্তকের মত ইতিহাসেরও ক্রমাগত নূতন সংস্করণ কিনিতে হইতেছে। পিতামহদের সময় হইতে আগত বিশ্বাসের মূল পরীক্ষা করিয়া, সেই পুরাতন অট্টালিকাগুলি ক্রমাগত নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাঁহাদের স্থানে নূতন নূতন গৃহ রচিত হইতেছে। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত কিছু পরে দিতেছি।

সভ্যতা, সমাজ ও বিশ্বাসের বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন ইতিহাসের বিষয়ের মধ্যে বটে। ইহার মানবের লিখিত সাক্ষী না পাইলেও মানবের হাতের কাজ কত যুগ ধরিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে সঞ্চিত আছে। কিন্তু ইতিহাস বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা

বুঝি তাহার আরম্ভ প্রামাণিক ঘটনা হইতে। প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ ও বিচার করা ঐতিহাসিকের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। এই মূল মন্ত্রটি এত সহজ, আপনারা প্রত্যহ আদালতে, সাংসারিক কাজে, ইহার এত ব্যবহার করেন, যে ইহার ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক বোধ হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের নানা প্রদেশে লিখিত আধুনিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় যে ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম আমরা এখনও স্বীকার করি নাই।

সাক্ষ্য পাইলেই আপনারা তিনটি প্রশ্ন করেন,—(১) সর্ব্বাগ্রে কে এজাহার দিয়াছে? সেই first information এর নকলটা সংগ্রহ হইয়াছে ত? পুলিস ডায়েরীর গোপনীয় নকল কি করিয়া পাওয়া যায়?

(২) এই সাক্ষীটি ঘটনা জানিবার কি সুযোগ পাইয়াছিল? এ কি স্বচক্ষে দেখিয়াছে, না পরের কথা শুনিয়া বলিতেছে?

(৩) মোকদ্দমার কোন পক্ষের সহিত ইহার স্বার্থ জড়িত আছে কি?

প্রত্যেক ইতিহাস-লেখককেও পদে পদে এই প্রশ্ন তিনটি করিতে হয়। ঘটনা সম্বন্ধে যাহারা কিছু লিখিয়া গিয়াছে, তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত, শ্রেণী বিভাগ, পরস্পরের উক্তির বিরোধভঞ্জন ও সমালোচনা করিয়া, তবে ইতিহাস লেখা আরম্ভ করা উচিত। প্রথমে এইরূপ তালিকা (critical bibliography) সংগ্রহ না করিয়া রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যে মহা ভ্রম তাহা আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝি না।

বর্ণিত ঘটনার সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান সাক্ষীর উক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সমসাময়িক লেখক না থাকিলে, ঘটনার যত অদূরবর্ত্তী সাক্ষী পাওয়া যায় ততই ভাল। পুরাতন বিররণ সংক্ষিপ্ত বা কর্কশভাষায় লিখিত হইলেও, আধুনিক সময়ের সুদীর্ঘ ও সুললিত বর্ণনার উপরে তাহাকে স্থান দিতে হইবে। আদি গ্রন্থ পাইলে অনুবাদ ব্যবহার করা অনুচিত।

অথচ আমাদের দেশের অনেক ঐতিহাসিকের নিকট মুড়ী মুড়কী এবং সীতাভোগের একই দর। ঘটনা সম্বন্ধে যাহারাই দুকথা লিখিয়া গিয়াছে সকলেই সমান বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া আমরা মানিয়া লই; বিচার করি না, সমালোচনা করি না, সত্যের আদি উৎসে পৌঁছিতে চেষ্টা করি না। এই দেখুন, পাঠান যুগের ভারত ইতিহাস লিখিতে গিয়া আমরা ফিরিষ্‌তা এবং আল্‌বাদায়ূণীর উপর, এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মুঘল সম্রাটগণ সম্বন্ধে খাফি খাঁর উপর অন্ধ ভক্তি করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করি। অথচ এই তিন লেখকই বর্ণিত ঘটনার অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ ঐ যুগের সমসাময়িক বিবরণ হইতে শুধু সংকলন করেন। আমরা সেই সব সমসাময়িক বিররণ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি না; তাহা যে গ্রহণের উপযোগী এ কথাও মনে মনে বিশ্বাস করি না। একজন সমসাময়িক সাক্ষীর বিরুদ্ধে হাজার জন পরবর্ত্তী যুগের নকলনবিশ

খাড়া হইলেও ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদের সাক্ষ্যের কোন মূল্য নাই, তাহাদের কথা সমালোচনা হইতে পারে, ইতিহাসের মূল উপাদান নহে,—এই সত্যটি কার্য্যতঃ মানিয়া লই না।

আবার, সাক্ষীটি সত্য জানিবার কতটুকু সুযোগ পাইয়াছিল, তাহা দেখা আবশ্যক। এই যেমন, শাহজাহানের পুত্র শূজা আরাকানে মারা যান; যেখানে হিন্দু মুসলমানের যাতায়াত নিষেধ ছিল, মগরাজা ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ ভিন্ন অন্য বিদেশীকে তাঁহার রাজ্যে ঢুকিতে দিতেন। এই ইউরোপীয় বণিকগণ শূজার শেষ দশা সম্বন্ধে যে সংবাদ ভারতে তাহাদের কুঠীতে প্রেরণ করে তাহা বর্ণিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কিছু, কিছু এবং আর্ভিন-অনূদিত মানুশীর আত্মজীবনীতে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। অথচ আমাদের লেখকেরা অন্য সব স্থান হইতে নানা গুজব সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ পূরণ করেন, এই দুই গ্রন্থ দেখেন না, দেখিলেও ইহাদের উক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করেন না।

আদি সাক্ষীর অনুসন্ধান করায় বিলাতে ইতিহাসক্ষেত্রে কি রাষ্ট্রবিপ্লবের ন্যায় পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ৪ শত বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডরাজ ৩য় রিচার্ড ইতিহাসে নরপিশাচ বলিয়া বর্ণিত হইয়া আসিতেছেন। অধুনা সার্ ক্লেমেন্টস্ মার্কহাম্ এই বিশ্বাসের ভিত্তি পরীক্ষা করিয়া ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা পড়িয়া আসিতেছি যে স্পেনের ভিসিগথ বংশীয় শেষ রাজা রডেরিক্ তাঁহার সেনাপতি জুলিয়ানের কন্যার প্রতি অত্যাচার করায়, জুলিয়ান মুসলমানদের ডাকিয়া রাজাকে বিনষ্ট করে। কিন্তু ডোজিপ্রভৃতির অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণ হইয়াছে যে এই বিররণটি উপন্যাস মাত্র; রমণীর প্রতি অত্যাচারের গল্প ঘটনার ছয় শত বৎসর পরে একজন ইটালীয় সন্ন্যাসী প্রথম রচনা করে; জুলিয়ান বলিয়া কেহ ছিল না; যে স্পেনদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মুসলমানদের পক্ষ লয় তাহার নাম আর্বান; রডেরিক স্পেনরাজ্যের ন্যায্য অধিকারী ছিলেন না, ইত্যাদি। ফলতঃ আরবদের স্পেন-বিজয়-কাহিনী একেবারে নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে; পুরুষগণের নাম ও চরিত্র, ঘটনা পরম্পরা, ঘটনার কারণ পর্য্যন্ত বদলাইয়া দিতে হইতেছে। নেপোলিয়ন সম্বন্ধে তিয়র্ (Thiers) যে ইতিহাস লিখিয়া যান, এবং যাহা আমাদের দেশে আদৃত য়্যাবটের নেপোলিয়ন-চরিতের মূল, তাহা নানা দেশের সরকারী কাগজ পত্র ও গোপনীয় চিঠি অনুসন্ধানের ফলে এখন শিক্ষিত সমাজে কাব্য বলিয়া ঘৃণায় পরিত্যক্ত হয়। অথচ এই নব অনুসন্ধানের ফল যেখানে একত্রীভূত করা হইয়াছে সেই Holland Rose's *Life of Napoleon I* এর নাম পর্য্যন্ত আমরা অনেকে শুনি নাই। সেই য়্যাবট্ লইয়াই আমরা নেপোলিয়ন জোসেফিন প্রভৃতির চরিত্র বর্ণনা করিতেছি। আমাদের দ্বিতীয় নীলমণি টডের "রাজস্থান"ও যে অনেকস্থলে অবিশ্বাসযোগ্য উপন্যাস মাত্র, একথা আমরা ভাবি না।

আসল গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিতে অনুবাদের উপর নির্ভর করা যে কি ভুল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গ্র্যান্ট ডফের "মারাঠাজাতির ইতিহাস" এক উপাদেয় গ্রন্থ; অথচ ডফ্ সাহেবের পণ্ডিত ভুল করায় আফ্‌জল খাঁর দূতের নাম শিবাজীর দূতকে দেওয়া হইয়াছে। এটি নগণ্য বিষয় নহে; আফজল খাঁর দূত যদি শিবাজীর টাকা খাইয়া নিজ প্রভুকে বধ্যভূমিতে ভুলাইয়া আনিত তবে সে বিশ্বাস-ঘাতক হইত; শিবাজীর দূতের পক্ষে ঐ কাজ ততদূর নীতিগর্হিত নহে। সেই মত, Dow's *History of Hindostan* নামক একখানা ইংরাজী গ্রন্থ অনেকে মুঘল-সম্রাটদের অতি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস মনে করিয়া তাহার মত উদ্ধৃত করেন; অথচ ডাওসাহেব সমসাময়িক ও প্রামাণিক কোন ফার্সী গ্রন্থ ব্যবহার করেন নাই, এবং যে সব নব্য ফার্সী গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন তাহারও বিশুদ্ধ বা অবিকল অনুবাদ দেন নাই; অধিকাংশ স্থলেই নিজের কল্পনাবলে সুরঞ্জিত কাহিনী লিখিয়াছেন। এখন পণ্ডিতসমাজে কেহই ডাও-এর গ্রন্থকে ইতিহাস বলিয়া মানেন না। সমসাময়িক লেখককে অন্ধভাবে বিশ্বাস করিয়া পূর্ব্বে গ্রীস দেশের ইতিহাস রচিত হইত। কিন্তু এখন প্রস্তরফলক, মুদ্রা প্রভৃতির সাহায্যে এবং যুক্তিসঙ্গত সমালোচনার ফলে গ্রীস-ইতিহাসে যে, কি মহাপরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বিউরী (Bury) প্রণীত *History of Greece* পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ ইসলামের অভ্যুদয় ও আদি যুগের বিশুদ্ধ ইতিহাস নব প্রকাশিত *Cambridge Medieval History* তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে অনেক ভ্রম দূর করে।

অতএব যদি মারাঠা ভাষাবিদ্ লেখক শুধু গ্র্যান্টডফ্ অবলম্বনে এবং ফার্সী জানা লেখক ডাও অবলম্বনে ইতিহাস লেখেন তবে সে পুস্তকের মূল্য কি? তাহা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারে না। এরূপ গ্রন্থের আমরা কেন আদর করিব? এরূপ উপগ্রন্থ, মহাগ্রন্থের গায়ে পরগাছা গ্রন্থকে বিলাতে rechauffee বলে, অর্থাৎ বাসি চপ্ কাট্‌লেট্ পর দিন গরম করিয়া টাট্‌কা জিনিষ বলিয়া বেচিবার চেষ্টা করা হইতেছে, এরূপ মাল। বাঙ্গালা সাহিত্যে যদি এইরূপ গরম করা বাসি ইতিহাসের বেশী কাট্‌তি হইতে দেওয়া যায়, তবে সাহিত্য ভোক্তাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ শঙ্কিত হইতে হইবে। এরূপ গ্রন্থের নির্ম্মম সমালোচনা করা একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, যদিও ইহা অত্যন্ত অপ্রীতিকর। এ কাজ ব্যক্তিবিশেষ না কবিয়া সুধীমণ্ডলী করিলে ভাল দেখায়, এবং তাহাতে বেশী ফল হয়।

যেখানে অনুবাদ ব্যবহার না করিলে চলে না, সেখানে সর্ব্বশেষে রচিত অথবা সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অনুবাদটি অবলম্বন করিতে হইবে। এই দেখুন, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর ইংরাজী দুই অনুবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাইস্ ও এণ্ডারসন্ নামক দুইজন সাহেব বাহির করেন; তাহা অত্যন্ত অশুদ্ধ ফার্সী পুঁথী অবলম্বনে লিখিত, এবং অনুবাদকেরাও অনেক স্থলে অর্থ ভুল বুঝিয়াছেন। ঐ পুস্তকের বিশুদ্ধ ফার্সী

পাঠ অবলম্বন করিয়া রজার্স সাহেব যে ইংরাজী অনুবাদ রচনা করেন তাহাতে মূল্যবান ভৌগোলিক টীকা ও সংশোধনী যোগ করিয়া দিয়া বেভরিজ সাহেব তাহা কয়েক বৎসর হইল প্রকাশ করিয়াছেন। যদি আমরা প্রথমোক্ত অশুদ্ধ ইংরাজী অনুবাদের বাঙ্গালা অনুবাদ করি, রজার্সের অনুবাদ দেখা আবশ্যক বিবেচনা করি না, তবে এরূপ অনুবাদে বঙ্গ সাহিত্য পরিপুষ্ট হইল, এ কথা বলা যায় না। সেই মত, চীন পর্য্যটকদিগের ভ্রমণকাহিনীর, মানুশীর গ্রন্থের এবং অশোকের অনুশাসনের একাধিক ইংরাজী অনুবাদ আছে। তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদটিই বাঙ্গালা লেখকেরা ব্যবহার করুন, এই বলিয়া জেদ করা সুধীমণ্ডলীর কর্ত্তব্য।

কখন কখন বাধ্য হইয়া অনুবাদের অনুবাদ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু কোটেসনের কোটেসন তস্য কোটেসন কেন ব্যবহার করিব? ইংরাজীতে একটি বড় কাজের কথা আছে, "Always verify your references" অর্থাৎ যাঁহার মত উল্লেখ করিলে, তিনি ঠিক সেই কথা গুলি বলিয়াছেন কি না তাহা ভাল করিয়া দেখিবে। আমি যে পরের বচনটি তুলিয়া দিলাম, তাহা কাহার বচন এবং কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত তাহা নির্দ্দেশ না করিলে সাহিত্যিক আসাধুতা হয় এবং ভ্রম সংশোধনেও বাধা পড়ে।

ইতিহাস লেখক বিস্তৃত ও বিশুদ্ধ প্রমাণ-পঞ্জী দিতে বাধ্য। আইনের পুস্তক যেমন গুড়ী গুড়ী অক্ষরে ছাপা নজীরের উল্লেখ পূর্ণ না হইলে চলে না, তেমনি ইতিহাসও বর্জাইস অক্ষরের ফুটনোটে আবৃত হওয়া আবশ্যক; ইহা পাণ্ডিত্য ফলাইবার উপায় নহে। ইহা না থাকিলে গ্রন্থের মূল্যহানি হয়। প্রত্যেক প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রতি পৃষ্ঠার পাদদেশে টীকা দিয়া তাহাতে প্রামাণিক গ্রন্থের নাম, সংস্করণ বা প্রকাশের বৎসর, পৃষ্ঠাঙ্ক প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুদ্ধ করিয়া উল্লেখ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন। আমাদের বড় দোষ যে আমরা অনেকেই নিজের রচিত ইতিহাস বা প্রবন্ধে এইরূপ আদি বৃত্তান্তের নাম ও পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লেখ করার পরিশ্রমটুকু সহিতে চাহি না; হয়ত প্রথমে কতকগুলি গ্রন্থের নাম মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিই। ইহাতে আমাদের জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত ভ্রমগুলি সংশোধন করিবার উপায় থাকে না, এবং জ্ঞানপিপাসু পাঠকও নিজে আদিবৃত্তান্ত পড়িয়া কোন বিষয়ে বেশী জানিবার পথ দেখিতে পান না।

এই যে সব প্রণালী এ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিলাম, তাহা হিসাব রাখার মত শুধু পরিশ্রমের কাজ, ইহাতে বিশেষ মেধার আবশ্যক নাই। আমরা যদি এই কাজ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি এবং আলস্য ত্যাগ করি, তবে আমাদের মধ্যে সকলেই এ কাজ করিতে পারেন।

এখন ইতিহাস রচনার আরও উচ্চতর সোপানে চড়া যাউক। ইতিহাস-লেখক ব্যক্তিগত ভ্রম সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন; একই ঘটনার উপর ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আলোকপাত করিবেন। শত্রুপক্ষ ইহা বলিয়াছে, মিত্রপক্ষ উহা বলিয়াছে,

বিদেশী ভ্রমণকারী এরূপ দেখিয়া গিয়াছে, স্বদেশী কবি ওরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে—এই সকল তথ্য একত্র করিয়া, তাহার মধ্যে কোন্ সাক্ষীটি বিশ্বাসযোগ্য এবং কতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য তাহা স্থির করিলে, তবে অতীত ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়। যদি ইতিহাসে কোন পক্ষ প্রথমে এক তর্ফা ডিক্রী পান, তবে তাহা এক দিন আপসেট্ হইবেই হইবে, কারণ জগতের জ্ঞানের আদালতে আপীল কখন তমেয়াদি দোষে বারিত হয় না; শত শত বৎসর পরেও অন্যায় মতের বিরুদ্ধে নালিশ করা চলে; আপীলের চূড়ান্ত সীমা সত্য নির্দ্ধারণ পর্য্যন্ত গিয়া তবে থামে। যদি মার্জ্জনা করেন, তবে আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দুটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। আমি এখন মিরজুমলার আসাম ও কুচবিহার জয়ের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত আছি; এজন্য এক পক্ষে মুঘল সংবাদদাতার ফার্সী গ্রন্থ ও বাদশাহী ফার্সী ইতিহাস, অপর পক্ষে আসামীদের লিখিত বুরঞ্জী এবং একজন ডাচ্ জাহাজী সৈন্যের কাহিনী ব্যবহার করিতে হইতেছে। সেই মত, শিবাজীর ও শম্ভাজীর কার্য্যকলাপের জন্য মুঘল বাদশাহদিগের পক্ষে লিখিত ফার্সী ইতিহাস, দুইজন সমসাময়িক নিরপেক্ষ হিন্দুর লিখিত ফার্সী ইতিহাস. বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের জন্য লিখিত ফার্সী ইতিহাস, মারাঠী ভাষায় লিখিত বখর ও পত্রাদি, এবং ইউরোপীয় বণিকদের সাক্ষ্য,—এই পাঁচ প্রকার বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

ঘটনার সত্য নির্দ্ধারণ করিয়াই ঐতিহাসিকের কার্য্য শেষ হইল না। অতীত যুগের বাহ্য আবরণ, তাহার গায়ের চামড়াটি. চক্ষুর সম্মুখে সহজে আনা যায়; কিন্তু তাহার হৃদয়টি দেখাইতে না পারিলে প্রকৃত ইতিহাস হয় না। শুধু রাজার রাজ্য পরিবর্ত্তন, যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া ইতিহাস নহে। ইতিহাস দর্শন নামের যোগ্য, কিন্তু পদেপদে দৃষ্টান্ত নজীর দেখাইয়া এই দর্শন লিখিতে হয়। দার্শনিক না হইলে প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক হওয়া যায় না। কিন্তু এরূপ লেখক ক্ষণজন্মা পুরুষ, আমাদের পরিষৎ বা সম্মিলন তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং সুধীমণ্ডলীর চেষ্টায় এ মহাকার্য্যের যতদূর সাহায্য হইতে পারে, কেবল তাহার বিষয়েই আমি বলিব।

১. প্রত্যেক বিভাগের প্রধান প্রধান বিষয়ে ও শাখায় যে কয়খানি বই হইতে ন্যূনতম ও সর্ব্বাধিক মূল্যবান জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে, তাহার তালিকা প্রকাশ। সেই বিষয়ে দেশী বিদেশী পণ্ডিতমণ্ডলী এ পর্য্যন্ত কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার ঠিক বিবরণ এই সব বই হইতেই আমরা পাইব। পূর্ব্বে অর্জ্জিত জ্ঞানের সিঁড়ির উপর না দাঁড়াইলে আমরা বিদ্যা বৃক্ষের উচ্চতর শাখায় চড়িতে পারি না।

২. পরিষৎ ও অন্য সুধীমণ্ডলী অথবা মহানুভব জমিদারগণ এই সব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক, প্রাচীন মুদ্রার সচিত্র তালিকা, লণ্ডন ও বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটিদ্বয়ের গত ৩০ বৎসরের পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান্ এন্টিকোয়েরী ও এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, সার্বেয়ার জেনেরালের আফিস হইতে প্রকাশিত ১ইঞ্চ = ৪ মাইল স্কেলের ভারতবর্ষের ম্যাপ,

প্রভৃতি অত্যাবশ্যক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। সে গুলির মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া এক এক বাক্স গ্রন্থ ক্রমান্বয়ে সমস্ত শাখা পরিষৎ ও মফস্বলের বিশ্বাসযোগ্য পুস্তকালয় ঘুরিয়া আসিবে। আমাদের গবর্ণমেন্ট চিকিৎসা-বিভাগে এইরূপ ভ্রাম্যমান পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া মফস্বলের ছোট ছোট শহরের ডাক্তারদের জ্ঞানের বিস্তার ও নবীনতার উপায় করিয়া দিয়াছেন।

৩. মূল পরিষদের এক বিভাগ খুলিতে হইবে যাহার নিকট আবেদন করিলে জিজ্ঞাসু নিজের চর্চ্চার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক রচিত প্রমাণ-পঞ্জী পাইবেন। পরিষৎ বাছিয়া ইতিহাসের প্রতি শাখার জন্য এক বা দুই জন বিশেষজ্ঞ স্থির করিবেন, এবং জিজ্ঞাসুর পত্রখানি উপযুক্ত শাখার বিশেষজ্ঞের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, তিনি তাহার উত্তর দিবেন। এই সব বিশেষজ্ঞের নাম ও ঠিকানা পরিষৎ পত্রিকায় সর্ব্বদা ছাপা থাকিবে, এবং তাঁহারা জিজ্ঞাসুদের নিকট যে সব সমালোচনা পূর্ণ প্রমাণ-পঞ্জীর (critical bibliography) পাঠাইবেন, তাহাও প্রকাশিত হইবে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মডার্ণ রিবিউয়ে শিখ ইতিহাস সম্বন্ধে এরূপ একটি তালিকা প্রকাশিত হয়।

আমাদের সম্মিলন বঙ্গভাষা-ভাষীদিগের। সুতরাং ঐতিহাসিক চর্চ্চার অত্যাবশ্যক গ্রন্থগুলি বাঙ্গলা আকারে সাধারণের হাতে দিতে না পারিলে আমাদের কর্ত্তব্যে ত্রুটি হইবে। এই দেখুন প্রতি বৎসর শত শত বঙ্গভাষী সংস্কৃত পরীক্ষা দেয়; তাহারা ইংরাজী জানে না, এবং অসংখ্য বাঙ্গালা মাসিকের পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি খুঁজিয়া পড়িবার অবসর এবং সুযোগও তাহাদের নাই। সুতরাং ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে যে সব নব নব সত্য ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই সব ছাত্রদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাহারা প্রত্নতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাস সম্বন্ধে এখনও মধ্যযুগে বাস করিতেছে; মানবজ্ঞান যে এতদিনে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার কিছুই জানে না। অথচ তাহাদের মধ্যে অনেক মেধাবী ও মৌলিকতাসম্পন্ন ছাত্র আছে; দেশ সম্বন্ধে, তাহাদের পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে, নিজ ধর্ম্ম জাতি সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হইতে শুধু ত্রিভাষী নয় বলিয়া ইহারা যে চিরবঞ্চিত হইয়া থাকিতেছে, ইহা কি পরিতাপের কথা নয়? প্রাচীন লেখমালার উদাহরণ হিন্দীতে গ্রন্থাকারে একত্র ছাপা হইয়াছে; বাঙ্গালায় হয় নাই। (নব প্রকাশিত "গৌড়লেখমালা" আংশিক গ্রন্থ।) ভিন্সেন্ট স্মিথ রচিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং ম্যাকডনেলের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় অনুবাদ করা হয় নাই, ইহা আমাদের মণ্ডলীর পক্ষে লজ্জার বিষয়। গুজরাতী ভাষা বাঙ্গালার চেয়ে কত কম লোক বলে, অথচ গুজরাতী ভাষার সেবকগণের আগ্রহ, শ্রমশীলতা ও দূরদর্শিতার ফলে সর্ব্ববিধ বিভাগের পুস্তকের অনুবাদে গুজরাত ছাইয়া গিয়াছে। আর আমরা বঙ্কিম রবীন্দ্রের মৌলিকতার গর্ব্ব করিয়া অলস হইয়া বসিয়া আছি! লোকশিক্ষার দিকে দৃষ্টি নাই! অথচ এই লোকশিক্ষার

প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়ার ফলে ক্রমে গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে সাধারণের জ্ঞানের সীমা বঙ্গের লোকসমষ্টির জ্ঞানের সীমাকে অতিক্রম করিবে। তখন বাঙ্গালীর মানসিক প্রাধান্য কোথায় থাকিবে? পুনা ও বরোডা ভ্রমণ করিয়া তথাকার স্কুল গুলি দেখিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, আর বিশ বৎসরের মধ্যে মারাঠাগণ জ্ঞানের বিস্তৃতিতে বাঙ্গালীদিগকে পিছু ফেলিয়া যাইবে।

ইতিহাসের জ্ঞান জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান। যে পরিমাণে অতীত জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করিব, যে পরিমাণে অতীতের উপদেশগুলি বর্ত্তমানে লাগাইতে পারিব, সেই পরিমাণে আমাদের জনগণ-মন উচিত পথে ধাবিত হইবে, শক্তি ফল প্রসব করিবে। আর যে পরিমাণে আমরা অসত্য বা অর্দ্ধসত্য লাভ করিয়াই সচেষ্ট থাকিব; সেই পরিমাণেই অমাদের জাতীয় উন্নতিতে বাধা পড়িবে, জনসমষ্টির শ্রম বিফল হইবে।

ইতিহাস কাব্য নহে। চিত্তবিনোদক ললিত আখ্যা অথবা শুষ্ক গবেষণাই ইহার চরম ফল নহে। অধ্যাপক সীলী সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন রাষ্ট্রনেতার, সমাজনেতার পক্ষে ইতিহাস সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, পথ-প্রদর্শক মহাবন্ধু। ইতিহাসের সাহায্যে অতীতকালের স্বরূপ জানিয়া সেই জ্ঞান বর্তমানে প্রয়োগ করিতে হইবে। দূরবর্ত্তী যুগে বা দেশে মানবভ্রাতারা কি করিয়া উঠিলেন, কি কারণে পাড়িলেন, রাজা, সমাজ ধর্ম্ম কিরূপে গঠিত হইল, কি জন্য ভাঙ্গিল, সেই তত্ত্ব বলিয়া আমাদের নিজের জীবন্ত সমাজের গতি ফিরাইতে হইবে। অতীত হইতে উদ্ধার করা সত্য ও দৃষ্টান্তের দীপশিখা আমাদেরই ভবিষ্যতের পথে রশ্মিপাত করিবে। ইহাই ইতিহাস চর্চার চরম লাভ।

মহা কবিদের সম্বন্ধে সত্যই বলা হইয়াছে যে তাঁহারা অমরধামে গমন করিবার পরও পৃথিবীতে নিজ আত্মা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা শিখি ঃ

ব্যক্তিগত গৌরব কি? লজ্জার বিষয় কি?
লোকে কিসে বল লাভ করে, কিসে পঙ্গু হয়?— (কীটস্)

সেই রূপ আমরা বলিতে পারি যে প্রকৃত ঐতিহাসিক জনসঙ্ঘকে, ব্যক্তি সমষ্টিকে শিখান, কিসে জাতীয় উত্থান-পতন, রোগ-স্বাস্থ্য, নবজীবন লাভ, মৃত্যুও ঘটে। এই মহাশিবতন্ত্র, এই জাতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সাধনা বিনা, সত্য নিষ্ঠা বিনা, ক্রমোন্নতির অদম্য স্পৃহা বিনা লাভ করা সম্ভব নয়।

হিন্দুর মুখে আরঞ্জেবের কথা

মহামহোপাধ্যায় শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আমাদের দেশে যাঁহারা ইতিহাস লেখেন, তাঁহাদের সংস্কার এ দেশে ইতিহাসের মালমসলা পাওয়া যায় না। ইতিহাস কাহাকে বলে, এ দেশের লোক তাহা জানিত না। এ দেশে কখন ইতিহাস লিখিত না। এ পৃথিবীটাকে তাহারা অসার, অপদার্থ মনে করিত বলিয়া, এ পৃথিবীর কোন ঘটনাই তাহাদের মনে লাগিত না। তাহারা পরকালের জন্যই ব্যস্ত থাকিত, পরকালের চিন্তাতেই জীবন কাটাইয়া দিত।

এ দেশের লোকের এতটা নিন্দা করা উচিত কিনা জানি না। ইহারা বড় বড় ইতিহাসের বই লেখে নাই সত্য, কিন্তু ছোটখাট বই যে একেবারে লেখে নাই, তাহা বলিতে পারি না। হর্ষচরিত পাকা ইতিহাস, রামচরিত পাকা ইতিহাস, দ্ব্যাশ্রয়কোষ পাকা ইতিহাস, রাজতরঙ্গিণীও পাকা ইতিহাস। খুজিলে আরও মিলে, নবসাহসাঙ্কচরিত, বিক্রমার্কচরিত ইত্যাদি পুস্তক কাব্য হইলেও এই পৃথিবীর ঘটনা লইয়াই লেখা। ইহারাও ইতিহাস। খুঁজিলে যে আরও ইতিহাস মিলিবে না, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। নেপালের যে চলিত বংশাবলী আছে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া রাইট সাহেব তাঁহার বই লিখিয়া গিয়াছেন, নেপালে যত পুথি আছে তাহার পুষ্পিকা ধরিয়া দেখা গেল যে, সে বংশাবলী এখন হইতে ৩০০।৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক হইলেও, তাহার আগে সব ভূল। তখন পুথির পুষ্পিকা হইতেই প্রথম রাজাবলী ও পরে ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা হইল। রাজাবলীটা এক রকম তৈয়ার হইয়াও গেল। চলিত বংশাবলীতে বলে যে, হরিসিংহ ১৩২১ খৃঃ অব্দে নেপাল আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া লন ও সেই অবধিই তাঁহার বংশধরেরা নেপালের রাজা। কিন্তু পুষ্পিকায বাজাবলী আর একরূপ হইয়া গেল। হরিসিংহের পর জন কতক নেপালী রাজার নাম পাওয়া গেল। তাহার পর দুজন রাণীর নাম, তাহার পর মল্লগণের অর্থাৎ হরিসিংহের বংশধরগণের নাম। পুষ্পিকার কথাই আমরা বিশ্বাস করিলাম। নেপালীরা চটিয়া গেল। বেশ গোলযোগ চলিতে লাগিল। তাহার পর ১৮৯৮।৯৯ সালে খুজিতে খুজিতে একখানি তালপাতের লেখা ছোট বংশাবলী পাইলাম। উহার শেষ রাজা প্রায় ৩০০ বৎসরের পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। বংশাবলীখানি প্রাচীন বলিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া পড়া গেল। পড়া বড় কঠিন, সেকালের কথাবার্ত্তার ভাষায় লেখা। সে ভাষা কেহই জানে না। যাহা হউক তাহা হইতে জানা গেল যে, হরিসিংহ একবার মাত্র আক্রমণ করিয়াছিলেন, দেশ দখল কবিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রায় ৫ পুরুষ পরে বিবাহসূত্রে তাঁহার বংশে নেপাল রাজ্য যায়। পুষ্পিকার ইতিহাস ও বংশাবলীর ইতিহাস মিলিয়া গেল। এখনকার

বংশাবলী ভুল বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেল। বাঙ্গালারও এইরূপ নূতন বংশাবলী দুই শত, আড়াই শত বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক থাকে। তাহার আগে গেলেই একটু গোলমাল, সমাজ যত দিন এক ভাবে রয়, তত দিন সব ঠিক থাকে। কিন্তু একটা যদি বিপ্লব হইয়া যায় তাহা হইলে ফের বংশাবলীও গোলমাল হইয়া যায়। আবার সেই কালের বংশাবলী খুজিতে হয়, তবে ঠিক কথা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের কুলশাস্ত্র অনেক দিনের, প্রায় বার শত বৎসরের। ইহার মধ্যে অনেক বিপ্লব হইয়া গিয়াছে সুতরাং অনেক জায়গায় গোল আছে। বিশেষ যত্ন করিয়া বহুকাল ধরিয়া খুজিয়া, খুব মন দিয়া পড়িয়া, তবে কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ঠিক নয়, স্থির করা যাইতে পারে। সেইটা যখন হইবে, তখন বার শত বৎসেরর একটা ইতিহাসের আদরা তৈয়ার হইবে।

আতি পুরাণ কালের ইতিহাস লিখিতে গেলে হিন্দুদের বই পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু মুসলমান-বিজয় হইতে এই যে আট শত বৎসর হইয়া গিয়াছে, ইহার জন্য সত্যই কি মুসলমানদের লেখা ছাড়া আর কোনও ইতিহাস নাই? অন্তত ইতিহাসের মালমসলাও কি একেবারে পাওয়া যায় না? যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কলঙ্কের কথা বটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস খুব বড় বই না থাকুক, ছোট ছোট রাজাদের ছোট ছোট ইতিহাস আছেই আছে এবং খোজ করিলে পাওয়া যাইবেই যাইবে। আমাদের অদ্যকার সভাপতি মহাশয় আরঞ্জেবের রাজত্ব-সম্বন্ধে মুসলমানদের দিক হইতে যত সংবাদ পাওয়া যায়, সব সংবাদই দিয়াছেন। তাঁহার আরঞ্জেবের ইতিহাস অতি সুন্দর গ্রন্থ। লোকে আরঞ্জেবকে যত মন্দ বলে, তিনি যে ততটা ছিলেন না, সেটা উনি বেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। উনি আরও দেখাইয়াছেন যে, আরঞ্জেব একজন খুব ভাল রাজা ছিলেন। প্রজা হিন্দু হউক আর মুসলমান হউক, প্রজার উন্নতিতে যে রাজার উন্নতি, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন এবং সেই মত কার্য্যও করিতেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বে প্রজা বেশ সুখে ছিল। তাঁহার সুবেদারেরা গর্ব্ব করিতেন যে, তাঁহারা টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় করাইতেছেন। কিন্তু আমি বলি, হিন্দুর দিক হইতে মালমসলা সংগ্রহ করিয়া কি আরঞ্জেবের একটা ইতিহাস লেখা যায় না? এত বড় ভারতবর্ষটা,—এ দেশের নানা ভাষা, নানা সাহিত্যে রহিয়াছে, সমস্ত একত্র করিয়া খুজিলে কি আরঞ্জেবের একটা ইতিহাস লেখা যায় না? আমার বিশ্বাস যায়। কেন বিশ্বাস ক্রমে বলিতেছি।

ইতিহাসে বাঙ্গলাই সকলের পিছনে পড়িয়াছে। এইখান হইতে আরঞ্জেবের ইতিহাসের কোন খবরই পাওয়া যাইবে না, লোকের দৃঢ় বিশ্বাস। আমি কিন্তু জানি, এখান হইতেও গোটা কতক মালমসলা সংগ্রহ হইতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করিয়া খুজিতে হয়। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন মল্লিক দুইখানি সংস্কৃত পুথি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি এই দুইখানি কি?" আমি দেখিলাম, এক খানি ১৬২৯ শকে লেখা, আর তাহার পাশে লেখা আছে 'সাহারং দেবস্য পঞ্চত্বাব্দে'। ব্রহ্মমোহনবাবু

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও রাজাটি কে? সাহারং দেব কে?' আমি ত প্রথমে ভাবিয়াই আকুল। হঠাৎ ১৬২৯ শকে ৭৮ যোগ করিয়া দেখিলাম ১৭০৭ হয়। তখন আমি বলিলাম, "সাহারং দেব—সাহা আরঞ্জেব। কারণ, তিনি ১৭০৭ অথবা ১৬২৯ শকে মরেন।" আমরা সেই কালের লোকের হস্তের একটা প্রমাণ পাইলাম যে, আরঞ্জেব ১৭০৭ খৃঃ অব্দে মরেন। অথচ এটা এক জন পাকা হিন্দুর হাতের লেখা পুঁথি হইতে।

বুদ্ধচরিত নামে এক অদ্ভুত পুথি আছে, পুঁথি এক খানি বৈ লেখা হয় নাই। নাথুরাম নামে যোশীমঠে এক পণ্ডিত কাশীতে রামাপুরায় বাস করিতেন। তিনি মারাঠী, মৈথিলি, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী জন কতক বিদ্যার্থী লইয়া বুদ্ধচরিত নামে এক প্রকাণ্ড পুথি লেখান, পুথির আগাগোড়া পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানে এক টুকরো ওখানে এক টুকরো পাওয়া যায়। বিন্ধ্বেশ্বরীপ্রসাদ দুবে মহাশয়ের নিকট যে অংশ আছে, সেটা প্রায় এক শত পাতা। কিসের জন্য সে পুঁথি লেখা হয়, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ফরুখসিয়ারের রাজত্বকালে লেখা হয়। তাহাতে সব মোগল বাদসাদের নাম পাইলাম এবং কাহার পর কে রাজা হইয়াছেন, তাহাও পাইলাম।

ত্রিপুরা ও কুচবিহারে হাতের লেখা যে সকল রাজাবলী আছে, তাহাতে অনেক জায়গায় আরঞ্জেবের সহিত যে তাঁহাদের সন্ধি-বিগ্রহ হইয়াছিল, তাহা লেখা আছে। কুমায়ুন-গড়োয়ালের রাজাবলীতেও তাহাই আছে। আরঞ্জেবের সময় কুমায়ূনে বাজবাহাদুর চন্দ্র নামে এক জন বড় রাজা ছিলেন। তিনি একবার মহাসমারোহে আরঞ্জেবের সহিত দেখাও করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ আদর পান নাই। তাঁহার ঠাকুরদাদা আকবরের কাছে যে আদর পাইয়াছিলেন, তাহার দশভাগের এক ভাগও তিনি পান নাই। সুতরাং দেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি আরঞ্জেবের অনেক বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। রাজবাহাদুর চন্দ্র এক জন বড় রাজা ছিলেন। তিনি আপদেবের পুত্র অনন্তদেব নামে একজন মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণকে মহারাষ্ট্র হইতে আনাইয়া কাশীতে বাস করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা একটা স্মৃতি-নিবন্ধ লেখাইয়া ছিলেন। আরঞ্জেবের সময় অনেক রাজপুত রাজা তাঁহার চাকরী করিতেন, কেহ কেহ তাঁহার সহিত যুদ্ধও করিতেন। তাঁহাদের সকলেরই ইতিহাস আছে। কাহারও দপ্তরখানায় যাইবার প্রয়োজন হয় না; ভাট ও চারণের পুঁথি হইতেই অনেক মালমসলা সংগ্রহ হইতে পারে। আরঞ্জেবের একজন প্রধান সেনাপতি যোধপুরের রাজা যশোবন্তসিংহের প্রধান মন্ত্রী মুতা নয়ানসী রাজপুতাঁনার একখানি মস্ত ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার নাম খ্যাত নয়ানসী। রাজপুতেরা বলে, খ্যাত নয়ানসী তাহাদের যথার্থ ইতিহাস। কিন্তু নয়ানসীর কথা তাহার পূর্ব্বের দুই তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক। তাহার আগে গেলেই শিলালেখের সহিত তফাৎ হইয়া পড়ে। নয়ানসীর পর অনেক খ্যাত লেখা হইয়াছে।

সেই সময়ের কথা যাহা লিখিয়াছে, তাহাই ঠিক, তাহার আগের কথা একটু একটু বেঠিক।

নয়ানসী যে শুধু একখানি খ্যাত লিখিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাহা নয়। আমি তাঁহার বাড়ী গিয়া দেখিয়াছি যে, তিনি সমস্ত রাজপুত রাজ্যের আয়-ব্যয়ের বিবরণও লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস যেমন প্রসিদ্ধ, এ আয়-ব্যয়ের বিবরণটা তত প্রসিদ্ধ নয়। কিন্তু এ বিবরণ খুব বিস্তৃত, ইহাতে মোগল-সাম্রাজ্যের আরঞ্জেবের সময়ের একটা প্রকাণ্ড দেশের অনেক বিররণ পাওয়া যায়।

আরঞ্জেবের মৃত্যুর ২০ বৎসরের মধ্যে যোধপুরের রাজা অভয়সিংহ গুজরাটের সুবাদার হন। তিনি একজন পোকর্ণা ব্রাহ্মণকে হিসাবের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সে ব্রাহ্মণের বংশ এখনও আছে। তাহাদের বলে খ্যাতবালা জোষী। তাহাদের বাড়ীতে গুজরাট সুবার অনেক দিনের হিসাবপত্র মজুত আছে, ইহাতেও আরঞ্জেবের আর একটি সুবার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

যোধপুরের কেল্লায় পুস্তকপ্রকাশ নামে একটি পুঁথিখানা আছে। উহাতে সংস্কৃতে লেখা ২ খানি মহাকাব্য আছে, এক খানির নাম অজিতোদয় ও আর এক খানির নাম অভয়োদয়। অজিতোদয়ে অজিতসিংহের বাল্যকাল হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত মোগলদের সহিত তাঁহার যত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়, সমস্ত ইতিহাস আছে। বাস্তবিকই আরঞ্জেব অজিতসিংহের উপর যেরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি ৪/৫ বার অজিতসিংহকে আপন দরবারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। অজিতসিংহ কিছুতেই যান নাই। যোধপুরের সিংহদের বাড়ীতে আরঞ্জেবের পাঞ্জাওয়ালা ঐ সকল চিঠিপত্র আছে। যশোবন্তসিংহ যখন মরেন, তখন অজিতের বয়স ৫বৎসর। অজিতের একটি ভাই ছিল, তাহার বয়স ৩ বৎসর। উহাদিগকে দিল্লীতে আটক করিয়া আরঞ্জেব সমস্ত মাড়বার রাজ্য দখল করিয়া লন। দিল্লীতে উহাদের প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া দুর্গাদাস রাঠোর ও মুকুন্দ খীচী উগাদিগকে লইয়া পলায়ন করেন। চারিদিকে পাহারা, দিল্লী সহর, তাহার ভিতর হইতে পলায়ন—অতি অদ্ভুত ব্যাপার! শিবাজী সন্দেসের গুড়ায় পালাইয়া ছিলেন। মুকুন্দ খীচী এবার সাপুড়ে সাজিলেন, জোড়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে দিল্লীর মাঝখান দিয়া চলিয়া গেলেন; কাঁধে বাঁক, বাঁকের দুই দিকে সিকে, প্রত্যেক সিকেয় ৩টি করিয়া সাপের পেঁড়ি। উপরের পেঁড়িতে গোখরো সাপ, মাঝের পেঁড়িতে অজিত; নীচের পেঁড়িতে আবার গোখরো সাপ। এইরূপ আর এক সিকের মাঝখানে অজিতের ভাই। মুকুন্দ খীচী জোড়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে দিল্লীর মাঝখান দিয়া যাইয়া যমুনা পার হইয়া, কিছু দূরে ঘোড়া তৈয়ার ছিল, তাহাতে চড়িয়া পলায়ন করিলেন। অজিতের প্রাণরক্ষা হইল। দুর্গাদাস রাণীকে লইয়া ক্রমে দিল্লী ত্যাগ করিলেন। ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

দুর্গাদাস সন্ন্যাসী সাজিলেন। অজিত তাঁহার চেলা হইলেন। অজিতের ভাই মরিয়া গেল। দুর্গাদাস ক্রমে রাঠোরদিগকে একত্র করিয়া অনেকগুলি পরগণা ও শেষে যোধপুরের কেল্লাটি পর্য্যন্ত দখল করিয়া লইলেন। মেড়তা ও তাহার নিকটবর্ত্তী পরগণাগুলি দিল্লীর হইয়া গেল। ১০।১২ বৎসর পরে রাঠোরেরা যখন দুর্গাদাসকে ধরিয়া বসিল, "আমরা কাহার জন্য যুদ্ধ করিতেছি? আমাদের রাজা কোথায়?" দুর্গাদাস বলিলেন, "৩।৪ দিন পরে তোমাদের রাজা আসিবেন ও এখানে দরবার করিবেন"। দরবার হইল, সব রাঠোর আসিয়া জুটিল, কেহই রাজাকে চেনে না। রাজা কিন্তু সকলকেই চিনেন এবং যে যে উপকার করিয়াছে এবং যে স্থানে যে বীরত্ব দেখাইয়াছে, তিনি সব জানেন। দুর্গাদাসের চেলাভাবে তিনি সব চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। রাঠোরেরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। রাজার এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া তাহারা আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহারা অদম্য উৎসাহে মোগলের অধিকৃত সকল যায়গা দখল করিতে লাগিল।

আরঞ্জেব আবার অজিতকে ভুলাইয়া দিল্লী লইবার চেষ্টা করিলেন, হইল না। তিনি এক নূতন কল করিলেন, তিনি দুর্গাদাসকে দিল্লীতে ডাকাইয়া লইয়া তাঁহাকে যোধপুরের পাট্টা লিখিয়া দিলেন। মনে করিলেন, ইহাতে অজিত ও দুর্গাদাস—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস হইবে। কিন্তু দুর্গাদাসেরও প্রভুভক্তি টলিল না, অজিতেরও অবিশ্বাস হইল না। আরঞ্জেবের মতলব সিদ্ধ হইল না বলিয়া তিনি আর এক কল করিলেন। তিনি দুর্গাদাসকে দিল্লীর মুন্‌সবদারি দিলেন। ক্রমে অজিত ও দুর্গাদাসের মনোমালিন্য হইল। দুর্গাদাস মাড়বার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু আরঞ্জেব তথাপি অজিতের কিছু করিতে পারিলেন না। রাঠোরেরা এখন খুব দল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

এইরূপে যাবজ্জীবন আরঞ্জেবের জ্বালায় জ্বালাতন হওয়ার পর একদিন খবরওয়ালা আসিয়া খবর দিয়া গেল, আরঞ্জেব মরিয়াছে। সেই দিন অজিতের বুক ফাটিয়া এক গাথা বাহির হইল—

"আইয়ো খবর অচিন্ত্যরী
মিট গীয়ো তনরী দাহ।
কসীদা ইম ভাখী ও
মরগীও আওরঙ্গ সাহ।"

'যাহা আমি কখন চিন্তা করি নাই, এমন খবর আসিয়াছে। আমার তনুর দাহ মিটিয়া গিয়াছে। খবরওয়ালারা বলিয়া গেল, আওরঙ্গ সা মরিয়াছে।' যোধপুরের লড়াই লইয়া কত কাব্য, কত গীত, কত দোহা যে আছে—তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

যোধপুরে যেমন, তেমনি প্রত্যেক রাজপুতরাজ্যের ইতিহাসে ও ভাট-চারণের পুথিতে আরঞ্জেবের রাজ্যের অনেক খবর পাওয়া যাইতে পারে। বিকানিয়ারের রাজা

অনুপসিং আরঙ্গেবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তিনি দক্ষিণ দেশে আরঙ্গেবের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারই বীরত্বে আদোনী সহর দখল হয়। আদোনীতে ইহার পূর্ব্বে কখনও মুসলমান যায় নাই, আদোনীর ব্রাহ্মণেরা সমস্ত পাঁজি-পুথি লইয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিতে গেল। অনুপসিং তাঁহাদের বলিলেন, "কেন নষ্ট করিয়া ফেলিবে, আমাকে দাও। আমি উহা যত্ন করিয়া রাখিব।" সেই পুথি তিনি আনিয়া বিকানিয়ারের কেল্লায় রাখিয়াছেন। রাজপুতাঁনায় তত বড় পুথিখানা আর কোথাও নাই। অনুপসিং দক্ষিণদেশ হইতে ৩৬ ক্রোর দেবতা লইয়া আসিয়াছিলেন। বিকানিয়ারের কেল্লায় এখনও তাঁহাদের পূজা হয়। তিনি অনেক দেশের পণ্ডিত সংগ্রহ করিয়া এক খানি প্রকাণ্ড স্মৃতি-নিবন্ধ লেখাইয়াছিলেন। উহার নাম 'অনূপবিলাস'। উহা এখনও কোথাও কোথাও চলে। তিনি কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নাগোজী ভট্টকে লইয়া গিয়া একখানি পুথি লেখাইয়া ছিলেন। অনুপসিং-এর তত্ত্বাবধানে শিবতাণ্ডব তন্ত্রের টীকাও লেখা হয়।

জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহ আরঙ্গেবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার ইতিহাসেও আরঙ্গেবের রাজত্বের অনেক খবর পাওয়া যায়। তাঁহারই কথামত শিবাজী দিল্লী আসিয়াছিলেন। যাঁহার তত্ত্বাবধানে শিবাজী দিল্লীতে থাকিতেন, তিনি জয়পুরের একজন জায়গীরদার আচ্‌রোলের ঠাকুর। আচ্‌রোলের বাড়ীতে শিবাজীর অনেক কথা এখনও পাওয়া যায়। বুঁদীর হাড়াচৌহানরাজ আরঙ্গেবের এক জন সেনাপতি ছিলেন। বংশ ভাস্কর নামে হাড়াচৌহানদের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস আছে, উহাতেও আরঙ্গেবের রাজত্বের অনেক খবর পাওয়া যায়। কারণ, হাড়ারা খুব বীর ছিলেন এবং আরঙ্গেবের হইয়া অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শত্রুশল্যচরিত নামে এক খানি সংস্কৃত বই আছে, এখানি আরঙ্গেবের সেনাপতি হাড়া-রাজ শত্রুশল্যের জীবনচরিত। উদয়পুরের রাজাদের সহিত আরঙ্গেব যাবজ্জীবনই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার খবর টডের রাজস্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু টড খবর পান নাই, এমন অনেক খবরও আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্যামল দানের চেষ্টায় বীর-বীরবিনোদ নামে উদয়পুরের একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস লেখা হয় ও ছাপা হয়, কিন্তু উদয়পুরের মহারাণা তাহা প্রকাশ হইতে দেন নাই, একটি কুটুরীতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এখনও কুটুরীর বাহিরে কোথাও প্রুফ আকারে, কাপি আকারে, ফর্ম্মা আকারে বীরবিনোদের টুকরা রাজপুতাঁনাময় ছড়াইয়া আছে। তাহা হইতেও আরঙ্গেবের রাজত্বের অনেক খবর পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক গৌরীশঙ্কর ওঝা শিরোহির দেবড়া ও সোলংখি রাজপুতদিগের ইতিহাস লিখিতেছেন, তাহা হইতেও আরঙ্গেবের রাজত্বের অনেক সংবাদ সংগ্রহ হইতে পারে। রতলামের ইতিহাস আরঙ্গেব হইতেই আরম্ভ। রতনসিংহের বচনীকা চারণদের মধ্যে খুব প্রসিদ্ধ। উহাতেও আরঙ্গেবের অনেক কীর্ত্তির কথা লেখা আছে।

শিখদিগের উপর আরঞ্জেব কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস শিখদের সাহিত্য হইতে অনেক পাওয়া যায়। শিখেরা ইতিহাস লিখিতে খুব মজবুত; ঐ সকল ইতিহাস পাঞ্জাবী ভাষায় লেখা। মহারাষ্ট্রদেশের লোকেও অনেক ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। মারাঠাদের প্রথম অভ্যুদয় আরঞ্জেবের সময়েই হইয়াছিল, সুতরাং সেই সময়ের মারাঠা-ইতিহাস ও আরঞ্জেবের ইতিহাস একই। ইহা ছাড়া রাজপুতাঁনার যেমন ভাটচারণ আছে, তেমনি মহারাষ্ট্রদেশে গন্ধালী নামে একটি জাতি আছে। তাহারা ছড়া কাটে ও গান করে। মারাঠারা যুদ্ধে গেলে ২/১ জন গন্ধালী সঙ্গেই থাকিত। যুদ্ধে জয় হইলে, কর্ত্তারা সব একত্র হইয়া সেই যুদ্ধের ঘটনা গান করিতে বলিতেন, তাহারাও স্ফুর্ত্তি করিয়া গাইত, উহারাও স্ফূর্ত্তি করিয়া শুনিতেন। মারাঠা-ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনার এইরূপ পোবাড়া আছে। তাহা হইতেও ইতিহাসের অনেক উৎকৃষ্ট মসলা সরবরাহ হইতে পারে।

নাগরী-প্রচারিণী-সভা হিন্দী পুস্তকের যে সকল বিবরণ প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা হইতেও অনেক সময় যথেষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়। বগেলখণ্ড ও বুন্দেলখণ্ডের রাজারা অনেকেই হিন্দী পুস্তক লিখিয়াছেন এবং রাজকবিদের দিয়া পুস্তক লিখাইয়াছেন। তাঁহাদের ভণিতায়, সূচনায় ও শেষে অনেক ইতিহাসের কথা পাওয়া যায়। হিন্দী পুস্তক হইতে ইতিহাসের অনেক মাল-মসলা সংগ্রহ হইতে পারে। কবিগণের জীবন-চরিত আছে, অনেক সময় তাহা হইতেও ইতিহাসের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। সৎনামীরা অতি নিরীহ লোক। তাহাদের মঠ হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্রই ছিল। আরঞ্জেব তাহাদের উপর বড়ই অত্যাচার করেন। তাহারা নিরীহ লোক, কিন্তু এতই চটিয়া যায় যে, দুই বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে। পরে হারিয়া গিয়া আবার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। তাহাদের মঠ খুঁড়িলে এই সকল যুদ্ধের বৃত্তান্ত পাওয়া যাইতে পারে। গোকুলে বল্লভী-সম্প্রদায়ের বারটি মঠ ছিল, বারটি কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ছিল। আরঞ্জেব যখন বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির ভাঙ্গিবার হুকুম দেন, বল্লভীরা মনে করিল—আমাদের মন্দিরও বোধ হয় ভাঙ্গিয়া দিবে। তাহারা ঠাকুর লইয়া পলাইল, —কেহ করৌলি গেল, কেহ জয়পুর গেল, কেহ কোটা গেল, কেহ বুন্দী গেল। বল্লভের নিজ বিগ্রহ, বল্লভীদিগের প্রধান বিগ্রহ—উদয়পুরে যাইতে যাইতে পথে আটকাইয়া গেলেন। যেখানে আটক ছিলেন, সে জায়গা উদয়পুর হইতে দশ পোনের মাইল। ভক্তেরা বিশ্বাস করিলেন, ঠাকুর এই খানেই থাকিবেন। সেখানে এক প্রকাণ্ড নাথদুয়ারা (নাথদ্বার) প্রস্তুত হইল, উহার আয় এখন বার লক্ষ টাকা। একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন, সমরকন্দ হইতে বঙ্কক পর্য্যন্ত এই সমস্ত ভূভাগে যাহা কিছু ভাল জিনিস পাওয়া যায়, সবই নাথজীর সেবায় আনিয়া দেওয়া হয়। এই যে বল্লভীদের পলায়ন, ইহা হইতেও আরঞ্জেবের সময়ের

অনেক ইতিহাস সংগ্রহ হইতে পারে'। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির আরঙ্গেবের একজন সুবাদার ভাঙ্গিয়া দেন, মন্দির ভাঙ্গার জন্য আরঙ্গেব সুবাদারকে খুব ধমক দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ধমকের পত্র সম্প্রতি বাহির হইয়াছে ও ছাপা হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরের মন্দির কয়েকবার ভাঙ্গা হইয়াছে ও গড়া হইয়াছে। তাহারও ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে, শুধু আরঙ্গেবের সময়ের কেন, মুসলমানদিগের শাসনের অনেক ইতিহাস বাহির হইতে পারে।

কাথিবাড়, মাড়বার, উদয়পুর, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে অনেক জৈন মঠে নানাবিধ ইতিহাসের গ্রন্থ পাওয়া যায়। এক প্রকারের গ্রন্থের নাম "রাস"; উহা হইতেই ফরবেস সাহেব 'রাসমালা' নামক একখানি ইতিহাসের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। আর এক প্রকারের গ্রন্থ আছে, তাহার নাম "ঢাল", তাহা হইতেও অনেক ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ হইতে পারে। আর এক রকম গ্রন্থ আছে তাহার নাম "সিঝাই"। সিঝাইগুলি হইতেও অনেক প্রকার ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ হইতে পারে।

আমার প্রবন্ধ লম্বা হইয়া আসিল, আর লম্বা করিয়া শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্য-চ্যুতি করিতে চাহি না। আজ আমার শেষ কথা এই যে, হিন্দুর তরফ হইতেও চেষ্টা করিলে মুসলমান ইতিহাসেরও অনেক মাল-মসলা সংগ্রহ হইতে পারে। আরঙ্গেব ত মুসলমানদিগের একপ্রকার শেষ রাজা বলিলেও চলে· হিন্দুদের তরফ হইতেও তাঁহার পুরা ইতিহাস লেখা হইতে পারে। যতদিন হিন্দুদের তরফ হইতে মুসলমানদিগের ইতিহাস লেখা না হয়, ততদিন ঐ ইতিহাস পুরাও হইবে না, ঠিকও হইবে না; কারণ, আমরা শুধু এক দলের কথা লইয়াই তাহাকে ইতিহাস বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি।

ইতিহাস-শাখার সভাপতির মন্তব্য

২ পৃষ্ঠায় (আওবঙ্গেবের কথা-সম্বন্ধে) একথা ঠিক নহে। আমি ভীমসেন কায়েথ এবং ঈশ্বরদাস নাগর নামক দুইজন হিন্দুর রচিত ফার্সী ইতিহাস ব্যবহার করিয়াছি; এবং ফার্সী ভাষায় হিন্দুর লিখিত অনেক অনেক ঐতিহাসিক চিঠিপত্র আমার কাজে লাগিয়াছে।

৫ পৃষ্ঠায় ১৬শ হইতে ৩০শ পংক্তি—এই অংশ পড়িতে দেওয়া হয় নাই, কারণ ইহাতে ঐতিহাসিক ভুল আছে। আদোনী দুর্গ অনেক আগে হইতে মুসলমানদের হাতে ছিল। আওরাংজীব সিদ্দি মাসুদ নাম বিজাপরী কেলাদারকে ঘুশ দিয়া এই দুর্গ দখল করেন, রণে নহে।

৬ পৃষ্ঠায় শিবাজীর আগমন-সম্বন্ধে—দিল্লী নহে, আগ্রা হইবে।

৬ পৃষ্ঠায়—আওরাংজীবের নহে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দারা শুকোর সেনাপতি।

৭ পৃষ্ঠায় ৬-৯ পংক্তি—এই অংশ পড়িতে দেওয়া হয় নাই, কারণ সৎনামীদিগের চরিত্রসম্বন্ধে তৎকালীন ইতিহাসে মত ভেদ দেখা যায়। তাহারা স্থানীয় কর্ম্মচারীদের অত্যাচারে বিদ্রোহী, বাদশাহের অত্যাচারে নহে।

৭ পৃষ্ঠায় ২১ পংক্তি—এটি ঐতিহাসিক ভ্রম। আওরাংজীবের সরকারী কাগজপ্রত্র দেখিয়া তাঁহার প্রিয় মুন্সী ইনাএৎউল্লার চেষ্টায় লিখিত "মাসির-ই-আলমগিরি" নামক ফার্সী ইতিহাসে (৮৮ পৃষ্ঠা) স্পষ্টই লেখা আছে যে, উক্ত বাদশাহের আজ্ঞায় কাশীতে বিশ্বেশ্বরের এবং মথুরায় কেশবরায়ের মন্দির ভাঙ্গা হয়। "ধমকের পত্র" কাল্পনিক। আওরাংজীব-প্রদত্ত কাশীর ফর্ম্মান্ শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন সেন Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1911. p. 681. তে ছাপাইয়াছেন, তাহাতে লেখা আছে— "আমাদের ধর্ম্মে নূতন দেবমন্দির নির্ম্মাণ নিষেধ, কিন্তু পুরাতন মন্দির ভাঙ্গার বিধি নাই।" কিন্তু কাশী ও মথুরার পুরাতন মন্দিরগুলিও ১৬১৯ খৃঃ বাদশাহের আদেশে ধ্বংস করা হয়।

৮ পৃষ্ঠা—শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দু কবি ভূষণের নাম উল্লেখ করেন নাই। আমি তাঁহার ঐতিহাসিক পদ্যগুলি এবং লালকবির "ছত্রপ্রকাশ" নামক প্রাচীন জীবনী দেখিয়াছি, এবং আসামী ও আহোম ভাষায় লিখিত "বুরঞ্জী"র ইংরাজী অনুবাদ ব্যবহার করিতেছি।

শ্রী যদুনাথ সরকার।

বাজার-দর ও বর্ত্তমান সমস্যা

শ্রী কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম.এ.

৩০/৪০ বৎসর পূর্ব্বেও চাউলের মণ গ্রাম-অঞ্চলে এক টাকা, দেড় টাকা হইতে দুই টাকা নয় সিকার মধ্যে ছিল। নদী, খাল, বিল যে সব গ্রামের কাছে ছিল সেখানে মাছ এত মিলিত যে, দুই, এক পয়সার মাছ কিনিলেই একটি ছোট গৃহস্থের ঘরে ডাল, তরকারী বড় রাঁধিতে হইত না। দুধ দুই পয়সা তিন পয়সা সেরে প্রচুর মিলিত, ঘিয়ের দাম টাকায় এক সেরের উপরে কখনও উঠিত না। ডাইল ২/৩ পয়সায় সের মিলিত, তেল মিলিত ৩/৪ আনায় একসের। চিনি বিলাসভোগ্য ছিল, গুড় অতি সুলভে মিলিত। ছাগ-মাংস শক্তিপূজার প্রসাদরূপে ব্যতীত কমই ব্যবহৃত হইত, দুর্গোৎসবের ভিড়ের সময়েও এক টাকা, পাঁচ সিকায় একটি ছাগ মিলিত। ঘর বাঁধিতে বাঁশ, বেত, খড়, চাটাই, হোগলা, কৃষাণ, ঘরামী, সবই অতি সুলভ ছিল। এক কাপড়ের কথায় বোধ হয় বলা যাইতে পারে, এখনকার তুলনায় তখন বেশী সস্তা ছিল না। এখন কাপড়ে আমরা খরচ করি বেশী, কারণ তখন প্রায় সুধু কাপড়েই চলিত, এখন কাপড়ের সঙ্গে 'চোপড়' বড় বেশী লাগে। আর এই কাপড়-চোপড়ের রকমও অনেক উঁচুতে উঠিয়াছে। নতুবা, তখনকার আটপৌরে মোটা কাপড় তখন যে দামে মিলিত, এখনও বোধ হয় প্রায় সেই দামেই মিলে। এ বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ নই। আমার বয়োজ্যেষ্ঠ যাঁহারা, তাঁহারাই বলিতে পারিবেন, এ কথা ঠিক কিনা।

ভাত-কাপড় ও বাড়ী-ঘর, এ পৃথিবীতে দেহ ধরিয়া থাকিতে হইলে, এই তিনটি সকলেরই প্রয়োজন। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আগে এই তিনটি, তারপর সুখে থাকিবার জন্য আরও অনেক জিনিষ লোকে চায়। শুনিয়াছি, শেষের এই সব জিনিষ লোকে যত চায়, তত তারা সভ্যতায়ও উন্নত হয়। তবে আমাদের দেশে অতীত ও বর্ত্তমান বাজারদরের হিসাবে এসব না ধরিলেও এক রকম চলে। কারণ নূতন নূতন বহু এমন অভাব ও প্রয়োজন এখন সৃষ্ট হইয়াছে, যা তখন ছিল না। এসব যেমন নূতন, এসবের দরের কথাও তেমন নূতন। তুলনা করিতে কি গণনা করিতে এসবের পুরাতন দর কিছু নাই।

বসনের কথাও ছাড়িয়া দিতে পারি, গৃহের উপকরণের কথাও না ধরিলে চলে। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন অশন দরসম্বন্ধে সেই অশনের সমস্যাই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হইয়াছে। সেই সমস্যা যদি আমরা কিছু বুঝিতে পারি, সঙ্গে অন্য প্রয়োজনের সমস্যা আপনিই বোঝা হইবে। সুতরাং বাজার-দর বলিয়া, এই দীন প্রবন্ধে প্রধানতঃ শনের দরই আলোচিত হইবে।

বাজার-দর অনেক পূর্ব্ব হইতেই বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। গত ৩০/৪০ বৎসরের মধ্যে যে বৃদ্ধিটা হইয়াছে, তাহা আমাদের অনেকেরই সাক্ষাৎ জ্ঞানগোচরে আসিয়াছে। সেই অবধি এই পর্য্যন্ত দর মোটের উপর বরাবরই বাড়িয়া চলিয়াছে, তবে গত ৮/১০ বৎসরের মধ্যে বড় বেশী বাড়িয়া পড়িয়াছে। প্রতি বৎসর এমনভাবে বাড়িতেছে, যে আমরা সকলেই তার কঠোরতা বড় তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি। ইহাও দেখিতেছি, যার দর একবার যা বাড়ে, তা আর বড় কমে না।

৩০/৪০ বৎসর পূর্ব্বে বাজার-দর যাহা ছিল, তার সঙ্গে এখনকার বাজার তুলনা করিলে, আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব, মোটের উপর আহার্য্যাদির দর ৩/৪ গুণ বাড়িয়াছে। তুলনা করিলে ইহাও মনে হইবে, অহো, সেই দর যদি এখন থাকিত, কি সুখেই দিন যাইত, কোনও দুঃখ আর থাকিত না, প্রচুর পরিমাণে মাছ, তরকারী, দুধ, ঘি খাইয়া বাঁচিতাম। আহা, কি সুখেই তখনকার লোক যেন ছিল। কিন্তু তখনই যে লোক সব সুখে স্বচ্ছন্দেই ছিল, কেহ কোনও অভাব জানিত না, দুঃখ পাইত না, তা নয়। বহুলোক তখনও অনেক দুঃখ পাইত, এমন সুলভ দুধ, ঘি, মাছ, তরকারী সকলেই যথেচ্ছ খাইতে পাইত না, ক্ষুদকুঁড়াও অনেকের জুটিত না। ইহার আগে, যখন সব আরও সস্তা ছিল, —তখনকার পুথিতে এরূপ দুঃখকষ্টের কথা, অভাবের কথা অনেক পাওয়া যায়। তখনকার দিন যাঁদের মনে আছে, তাঁরাও একথা স্বীকার করিবেন, সেই সস্তার দিনেও সকলে যে যাহা ইচ্ছা, পেট ভরিয়া খাইত, তা নয়। আবার এখনকার দুর্ম্মূল্যের দিনেও যে সকলে উপবাস করিতেছে, তাও নয়। আরও তখন অন্য ব্যয় কম ছিল, এখন তা অনেক বাড়িয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ ইহাই বলিতে হইবে, তখন সাধারণ লোকের টাকা এত কম ছিল, যে বাজেখরচ কম থাকা সত্ত্বেও, সস্তা জিনিষও স্বচ্ছন্দমত কিনিতে পারিত না। এখন টাকা এত বাড়িয়াছে যে, বাজে খরচ এত বেশী বাড়িয়াও দুর্ম্মূল্যের জিনিষও কিছু কিনিয়া খাইতে পারিতেছে।

দেশ ক্রমে দরিদ্র হইতেছে, এই কথাই আমরা সর্ব্বদা বলিয়া থাকি। সুতরাং আগের চেয়ে দেশের টাকা বাড়িয়াছে, একথা বলিলে, সহজেই আমাদের মনে হইবে, একি পাগলের মত অসম্ভব কথা। কিন্তু একটু তলাইয়া একথা ভাবিয়া দেখিলেই আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব, উপর উপর অসম্ভব মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে কথাটা অসম্ভব নয়। টাকার হিসাবে লোকের আয়-বৃদ্ধির সঙ্গেও লোকের দারিদ্র্য বাড়িতে পারে। কেবল যে অন্য ব্যয়ের প্রয়োজন বাড়িয়াই এরূপ হয় তা নয়। ব্যয়ের প্রয়োজন সমান থাকিয়াও এরূপ হইতে পারে। আস্ত টাকা আমরা চিবাইয়া গিলিয়া খাই না, টাকায় বোনা কাপড়ও পরি না, টাকা সাজাইয়াও ঘর বাঁধি না। সুতরাং টাকার আয় কত বাড়িল, কেবল তার হিসাবে দারিদ্র্য বা সম্পদ্‌বৃদ্ধির হিসাব হয় না, সেই টাকায় আমাদের আহার্য্যাদি কি পরিমাণে মিলিতেছে, টাকার কি দাম হইয়াছে, তার হিসাব

আমাদিগকে করিতে হইবে। এক টাকায় যদি দিন চলে, তখন দুই টাকা আয় হইলেও সে ধনী। আর ঠিক সেই দিন চালাইতে যখন কাহারও ৫ টাকা লাগে, তখন ৪ টাকা আয়েও সে দরিদ্র। অথচ টাকার হিসাবে তার আয় দ্বিগুণ বাড়িল।

এখন আমাদের দেখিতে হইবে, বাজার-দর যে অনুপাতে বাড়িতেছে, আমাদের টাকার আয় সে অনুপাতে বাড়িতেছে কিনা! যদি, তা হয়, তবে বলিতে হইবে, বাজার-দর বৃদ্ধিতে আমাদের কোনও ক্ষতি হয় নাই। আর যদি তা না হয়, তবে বলিতে হইবে, আমাদের বড় দুঃসময় আসিয়াছে। ইহার প্রতিকার আবশ্যক। সেই প্রতিকার কি হইতে পারে? হয় আয় বাড়াইতে হইবে, না হয় বাজার দর নামাইতে হইবে। ইহার কোন্‌টা সম্ভব বা সহজ সাধ্য হইতে পারে? একথা বুঝিতে হইলে, আগে বুঝিতে হইবে বাজার-দর কেন চড়িয়াছে, কেন চড়িতেছে, আর নামিতে পারে কিনা? যদি পারে, ভাল। না যদি পারে, সম্ভব যদি তা না হয়, তবে টাকার আয় যাতে বাড়ে, সেই পথ দেখিতে হইবে। অন্য উপায় নাই।

লোকে যত চায়, তার চেয়ে কম যদি পায়, তবে চাওয়া জিনিষের দর চড়ে। দেশের বর্ত্তমান লোক-সংখ্যার হিসাবে আহার্য্যের আমদানি বাজারে বড় কম হইতেছে, তাই দর চড়িতেছে, স্বভাবতঃই এইরূপ আমাদের মনে হইতে পারে। পাটের টাকার লোভে কৃষকেরা ধান বোনে কম, আবার চাউল যা জন্মে, তাও অনেক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। সুতরাং দেশের বাজারে চাউল আসে কম, দরও আগুন। গরু ঘাষ পায় না, না খাইয়া মরিতেছে, দুধ কমিতেছে, তাই দুধের আর ঘি-মাখনের দাম এত বাড়িয়াছে। খাল বিল শুকাইতেছে, নদী মরিতেছে, আবার সর্ব্বত্র ষ্টিমার জল তোলপাড় করিয়া যাতয়াত করিতেছে, সুতরাং মাছ কমিতেছে, যেমন মাছ কমিতেছে, তেমন তার দরও বাড়িতেছে। বন জঙ্গল সাফ হইতে যে কাঠ কমিতেছে, কাজেই লাক্‌ড়ীর দাম এত বাড়িয়াছে। এই সবই সাধারণতঃ আমরা বাজার-দর বৃদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকি। সুতরাং ইহাও বলিয়া থাকি যে, এই কারণ দূর হইলেই বাজার-দর কমিবে। যদি পাট উঠিয়া গিয়া সকল ক্ষেতে ধান হয়, যদি বিদেশে চাউলের রপ্তানী বন্ধ করা যায়, তবে দর নামিবে। যদি গোবংশের উন্নতি-সাধন করা যায়, তবে দুধের দর নামিবে। যদি মাছের চাষে বিশেষ যত্ন নেওয়া যায়, তবে বাজারে মৎস্যের আমদানী বাড়িবে, শস্তায় মাছ মিলিবে, সকলে বাটি ভরা মাছের ঝোল খাইবে।

প্রয়োজনের হিসাবে আমদানী কমিলে, চাওয়ার চেয়ে পাওয়া কম হইলে, দর যে বাড়ে তা ঠিক। কিন্তু তাই বলিয়া দর বাড়িলেই যে মনে করিতে হইবে, প্রয়োজনের হিসাবে আমদানী কমিয়াছে, চাওয়ার তুলনায় পাওয়া কম হইয়াছে, তা নয়। ডাকাতরা কালীপূজা করে, তাই বলিয়া কালীপূজা যে করে সেই ডাকাত হয় না। জলে ভিজিলে জ্বর হয় বলিয়া কারও জ্বর হইলে সে জলেই ভিজিয়াছে এরূপ মনে করা ভুল। না

খাইয়া মানুষ মরে, তাই মানুষ মরিলেই মনে করা চলে না যে, সে না খাইয়াই মরিয়াছে। চাওয়ার চেয়ে পাওয়া কমিলে দর বাড়ে, তাই বলিয়া দর বাড়িলেই ইহাই তার এক মাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা ঠিক নয়। এ কারণেও বাড়িতে পারে, আবার বাড়িবার আরও পাঁচটা কারণও থাকিতে পারে।

কেবল চাওয়া-পাওয়ার অসামঞ্জস্যে দর যদি বাড়ে-কমে, তবে সাধারণতঃ সে বাড়া-কমা দীর্ঘকাল থাকে না। স্বাভাবিক কোনও অলঙ্ঘ্য বাধা না থাকিলে, অল্পদিনেই এ অসামঞ্জস্য দূর হয়, এবং দর আবার আগের মত হয়। যাহা হউক, লোকের চাওয়ার তুলনায় পাওয়া কমিয়াছে কিনা, লোকের খাইতে যা লাগে, তার তুলনায় বাজারে খাদ্যের আমদানী কম কিনা, তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে প্রধানতঃ চাউলের অবস্থা ধরিয়া আলোচনা করিলে, সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। কারণ এই খাদ্যবিশেষের প্রয়োজনের একটা মোটামুটি সীমা নির্দ্দেশ করা যায়। মাছ, দুধ, তরী-তরকারী আমরা বেশী হইলে বেশী খাই, কম হইলে কম খাইয়াও পারি। কিন্তু চাউল বেশী হইলেই বেশী খাই না, কম হইলেও, জীবনধারণ দুস্কর। ধরুন, আমরা প্রত্যেকে গড়ে বেলায় একপোয়া করিয়া চাউল খাই, এবং সেই হিসাবে চাউল কিনি। আগামী বৎসর হইতে পাট রপ্তানী বন্ধ হইয়া (যুদ্ধের যে রূপ অবস্থা তাতে হইতেও পারে) বাজারে চাউলের আমদানী যদি চারিগুণ বৃদ্ধি পাইয়া দর চারিগুণ নামে, তবে কি আমরা বেলায় অমনই একসের করিয়া চাউলের ভাত খাইতে আরম্ভ করিব? তবে যদি এমন হয়, এখন বহুলোকে ভাত খাইতেছেই না, তবে তারা তখন ভাত পাইবে। কিন্তু আমরা কি বলিতে পারি, এই বাঙ্গালাদেশে অনেক লোক ভাত না খাইয়া মরিতেছে? ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা যেমনই হউক, বাঙ্গালার বাজারে যে চাউল কম বলিয়া বহুলোক উপবাস করিতেছে, বাঙ্গালার অবস্থা যাঁরা ভাল করিয়া লক্ষ করিয়া দেখিতেছেন, তাঁরা এমন কথা বলিবেন না। অনেক পবিবাব এমন থাকিতে পারে, যারা একবেলা খায়। কিন্তু তাও যে সাধারণতঃ খুব বেশী তা নয়। মধ্যে মধ্যে কোনও কারণে সাময়িক 'অকাল' উপস্থিত হইলে, কিছুকালের জন্য এরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ অবস্থা এরূপ নহে। যখন এক টাকা, দু টাকায় চাউলের মণ মিলিত, তখনও এরূপ অর্দ্ধাশন যে একেবারে ছিল না, তা নয়। আর তখন যে লোক-সংখ্যার হিসাবে চাউল অনেক বেশী বাজারে আসিত, তাই শস্তা ছিল, এরূপ মনে করাও ভুল। কারণ লোক যা খাইতে পারে, তার অনেক বেশী চাউল বাজারে আসিলে, সে চাউল দিয়া লোকে কি করিত? বেশী হইলে কিছু অপচয় হয়, লোকে ফেলিয়া ছড়াইয়া খায়। আর কম হইলে তা করে না। কিন্তু এখনকার চেয়ে আগেকার লোক যে বড় বেশী ফেলাইয়া ছড়াইয়া খাইত, তা নয়। সেকালের গৃহিণীরা এ সম্বন্ধে বড় কড়া ছিলেন। ভাত লক্ষ্মী, ভাতের অনিষ্ট তাঁরা সহিতে পারিতেন না। পাতে লবণের

কাছে দুটি ভাত থাকিলেও, বউরা তাহা কুড়াইয়া রাখিয়া খাইত। এখন বরং পাতের ভাত অবজ্ঞায় অনেকে ফেলিয়া দেয়। মুষ্টিভিক্ষার ভিখারী তখনও ছিল, এখনও আছে। সম্পন্ন-গৃহস্থেরা তখন ভোজ দিতেন বেশী, কিন্তু ভোজ যারা খাইত, তাদের ঘরের ভাতটা বাঁচিত। ঘরের ভাতে পেট ভরিয়া কেহ পরের বাড়ী ভোজ খাইতে আসে না।

যাহাহউক, যদি একথা আমরা স্বীকার করি যে, বাঙ্গালার ছোট বড় প্রায় সকলেই আগেও যেমন মোটের উপর দুবেলা ভাত খাইত, এখনও তা খাইতেছে, তবে একথাও স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাঙ্গালার বাজারে লোক-সংখ্যার তুলনায় চাউলের আমদানী কম নয় এবং তার জন্যে চাউলের দর স্থায়িভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান অন্যদিকে করিতে হইবে।

মাছ, দুধ, তরকারী প্রভৃতির আমদানী এখন লোক-সংখ্যার হিসাবে অত্যন্ত কম কি এবং তাহাই এ সবের দর-বৃদ্ধির কারণ কি না, ইহা বলা শক্ত। তবে একথা ঠিক যে, আগে মাছ, দুধ, তরকারী প্রভৃতির জন্য গৃহস্থেরা যত ব্যয় করিতেন, এখন প্রায় সকলেই তার চেয়ে বেশী ব্যয় করেন। কিন্তু বেশী ব্যয় করিয়াও অনেকে প্রচুর পরিমাণে খাইতে পান না। খাইতে কম পান, সেই কমেও যে তাঁহাদের টাকা বেশী ব্যয় করিতে হয়, করিতে পারেন ও করেন, একথা অস্বীকার করা সহজ নয়। ইহাদের দুঃখের কারণ প্রধানতঃ এই যে, যত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে এসব ও স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে খাওয়া যতটা প্রয়োজন ততটা খাইতে পান এরূপ অর্থ তাঁদের নাই। আগেকার অপেক্ষা বেশী হইয়াছে, কিন্তু যত বেশী হইলে এই বেশী দরের সঙ্গে চলিতে পারেন, তত বেশী হয় নাই।

এই সব অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে, মনে হইবে, কোনও কোনও পদার্থ-সম্বন্ধে কতক পরিমাণে সত্য হইলেও আহার্য্যাদির অপ্রাচুর্য্যই বাজার-দর-বৃদ্ধির প্রধান কারণ নহে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অবস্থাও আমরা দেখিতে পাই যে, সাধারণলোকে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক অর্থব্যয় করিতে পারে। কিন্তু ব্যয় করিয়াও প্রচুর পরিমাণে সকল খাদ্য পায় না। ইহা হইতে এই এক সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, দেশের লোকের হাতে মোটের উপর টাকা বাড়িয়াছে, কিন্তু টাকার দাম বড় কমিয়াছে। অর্থাৎ টাকায় আগে যা মিলিত, তা মেলে না। তাই দেখিতে পাই, বাজার-দর বড় বাড়িয়াছে। যাদের আয়ের তুলনায় দর বাড়িয়াছে, তাদের বড় কষ্টও হইয়াছে।

মোটের উপর অপ্রাচুর্য্য নয়, লোকের হাতে এখন যে টাকা আসিতেছে, তার দাম কমিয়া যাওয়াই বাজার-দর বৃদ্ধির প্রধান কারণ। চাউলের সম্বন্ধে একথা যদি সত্য হয়, তবে অন্যান্য জিনিষের পক্ষেও একথা বহুলপরিমাণে সত্য। যেসব কারণে কোনও দেশে টাকার দর কমে, সে সব কারণ সাধারণতঃ এমন কায়েমী হইয়া দাঁড়ায়, যে টাকার দাম আর সহজে বাড়ে না, বাজারদরও কমে না।

পৃথিবীর প্রায় সকলদেশেই মধ্যে মধ্যে এইরূপ টাকার দাম স্থায়িভাবে কমিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি সর্ব্বত্রই প্রায় টাকার দাম বড় কমিয়াছে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তারে যত টাকা আসে এবং যত সে টাকা জনসাধারণের মধ্যে ছড়ায়, ততই বিনিময়ে চল্‌তি টাকা বেশী হয়, টাকার দাম কমে। দেশ-বিদেশের মধ্যে যাতায়াত ও খবরাখবর যত সহজ হয়, বাণিজ্যের সম্বন্ধ যত বাড়ে, তত যে দেশে টাকা কম ও দর শস্তা, সে দেশে টাকার আমদানী এবং তার সঙ্গে দরও বাড়িতে থাকে। বিদেশী যদি কোনও দেশে অবাধে বাণিজ্য করিতে পারে, আর যদি দেখে তার দেশ অপেক্ষা সেই দেশে বহু জিনিস দরে শস্তা, তবে তার টাকা থাকিলে প্রচুর পরিমাণে সে সেই সব জিনিস কিনিয়া নিয়া নিজের দেশে বিক্রয়া করিবে। তার দেশের বহু টাকা সেই দেশে আসিবে, লোকের মধ্যে ছড়াইবে, ফলে টাকার দর কমিবে, বাজার-দর বাড়িবে। বাণিজ্য-বিস্তারের সঙ্গে টাকা বাড়ে, লোকের মধ্যে বেশী ছড়ায়, এবং যে সব জিনিষ একেবারে কাঁচা নয়, উৎপাদনের পরেও বহুদিন থাকে, দূরে রপ্তানী হইতে পারে, তাহার দরে দেশ-বিদেশে মোটের উপর একটা সমতা হইবার মত হয়।

বাণিজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে টাকা বাড়ে, টাকা ছড়ায়। কিন্তু এই টাকা কোথা হইতে আসে? নূতন নূতন সোণা-রূপার খনি আবিষ্কৃত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে সোণা-রূপা যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, তার চেয়ে বাণিজ্য এবং বাণিজ্যের জন্য অর্থবিনিময়ের প্রয়োজন অনেক বেশী বাড়িয়াছে। মূল্যবান্ ধাতুর মূদ্রায় এই বিপুল আয়তনের ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে না বলিয়া বণিক্-সমাজে ধার-বিনিময়পত্র বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং সকল দেশের গবর্ণমেন্ট এবং বড় বড়-ব্যাঙ্ক বহুপরিমাণে নোট প্রভৃতি কাগজের মুদ্রা বাহির করেন। এসবও অর্থ-বিনিময় সম্পর্কে টাকার ন্যায় চলে।

ধার বিনিময়-পত্রাদির কথা সাধারণতঃ আমরা বেশী জানি না, কারণ বাঙ্গালী শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য বড় কম। যাঁরা সাধারণ সাহিত্য লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা এসব চক্ষেও বড় দেখেন না। তবে নোটটা যে টাকার স্থানে প্রচুর পরিমাণে চলিতেছে, ইহা সকলেই আমরা দেখিতেছি। আস্ত টাকার চেয়ে নোটই বরং আমরা বেশী দেখিতে পাই। রূপার টাকা যত চলিতেছে, তাহার চারিগুণ যদি নোট চলে, তবে বলিতে হইবে বিনিময়ে চল্‌তি টাকা পাঁচগুণ বাড়িয়াছে। আবার সেই টাকা ব্যবসায়াদির বিনিময়ে যত দ্রুত হাত বদ্‌লায়, তত সে হাত-বদলানর সংখ্যা বৃদ্ধিরই ন্যায় ফলদায়ক হয়। অর্থনীতিশাস্ত্র বড় জটিল সমস্যা। এ প্রসঙ্গেও এগুলির বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর এইস্থলে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে টাকায় ও নোটে এবং আজকালকার বাজার-বিনিময়ে তাদের দ্রুত হাত-বদলানতে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চলতি টাকার সংখ্যা অনেক বেশী বাড়িয়াছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে

আমরা বড় ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যের সম্বন্ধে আসিয়া পড়িয়াছি, দেশের মধ্যেও সর্ব্বত্র অতিদ্রুত বিবিধ বাণিজ্যের বিস্তার হইতেছে। ইহাতে চল্‌তি টাকার পরিমাণ আমাদের দেশেও বাড়িয়াছে।

দেশের মধ্যে চল্‌তি টাকা বাড়িয়াছে, তাই বলিয়া দেশের সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে সম্পদ-সৌভাগ্য যে বাড়িয়াছে তা বলি না। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী', কিন্তু দেশে বহুল বাণিজ্য বিস্তার হইতেছে বলিয়া একথাও বলিতে পারি না যে, দেশ ভরিয়া ঘরে ঘরে লক্ষ্মী বসতি করিতেছেন। দেশের মধ্যে এবং বিদেশের সঙ্গে প্রচুর ব্যবসায়-বাণিজ্য এখন যেমন চলিতেছে, বোধ হয় কোনও কালে ভারতের বাণিজ্য এত বিপুল আকারের হয় নাই। কিন্তু এই বাণিজ্য যাঁহাদের হাতে, বাণিজ্য প্রধানতঃ যাঁহারা চালাইতেছেন, তাঁহারা বিদেশী বণিক, এদেশের স্থায়ী অধিবাসী নন। কিন্তু বিদেশী হইলেও তাঁহাদের ব্যবসায় বাণিজ্য এ দেশেই চলিতেছে, বাণিজ্য-উপলক্ষ্যে তাঁহাদের বহু অর্থ ও দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। রেলে-ষ্টীমারে, বহু কলকারখানায়, খনিতে, চায়ের বাগানে, নীলের ক্ষেতে তাঁহাদের প্রচুর মূলধন এ দেশে খাটিতেছে। ব্যবসায়ে যে টাকা খাটে, তা সব কেহ নিজের ঘরেই রাখিতে পারে না। আর পাঁচজনের মধ্যে বহুপরিমাণে তাহা ছড়াইতে হয়, তবে তাহাদের সাহায্যে মূলধনে লাভ দাঁড়ায়। বিদেশীর মূলধন যে এ দেশে খাটিতেছে তাহা বহুপরিমাণে তাঁহাদের সহকারী কেরাণী, সরকার, দালাল, মিস্ত্রী, কুলী প্রভৃতি রূপে এদেশের লোকের মধ্যে আসিতেছে। এইসব ব্যবসায়ের সংস্রাবে এদেশেরও হাজার হাজার লোক অর্থোপার্জন করিতেছেন। যদি এ মূলধন সব দেশীয় লোকের হইত, ব্যবসায়ের কর্ত্তৃত্ব দেশের অধিবাসীরাই করিতেন, তবে খুবই ভাল হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশীয় লোক যদি তাহা না করেন বা করিতে না পারেন, তবে ইহাই বা মন্দ কি?

তারপর এদেশে উৎপন্ন বহু কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্যাদি বিদেশী বণিকেরা কিনিয়া বিদেশে চালান দিতেছেন। কেবল যে তাঁহাদের দেশের জিনিস বিক্রয় করিয়া এ দেশের টাকা তাঁহারা লুটিয়া লইতেছেন তা নয়, যাহা লইতেছেন তাহাও প্রচুর পরিমাণে আবার এদেশে আনিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেছেন। তাঁহারা কত নিতেছেন, কত দিতেছেন, এই বিনিময়ের খতিয়ানে কোন পক্ষের লাভ-লোক্‌সান কি হইতেছে, তার আলোচনা আমাদের এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিদেশীর বাণিজ্যের ফলে দেশের চল্‌তি টাকা অনেক বাড়িয়াছে।

কেবল বিদেশের ও বিদেশীর বাণিজ্যই যে চল্‌তি টাকা বাড়িয়াছে তা নয়। গবর্ণমেন্টের শাসন-পরিচালনার বিধি-ব্যবস্থাতেও দেশের চল্‌তি টাকার বৃদ্ধির পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছে। বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের শাসন-ব্যাপার বড় জটিল, বহু বিভাগে, বহুরকম কর্ম্মভার গবর্ণমেন্ট নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে চালাইতেছেন। বড় বড়

সাহেব কর্ম্মচারী যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের নিম্নে যত দেশীয় কর্ম্মচারী এখন নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। ইহাতে গবর্ণমেন্টের তহবিল হইতে যে টাকা দেশের লোকের মধ্যে ছড়াইতেছে, তাহাও নিতান্ত কম হইবে না। অনেকে বলিতে পারেন, গবর্ণমেন্টের আয় ত প্রজার প্রদত্ত কর হইতে আসে? তবে ইহাতে চল্‌তি টাকার বৃদ্ধির সহায়তা করিবে কেন? কররূপে গবর্ণমেন্ট যাহা নিতেছেন তাও সব নয়, কতক অংশমাত্র গবর্ণমেন্ট রাজসেবার বিনিময়ে প্রজাকে দিতেছেন। ইহার উত্তর আছে। এখন গবর্ণমেন্টের আয় কেবল প্রজার প্রদত্ত কর হইতেই হয় না। গবর্ণমেন্ট প্রজার নিকট হইতে বহু ঋণ গ্রহণ করেন। সেভিংস-ব্যাঙ্কের টাকা, কোম্পানীর কাগজের টাকা প্রভৃতি এই ঋণ। এই টাকা দেশের লোক ব্যবসায় খাটাইলেও দেশের লোকের মধ্যেই অবশ্য ছড়াইত। কিন্তু যে টাকা লোকে ব্যবসায়ে খাটাইতে চায়, তাহা দিয়া কোম্পানীর কাগজ কেনে না, সেভিংস-ব্যাঙ্কেও তা রাখে না। মধ্যে মধ্যে যে গবর্ণমেন্ট নূতন টাকা মুদ্রিত করেন ও অনেক নূতন নোট বাহির করেন, তাহা হইতেও আয় কিছু বাড়ে। বাণিজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে চল্‌তি টাকা বৃদ্ধির প্রয়োজন, তাই প্রধানতঃ গবর্ণমেন্টকে মধ্যে মধ্যে নূতন টাকা ও নূতন নোট বাহির করিতে হয়। ইহা ব্যতীত গবর্ণমেন্টের হাতে ব্যবসায়-বাণিজ্যও অনেক আছে, তাহাতেও আয় কম হয় না। আর একটী কথা আছে। প্রজার প্রদত্ত রাজস্ব যে সর্ব্বত্র সকল প্রকার শাসনাধীনে বেশীর ভাগে আবার প্রজার মধ্যে ফিরিয়া আসে তা নয়। এই কর প্রজারা দেয়, প্রজাকে দিতেই হইবে। সেই টাকা যত পরিমাণে প্রজার মধ্যে ফিরিয়া আসে, তত পরিমাণে প্রজার মধ্যে চল্‌তি টাকা বাড়ে, বলিতে হইবে। গবর্ণমেন্টের এই করলব্ধ আয় ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বেতনে, পেন্সনে এবং আরও অনেক রকমে দেশের বাহিরে যায়, তা সত্য। কিন্তু দেশের প্রজাদের মধ্যেও নিতান্ত কম আসে না। পূর্ব্বে মুসলমান রাজাদের আমলে রাজস্ব বিদেশে যাইত না। কিন্তু তাই বলিয়া সব যে প্রজাদের মধ্যেই ফিরিয়া আসিত তা নয়। তাহাদের শাসনপ্রণালী অন্যরূপ ছিল। দেশীয় কি বিদেশীর বেতনভোগী এত বেশী কর্ম্মচারীর প্রয়োজন তাঁহাদের হইত না। বড় রাজকর্ম্মচারীরা প্রায়ই বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর ভোগ করিতেন। রাজস্ব বহুপরিমাণে রাজকোষেই সঞ্চিত থাকিত। তারপর নোট কি কোম্পানীর কাগজ, কি কোনওরূপ ব্যবসায়-বাণিজ্যে রাজসরকারর কোনও আয় ছিল না। প্রজারা সোণা-রূপার টাকায় রাজস্ব দিত, তাই রাজাদের একমাত্র আয় ছিল, তাহারও অনেক রাজকোষে সঞ্চিত থাকিত। কেবল রাজাদের কথা কেন? জমিদারেরাও টাকা বহুপরিমাণে সঞ্চিত রাখিতেন। দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে অনেক সময় অশান্তির অবস্থা ছিল। নানা রকমে টাকা লুণ্ঠিত হইত। তাই অনেকে বহু টাকা ও মোহর মাটির নীচে পর্য্যন্ত পুতিয়া রাখিতেন। দেশে তখন সোণা-রূপা এখন অপেক্ষা বেশী ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার অধিকাংশই প্রজার মধ্যে

চল্‌তি হইয়া ছড়াইয়া পড়িত না। রাজস্ব বিদেশে না গেলেও দেশীয় প্রজার মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে ফিরিত না, ছড়াইত না, রাজকোষেই বেশী সঞ্চিত থাকিত।

কতক নূতন এই ব্যবসায়-বাণিজ্যের ফলে এবং কতক রাজশাসন-সংক্রান্ত নূতন ব্যবস্থার ফলে দেশের মধ্যে চল্‌তি টাকা অনেক বাড়িয়াছে, বাড়িয়া টাকার দাম অনেক কমিয়াছে এবং ইহাই বর্ত্তমান চড়া বাজার-দরের প্রধান কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কেবল মাছ, দুধ, তরকারী প্রভৃতি কোনও কোনও পদার্থসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, অপ্রচুরতা হয়ত কতক পরিমাণে এই দর-বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। আরও একটি কারণও কতক পরিমাণে কোনও কোনও দ্রব্য-সম্বন্ধে এই দর-বৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারে।

এক ব্যবসায়ে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা মিলিয়া একমত হইয়া তাঁহারা যার যে ব্যবসায় করেন, অনেক পরিমাণে দর চড়াইয়া রাখিতে পারেন। অনেক সময় কতিপয় ধনী ব্যবসায়ী কোনও কোনও উৎপন্ন দ্রব্য গোলাজাত করিয়া তাহার উপর প্রায় একচেটিয়া প্রভুত্ব করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এইরূপ প্রভুত্বাধীন দ্রব্যাদির উপরে তাঁহারা যে দর নির্দ্দিষ্ট করেন, সে দরের ব্যতিক্রম করা খুচরা-ব্যবসায়ীদের পক্ষে বা ক্রেতাদের পক্ষে বড় সহজসাধ্য হয় না। সকল দেশেই এই রকমে কোনও কোনও জিনিষের দর অনেক সময়ে বেশ চড়া থাকে। আমাদের দেশেও এরূপ যে হইতেছে না, তা বলা যায় না। বড় বড় পাইকারী 'বাজার-প্রভু'-দের লোভে ও কারসাজিতে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা সর্ব্বদা আমরা দেখিতে বা বুঝিতে পারি না। তবে, সকলের জ্ঞানগোচরে চল্‌তি বাজারে এক ব্যবসায়ের মধ্যে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাজার-দর, সম্বন্ধে একটা মিলের লক্ষণ আমরা মধ্যে মধ্যে বেশ দেখিতে পাই। ধরুন, কলিকাতার দুধের বাজারের অবস্থা। সর্ব্বত্রই 'খাটি' নামে অভিহিত দুধ টাকায় চারিসের এখন পাওয়া যায়। দুধ এমন একটা জিনিষ যাহা মজুত রাখা যায় না, যাহা ঠিক সমান বাঁধা ব্যয়ে সমান পরিমাণেও প্রতিদিন উৎপন্ন হয় না। অথচ কয়েক বৎসর যাবত আমরা দেখিতেছি, কলিকাতা দুধের দর বারমাস চারি আনা সেরে চলিতেছে। এই বৃহৎ কলিকাতার কোথাও একটি দিন তাহার পার্থক্য কিছু হয় না। কলিকাতার দুগ্ধ-ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা মিল ব্যতীত এমন হইতে পারে না। তারপর কলিকাতার কয়লার বাজার। আজ ২/৩ বৎসর যাবৎ দেখা যাইতেছে, কলিকাতার কয়লার দর কখনও বাড়ে কখনও কমে। যে দিন বাড়ে, সর্ব্বত্র সমানভাবে বাড়ে, আবার যেদিন কমে সর্ব্বত্র সমানভাবে কমে। ইহাতেও কয়লা-ব্যবসায়ীর মধ্যে একটা মিলের আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য কয়লা দোকানে দোকানে উৎপন্ন হয় না, খনি হইতে আমদানী হয়। খনির কর্ত্তা ও আমদানীর কর্ত্তারাই বুঝিয়া ইহার দর নির্দ্দিষ্ট করেন। কিন্তু দোকানদারদের মধ্যেও কিছু একটা মিল নাই, এমন বলা যায় না। প্রত্যহ প্রতি দোকানে

নূতন কয়লা আসে না। অথচ সহসা একদিন প্রাতঃকালে দেখা যায়, সর্ব্বত্র প্রায় সমান-ভাবে কয়লার দর বাড়িয়াছে বা নামিয়াছে। মিল ব্যতীত এমন হওয়া সম্ভব নয়। বহু দৃষ্টান্ত এমন পাওয়া যাইবে। কিন্তু দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ করিয়া ফল নাই।

তবে ২/৪ জনের বা কোনও সম্প্রদায়ের, কোনও ব্যবসায়ের উপরে একচেটিয়া প্রভুত্বে অতিরিক্ত দর বেশীদিন থাকিতে পারে না। ব্যবসায়ীমাত্রেই লাভ চান, কতদরে বিক্রয় করিলে মোটের উপর সবচেয়ে বেশী লাভ হইবে, তাঁহারা ইহাই হিসাব করিয়া বিক্রীত জিনিষের দর নির্দ্দিষ্ট করেন। জিনিষ কম বিক্রি হইয়া মোটের উপর লাভ কম থাকিবে, এত বেশী দর চড়াইয়া তাঁহারা কখনও রাখেন না। যদি খরচ পোষায় আর খাট্‌নী পোষায় তবে সাধারণ লোকের সাধ্যের অতিরিক্ত দরে ইহারা কখনও জিনিষ বিক্রয় করিতে চান না। কি খরচ তাঁদের করিতে হয় এবং খাট্‌নী পোষাইতে তাঁরা কত চান, তাও অনেক পরিমাণে আবার টাকার দামের উপরে নির্ভর করে। টাকার দাম যে পরিমাণে কম হইবে, সেই পরিমাণে টাকা খরচ তাঁহাদিগকে বেশী করিতে হইবে, টাকার হিসাবে লাভ তাঁহারা বেশী চাহিবেন। সুতরাং এস্থলেও টাকার দামের হ্রাসবৃদ্ধির কথা আসিয়া পড়িতেছে।

অপ্রাচুর্য্য এবং ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া প্রভুত্ব প্রভৃতি কারণে বাজার-দর যেটুকু বাড়াইয়া রাখিয়াছে, সেটুকু নামান দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নয়। কিন্তু চল্‌তি টাকা বাড়িয়া, টাকার দর কমিয়া, বাজার-দর যাহা চড়িয়া গিয়াছে, তাহা আর কমার সম্ভাবনা নাই। কমা দূরে থাক, যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আরও কিছু বাড়িতে পারে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মধ্যে মধ্যে বাজার-দর এইরূপে স্থায়ী ভাবে বাড়িয়াছে। বর্ত্তমান যুগে যে খুবই বাড়িয়াছে, তাহাও ঠিক। ইহাতে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের যে সমান কষ্ট হয়, তা নয়। কোনও কোনও শ্রেণী বরং ইহাতে বিশেষ লাভবান্‌ই হইয়া থাকেন। যাঁহারা উৎপাদনে এবং বিনিময়ে নিযুক্ত থাকেন, অর্থাৎ ব্যবসায়-বাণিজ্যাদি করেন, সাধারণতঃ তাঁহারাই বাজার-দর চড়ায় লাভবান্‌ হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট হারে মাসিক বেতনে বা দৈনিক ঠিকা-মজুরীতে কাজকর্ম্ম করিয়া জীবিকা-অর্জ্জন করেন, তাঁহাদিগের দর চড়ায় কিছুকাল বড় কষ্ট পাইতে হয়। কারণ দর যে হারে বাড়ে, তাঁহাদের বেতন বা মজুরী সে হারে বড় বাড়িতে পায় না। যতদিন বাজার-দরে ও তাঁহাদের আয়ের হারে একটা সামঞ্জস্য না হইয়া দাঁড়ায়, ততদিন তাঁহাদিগকে বড় কষ্ট পাইতে হয়।

আমাদের দেশেও ঠিক এই অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা উৎপাদন—বিনিময় প্রভৃতি বিবিধ ব্যবসায়-বাণিজ্যে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন, তাঁহারা বাজার-দর বৃদ্ধিতে সাধারণতঃ কোনও কষ্ট পাইতেছেন না। কিন্তু যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট হারের বেতনে বা মজুরীতে কাজকর্ম্ম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে এই

বাজার-দর অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যেও যাঁহারা যে পরিমাণে বাজার দরের সঙ্গে আপনাদের আয় বাড়াইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের ক্লেশ তত কম হইতেছে।

অনেক সাধারণ কাজকর্ম্মের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, এইরূপ আয়ের হার বেশ বাড়িয়াছে। দিন-মজুরের মজুরী এখন প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে, যেখানে বাড়ে নাই, সেখানে তাহারা কাজের সময় কমাইয়া ক্ষতি পোষাইয়া লয়। ভৃত্য আগে যে বেতনে মিলিত, এখন তায় মেলে না, বেতন অনেক বেশী দিতে হয়। আবার তারা কাজ কম করে, কথা বলিলে মুখের উপর দু'কথা শুনাইয়া দেয়, কথায় কথায় কাজ ছাড়িয়াও চলিয়া যায়। নাপিত আগে এক পয়সায় কামাইত, এখন দুই পয়সা করিয়া লয়। ধোপারা কাপড় কাচিতে বেশী দাম চায়, আবার কাপড় ছিঁড়িয়া, হারাইয়া, চুরি করিয়াও বেশ চলিয়া যাইতেছে। কুলীরা এখন মোট বহিতে বেশী পয়সা লয়। লোকের কাজে ইহাদের যত দরকার হয়, লোকে তত ইহাদের পায় না। বরং ইহারা যত চায় তার বেশী কাজ পায়। কাজেই ইহারা সহজেই আপনাদের আয়ের হার বাড়াইতে পারিয়াছে, এবং যাদের পয়সা ইহারা আয় করে, তাদের খাতিরও কম করে।

কিন্তু বর্ত্তমান বাজার-দরে সবচেয়ে বেশী কষ্ট হইয়াছে, বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্র-সম্প্রদায়ের। ইহারা অনেকেই নির্দ্দিষ্ট বাঁধা বেতনে কাজকর্ম্ম করেন। ইহাদের মধ্যে আবার বেশীর ভাগই অল্পবেতনের কেরাণী বা স্কুলমাষ্টার। যাঁহারা আইন বা চিকিৎসা ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের বাঁধা বেতন নাই বটে, কিন্তু লোকের মামলা-মোকদ্দমার কি রোগ-চিকিৎসার প্রয়োজন অথবা তার জন্য অর্থব্যয়ের যে সামর্থ্য আছে, তাহার তুলনায় ইহাদের সংখ্যা এত বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে, যে অনেকেরই আয় ইহাতে অত্যন্ত কম হইয়াছে। যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট বেতনে কাজ-কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কর্ম্ম-প্রার্থীর সংখ্যার তুলনায় প্রাপ্য কর্ম্ম-সংখ্যা এত কম এবং প্রতিযোগিতাই এত বেশী হইয়াছে যে, অনেকে কাজকর্ম্ম পানই না। যাঁহারা পান, তাঁহাদেরও ওই প্রতিযোগিতার জন্য বেতনের হার বৃদ্ধির কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ২০/২৫ টাকা বেতনের একটী কেরাণীগিরি বা মাষ্টারী খালি হইলে তার জন্য সেই কার্য্যের যোগ্য বা যোগ্যেরও অধিক বিদ্যার অধিকারী বহুলোক যদি প্রার্থী হন, তবে সেরূপ কোনও কার্য্যের বেতনের হার বৃদ্ধি না পাইয়া যে হ্রাস হইবারই অধিক সম্ভাবনা, একথা বলাই বাহুল্য। এই সব চাকরীর অবস্থা এখন এইরূপই হইয়াছে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের সাধারণ অবস্থা অন্যরূপ ছিল। খাদ্যাদি অতি সুলভ ছিল, অন্যান্য প্রয়োজনও কম ছিল। যৌথ-পরিবারের দায়িত্ব ও অধিকারের দাবী এমন শিথিল ছিল না। এক পরিবারের ২/১ জন মাত্র কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলেই অন্যান্য সকলের চলিয়া যাইত। অনেক গৃহস্থ সম্পন্ন জ্ঞাতিকুটুম্বের সাহায্যেও প্রতিপালিত হইতেন। এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, দিন কাল আর

এক রকম হইয়াছে। পৈতৃক কোনও সম্পদ নাই, এখন বয়স্কপুরুষ মাত্রেরই কিছু না কিছু উপার্জ্জনের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রচুর ব্যবসায়-বাণিজ্যের বৃদ্ধি এবং বর্ত্তমান রাজকীয় শাসন-পদ্ধতির প্রয়োজনে বহু নূতন নূতন জীবিকার পথ বাহির হইয়াছে। এদিকে গবর্ণমেন্টের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিস্তারে এই সব কাজ-কর্ম্মের যোগ্যতাও অনেকে লাভ করিতেছেন। মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের প্রয়োজন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই এই শিক্ষা লাভ করিয়া এই সব বৃত্তির দিকে ধাবিত হইতেছেন। কিন্তু যতলোক এই দিকে ধাবিত হইতেছেন, তত লোকের মত জীবিকার বৃদ্ধি এসব পথে হইতেছে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু তবু, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক লোক এখন নানা দিকে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে ৩০/৪০ কি ২৫/৩০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গড়ে যে আর্থিক আয় ছিল, তাহা এখন অনেক বাড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে অর্থের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা আরও অনেক বেশী বাড়িয়াছে। টাকার হিসাবে আয় বাড়িয়াছে, ঘরে ঘরে টাকা বাড়িয়াছে, কিন্তু বাজার দরের হিসাবে সে টাকার দাম অনেক কমিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার অনেক ব্যয়বহুল নূতন নূতন প্রয়োজনও তাহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। যদি আগের মত অতি সরল গ্রাম্যভাবে কেবল মোটাভাত-কাপড়ে আমাদের জীবন কাটান এখন সম্ভব হইত, তবে হয়ত বাজারদরের সঙ্গে যে এই আয়বৃদ্ধি (অথবা আয়ের সঙ্গে যে এই বাজারদর বৃদ্ধি) হইয়াছে, তাহাতে কষ্টে একরূপ চলিয়া যাইত, যদিও তাও ঠিক বলা যায় না। কিন্তু তাহা আর সম্ভব নয়। নূতন-নূতন ব্যয় যাহাতে বাড়িয়াছে, তাহার কতক অবশ্য পরিত্যজ্য তুচ্ছ বিলাস হইলেও, অধিকাংশ আমাদের বর্ত্তমান যুগের নূতন ধরণের জীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন।

বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণের টাকার হিসাবে আয় যতই বাড়ুক, বাজারদরে এবং অন্যান্য নূতন প্রয়োজনে, টাকা যত চাই, তত বাড়ে নাই। তাই এই বাজারদর বৃদ্ধিহেতু তাঁহাদের পক্ষে বড় একটা ক্লেশকর আর্থিক সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, প্রধানতঃ যে কারণে বাজারদর বাড়িয়াছে, সে কারণ দূর হইবার নহে, এই চড়াদরই স্বাভাবিক দর হইয়া দাঁড়াইতেছে ও দাঁড়াইবে। এইরূপে স্থায়ীভাবে বাজারদর যখন চড়ে, তখন নির্দ্দিষ্ট হারের বেতন বা মজুরীতে কাজকর্ম্ম করিয়া যাঁহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়, তাঁহারাই প্রথমে ক্লেশভোগ করেন। কারণ বাজার দরের সঙ্গে সঙ্গেই বেতন ও মজুরীর হার বাড়ে না। যাদের যত শীঘ্র বাড়ে, তাদের ক্লেশ তত শীঘ্র কমিয়া যায়। বাঙ্গলার কুলী, মজুর, ভৃত্যাদি সম্প্রদায় বাজার দরের সঙ্গে ইতিমধ্যেই তাহাদের আয়ের হার বাড়াইতে পারিয়াছে, তাহাদের ক্লেশও অনেক কমিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায় যে সব বৃত্তি

অবলম্বনে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের চাওয়ার তুলনায় এ সব বৃত্তি এত কম প্রাপ্য যে, তাহাতে তাঁহাদের আয়বৃদ্ধির সুবিধা হইতেছে না। নূতন নূতন আরও বহু ব্যয়ের প্রয়োজন বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহাদের অবস্থা যারপর নাই কঠোর হইয়া উঠিয়াছে।

এখন ইহার কি প্রতিকার হইতে পারে? একমাত্র, প্রতিকারের উপায় এই দেখা যায় যে, তাঁহাদিগকে নিজেদের আয় বাড়াইতে হইবে। এখন তাঁহারা গড়ে জনে জনে যত আয় করিতেছেন, তার অনেক বেশী আয় তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। এই আয় বাড়াইতে হইলে অর্থবহুল নূতন নূতন পথে জীবিকা অন্বেষণের চেষ্টা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। পুরাতন পথগুলি অবশ্য একেবারে বন্ধ হইতে পারে না। সে পথেও বহু লোককে যাইতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও বেতনের হার বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন। প্রতিযোগিতা অনেক পরিমাণে শিথিল না হইলে, বেতনের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অনেকে এ পথ ছাড়িয়া নূতন পথ না ধরিলে, প্রতিযোগিতাও শিথিল হইবে না। এখন এই সব নূতন পথ কি হইতে পারে? নূতন নূতন দিকে ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তার ব্যতীত নূতন পথ পাইবার আর উপায়ান্তর নাই। শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানগণের কর্ম্মশক্তি এখন প্রধানতঃ এই দিকেই নিয়োজিত করিতে হইবে। তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও এখন তদনুরূপ করিতে হইবে।

কেমন করিয়া এসব দিকে কি করা যাইতে পারে, তার পক্ষে কি সব বাধা আছে, কেমন করিয়া সে সব বাধাই বা দূর হইতে পারে, তার বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নাই। তবে যাঁহারা দেশের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদের সম্মুখে যতগুলি বড় বড় সমস্যা এখন উপস্থিত হইয়াছে, তার মধ্যে এ সমস্যা অন্য কোনও সমস্যা অপেক্ষা গুরুত্বে ন্যূন নহে।

ইহার গুরুত্ব বুঝিয়া তাঁহারা যদি বিশেষ আগ্রহে এই দিকে মনোনিবেশ না করেন, তবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায় দেশ হইতে বিলুপ্ত হইবে। তার চেয়ে বড় অমঙ্গল, বড় দুর্ভাগ্য দেশের আর কিছু হইতে পারে না।

নগদ-বাকী

শ্রী ক্ষীরোদচন্দ্র পুর-কায়স্থ, এম্.এ.

নগদ-বাকী—কথাটা হয়ত হেঁয়ালির মত শুনায়। বৈয়াকরণিক মহাশয় যেন ইহাকে দ্বন্দ্ব-সমাস বলিয়া ভ্রম না করিয়া ফেলেন। ইউরোপীয় মহাদ্বন্দ্বের ফলে সকল প্রকার দ্বন্দ্বের প্রতি অর্থনৈতিকের বিশেষ ভীতি জন্মিয়া গিয়াছে। "রামেশ্বর" পদ লইয়া নাকি রাম ও মহেশ্বরের মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, তখন ব্রহ্মা আসিয়া মীমাংসা করিয়া দেন—"রামেশ্বর মানে রামের ঈশ্বরও নয়, রাম যাহার ঈশ্বরও নয়।" ব্রহ্মা আজ্ঞা করিলেন—"রামই ঈশ্বর।" আমিও বলিতেছি বর্ত্তমান কালের বাণিজ্যে "নগদ" টাও "বাকী"; বর্ত্তমান বাণিজ্যের আদান-প্রদানে নগদ ও বাকীর পার্থক্য অতিশয় ক্ষীণ। আধুনিক বাণিজ্যের টাকাকে নগদ বলিলেও ঠিক হয় না, বাকী বলাও চলে না বরং নগদবাকী কথাই বেশী প্রযোজ্য। আজকাল যাহাকে বণিক্-সম্প্রদায় cash (নগদ) বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা credit cash (বাকী-নগদ বা নগদ-বাকী)।

বাণিজ্যে মা লক্ষ্মী বাস করেন ইহা চির প্রসিদ্ধ; তাহার প্রতি মা ষষ্ঠীরও কৃপা নিতান্ত কম নয়। অভিজাত বংশের ইতিহাস-বিশ্রুত অনুর্ব্বরতা হেতু পীতধাতু পরিমাণে বাণিজ্যের সঙ্গে পারিয়া উঠে না। ভারতবর্ষের কথা ধরিলেই দেখা যাইবে, গত ৫০ বৎসরে মোট বহির্ব্বাণিজ্য (আমদানী ও রপ্তানি) ১৮৬৪ সালের ৯০ কোটী টাকা হইতে ১৯১৪ সালে ৪৩০ কোটী টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া দেশের মধ্যে অন্তর্বাণিজ্যও আছে। ১৯১২-১৩—এই এক বৎসরে ভারতবর্ষের অন্তর্বাণিজ্যেব (Internal trade) পরিমাণ মোট ৬,৮৭,৯৪০০০ হাজার টাকা। ভারতীয় রেলপথের যাত্রীসংখ্যা ১৮৯০ হইতে ১৯১১ এই ২২ বৎসরে শতকরা ১৬৮ জন হিসাবে অর্থাৎ আড়াই গুণেরও অধিক বাড়িয়াছে। রেলপথে নীত "মালের" পরিমাণ ১৮৯০ সালের অনুপাতে শতকরা ২১১ টন হিসাবে অর্থাৎ তিন গুণেরও বেশী বাড়িয়াছে। দেশের বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য যতদূর হিসাব করিতে পারা গিয়াছে তাহাতে গত ২২ বৎসরে ২ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

যুক্তরাজ্যের (ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ড) মোট বহির্বাণিজ্য ১৮৯০ সালে ৭৪৪৫ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১৯১২ সালে ইংরাজীতে ১৩৪৩৬ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। ১৯১৩ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ১৩৩৭ কোটী টাকা (৪২৭ কোটি ডলার)। ১৯১২ সালে ফরাসী দেশের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ৫৮৩৪ লক্ষ পাউণ্ড। জর্ম্মাণ-সাম্রাজ্যের বহির্বাণিজ্য ১৯১২-১৩ সালে মোট ১০৬২৮ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। সুতরাং দেশের মুদ্রা—পাউণ্ড, ডলার, ফ্রাঙ্ক, মার্ক বা টাকাই হউক,—

বর্ত্তমান কালের ব্যবসায়ে শুধু মুদ্রা দিয়া ব্যবসা পরিচালন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি কোটি কোটি মুদ্রা ক্রেতা-বিক্রেতার বা উত্তমর্ণ-অধমর্ণের মধ্যে আদান-প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে একদিকে তাহা যেমন নিতান্তই অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িবে, অন্যদিকে তেমনি চুরি-ডাকাতির ভয়ও বাড়িয়া যাইবে। কেবল আমাদের দেশে নয়, ইউরোপীয় মুদ্রার ইতিহাসে মুদ্রার উপর স্বর্ণকারের অত্যাচার চিরপ্রসিদ্ধ। আমাদের অঞ্চলে একটা প্রবাদ আছে, সোণার ব্যবসায়ী আপনার বাপকেও ঠকায়। ইউরোপীয় স্বর্ণব্যবসায়ী বাপকে ঠকাইবার কোন সুবিধা করিতে পারিয়াছে কিনা হলপ করিয়া বলিতে পারি না। তবে দেশশুদ্ধ লোককে ঠকাইয়া নিজের সিন্ধুক পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে, তাহা প্রাচীন আমষ্টারডাম্ নগরের রাজকীয় ব্যাঙ্কস্থাপনেই দেখিতে পাই। বর্ত্তমান কালের লণ্ডনের ন্যায় মধ্যযুগের আমষ্টারডাম্ নগর অন্তর্জাতীয় ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল। সেখানকার স্বর্ণকারের "ব্যবসায়-বুদ্ধির" অনুগ্রহে পূর্ণ ওজনের যত মুদ্রা তাহা সিন্ধুকে "তলাইয়া পড়িত" আর স্বর্ণব্যবসায়ীর কৃপায় যাহারা "লঘিমা" লাভ করিত তাহারা হাল্কা শরীরে বাজারে বিচরণ করিত।

অন্তর্জাতীয় বাণিজ্যে পীত ধাতুই মূল্যের পরিমাপক (standard)। তাহার পরিমাণ পৃথিবীতে যে গতিতে বাড়িতেছে তাহা সমগ্র পৃথিবীর বাণিজ্যের সঙ্গে কুলাইয়া উঠিতে পারে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত উত্তোলিত (raised) স্বর্ণের মূল্য ৩০৩ কোটি পাউণ্ড (প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা)। বিশেষতঃ স্বর্ণকে শুধু টাঁকশালে পোড়াইয়া মার্কা মারিয়া আমরা সন্তুষ্ট হই না; কুবের ঠাকুরের অনুগ্রহের চিহ্ন স্বরূপ আশীর্ব্বাদ শরীরে ধারণ করিয়াও তদ্দারা গৃহ সাজাইয়া ভক্তির পরিচয় দেই। যদি অন্যান্য প্রকার টাকার ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে স্বর্ণের কাটতি (demand) বাড়িয়া গিয়া তাহার মূল্য "চড়িয়া" যাইবে। স্বর্ণের হিসাবে (in terms of gold) অন্য সকল দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যাইবে। তাহাতে ব্যবসা বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ হইয়া অন্ন-সংস্থানের পথ বন্ধ হইবে।

প্রধানতঃ তিন উপায়েই স্বর্ণের মুদ্রারূপে ব্যবহার কমাইয়া দেওয়া হয়—(১) নোট, (২) চেক্, (৩) হুণ্ডি। এই তিনটির প্রথমটিকে কাগজের টাকা (paper-money) বলা হয়। চেক্ ও হুণ্ডিও অনেকাংশে টাকার কার্য্য করে, সুতরাং এই তিনটিরই সাধারণ নাম "কাগজের টাকা" বলা যাইতে পারে। ইহারা বড়-সাহেবের চাপরাশী বাঘের উপর টাঘ—ঠিক টাকার চেয়ে, ইহাদের প্রতাপ বেশী।

নোট সরকার বাহাদুরের একপ্রকার অঙ্গীকার পত্র মাত্র। "সরকার অঙ্গীকার করিতেছেন বাহককে লিখিত টাকা দাবীমাত্র দিবেন।" বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে কোন ব্যাঙ্কের "নোট প্রসব" নিষিদ্ধ। ইংলণ্ডেও "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" ভিন্ন আর কোন ব্যাঙ্কে নোট ইস্যু বা বাহির করিবার সনন্দ বা এক্তিয়ার নাই। ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের ন্যায়

ভারত সরকারকেও প্রত্যেকখানি নোটের পরিবর্ত্তে সেই পরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ অথবা রৌপ্য "গুদামজাত" করিতে হয়। ইহার নাম (paper-currency reserve) কাগজের টাকার রিজার্ভ। ঐ রির্জাভ ফাণ্ডের কেবল মাত্র ১৪ কোটি টাকা ব্রিটিশ ও ভারতীয় "কোম্পানীর কাগজে" (securities) "লাগাইয়া রাখা" (invested) যাইতে পারে। সরকার (Government) সকল সময়েই নোটের পরিবর্ত্তে টাকা দিতে প্রস্তুত থাকায়, আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। সুতরাং "রোক" (cash) ১০০টি টাকার বোঝা বহিয়া মরার চাইতে, কোটের পকেটে ১০০ টাকার হাল্কা নোট লইয়া যাওয়াই সুবিধা মনে করি। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে গত ১৯১১-১২ সালে মোট ৬১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার নোট বাহির করিয়া সরকার বাহাদুর তাহা ভাঙ্গাইবার জন্য মাত্র ১৫কোটি ৪০লক্ষ মুদ্রিত টাকা অর্থাৎ শতকরা ২৫১ টাকা মজুত রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট যদিও বাকী ৪৫ কোটি টাকার মধ্যেও ১৪ কোটি মাত্র কোম্পানীর কাগজে লাগাইয়াছেন, বাকী ৩১ কোটি টাকারও এক হিসাবে সাধারণ সময়ে অর্থাৎ বিশেষ কোন বিপ্লব উপস্থিত না হইলে আর কোন আবশ্যকই নাই। বর্ত্তমান বৎসরের কুরুক্ষেত্রের ফলে দেশে যে আতঙ্ক জন্মিয়াছিল তাহাতেও পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় মোট ৭ কোটি টাকার নোটের মাত্র চল্‌তি কমিয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে, দেশের মোট চল্‌তি টাকার (রোক্‌ ও নোট) সংখ্যায়, এক-পঞ্চমাংশ হইতে এক-চতুর্থাংশ, নোট।

সাল	মোট টাকার চল্‌তি	চল্‌তি নোট	টাকার চলন
১৯০৩	১৪৭ কোটি	৩০ কোটি	১১৭ কোটি
১৯০৪	১৫২ কোটি	৩১ কোটি	১২১ কোটি
১৯০৫	১৬৪ কোটি	৩৬ কোটি	১২৮ কোটি
১৯০৬	১৮৫ কোটি	৩৭ কোটি	১৪৮ কোটি
১৯০৭	১৯০ কোটি	৩৫ কোটি	১৫৫ কোটি
১৯০৮	১৮১ কোটি	৩৬ কোটি	১৪৫ কোটি
১৯০৯	১৯৮ কোটি	৪১ কোটি	১৫৭ কোটি
১৯১০	১৯৯ কোটি	৪২ কোটি	১৫৭ কোটি
১৯১১	২০৯ কোটি	৪৭ কোটি	১৬২ কোটি
১৯১২	২১৪ কোটি	৫১ কোটি	১৬৩ কোটি

এখন বিচার করুন, দেশের প্রচলিত টাকার এই এক-চতুর্থাংশ নগদ না নগদ [illegible]

বলি, বাকী বলি না এবং বলিতেও পারি না। কাহারো কাহারো একটা রোগ আছে, দেশশুদ্ধ লোককে কুটুম্ব বলিয়া পরিচয় দেওয়া। নগদ বেচারার সেই রোগ উপস্থিত

হইয়াছে কিনা diagnosis নির্ণয় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আধুনিক বাণিজ্য-জগতে সরকারী মুদ্রা প্রভৃতি অপেক্ষা চেক ও "বিল অব্ এক্সচেঞ্জের" প্রচলন বেশী। বর্ত্তমান বাণিজ্য-জগতের সহিত যাহারা বিন্দুমাত্র সম্পর্ক রাখেন, তাঁহারাই জানেন, আজকাল দেশের মধ্যে কাহাকেও টাকা দিতে হইলে সাধারণতঃ কোন ব্যাঙ্কের নামে চেক কাটিয়া দেওয়া হয়। বিদেশে টাকা পাঠাইতে হইলে ব্যাঙ্ক হইতে একখানা draft (বরাতচিঠি) বা Bill of exchange (বিল অব এক্সচেঞ্জ) অর্থাৎ হুণ্ডি কিনিয়া আনিতে হয়। এরাও "কাগজবংশীয়", তবুও ইহারা নগদ।

রাম বসু যদি শ্যাম দত্তকে ৫৭০্ টাকা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তিনি তাঁহার ব্যাঙ্ককে এই মর্ম্মে বরাতচিঠি লিখিয়া দেন—

"কলিকাতা ব্যাঙ্ক প্রতি ঃ

বরাতচিঠি দৃষ্টে শ্যাম দত্তকে অথবা তাহার বরাতী আর কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে মোট ৫৭০্ টাকা সম্‌ঝাইয়া দিবে।"

চেকের ফারম ছাপা থাকে; কেবল নাম ও টাকার সংখ্যাটী বসাইয়া দিলেই চলে। শ্যাম দত্ত যদি ব্যবসায়ী হয়, তাহা হইলে সে তাহার যে ব্যাঙ্কের সহিত কারবার, সেই ব্যাঙ্কে গিয়া এই চেকখানি হাজির করে। যদি উভয়ের এক ব্যাঙ্কের সহিত কারবার থাকে, তাহা হইলে রাম বসুর হিসাবে খরচ লিখিয়া শ্যাম দত্তের হিসাবে জমা দিলেই ব্যাঙ্কের কার্য্য হইয়া গেল। শ্যাম দত্ত যদি ব্যবসায়ী লোক না হইয়া, বিত্তবিহীন (যে শ্রেণীর নাম মধ্যবিত্ত, সেই শ্রেণীর) হয়, তাহা হইলে সে হয়ত কিছু নোট ও কিছু টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু আমরা ব্যবসায়ের কথা আলোচনা করিতেছি, তাই উভয়কেই ব্যবসায়ী ধরিয়া লইব। ব্যবসায়ী হইলেও উভয়ের এক ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার না থাকিতে পারে। তাহা হইলে রামের ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইয়া আনিয়া তাহার নিজের ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া যে হেঙ্গাম, তাহা অনেক সময় অসুবিধাজনক এবং এতটা কষ্ট স্বীকার করিবার আবশ্যকতাও নাই। তাহার ব্যাঙ্ক বিনা পারিশ্রমিকেই এই কার্য্য করিতে প্রস্তুত। সর্ব্বদাই এরূপ ঘটিতেছে যে, এক ব্যাঙ্কের নামে চেক অন্য ব্যাঙ্কে জমা হইয়া যায়। পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের নিকট যে পাওনা থাকিত, তাহা লোক পাঠাইয়া উশুল করিয়া লইত। ইহাতে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। অনাবশ্যকভাবে এক ব্যাঙ্ক হইতে টাকা অন্য ব্যাঙ্কে পাঠাইতে হইত। ধরুন, যেন কলিকাতা ব্যাঙ্ক দিল্লী-ব্যাঙ্কের নিকট ৫০ হাজার টাকা পাইবে। আবার ভারত-ব্যাঙ্ক দিল্লী-ব্যাঙ্ককে ৫২ হাজার দিবে। আবার কলিকাতা-ব্যাঙ্ক ভারত-ব্যাঙ্ককে ৫৩ হাজার টাকা দিবে। এই অবস্থায় যদি প্রত্যেক ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটী আদান-প্রদানের জন্য টাকার দরকার হয়, তাহা হইলে কত টাকার আবশ্যক? অথচ যদি তাহারা একত্র মিলিত হয়, তাহা হইলে মাত্র তিন হাজার টাকায় এই কাজটা শেষ করা যাইতে পারে এবং

বহু পরিশ্রম ও ব্যয় কমিয়া যায়। মোট ১,৫৫,০০০ টাকার চেক ৩ হাজার টাকা দ্বারা নিকাশ করা যায়। উপরের চেকগুলি নিকাশ করিবার কালে নিম্নলিখিত ভাবে হিসাব করা যায়।

	প্রাপ্য	দেয়	মোট প্রাপ্য বা দেয়
কলিকাতা-ব্যাঙ্ক	৫০	৫৩	– ৩
দিল্লী-ব্যাঙ্ক	৫২	৫০	+ ২
ভারত-ব্যাঙ্ক	৫৩	৫২	+ ১

এখন যদি কলিকাতা ব্যাঙ্ক দিল্লী-ব্যাঙ্ককে ২ হাজার ও ভারত-ব্যাঙ্ককে এক হাজার টাকা দেয়, তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়া যায়। ইহাতে ১৫২ হাজার টাকার ব্যবহার অনাবশ্যক হইল।

যে ঘরে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিসকল মিলিত হইয়া তাহাদের পরস্পরের দৈনিক হিসাব এই ভাবে নিকাশ করে, তাহার নাম Clearing house (ক্লিয়ারিং হাউস) বা নিকাশ-আফিস। গত ১৮৯০ সালে ভারতবর্ষীয় সকল "ক্লিয়ারিং হাউসের" নিকাশের পরিমাণ ছিল ১৩৭ কোটি ৭৫ লক্ষ। ১৯১০ সালে তাহা ৪১০ কোটি ৮ লক্ষ ও ১৯১১ সালে ৪৫৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯১০ সালে মোট প্রচলিত টাকার পরিমাণ ১৬২ কোটি ও ১৯১১ সালে ১৬৩ কোটি। প্রচলিত টাকার তিনগুণ চেক্ 'ক্লিয়ারিং হাউসে' নিকাশ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সাড়ে চারিশত কোটি টাকার চেক নিকাশ করিতে (Cash) টাকার প্রয়োজন অতি সামান্যই হইয়াছে।

বাকী যে সকল চেক্ নিকাশ-ঘরে নিকাশ হইবার জন্য দর্শন দেয় না, তাহাদের নগদত্বের প্রমাণটাও একবার শুনুন। অতি পূর্ব্বে যখন ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার প্রথার সৃষ্টি হয়, তখন গচ্ছিত টাকা পাহারা দিবার জন্য ব্যাঙ্ককে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হইত। ক্রমে যেদিন ব্যাঙ্কওয়ালা বুঝিতে পাবিল যে, যত টাকা সে গচ্ছিত রাখে, তাহা সময় সময় শোধ করিতে তাহার সমস্ত টাকার আবশ্যক হয় না, তখন হইতে সে অনাবশ্যক অংশটা ধার দিতে আরম্ভ করিল। হিসাবের মত লিখিলে এই দাঁড়ায়—

	প্রথম	তহবিল ও সম্পত্তি
দায়—		
	গচ্ছিত—১০০০	নগদ—১০০০
	দ্বিতীয় অবস্থায়	তহবিল ও সম্পত্তি
দায়—		
	গচ্ছিত—১০০	নগদ—৪০০
		কর্জ্জ—৬০০
		১০০০

চেকের প্রচলন বাড়িয়া যাওয়ার কালে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, যাহারা ব্যাঙ্কে কর্জ্জ করিতে আসে, তাহারাও সেই টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া একখানা চেকের বহি লইয়া যায়। তখন ব্যাঙ্ককে কর্জ্জের টাকাকে হিসাবের দুই দিকে লিখিয়া রাখিলেই চলে। যেমন, —

দায়—		তহবিল ও সম্পত্তি	
গচ্ছিত—	১০০০	নগদ —	১০০০
কর্জ্জ ঐ—	৬০০	কর্জ্জ —	৬০০
	১৬০০		১৬০০

মনে করুন, অভিজ্ঞতা দ্বারা যদি ব্যাঙ্ক এই কথা জানিতে পারে যে, ১০০ টাকা যদি গ্রাহকের নিকট তাহার "দেয়" হয়, তাহা হইলে মাত্র ৪০ টাকা তাহার সিন্ধুকে থাকিলেই চলে এবং তাহা হইলে ঐ ব্যাঙ্ক ১০০০ টাকা মজুত রাখিয়া আরও ৯০০ কর্জ্জ দিতে পারে।

গচ্ছিত —	১০০০	নগদ —	১০০০
ঐ —	৬০০	কর্জ্জ —	৬০০
ঐ —	৯০০	কর্জ্জ —	৯০০
	২৫০০		২৫০০

এই সময় হইতে যাহারা টাকা গচ্ছিত রাখিত (Depositors); ব্যাঙ্ক তাহাদিগকে সুদ দিতে আরম্ভ করিল। ব্যাঙ্ক যে হারে গচ্ছিত টাকার সুদ দেয়, কর্জ্জ টাকার সুদ তাহার চেয়ে শতকরা ১ টাকা বেশী চায়। এক ব্যাঙ্কের চেক ভিন্ন ব্যাঙ্কে জমা হইবার জন্য গেলে ক্লিয়ারিং হাউসে কিভাবে তাহা নিকাশ হয় তাহা বলিয়াছি। বাকী যে সকল চেক্ একই ব্যাঙ্কে ফিরিয়া আসে, তাহার কতক আবার সেইখানে জমা হইয়া যায়; বাকী অংশের জন্য শুধু "রোক" টাকার দরকার। যে সকল দেশে ব্যাঙ্ক প্রাচীন প্রতিষ্ঠানে (Institution) দাঁড়াইয়া গিয়াছে, সেখানে ব্যাঙ্ককে গচ্ছিত টাকার চেক আবশ্যকমত শোধ করিবার জন্য শতকরা ২০ হইতে ২৫ টাকা তহবিলে রাখিলেই চলে। অতি অল্পস্থলেই শতকরা ৩০ টাকার বেশী তহবিলে রাখিতে হয়। সুতরাং চেকের প্রতি টাকার নগদত্বের পরিমাণ $\frac{১}{৫}$ হইতে $\frac{১}{৪}$ মাত্র।

ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব ও চেকের স্বাক্ষরকারীর সততা এই উভয়ের উপর বিশ্বাস একত্র না হইলে চেকের এত প্রসার অসম্ভব ছিল। ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব-বিষয়ে লোক সন্দিহান হইলে ঐ ব্যাঙ্কের নামীয় চেক্ কেহ গ্রহণ করিত না। স্বাক্ষরকারী যদি প্রবঞ্চক হয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কেব নিকট টাকা গচ্ছিত না রাখিয়াও সে চেক্ লিখিয়া দিতে পারে। আবার নোট অপেক্ষাও চেকে সুবিধা বেশী। ধরুন, কাহাকেও আপনাদের ১১৭৷৷৴৹ দিতে হইবে। নোটে সেই টাকা দিতে হইলে তাহাকে আপনি ১১৫ টাকার বেশী নোট

দিতে পারেন না। বাকী ২৷৷৵৹ আনা "রোক" টাকায় দিতে হয়। চেকে এ সব কোন লেঠা নাই। ফারমে যে সংখ্যা খুসি লিখিয়া দিতে পারেন। ছেলেবেলায় এক দৈত্যের গল্প শুনিয়াছি। তাহার এক গদা ও একগাছি দড়ি ছিল, তাহা যাহার হাতে যাইত, তাহার হুকুম তামিল করিত। আমাদের নোটেরও সেই অবস্থা। ১০০্ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের যত নোট তাহারা এই জাতীয়। ডাকে যদি এদের পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে "জেনানা আদমির মত" অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া শীল (Seal) করিয়া ইন্‌সিওর করিয়া তবে দিতে হয়। আমাদের "জীবন্ত লগেজ" লইয়া নড়াচড়া করার মত ইহাদিগকে স্থানান্তরিত করা ব্যয়সাধ্য ও বিপজ্জনক। চেকের উপর আবার যদি কোণাকোণি Not negotiable (হস্তান্তর অগ্রাহ্য) লিখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে মোটেই লেঠা নাই। ইহাতে হস্তান্তরে ঠিক বাধা নাই। তবে যে ব্যক্তি ইহা অন্যকে দিবে, তাহার ঐ চেকের উপর যে দাবী থাকে, তৃতীয় ব্যক্তির তাহার চেয়ে বেশী দাবী হইতে পারে না, সুতরাং চোর যদি চুরি করিয়া অন্যের নিকট বিক্রী করে, তাহা হইলে ক্রেতার ঐ চেকের উপর কোন দাবী হয় না। কারণ বিক্রেতা চোর-স্বত্ত্বাধিকারী নহে। সুতরাং এই প্রকার চেক্ অনায়াসে আধ আনার এন্‌ভেলোপের ভিতরে পুরিয়া পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এমন অবস্থায় চেক্ যে সকলকে ডিঙ্গাইয়া উঠিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এই যে শত শত কোটী টাকার চেক্ দেশে চলিতেছে, ইহারা নগদ না বাকী? টাকার বহুগুণ যাহারা পরিমাণে তাহারা নগদ না বাকী না নগদ-বাকী? নগদ নয়—কারণ আসলে চেকও ত একপ্রকার বরাত চিঠি। আর বাকীও বলিতে পারি না। কারণ চেক্ একখানা পাইলে পাওনাদার সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যায়।

উপরে ব্যাঙ্কের হিসাবের যে নমুনা দিয়াছি, তাহাতে ব্যাঙ্ক সমস্ত টাকা কর্জ্জই দেয় ধরিয়া লইয়াছি। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু আরো অন্যান্য উপায়ে সে তাহার টাকার ব্যবহার করে। তার মধ্যে প্রধান আর একটীর আমরা আলোচনা করিব। ব্যাঙ্কের হিসাবে Bill (বিল) বা Bill of Exchange (বিল অব এক্সচেঞ্জ) অর্থাৎ হুণ্ডি ব্যাঙ্কের টাকা লাগাইবার (Investment) একটি প্রধান উপায়। সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ এই রকম দাঁড়ায়।

দায়			সম্পত্তি ও তহবিল		
মূলধন	—	১০০০০০্	কর্জ্জ	—	২০০০০০্
রিজার্ভফাণ্ড	—	৩০০০০্	কোম্পানীর কাগজ	—	২০০০০্
গচ্ছিত	—	২০০০০০্	ঘর-বাড়ী ও আসবাব	—	২০০০০্
		৩৩০০০০	হুণ্ডি	—	৩০০০০্
			নগদ	—	৬০০০০্
					৩৩০০০০

একটা নূতন কথা এই দেখা যাইতেছে, ব্যাঙ্ক নিজের মূলধনকেও দায় বলিয়া লিখেন; কারণ ব্যাঙ্ক মূলধনের জন্য অংশীদারগণের নিকট দায়ী। রিজার্ভ ফাণ্ড সম্বন্ধেও ঐ কথা। সম্পত্তি ও তহবিলের (assets) দিকেও তিনটি নূতন জিনিষ দেখা যাইতেছে, ১. কোম্পানীর কাগজ, ২. ঘর-বাড়ী ও আস্‌বাব, ৩. হুণ্ডি। ব্যাঙ্ক পরিচালনে বড় "হুসিয়ারী" চাই। নগদ তহবিল যদিও গচ্ছিত টাকার $\frac{১}{৪}$ রাখিলে চলে, তথাপি এমন ঘটিতে পারে যে ডিপজিটারগণ হঠাৎ টাকা চাহিয়া বসিবেন। সুতরাং ব্যাঙ্কের নগদ ছাড়া আর যে সম্পত্তি থাকে তাহা এমন হওয়া চাই যেন অনায়াসে তাহা বিক্রী করিয়া রোক্ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। যে সকল সম্পত্তি জামিন রাখিয়া ব্যাঙ্ক ধার দেন, তাহা এই প্রকার হওয়া চাই। যেন আবশ্যকমত তাহাও অবিলম্বে বিক্রী করিতে পারা যায় এবং তাহাতে কোন লোক্‌সান না হয়। কোম্পানীর কাগজ এই শ্রেণীর। তাহার জন্য ক্রেতার অভাব হয় না এবং দরেরও খুব বেশী উঠ্‌তি-পড়্‌তি হয় না। এইজন্য ব্যাঙ্ক নিজেই কিছু কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া রাখে।

হুণ্ডি ও বরাত-চিঠি ভাল গ্রাহকের হইলে কোম্পানীর কাগজের চেয়ে কম বিশ্বাসযোগ্য নয়। হুণ্ডি ছাড়া আধুনিক বাণিজ্য অসম্ভব হইয়া পড়িত। মনে করুন, কলিকাতার দাস-কোম্পানী, লণ্ডনে মিঃ স্মিথের নিকট ১৫০০০ টাকার পাট পাঠাইল। জাহাজে সেই মাল পৌঁছিতে অন্ততঃ ৫ সপ্তাহের দরকার। আবার স্মিথের সেই মাল বিক্রী করিতে হয়ত আরো ৬ সপ্তাহ লাগিবে। এমন অবস্থায় তিন মাসের পূর্ব্বে স্মিথ সেই টাকা আদায় করিতে প্রস্তুত না হইবারই কথা। এদিকে দাস-কোম্পানীও তিন মাস অপেক্ষা করিতে নারাজ। তখন হুণ্ডির সৃষ্টি করে। হুণ্ডিতে লেখা থাকে—

"কলিকাতা

তারিখ—

অদ্য তারিখ হইতে তিন মাস (ও অনুগ্রহের তিন দিন) পর এই হুণ্ডি দর্শনমাত্র—কে মোট ১৫০০০ টাকা সমজাইয়া দিবে। ইহার মূল্য আমি পাইয়াছি।

স্বাক্ষর—শ্রীদাস-কোম্পানী।

মিঃ স্মিথ প্রতি— "

কাগজখানা হাতে লইয়া তখন দাস-কোম্পানীর লোক হয়ত ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলে দর্শন দেয়। তাহারা তখন তাহার Bill of Lading (মাল-চালানী রসিদ) ও মালের জাহাজী ইন্‌সিওরের রসিদ পরীক্ষা করে এবং সন্তুষ্ট হইলে তাহাকে ১৫ হাজার টাকা হইতে বাজারদরে তিন মাসের সুদ কাটিয়া রাখিয়া বাকী টাকা সমজাইয়া দেয়। ধরুন, যেমন বর্ত্তমান সময়ে ডিস্কাউন্টের (বা সুদের) দর শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা অর্থাৎ ত্রৈমাসিক ১৷৹ টাকা। তাহা হইলে ঐ ১৫ হাজার টাকার হুণ্ডির বর্ত্তমান মূল্য = ১৫০০০ – (১৫০ × ১॥) = ১৫০০০ – ২২৫ = ১৪৭৭৫ টাকা। ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল তাহাকে

১৪৭৭৫ টাকা দিয়া ১৫০০০ টাকার হুণ্ডিখানি রাখে। দাস-কোম্পানী তাহার হিসাবে ১৪৭৭৫ টাকা জমা দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। এখন আর ২২৫ টাকা হইলে দাস-কোম্পানী আরো ১৫০০০ টাকার কারবার করিতে সক্ষম। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লণ্ডনের তাহাদের এজেন্টের নিকট বা ব্রাঞ্চ-অফিসে হুণ্ডিখানা ডাকে পাঠাইয়া দেয়। তাহারা স্মিথকে হুণ্ডিখানা দেখাইলে সে কোণাকোণি লিখিয়া দেয় "গৃহীত হইল স্মিথ"। তখন ব্রাঞ্চ অফিস তাহা তাহার সম্পত্তিরূপে তিনমাস রাখিয়া দিতে পারে। সময় হইলে (when it matures) স্মিথের নিকট হইতে ১৫ হাজার টাকা আদায় করিয়া লয়। স্মিথ তখন তাহার ব্যাঙ্কের নামে একখানা চেক লিখিয়া দেয়। আবার সেই চেক্ ক্লিয়ারিং হাউসে নিকাশ হয়।

স্মিথ যদি ব্যাঙ্ক-মহলে (in Banking circles) পরিচিত লোক না হয়, তাহা হইলে একটু গোল বাঁধিতে পারে। স্মিথ তিন মাস পরে যে টাকা আদায় করিবে, তাহার বিশ্বাস কি? তখন স্মিথ কোন Accepting House-এর শরণ লয়। তাহারা তাহাকে জানে এবং বিশ্বাস করে এবং কিছু কমিশন দিলে তাহারা হুণ্ডিখানা ও তাহাদের নামটাও স্বাক্ষর করিয়া দেয়। মানে, স্মিথ টাকা দিতে অসমর্থ হইলে তাহারা টাকা শোধ করিবে। Accepting House (একসেপ্‌টিং হাউসের) খাতির (Credit) যথেষ্ট থাকায় সেই হুণ্ডি তখন নোটের মত চলিতে থাকে। তখন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের যে লণ্ডনের ব্রাঞ্চ আফিস—তাহারা, আবশ্যক বোধ করিলে, হুণ্ডিখানাকে অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে পারে। অবশ্য বিক্রয় করিলে বাজার-দরে তাহার যে "র্বত্তমান-মূল্য" Present worth তাহাই পাইবে। সাধারণতঃ কলিকাতার চেয়ে লণ্ডনের সুদের হার কম। সুতরাং বিক্রয় করিলে কলিকাতার চেয়ে তাহারা দর বেশী হইবে। তাই ভাল হুণ্ডির এত আদর। ব্যাঙ্ক ইহাকে "লগ্নীর" মধ্যে আদর্শ স্থানীয় (Ideal Investment) মনে করে। এক প্রকার ব্যাঙ্ক আছে, যাহাদের ব্যবসায়ই হুণ্ডি ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা লাভ করা। ইহাদের নাম Discount House (ডিস্কাউন্ট হাউস)। ফলে হুণ্ডির ব্যবহার বৃদ্ধি হওয়ায় ভিন্ন দেশে জিনিষ ক্রয় করিয়াও টাকা জাহাজে বোঝাই দিয়া বড় একটা পাঠাইতে হয় না।

পূর্ব্বোক্ত হুণ্ডির বাবদ ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের নামে লণ্ডনে ১৪,৭৭৫ টাকা জমা থাকায় কলিকাতার কোন ব্যবসায়ী যদি লণ্ডনে টাকা পাঠাইতে চায়, তাহা হইলে সে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের লণ্ডনের আপিসের নামে একখানি বরাত চিঠি কিনিয়া আনে। কলিকাতার ব্যবসায়ী তখন লণ্ডনের পাওনাদারের নিকট কাগজখানা পাঠাইয়া দেয়। টাকার চোখ আর কেউ বড় একটা দেখে না। বিশেষতঃ যেখানে টাকার পরিমাণ বেশী, সেখানে ত মোটেই না।

ভারতীয় বাণিজ্যের আর একটা সুবিধা—"ভারত-সচিবের কাউন্সিল বিল" (Council Bills of the Secretary of State) বিলাতে ভারত-সরকারের অনেক

প্রকার দেয় আছে। তাহা শোধ করিবার জন্য ভারত-সচিব (Secretary of States for India) ভারত-সরকারের নামে কতকগুলি বরাত-চিঠি (Drafts) বিক্রী করেন। যাহাদের বিলাত হইতে ভারতে টাকা পাঠাইবার আবশ্যক, তাহারা সোণা না পাঠাইয়া "কাউন্সিল বিল" কিনিয়া পাঠায়। সেইগুলি তাহারা ডাকে পাঠাইয়া দেয়। কাউন্সিল বিল দিয়া কারেন্সী আফিস হইতে নোট বা টাকা বাহির করিয়া লওয়া যায়। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ভারত সচিব তাহাদের আবশ্যকীয় টাকার অতিরিক্ত টাকার বিলও বিক্রয় করেন। তাহাতে বিলাতে বহু ক্রোড় টাকার পীতমুদ্রা জমিয়া গিয়াছে। আবার ভারতীয় ব্যবসায়ী যখন বিলাতে টাকা পাঠাইতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে, তখন ভারত-সরকার ভারত-সচিবের নামে বরাত-চিঠি ও বরাত টেলিগ্রাম (Telegraphic Transfers & Drafts) বিক্রয় করিয়া থাকেন।

ব্যবসায়ীর হুণ্ডিই হউক, ব্যাঙ্কের বরাত-চিঠিই হউক, ভারত-সচিবের কাউন্সিল বিলই হউক অথবা ভারত-সরকারের বরাত-চিঠি বা টেলিগ্রামই হউক, ইহারা সকলেই ধাতব মুদ্রাকে ব্যবসাভূমি হইতে বেদখল করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ইহারা সকলেই যে অন্ত্যজ—কাগজের টাকা মাত্র, ইহা বলাই বাহুল্য। অথচ এদের বাকী বলিলে, গালি দেওয়া হয়। কিন্তু আর যাই বলুন, নগদ বলিতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। কি বলিব?—নগদ বাকী?

এমনি ভাবে আমরা সকল কাজে টাকাকে পিছে ফেলিয়া কাগজকে প্রাধান্য দিতেছি; নগদের নামে নগদ ও বাকীর একটা খিচুড়িতে ততটা ছাড়িয়া দিতেছি। টাকা ভারি—চাই নোট; নোটে খুচরা হয় না—আদর করি চেক। বিদেশে চেক্ চলে না,—কিনিয়া লই। হুণ্ডি না হয় বরাত-চিঠি। হুণ্ডি দুষ্প্রাপ্য হইলে সরকারী বরাত-চিঠি বা টেলিগ্রাম। পৌরোহিত্য ছিল, গৌরবের ব্যবসায়। আজ ব্রাহ্মণকুলে যে নিতান্ত উপার্জ্জনে অক্ষম এবং কোন কোন স্থলে অনিচ্ছুক, তাহারাই পুরোহিত। সম্মান অপেক্ষা কৃপাই তাহাদের পুরস্কার। পার্থিব সভ্যতার প্রধান সহায় নগদ টাকা—ধাতব মুদ্রার আজ সেই দশা। চেক্ বা হুণ্ডি বা বরাত-চিঠির বা এমন কি নোটও যেখানে যাইতে গররাজি; অথবা এমন ভক্তিবিহীন কোন অব্যবসায়ী (Unbusinesslike) যদি থাকে, যে কাগজের টাকার উপর সন্দিহান, তখনি এই কুলীন মহাত্মার ডাক পড়ে!

বর্ত্তমান কালের একদেশদর্শিতারও একটা প্রমাণ দেখুন। দেশের সকল জিনিষের দর বাড়িয়া গিয়াছে! ১৮৯০ হইতে ১৯১২ এই ২৩ বৎসরে গড়ে সকল জিনিষের দর শতকরা ৪১৲ হিসাবে বাড়িয়া গিয়াছে। একদল বলিতেছেন, "যত দোষ ঐ টাকার। তার বংশ এত বাড়িয়া যাওয়াতেই জিনিষের দর বাড়িয়া গিয়াছে।" আর একদল টাকার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন "মানিলাম, টাকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাতে কি? আমার হাতে টাকা যদি বেশী আসে তাহা হইলে কি আমি ১০৲ টাকার

জিনিষের জন্য ১৪ টাকা দেই। বরং ১০ টাকা খরচ করিয়া ৪ টাকা সিন্ধুকে রাখিয়া দেই। যার ২০ সম্বল সেও যদি ৫ মন চাউল কিনে, ২০০ টাকা হাতে থাকিলেও সেই ব্যক্তি সেই চাউল ৫।০ টাকা দিয়া কিনিবে না।" অর্থনৈতিক বিষয় লইয়া ওকালতী করিতে গিয়া তাঁহারা প্রথমেই ভুলিয়া যান যে "প্রচলিত টাকা" (Money in circulation) লইয়াই কথা হইতেছে। সিন্ধুকের টাকাকে বাদ দিয়াই কথা হইতেছে। টাকার সংখ্যা যদি বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সুদ কমে; সুতরাং ব্যবসায়ীরা অধিক দরে জিনিষ কিনিতে পারে। ব্যবসায়ী ক্রেতার সংখ্যা বাড়িয়া যায়। এই ভাবেই টাকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে জিনিষের দর বাড়িতে থাকে। আর এক ভাবেও কথাটাকে প্রমাণ করা যায়।

ধরুন, যেন এক দেশে কেবলমাত্র এক প্রকার ১০০টি দ্রব্য আছে এবং তাহার প্রত্যেকটীর মূল্য যদি ৷৷০ আনা হয়, তাহা হইলে সেই দেশের ব্যবসায়ের জন্য ৫০ টাকার দরকার। অর্থাৎ—

আবশ্যকীয় টাকার সংখ্যা = দ্রব্যের সংখ্যা × প্রত্যেকটির মূল্য

$= ১০০ \times \frac{১}{২} = ৫০$

এমন যদি এমন হয়, যে প্রত্যেকটি টাকা বৎসরে দুই হাত ঘুরে, তাহা হইলে প্রত্যেকটি টাকা প্রকৃতপক্ষে ২টি টাকার কার্য্য করে। তাহা হইলে উপরোক্ত উদাহরণে—

$$\text{আবশ্যকীয় টাকার সংখ্যা} = \frac{\text{দ্রব্যের সংখ্যা} \times \text{প্রত্যেকটির মূল্য}}{\text{টাকার হস্তান্তরের দ্রুততা}}$$

$$\text{অর্থাৎ আবশ্যকীয় টাকার সংখ্যা} = \frac{১০০ \times \frac{১}{২}}{২}$$

$$= \frac{৫০}{২} = ২৫$$

সুতরাং টাকার সংখ্যা যদি জানা থাকে, তাহা হইলে উপরোক্ত সঙ্কেত হইতে মূল্যও স্থির করা যাইতে পারে। যেমন—

$$\text{টাকার সংখ্যা} = \frac{\text{দ্রব্যের সংখ্যা} \times \text{প্রত্যেকটির মূল্য}}{\text{টাকার হস্তান্তরের দ্রুততা}}$$

সুতরাং—

$$\text{টাকার সংখ্যা} \times \text{টাকার দ্রুততা} = \text{দ্রব্যের সংখ্যা} \times \text{প্রত্যেকটির মূল্য}$$

সুতরাং —

$$\frac{\text{টাকার সংখ্যা} \times \text{টাকার দ্রুততা}}{\text{দ্রব্যের সংখ্যা}} = \text{প্রত্যেকটির মূল্য}$$

যদি আম্‌দানি ও কাট্‌তিটা স্থির ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে যে, কোন দেশের জিনিষের—

$$\text{গড় মূল্য} = \frac{\text{মোট টাকার পরিমাণ} \times \text{টাকার দ্রুততা}}{\text{জিনিষের মোট পরিমাণ}}$$

একটি টাকা বৎসরে কত হাত পরিবর্ত্তন করে, তাহা প্রায় স্থির থাকে। এমন অবস্থায় যদি জিনিষের পরিমাণও স্থির (অপরিবর্ত্তিত) বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় এবং মোট টাকার পরিমাণকে যদি ৩ গুণ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে গড়মূল্যও যে ৩ গুণ বাড়িয়া যাইবে ইহা বুঝাইতে গণিতের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন নাই।

অনেক সময় এমন হইতে পারে যে, টাকার পরিমাণ বাড়িয়া দুইগুণ হইল অথচ টাকার দ্রুততা (Rapidity of circulation) অর্দ্ধেক হইয়া গেল, তাহা হইলে মূল্য বাড়িবে না। অথবা 'টাকার দ্রুততা'' স্থির থাকিয়া যদি জিনিষের পরিমাণও টাকার মত দ্বিগুণ হইয়া যায়, তাহা হইলে গড়মূল্য স্থির থাকিয়া যাইবে। তবে বাস্তবজগতে মূল্যের determinant (নিয়ামক) যতগুলি শক্তি আছে, তাহারা শুধু একটা করিয়া, কখনো কার্য্য করিতে দেখা যায় না। তিনটি শক্তির শেষফল কি দাঁড়াইবে, তাহা একটি মাত্র বিষয় (Factor) আলোচনা করিয়া বলা যাইতে পারে না। তবে যে কোন বিষয়ের (Factor-এর) গতি, উর্দ্ধ বা অধঃ, মাপ করিলে ইহা সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হইবে না, ঐ শক্তির চেষ্টা (tendency) গড়মূল্যকে তাহার দিকে পরিবর্ত্তিত করা। যেমন ধরুন, যদি মালের পরিমাণ হঠাৎ তিনগুণ বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে এমন সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হইবে না যে, ঐ শক্তির চেষ্টা (tendency) মূল্যকে এক-তৃতীয়াংশ করিয়া ফেলা। সুতরাং টাকার সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা যদি প্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে সেই অনুপাতে মূল্য ''বাড়িয়া'' যাইবার একটা চেষ্টা রহিয়াছে, বলা অন্যায় নয়। তবে তাহার পরিমাণ-বৃদ্ধি জিনিসের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত তুলনা করা আবশ্যক। অল্পকাল মধ্যে কোন দেশের মুদ্রার প্রচলনের দ্রুততার (Rapidity of circulation) বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইবার সম্ভাবনা অল্প; সুতরাং শক্তিটাকে স্থির (constant) ধরিয়া লইতে পারি। তাহা হইলে গড়মূল্যের নিয়ামক (determinant) শক্তিরূপে কেবলমাত্র রহিল—টাকার সংখ্যা ও দ্রব্যের পরিমাণ। ১৮৯০-৯৪ এই ৫ বৎসরের গড় লইয়া তাহাকে যদি ১০০ ধরিয়া লই, তাহা হইলে ১৯১১ সালে টাকার পরিমাণ ১৬০, ব্যবসায় ২২২ ও টাকার দ্রুততা ১০০, সুতরাং—

$$\text{গড়মূল্য} = \frac{১৬০ \times ১০০}{২২২} = ৬০ \text{ প্রায়}$$

যে সকল সংখ্যা আমরা পাইয়াছি, তাহা হইতে আমরা আশা করিতে পারিতাম যে, ১৮৯০-৯৪ এই ৫ বৎসরের গড়কে ১০০ ধরিয়া লইলে ১৯১১ ইংরাজীতে তাহার আনুমানিক মূল্য ৬০ হইত অর্থাৎ মূল্য শতকরা ৪০্ হিসাবে কমিয়া যাইত। অথচ প্রকৃতপক্ষে গড়মূল্য ১৩৪ ছিল। কিন্তু টাকা হিসাব করিতে গিয়া খাঁটি নগদ ও নোটকেই ধরিয়াছি, "নগদ-বাকীকে" ধরি নাই। বাণিজ্য-জগতে "নগদ-বাকীর" চলনই যখন বেশী, তখন তাহাকেও ঐখানে যোগ দিয়া দেখিব, কোন সন্তোষজনক জবাব পাই কি না। দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের বৃদ্ধিকেই "নগদ-বাকীর" বৃদ্ধির মাপকাটি ধরিয়া লইলাম। এই প্রকার হিসাব অবশ্য অনেকটা স্থূল। ১৮৯০-৯৪ এই পাঁচ বৎসরের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের গড়কে ১০০ ধরিয়া লইলে ১৯১১ সালে তাহা ২৮৬তে দাঁড়ায়। তাহা হইলে—

$$\text{গড়মূল্য} = \frac{১৬০ + ২৮৬}{২২২} \times ১০০ = \frac{৪৪৬}{২২২} \times ১০০ = ২০০ \text{ (মোটামুটী)}$$

সুতরাং যদি কেবলমাত্র টাকার হ্রাস-বৃদ্ধির উপরই মূল্য নির্ভর করিত, তাহা হইলে হয়ত সকল দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ হইয়া যাইত। কিন্তু গত ২০/২৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে প্রাচীন প্রথার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া টাকার প্রচলন বাড়িয়া গিয়াছে। বহুস্থলে যেখানে দ্রব্য দিয়া দ্রব্য ক্রয় করা হইত, সেখানে টাকার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। এমন অবস্থায় মূল্য দ্বিগুণ না হইয়া দেড়গুণেরও কিছু কম বাড়িয়াছে হইাই স্বাভাবিক। তারপর জিনিষের আম্‌দানি ও কাটতির উপরও তাহার দাম অনেকটা নির্ভর করে। এই ২২ বৎসরে এই সকল শক্তির ক্রিয়াও মূল্যে প্রকাশ পাইয়া থাকিবে।

মোট কথা, দ্রব্যের মূল্য যদি টাকার অধিক্যহেতু বাড়িয়া থাকে, তাহার জন্য খাঁটি নগদ টাকা দায়ী হইতে পারে না। যদি কেহ দায়ী থাকে, তবে সে নগদ-বাকী অর্থাৎ বর্ত্তমান বাণিজ্যের কাগজের টাকা। অন্ত্যজ জাতির স্বভাবসুলভ উর্ব্বরতাহেতু তাহার বংশ এত দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কুলীন "মুদ্রাগোত্রীয় রজতচক্র" তাহার সঙ্গে বংশ বৃদ্ধি করিয়া উঠিতে পারেন নাই! সুতরাং দোষের ভাগটা তাহার ঘাড় হইতে নামাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

আবার বিবেচনা করুন, গত ১২ বৎসরে নগদ টাকার যে কিছু বংশ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার দোষ বা গুণের ভাগী ভারত-সচিবের বরাত চিঠি বা কাউন্সিল বিল। পুনর্মুদ্রিত পুরাতন টাকার সংখ্যা বাদ গিয়া খাঁটি নূতন মুদ্রিত টাকার সংখ্যা ও বিক্রীত কাউন্সিল বিলের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কত নিকট, তাহা নিম্নলিখিত তালিকাতেই স্বপ্রকাশ। ১৯০৭ সালে আমেরিকায় যে, অর্থ-সমস্যা (Banking crisis) উপস্থিত হয়, তাহার ফলে পরবর্ত্তী বৎসরে (১৯০৮-০৯ সালে) বিক্রীত কাউন্সিল বিলের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যায়। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ভারত-সরকার

ভারতসচিবের নামে, বরাতি চিঠি ও টেলিগ্রাম বিক্রয় করেন। তাহাতে রাজকোষে টাকার পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ফলে ১৯০৮-০৯ সালে প্রচলিত নোটের অনুপাতে রোক টাকা রিজার্ভ-ফণ্ডে শতকরা ১০৩টি হইয়া দাঁড়ায়। ১৯০৯-১০ সালে শতকরা ৬১.৬ ও ১৯১০-১১ সালে শতকরা ৫২.৮ থাকিয়া যায়। ১৯১১-১২ সালের পূর্ব্বে রিজার্ভ কেন্দ্রের এই অবস্থা—এই অস্বাভাবিক স্ফীততা—দুরীভূত না হওয়ায় সরকার বাহাদুর ১৯০৮-১৯১১ পর্য্যন্ত অতি অল্প সংখ্যক টাকাই মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহা ১৯০৮-০৯ সালের কাউন্সিল বিলের পরিমাণ অত্যধিক কমিয়া যাওয়া ও ভারত-সরকারের বরাত টেলিগ্রাম ও চিঠির (Drafts of Telegraphic transfer) বিক্রয় বাড়িয়া যাওয়ার ফল। সুতরাং নগদ টাকার বংশবৃদ্ধি বা লোপের জন্য ঐ শ্রেণীর কাগজের টাকা বা নগদ বাকীই দায়ী। নগদ টাকা হইতে জন্মলাভ করিয়া, বর্ত্তমানে নগদ বাকীই, নগদের কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং টাকার উপর যদি কোন অভিযোগ থাকে, নগদকে বাদ দিয়া নগদ বাকীর সঙ্গে বুঝা পড়া করুন।

	খাঁটি নূতন মুদ্রিত টাকার পরিমাণ	বিক্রীত কাউন্সিল-বিলের পরিমাণ
১৯০৪-০৫	৭.৮১ লক্ষ	৩৬,১২ লক্ষ
১৯০৫-০৬	১৬,৮৮ লক্ষ	৪০,৬৯ লক্ষ
১৯০৬-০৭	২৩,৩৮ লক্ষ	৫০,৪৭ লক্ষ
১৯০৭-০৮	১৫,৭০ লক্ষ	২৩,৪৬ লক্ষ
১৯০৮-০৯	২৪ লক্ষ	৮,০২ লক্ষ
১৯০৯-১০	১১ লক্ষ	৪১,৪৯ লক্ষ
১৯১০-১১	২০ লক্ষ	৩৯,৪৪ লক্ষ
১৯১১-১২	৩০ লক্ষ	৪০,১৬ লক্ষ
১৯১২-১৩	১৬,০০ লক্ষ	৩৮,৮৩ লক্ষ
১৯১৩-১৪	১০,২০ লক্ষ	৪৬,৬০ লক্ষ

ভারতীয় শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা

শ্রী মন্মনাথ ঘোষ এম্,সি,ই; এম্,আর,এ,এস্

ব্যবসায় এবং বাণিজ্যে আমি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিবার পক্ষপাতী নহি। স্বার্থ-বিজড়িত না থাকিলে কোনও কাজে আন্তরিক যত্ন বা চেষ্টা সকলে করিতে পারেন না। অবশ্য কোনও কোনও মহাত্মা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি বিরল। কোনও কাজের সম্যক্ উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহাতে মনঃপ্রাণ সমর্পণ না করিলে আশানুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা যায় না। এই কারণে নিঃস্বার্থ লোকের পক্ষে নির্লিপ্ত ভাবে কাজ করা অধিকাংশস্থলেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। একথা বুঝাইবার জন্য আমাদিগকে বেশীদূর যাইতে হইবে না। দেশীয় ব্যক্তিবিশেষের কারখানাগুলির সহিত অবৈতনিক ডিরেক্টরগণ-পরিচালিত যৌথকারবারগুলির তুলনা করিলেই ইহার স্যততা উপলব্ধি হইবে।

আমাদের দেশে যৌথকারবারের প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালন-ভার যে শ্রেণীর লোকের উপর ন্যস্ত হয়, তাঁহাদের আদৌ অবসর না থাকায়, ইচ্ছা থকিলেও তাঁহারা কর্ত্তব্য-সাধনে অসমর্থ হইয়া পড়েন। যাঁহাদিগকে কায়িক পরিশ্রম এবং মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হয়, তাঁহারা অবৈতনিক (Honorary) কাজে যে কতটুকু সময় দিতে পারেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। এ অবস্থায় দেশের কল্যাণকামী সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, যতদিন দেশের যৌথকারবারগুলি প্রকৃত ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইতেছে, ততদিন উহাদের উন্নতির কোন আশা নাই। যে সকল ব্যক্তি পুরুষানুক্রমে ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, অথবা যাঁহারা রীতিমত ব্যবসা-শিক্ষা করিয়া উহাতেই জীবন-উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, তাঁহারাই আমাদের এই অসময়ের একমাত্র কাণ্ডারী। এই শ্রেণীর লোকই দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন্ কোন্ শিল্প প্রয়োজন এবং সুবিধাজনক হইবে বলিতে পারেন এবং কিরূপভাবে পরিচালিত হইলে উহা লাভবান্ হইতে পারে, তাহাও তাঁহারা যেরূপ বুঝিবেন. অন্য কেহ সেরূপ বুঝিতে পারিবেন না। এই সমস্ত কারণে কারখানা স্থাপন করিবার সময় এইরূপ লোকের পরামর্শই আবশ্যক। নতুবা যে সে শিল্প খেয়ালানুযায়ী আরম্ভ করিলে, তাহার ফলও যে তদনুরূপ হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

কোনও শিল্পই অন্য এক বা ততোধিক শিল্পের সাহায্য ব্যতিরেকে হইতে পাবে না। সুতরাং শিল্পকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে আস্তে আস্তে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার শিল্পানুষ্ঠান করিতে হইবে। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন আমাদের অনুষ্ঠিত কোনও শিল্পেরই ভবিষ্যৎ আশানুরূপ হইবে না। জানি. এ কার্য্য বহুব্যয় এবং

সময়সাপেক্ষ, কিন্তু ইহা আমাদিগকে করিতেই হইবে। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদিগের প্রয়োজনীয় কোনও কল বা যন্ত্রাদি এখানে প্রায়শঃ প্রস্তুত হইতে পারে না; যদিবা তাহা বিদেশ হইতে আনাইতে পারি তাহা চালাইবার আনুষ্ঠানিক উপকরণ, যথা—উকা, বেল্টিং, মেসিন অয়েল ইত্যাদি কোথায়? যদি বা এই সমস্ত জিনিস বিদেশ হইতে পাইলাম, প্রস্তুতমাল পালিসাদি করিবার জন্য আমাদিগকে সমুদ্রপারে হা করিয়া চাহিতে হইল! হয় তো জিনিষ প্রস্তুতের জন্য অনেকগুলি মাল মসলাই বিদেশ হইতে আনিতে হইল! এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইলে সে জাতির আশা কোথায়?

কিছুদিন পূর্ব্বে এদেশে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে উৎপন্ন জিনিষও মন্দ হয় নাই। আর কিছুদিন ঐ সকল কারখানা চালাইতে পারিলে, তাহারা নিশ্চয়ই বিদেশ হইতে আমদানী মালের ন্যায় উৎকৃষ্ট জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারিত। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাহাদের অধিকাংশই আজ অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। উপযুক্ত সহানুভূতির অভাবই ইহার কারণ। যাহা হউক, যেগুলি এখনও আছে, তাহাদের সহায়তা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট ঔদাসীন্য দেখা যায়।

আমাদের আর একটী দোষের জন্য কারখানাগুলি স্থায়ী হইতেছে না বা উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না। আমরা শিক্ষিত শিল্পীদ্বারা কাজ আরম্ভ করাইয়া উৎপন্ন জিনিষ বাজারে বিক্রয়ের উপযুক্ত হইলেই মনে করি তাঁহাদের কাজ শেষ হইল; উচ্চবেতনে শিক্ষিত শিল্পীর তখন আর প্রয়োজন নাই। তাঁহাদিগকে যে বেতন দিতে হয়, তাহা বাঁচাইলে কারখানায় লাভ হইব। কিন্তু তাহাই কি হয়? অভিজ্ঞতার ফল কি আদৌ নাই? ঐ সমস্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে না ছাড়াইয়া বরং ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে কোম্পানীর লভ্যাংশ দিয়া সেই সেই কাজে আরও উৎসাহিত করিলে সুফলই ফলিতে পারে। যাঁহার দ্বারা যে কার্য্য হইতে পারে, তাহা আজও আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে শিখি নাই; সুতরাং কে কিরূপ কাজের লোক তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ফলে এই হয় যে, প্রতিনিয়ত কম বেতনের শিল্পী রাখিয়া আমরা কাজের কোন উৎকর্ষ লাভ করা দূরে থাকুক ক্রমশঃ উহার অবনতি করিতে থাকি। বর্ত্তমান কঠোর প্রতিযোগিতার সময় প্রস্তুত মাল যত উৎকৃষ্ট এবং সস্তা হইবে, তাহা তত আদরণীয় হইবে এবং সেই ব্যবসায়ে তত অধিক লাভ হইবে।

এদেশে ব্যবসা অধিকাংশ স্থলেই অশিক্ষিত লোকের দ্বারা পরিচালিত হয়, সুতরাং তাঁহাদের অনেকেরই তাদৃশ্য ব্যবসা-জ্ঞান থাকিতে পারে না। পাঁচজন দোকানদার একত্র হইয়া কাজ করিবার শক্তি বা ইচ্ছা তাঁহাদের নাই, এই কারণে তাঁহারা পরস্পর অন্যায় প্রতিযোগিতায় স্ব স্ব ব্যবসায়ের অপকার সাধন করেন এবং তৎসঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের

মূল্য এরূপভাবে কমাইয়া দেন যে ঐ সমস্ত দ্রব্যের উৎকর্ষ করা দূরে থাকুক, তাহা প্রস্তুত করিতেও অনেক শিল্পীকে বিরত হইতে হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, স্বদেশজাত দ্রব্যের উপরই তাঁহাদের এইরূপ ব্যবহার। এই শ্রেণীর দোকানদারগণ দেশী জিনিষ হইলেই ধারে চাহিয়া বসেন; কিন্তু শতকরা পাঁচজন লোকও স্ব স্ব অঙ্গীকার মত টাকা পরিশোধ করেন না। ইহাতে কোন্ বাজারে কি পরিমাণ মাল প্রতিমাসে বা বৎসরে কাট্‌তি হইতে পারে, শিল্পীগণ তাহা নিরূপণ করিতে পারেন না। এই সমস্ত দোকানদারদিগকে লইয়া ক্লাব বা এসোসিয়েসন করা আবশ্যক এবং তাঁহাদের সামান্য একটু যত্ন ও চেষ্টা দেশের যে কি প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান যুগে সমস্ত সভ্যদেশের লোকই স্বার্থত্যাগ করিয়া থাকেন এবং সেই কারণেই তাঁহারা জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন। অবশ্য তাঁহাদিগকে অধিকাংশ স্থলেই বাধ্য হইয়া স্বার্থত্যাগ করিতে হয়; কারণ স্ব স্ব দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য তাঁহাদিগকে প্রায়শঃ অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হয়। বিদেশ হইতে আমদানী জিনিষের উপর গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক প্রয়োজনানুযায়ী উচ্চ শুল্ক নির্দ্ধারিত হওয়ায় স্বদেশজাত দ্রব্য সেখানে অনেক মূল্যে অর্থাৎ উচ্চলাভে বিক্রয় হয়। এ বিষয়ের একটী উদাহরণ দিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন। "ঈগল-কপিং-পেন্সিল" যাহা আমরা ভারতবর্ষে তিন পয়সায় কিনিতে পাই, তাহা আমেরিকায় প্রস্তুত হইলেও তথায় ছয় পয়সায় বিক্রীত হয়; তাহার কারণ এই যে আমেরিকায় গভর্ণমেন্ট উক্ত জিনিষের উপর শতকরা ১০০ টাকা হিসাবে শুল্ক ধার্য্য করায় যে কোনও বিদেশ হইতে উহা আমদানী করিতে হইলে প্রথমতঃ কাষ্টম হাউশেই তাহার মূল্য দ্বিগুণ হইয়া যায়, তৎপরে ব্যবসায়িগণের লাভালাভ আছে। এ অবস্থায় বিদেশ হইতে ঐ জিনিষ আমদানী করিলে যে দর হইতে পারে, সেই দরেই দেশে প্রস্তুত মাল বিক্রয় হয়। অর্থাৎ বিদেশীয় মাল সস্তা না হওয়ায় আমেরিকাবাসিগণকে বাধ্য হইয়া উচ্চ মূল্যে উহা ক্রয় করিতে হয়।

আমাদের দেশেও ঐরূপ ব্যবস্থার অতীব প্রয়োজন হইয়াছে। এজন্য আমাদিগকে গভর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। অবশ্য যে সমস্ত জিনিষ ইংলণ্ডে প্রস্তুত হইয়া এখানে বেশীর ভাগ বিক্রীত হয়, সে গুলি ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য জিনিষের উপর আপাতত উচ্চহারে শুল্ক ধার্য্য করিতে আমাদের বা গভর্ণমেন্টের কোনও আপত্তি হইবার কারণ নাই। গভর্ণমেন্টের বিনা সাহায্যে কোনও দেশের শিল্পোন্নতি হইতে পারে না এবং এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদিগকে গভর্ণমেন্টের পূর্ণ সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হইবে এবং যাহাতে এতদ্দেশে Protective duty অর্থাৎ সংরক্ষণী-শুল্ক স্থাপিত হয়, তাহা করিতে হইবে।

এই আজ দুই বৎসর অতীত হয় নাই, আমাদের দুইজন প্রাতঃস্মরণীয় মহামতি স্যার টি. পালিত এবং ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অজস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। এইরূপ দান দেশের শিল্পোন্নতির জন্যও আবশ্যক হইয়াছে। দাতৃগণ দেশের সমগ্র বড়ো বড়ো সহরে Commercial museums স্থাপিত করিয়া দিলে দেশীয় শিল্পের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। শত বৎসর ধরিয়া প্রদর্শনী করিয়া যে ফল না হইবে, কতকগুলি স্থায়ী Commercial museums স্থাপিত করিয়া দিলে তদপেক্ষা অল্প ব্যয়ে অধিকতর কাজ হইবে। ঐ সমস্ত Museums বা যাদুঘরে দেশী ও বিদেশী সমস্ত জিনিষের নমুনা ও মূল্য পাশাপাশি রাখিয়া দিতে হইবে এবং দেশের কোথায় কোন্ জিনিষ উৎপন্ন হয় তাহা লিখিয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলে দেশীয় শিল্পীগণ উহা হইতে নিজ নিজ জিনিষের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিতে পারিবেন এবং জনসাধারণও কোথায় কোন্ জিনিষ কি মূল্যে পাওয়া যায়, সহজে বুঝিতে পারিবেন। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে অনেক মেলা ও প্রদর্শনী হইতেছে; কিন্তু তাহাতে কি আমরা ঈপ্সিত ফল পাইতেছি। আপনাদের অনেকেই বোধ হয় অল্পাধিক বিশ পঁচিশটা প্রদর্শনী দেখিয়াছেন, কিন্তু প্রদর্শনী বন্ধ হইয়া গেলে কোথায় কি জিনিষ পাওয়া যায় আর বলিতে পারেন কি? আমরা জানি, অনেকে স্বদেশজাত জিনিষের প্রাপ্তিস্থান না জানায় ইচ্ছা থাকিলেও উহার উৎসাহ দিতে পারেন না। জাপান এবং জার্ম্মনীর ন্যায় যদি দেশের প্রতি সহরে এইরূপ Commercial যাদুঘর স্থাপিত হয় এবং বড় বড় সহরে Museum গুলিতে Expert Chemist থাকেন, তাহা হইলে আমাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এখন গভর্ণমেন্ট এবং জনসাধারণের ঝোঁক অনেকটা শিল্পোন্নতির দিকে পড়িয়াছে। এ সুযোগ ছাড়া আমাদের কোনও মতে উচিত নহে। আমাদের ধনী দেশবাসিগণ একটু চেষ্টা করিলেই একার্য্য অতি সহজেই সংসাধিত হইতে পারে।

শ্যামে হিন্দুধর্ম্ম

শ্রী গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ

হিন্দু অর্থে কি বুঝি : বর্ত্তমান প্রবন্ধে "হিন্দু" অর্থে কেবল ভারতীয় হিন্দু জাতিকেই বুঝিতে হইবে।

হিন্দু ধর্ম্ম অর্থে বৌদ্ধ ধর্ম্ম নহে : বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায় বিশেষকে ধরা হইয়াছে। অপিচ, যথার্থ সনাতন "হিন্দু" পদবাচ্য জাতিকেই এস্থলে গ্রহণীয়। অধিকন্তু, শ্যামদেশে বৌদ্ধ-সম্পৃক্ত তাবৎ ব্যাপার আমাদের হিন্দু ক্রিয়া-কাণ্ডের মধ্যে গৃহীতব্য নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া আমরা কেবল হিন্দু দেবদেবীর বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

ব্রাহ্মণ প্রাধান্য : সংস্কৃত হইতে শ্যামদেশের ভাষা বর্দ্ধিত এবং পুষ্ট হইয়াছে। শ্যামবাসিগণের ভাষার প্রায় অধিকাংশ কথা প্রাচীন আর্য্যগণের নিকট হইতে গৃহীত। তাহাদের ধর্ম্ম ও রাজকীয় অধিকাংশ ক্রিয়াকাণ্ড প্রাচীন আর্য্যরীতি অনুসারে সাধিত হয়। তথায় ব্রাহ্মণগণের সংস্কার, ব্রাহ্মণ ভবিষ্যদ্বক্তাগণের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ, বেদাদির নিয়ম প্রতিপালন এবং ব্রাহ্মণগণের ক্রিয়া-কলাপাদি সর্ব্বকার্য্যে বিহিত হইয়া থাকে। রাজার ক্রিয়াকাণ্ডের সকলগুলিই হিন্দুরীত্যনুসারে সম্পন্ন হয়। উক্ত দেশের প্রধান প্রধান উৎসবাদিতে ব্রাহ্মণ ভবিষ্যদ্বক্তাগণের পরামর্শ গ্রহণ করত কার্য্য করা হয়। প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। তথায় ব্রাহ্মণগণই উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। এই প্রকার উচ্চ কার্য্যে বিনিযুক্ত থাকিয়াও তাঁহারা যথার্থ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য সম্পাদন করেন। ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব দেবমন্দিরে দেবারাধনা করিয়া থাকেন। সেই সকল মন্দিরে শচীপতি ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও অন্যান্য হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি বিদ্যমান। বস্তুতঃ তথায় জাগতিক সৃষ্টি ও পৌরাণিকী কথা প্রভৃতি হিন্দুগণের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইয়াছে। তাহারা দেবদেবী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করে। দেবগণ মর্ত্ত্য অপিচ মহৎ যোনিসম্ভূত। তাহাদের মধ্যে নাগগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, পরন্তু তাহারা কোনও কোন অংশে দেবগণের তুল্য প্রভাবসম্পন্ন। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ভগবানের চিহ্ন-স্বরূপ বলিয়া তদ্দেশবাসিগণ উক্ত দেবচিহ্নকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দান করিয়াছে। প্রাচীনকালে তথায় বৃক্ষ পূজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশেও গীতায় অশ্বত্থবৃক্ষকে নারায়ণের স্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত আছে। বৌদ্ধগণ এই স্থানে আগমন করিবার বহু পূর্ব্বে বৃক্ষপূজা হইত।

তথায় বুদ্ধদেবের হস্তে বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্র দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রের বজ্রও কুত্রাপি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত দেবের হস্তে চক্র রক্ষিত হইলে সর্ব্বনিহন্তারূপে

আবির্ভূত বুঝিতে হইবে এবং শেষোক্ত দেবতার হস্তে বজ্র দৃষ্ট হইলে অজ্ঞানতা এবং পাপের বিলোপকারী বলিয়া গৃহীত হইবে। পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁহারা হিন্দুমতের সানুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

দেবগণ ঃ এক সময়ে শ্যামদেশে ব্রাহ্মণগণের পূর্ণ আধিপত্য ছিল। শ্যামবাসিগণ বলে, ব্রাহ্মণগণের তৎকালে সুবৃহৎ ষোড়শটি দেশে একাধিপত্য ছিল, তন্মধ্যে শ্যামদেশে একটি। স্বর্গের দেবগণ সম্বন্ধে শ্যামবাসীর মত—দেবগণ জরামরণবর্জ্জিত। তাঁহাদের গলদেশের পুষ্পমাল্য কদাপি নিষ্প্রভ হয় না। তাঁহাদের কদাপি গাত্র হইতে ঘর্ম্মনির্গত হয় না। তাঁহাদের শীত-গ্রীষ্ম নাই। তাঁহাদের শরীরের অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয় না। পুরুষ বা অঙ্গনা সকলেরই যৌবন অক্ষুণ্ণ, তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে অপর প্রাণীহৃদয়ে প্রবেশলাভ করিতে সমর্থ। শ্যামবাসীর মতে বহু নিম্নশ্রেণীর দেবতাও বিদ্যমান আছে। নিম্নশ্রেণীর দেবতাগণের দৈহিক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। আমাদের দেশের জ্যোতির্ব্বিদ্গণের ন্যায় তাঁহারা ভূকম্পন, চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহণ এবং গ্রহনক্ষত্রাদির অভ্যুত্থান বা উদয়ের সময় নির্দ্দেশ করিতে পারেন।

শৈব ও গন্ধর্ব্ব ঃ শ্যামবাসীর মধ্যে বহু শৈব দৃষ্ট হয়। শিবের ত্রিশূলকে শ্যামভাষায় "ত্রি" বলে। উক্ত ত্রিশূলে বুদ্ধদেবের কোন চিহ্নই নাই। বুদ্ধদেব শান্তির অবতার। যুদ্ধবিগ্রহাদি তাঁহার মধ্যে কোন প্রকারেই স্থান পাইতে পারে না। সুতরাং উহা শিবের ত্রিশূল ভিন্ন অন্য কিছুই উপলব্ধি করা যায় না। উহা হিন্দুগণেরই প্রধান উপাস্য দেবতার নিদর্শন। "এই-ফুম" নামক গ্রন্থে গন্ধর্ব্বের নাম দৃষ্ট হয়। গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ ইন্দ্রের সভায় গীত-বাদ্যাদির কর্ম্ম করে। উক্ত গ্রন্থে সুপর্ণ ও গরুড়ের উল্লেখ আছে। উহা শ্যাম-ভাষায় "সুবন" ও "খৎ" বলে। সুপর্ণ ও গরুড় উভয়েই পক্ষীর মধ্যে গণ্য। বাঙ্গালা ভাষায় উক্ত দুইটি পক্ষীকে সুবর্ণরাজ ও গরুড় বলে। ইহারা উভয়ে অত্যন্ত সর্পপ্রিয়। সুতরাং নাগগণের শত্রু। তাহাকে তাহারা গুরুদাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

ধ্যান ও স্বর্গ ঃ তথায় ধ্যানের চারি প্রকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সাকার এবং নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানও চারি প্রকার। উক্ত ধ্যানের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্যামবাসীর মতে ব্রহ্মের ধ্যানদ্বারা অতি নীচ জাতিও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। সাকার ব্রহ্মের ষোড়শটি স্বর্গ বিনির্দ্দিষ্ট আছে। তদুপরি চারিটি নিরাকার ব্রহ্মের স্থান। যাঁহারা প্রথম ধ্যানদ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহাদের জন্য সর্ব্ব নিম্ন হইতে তৃতীয় স্বর্গ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। উক্ত ধ্যানদ্বারা সূক্ষ্মদৃষ্টি জন্মে এবং প্রথম শ্রেণীর শান্তি রাজ্যে অধিরোহণ করিতে পারা যায়। তখন সমগ্র পার্থিব বিষয়ে অনাসক্তি জন্মে। কিন্তু তাহাতে নির্ব্বাণমুক্তি হয় না।

জাতিস্মর ঃ চতুর্থ স্বর্গ হইতে তিনটি স্বর্গ দ্বিতীয় ধ্যানী সিদ্ধব্যক্তিগণের জন্য বিনির্দ্দিষ্ট আছে। উক্ত ধ্যানদ্বারা সদানন্দময়ের রাজ্যের পথ সুগম করিয়া দেয়।

ক্রমে উর্দ্ধ তিনটি তৃতীয় ধ্যানী সিদ্ধব্যক্তির পক্ষে। উক্ত ধ্যানের ফল চতুর্থ ভগবৎপ্রেমানন্দলাভ। অপর তিনটি চতুর্থ ধ্যানী সিদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে। উক্ত ধ্যানের ফল পূর্ণশান্তি—অবিরামশান্তি। অতঃপর ক্রমোন্নতব্যক্তি অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হয়েন এবং অবশেষে পারলৌকিক ব্যাপার দৃষ্টি এবং শ্রুতিগোচর করিতে সমর্থ হয়েন। তখন তিনি অপর ব্যক্তি কি চিন্তা করিল, তৎসমুদায় বলিয়া দিতে পারেন। পরিশেষে তিনি জাতিস্মর বলিয়া পরিগণিত হইলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণপথে আনয়ন করিতে পারেন। বায়ু মধ্যে ব্যোমপথ দিয়া গমনাগমন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ অথবা অপর দুঃসাধ্য কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়েন। ইহাদ্বারা তিনি পরিশেষে সমগ্র স্বর্গে পরিভ্রমণ করিতে পারেন।

ইন্দ্র, ঐরাবৎ ও মকর, শ্বেতশঙ্খ ঃ শ্যামদেশের মন্দিরাদিতে ইন্দ্রের ঐরাবত—(হস্তী) মূর্ত্তি বহু প্রাচীন মন্দিরগাত্রে দৃষ্ট হয়। এখানকার লোকের ধারণা ঐরাবতমূর্ত্তি মন্দিরগাত্রে না থাকিলে মন্দিরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। অন্যত্র ইন্দ্র ত্রিমুণ্ড, হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আছেন, লক্ষিত হয়। মকরের চিহ্নও বহুস্থানে পরিদৃষ্ট হয়। গঙ্গার বাহন মকর। ভারতবর্ষের হিন্দুদেব-দেবীর বহুমূর্ত্তি এই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। সমুদ্র-মন্থন-কালে বিষ্ণু সিন্ধু হইতে শ্বেতশঙ্খ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্যাম রাজের নিকট শ্বেতশঙ্খও সেই জন্য অত্যন্ত আদরের সামগ্রী। শ্যামরাজ একদা তদীয় মহিষীকে বহু পারিতোষিক প্রদান করেন। তন্মধ্যে শ্বেতশঙ্খ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্যামদেশের ব্রাহ্মণগণ বা রাজ-জ্যোতির্ব্বিদগণ এই প্রকার বহু শঙ্খ উপঢৌকন সহ গ্রহণ করিয়া রাজ-শোভাযাত্রার সহিত শঙ্খবাদন ও সঙ্গীতালাপ করিতে করিতে রাজপথ দিয়া গমন করিয়াছিলেন। সেই জ্যাতির্ব্বিদগণের মধ্যে একব্যক্তি মহামূল্য মণিরত্নখচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজ-উপঢৌকন বহন করিয়াছিলেন। তদ্দেশের রাজগণ একপ্রকার কার্য্যদ্বারা আপনাকে মহাগৌরবান্বিত মনে করেন। বিষ্ণু যেমন দুগ্ধ-সমুদ্র হইতে শঙ্খ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহা অতি প্রিয়বস্তুর মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, শ্যামরাজগণও উক্ত দ্রব্যকে তদ্রূপ জ্ঞান করেন। এইটি বিষ্ণুর কূর্ম্ম-অবতারের কথা। শ্যামবাসীর হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্ম কি প্রকার দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে তাহা এই সকল বিষয় দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

হংসবাহিনী বীণাপাণি ঃ বীণাপাণি হংসবাহিনী বলিয়া ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত পেগুর রাজধানীর নাম অধুনাও হংসবতী বলিয়া কথিত হয়। তজ্জন্যই শ্যামের বহুপল্লীতে অত্যুচ্চ স্তম্ভাদির উপরিভাগে হংসমূর্ত্তি বিরাজিত।

হন ও ব্রহ্মা ঃ শ্যামবাসিগণ এখনও হংসকে "হন" বলে। উক্ত দেশে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে। পরন্তু আমাদের দেশের ব্রহ্মামূর্ত্তির সহিত তুলনা করিলে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। কুত্রাপি সমচতুষ্কোণ চত্বরের মধ্যে চতুর্ম্মুখ

ব্রহ্মার মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। দেবতাকে শ্যামভাষায় "দেবদা" (Thewada) বলে। সকল দেবতারই হস্তে তরবারি ও পঙ্কজ লক্ষিত হয়! তাহারা বলে "দেবদ্দুংশ পর্ব্বত" মেরু পর্ব্বতের সমতুল্য উচ্চ এবং তথায় ইন্দ্রের রাজ-প্রাসাদ বিদ্যমান।

কল্পবৃক্ষ ঃ ইন্দ্রের উদ্যানে "কল্পবৃক্ষ" আছে। শ্যাম ভাষায় তাহাকে "কামফ্রুক্" কহে। দেবগণের প্রার্থিত বস্তু উক্ত মহীরুহ প্রদান করিয়া থাকে।

যম ঃ যম বায়ুমণ্ডলে বসতি করেন।

স্বর্গের স্থান ঃ শ্যামবাসিগণ বলে, বুদ্ধদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে "দুশীতে" বা তুশীতে" অবস্থান করিতেন। সুতরাং তিনি একজন দেবতা। সেই দুশীতই স্বর্গ বলিয়া কথিত হয়। শ্যামভাষায় দুশীত বা তুশীত অর্থে স্বর্গ। সর্ব্বাগ্রে তুশীত, পরে নিমনরাদি; অবশেষে পরনিমিত বসবাদি। তদুপরি কামদেব অবস্থান করেন। সেই স্বর্গে "করবেক" নামে একপ্রকার পক্ষী আছে। এই প্রকার কিম্বদন্তী যে উক্ত বিহঙ্গমের মিষ্টস্বরে অরণ্যানীর সমগ্র প্রাণী মুগ্ধ হইয়া থাকে।

শ্যামবাসী স্বর্গের এইরূপ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছে—মরুশৃঙ্গের নিম্নে সুরদেব ইন্দ্রের প্রাসাদ। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যম, কামদেব, স্থাবর (জগন্মাতা), দেবরাজ, গরুড়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বায়ু প্রভৃতি বহুমূর্ত্তি তথায় দৃষ্ট হয়। বৈদিকধর্ম্মের আভাষও প্রাপ্ত হওয়া যায়। বায়ু-সম্বন্ধে শ্যামবাসিগণ যে প্রকার বর্ণনা করে তাহা বেদ হইতেই গৃহীত। লোহিত-পরিচ্ছদাবৃত হইয়া পবনদেব তদীয় মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। যেন তাঁহার মস্তক গগণমার্গ স্পর্শ করিয়াছে। পূর্ব্বে যে ব্রহ্মার বিষয় উক্ত হইয়াছে, শ্যামভাষায় তাঁহাকে "ফ্রাম" কহে। তিনি ধ্যান-স্তিমিত। এইরূপ কথিত আছে বুদ্ধদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তুষিতে অবস্থানকালে ব্রহ্মার নিকট হইতে ধ্যান-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে লোকে তাঁহাকে সেই জন্য ধ্যান-বিজ্ঞান-অভিজ্ঞ বলিয়া অর্চ্চনা করিতেন।

নাগরাজ

তাহারা নাগরাজকে "ফাইয়ানাক্" বলিয়া থাকে। তথায় উক্ত নাগসম্বন্ধে এই প্রকার কিম্বদন্তী আছে যথা—নাগরাজ স্বেচ্ছানুসারে স্বদেহ পরিবর্ত্তিত করিয়া বিভিন্ন মূর্ত্তি ও বর্ণ ধারণ করিতে সমর্থ। ভূমধ্য দিয়া গমন করিতে, ব্যোমপথে বিচরণ করিতে এবং এক সময়ে সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান হইতে পারেন। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে কোন প্রাণীকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে সমর্থ। তিনি বায়ুমধ্যে বিষ সংযুক্ত করিয়া প্রাণী-জগৎকে বিধ্বংস করিতে পারেন। নাগরাজ সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া আছেন। তাঁহাকেই শ্যামবাসিগণ কালনাগ বলিয়া অভিহিত করে।

বেদপারগ ব্রাহ্মণ

শ্যামে জ্যোতির্ব্বিদ ব্রাহ্মণ ঃ বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে হিন্দুরাজগণ কোন ক্রিয়াকলাপাদি সম্পন্ন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করিতেন। যজ্ঞাদি কার্য্যও ঐরূপে সুসম্পন্ন হইত। এই প্রকারে ব্রাহ্মণগণই তাঁহাদের পারিবারিক জ্যোতির্ব্বিদ্ ও পুরোহিত রূপে কার্য্য করেন। ভারতবর্ষের ন্যায় শ্যামদেশে বর্ত্তমান সময়েও শ্যামরাজগণ কতিপয় ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ব্বিদ্ ও ভবিষ্যদ্বক্তাকে প্রতিপালন করেন। তাঁহাদের প্রধান কার্য্য রাজা, রাজপরিবার ও রাজকীয় ব্যাপারাদির শুভদিন, মাহেন্দ্রযোগ ও শুভ মুহূর্ত্ত নির্দ্ধারণ এবং রাজকীয় সমগ্র ক্রিয়াদি পরিদর্শন ও সুব্যবস্থা করিয়া সুসম্পন্ন করণ।

বেদ ঃ শ্যামবাসীর ধর্ম্মে ও ঐতিহাসিক পুস্তকাদিতে তিন বেদ ও হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে। বেদের সারসংগ্রহ ও তথায় পরিদৃষ্ট হয়। শ্যামভাষায় তিনবেদকে "ত্রাইফেৎ" কহে এবং শাস্ত্রকে "শাৎ" বলে। তথায় শাস্ত্রে মহাজনের দ্বাত্রিংশৎ চিহ্ন উল্লিখিত হয়। তাহারা বলে, মহাব্রহ্মা ব্রাহ্মণবেশে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া জনগণকে বেদ-শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। পরন্তু, শ্যামবাসিগণ অথর্ব্ববেদকে বেদমধ্যে গণ্য করে না। তাহারা ঋগ্‌বেদের কতিপয় অংশ, যজুর্ব্বেদের কতিপয় শাখা এবং সামবেদের অধিকাংশ বিষয় লইয়াই তিন বেদ বলিয়া গণ্য করে। তাহাদের মধ্যে কেহ একটি বেদে পারদর্শী হইলে তাঁহাকে বেদপারগ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করে না। তাহাদের মতে তিনবেদেই সম্যক্ অধিকারী হওয়া আবশ্যক। বেদের বহুস্থানই শ্যামবাসী বাক্যচ্ছলে উদ্ধৃত করিয়া থাকে। শ্যামবাসী ব্রাহ্মণগণের বিষয় বহু পুস্তকে উল্লিখিত আছে।

তিন জাতি ঃ সর্ব্বপ্রথম উত্তর-শ্যামে ফিলোআনুসকের আধিপত্য স্থাপিত হইলে, ব্রাহ্মণগণের প্রভাব তথায় পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হইত এবং দক্ষিণ শ্যামে রাজধানী স্থাপিত হইলে তাঁহাদের (ব্রাহ্মণগণের) প্রভাব হ্রাস হইয়া পড়ে। শ্যামবাসী বলে, বেদের মধ্যেই উপাসনা পদ্ধতি, চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্র লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ফ্রামন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্তিয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, কাহাবদি অর্থাৎ গৃহপতি এই তিন জাতিই তথায় সর্ব্বপ্রধান। তথায় ব্রাহ্মণেরা পঞ্চতপ করেন। অর্থাৎ চারিদিকে অগ্নি রাখিয়া মধ্যস্থলে উপবেশন করিয়া জপাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। শ্যামভাষায় "ঋৎ" শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সংস্কৃত "ঋদ্ধি" রই অপভ্রংশ।

দুই সম্প্রদায় ঃ দার্শনিকগণ বলেন, তথায় দুইটি সম্প্রদায় আছে। (১) ব্রাহ্মণ্যেয়ম্ ও (২) শামণ্যেয়ম্। যাঁহারা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, জগদীশ্বর ও অন্যান্য দেবগণ, পিতৃপুরুষগণ এবং অপর শুভাকাঙ্খিগণের অর্চ্চনা করেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ্যেয়ম্ পদবাচ্য। অপর দল পর-জন্ম বিশ্বাস করে না এবং কাহাকেও উপাসনা করে না ও মৃত্যুর পর কি ঘটিবে তাহা পরিজ্ঞাত নহে। তাহারাই শেষোক্ত শামণ্যেয়ম্ বলিয়া কথিত। সেই স্থানের

ধর্ম্মমধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সনাতন ধর্ম্ম। অধুনা তথায় বহুব্যক্তি উক্ত ধর্ম্মোপাসক। পরন্তু তাহারা বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া বিভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াছে।

থাও মহাফ্রোম্ ঃ এখানকার ব্রাহ্মগণের মত এই যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড "থাওমহাফ্রোম" হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবান্ ব্রহ্মাকে শ্যামভাষায় থাওমহাফ্রোম্ কহে। তিনি স্বভাবকে দুইটি পৃথক অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা, "ঈসুয়ান্" অর্থাৎ বিষ্ণু পৃথিবীর অধীশ্বর এবং "নারাই" অর্থাৎ শিব মঙ্গলের নিদান ও সিন্ধুপতি দুষ্টের দমনকারী।

তথায় দেবগণ সকাশে বলিদান প্রথা প্রচলিত আছে। ত্রিমুখবিশিষ্ট এবং বড়ভূজযুক্ত কোন এক দেবতার সম্মুখে তাহারা (শ্যামবাসী) পশু বলিদান করিত। তথায় ব্রাহ্মণগণ বলেন, তিনটি দেবতা এক মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই জন্য উক্ত মূর্ত্তি ষড়ভুজ। বলি একটি দেবতাকে দান করিলেই তিনটি দেবতাকে প্রদান করা হইল। কখনও কখনও তদ্দেশবাসিগণ স্বতন্ত্র ত্রিমূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজাদি করিত। তাহারা বলে, প্রকৃতপক্ষে তিনটিই এক।

গঙ্গানদী ঃ শ্যামদেশে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-সময়ে যদ্যপি কেহ পাপানুষ্ঠান করিত, সকলে তাহাকে ভারতবর্ষে গমন করিয়া পুণ্যতোয়া গঙ্গানদীতে অবগাহনের ব্যবস্থা প্রদান করিত। সেই ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করিয়া পাপের স্খালন করিত। কোন ব্যক্তির মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে গঙ্গা অথবা তৎস্থানীয়া অপর কোন নদীর তীরে লইয়া গিয়া জল-প্রদান অথবা মৃত্যুকালোচিত ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন করা হইত। এই সকলগুলিই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমত। বহুদূরবর্ত্তী শ্যামদেশেও সেই মত প্রচলিত ছিল। এইরূপ করিবার অর্থ এই যে উহাতে মৃতব্যক্তি স্বর্গ বা পুণ্যময়স্থান লাভ করিবে। তখন আর তাহার কোন জ্বালা-যন্ত্রণা থাকিবে না।

জম্বুদ্বীপ ঃ প্রাচীন ভৌগোলিকগণ জম্বুদ্বীপের মনোহর বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে তাহার নাম দৃষ্ট হয়। শ্যামদেশেও তদ্রূপ বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। তাহারা জম্বুদ্বীপকে "সঙ্কুদ্বীপ" বলে।

শিক্ষা—ভারতীয় জ্যোতিষ ঃ তাহারা কিন্তু শিক্ষা-ব্যাপারে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। শিক্ষিত যাজকগণ অধুনা সংস্কৃত ভাষাও কিঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত আছেন। পরন্তু তথায় পালি ভাষারই প্রচলন অধিক। ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণের তালিকা ব্রহ্মবাসীর হস্ত হইতে শ্যামদেশবাসী গ্রহণ করিয়াছে। তথা হইতে কিয়দংশ ইউরোপেও লইয়া গিয়াছে।

নাটকাদি ঃ তথায় রামের সম্বন্ধে চারিশত সর্গে পূর্ণ একখানি বৃহৎ নাটক দৃষ্ট হয়। উহা এত দীর্ঘ যে, সমগ্র অংশ অভিনয় করিতে ছয় সপ্তাহের আবশ্যক হয়।

অবরোধ-প্রথা ঃ শ্যামদেশে হিন্দু-প্রাধান্য সময়ে স্ত্রীলোকগণের অবরোধ-প্রথা ছিল না। বর্ত্তমান সময়েও তথায় অবরোধ-প্রথা নাই। তথায় স্ত্রীলোকগণ স্বামীকে ভক্তি যত্ন করে। স্বামীর সম্মুখীন হইয়া বাক্যোচ্চারণ করে না। তাহারা নদী, তড়াগাদি হইতে কলসীর সাহায্যে জল আনয়ন করে। তথায় আমাদের দেশের ন্যায় স্ত্রীলোকগণ বেণীবন্ধন করে।

শোকে শ্বেত পরিচ্ছদ ঃ ভারতের কোনও কোনও স্থানের ন্যায় শ্যামবাসিগণ অনাবৃত মস্তক ও নগ্নপদে গমনাগমন করে। আমাদের দেশের ন্যায় তাহার আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। ভারতের ন্যায় শ্যাম-বাসীও শিরোপরি "শিখা" বন্ধন করে। উহা দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চি হইতে দুই ইঞ্চি পর্য্যন্ত। ইহাদের আকৃতি তৈলঙ্গীদের ন্যায়।

কেশ ঃ ইহারা শিরোভাগে চারি ইঞ্চি পরিমিত স্থানে দীর্ঘকেশ ধারণ করে। অপরাংশ মুণ্ডন করিয়া ফেলে। যাহারা দীর্ঘকেশ ধারণ করে, তাহাদের শিখাও তত্তুলনায় দুই ইঞ্চি অধিক দীর্ঘ রাখিতে হয়। তথায় স্ত্রীলোকগণ কেশ মুণ্ডন করে না। অধিকন্তু, মস্তকে কি স্ত্রী, কি পুরুষ কেহই আবরণ প্রদান করে না। কেবল যে সকল রাজকর্ম্মচারি রাজসভায় সমুপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের পাগড়ী ব্যবহার করিতে হয়।

স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ঃ কাম্বোজিয়াগণও শ্যামবাসীর ন্যায় পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করে। ভারতের ন্যায় শ্যামদেশের ললনাগণ কণ্ঠভূষণ, বলয়, মাদুলী প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করে। তাহারা কখনও "উল্কি" পরেনা।

প্রণাম ঃ শ্যামবাসী পূজ্য ব্যাক্তিকে হিন্দুগণের প্রাচীন প্রথায় অর্থাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। তাহারা রাশিচক্র ও নক্ষত্রাদির নাম হিন্দুগণের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছে।

রাজা নিজব্যয়ে ভারতবাসী ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ও দেবার্চ্চনার জন্য মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। উক্ত মন্দিরাদিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অর্চ্চনা করা হয়। এই সকল দেবতাই প্রধান। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবদেবীও মন্দির মধ্যে দৃষ্ট হয়। সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ব্যাপারেও রাজা সেই ব্রাহ্মণগণের উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পুরোহিত ঃ পুরোহিতগণ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সায়ংকালে যে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া থাকেন, তাহা প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে শ্রুতিগোচর হয়। অতঃপর ঢক্কা-নিনাদ-দ্বারা সন্ধ্যার্চ্চনাদি সম্পন্ন হইবার বার্ত্তা দেশবাসীকে বিজ্ঞাপন করা হয়। শ্যামবাসিগণ তদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় দর্শন করিলে ঈর্ষাপরায়ণ হয় না। তাহারা বলে, সকল ধর্ম্মই এক, তবে প্রকার ভেদ মাত্র। যাহার যে প্রকার ইচ্ছা, সে তাহাই সম্পন্ন করুক। রাজা তত্র স্থলের ধর্ম্মের নেতা।

শবদাহ প্রথা

শবদাহ ঃ শ্যামবাসিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের সময় হইতে শবদাহ প্রথা প্রচলিত আছে। বৌদ্ধপ্রাধান্য সময়েও উহার শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়া বৌদ্ধগণ উহার বিলোপ-সাধন করেন নাই। বৌদ্ধগণও শবদাহ করিতেন। হিন্দুগণের মতে এই শবদাহপ্রথা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহা দ্বারা দেশের বায়ু দুষিত হয় না। বরং বিষাক্ত দ্রব্য দগ্ধ হইয়া যায়। শবকে ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলে বিষাক্ত দ্রব্য নষ্ট না হইয়া বরং বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাহা বায়ুসংযোগে সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ বিষাক্ত করিয়া তুলে এবং সেই বায়ু নিশ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ করিয়া লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই প্রকারে দেশে মড়কের উৎপত্তি হয়। এই বাক্য বৌদ্ধগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া হিন্দু প্রথারই অনুমোদন করিয়াছেন। হিন্দুগণ ভারতবর্ষে যেমন মৃতের সৎকার স্থানে কড়ি, স্বর্ণখণ্ড প্রভৃতি প্রদান করেন, শ্যামদেশেও তদ্রূপ বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। শনি ও মঙ্গলবারে কাহারও মৃত্যু হইলে বাঙ্গালাদেশে তুলসী ও কদলীবৃক্ষ শবদাহ স্থানে লইয়া যাইতে হয়, শ্যামদেশেও তদ্রূপ বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষাদি প্রদানের বিধি আছে। শবদাহ করিবার সময়ে তাহারা ক্রন্দন করে। তথায় সকল শ্রেণীর লোকেই মৃতদেহ দাহ করে।

মৃত নরপতি ঃ পরন্তু, উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ মৃতদেহ বহুদিন পর্য্যন্ত মৃতাধারে সুগন্ধি ঔষধ দ্বারা সিক্ত করিয়া রাখে ও পরিশেষে তাহা মহাসমারোহে দগ্ধ করে। সেখানকার নরপতির মৃত্যু হইলে তদীয় দেহ ভস্মসাৎ করিয়া সেই দেহাবশিষ্ট দ্রব্য লইয়া তদুপরি একটি সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে নীল-পীতাভ বিবিধ চিত্রাদি অঙ্কন করা হয়। তন্মধ্যে কতিপয় চিত্রিত বৃক্ষপত্রাদি রৌপ্য ও সুবর্ণময় করিয়া নির্ম্মিত করা হয়। উক্ত মন্দিরের শিরোদেশে নিরেট স্বর্ণালঙ্কারাদি দোদুল্যমান্ থাকে। এই প্রকার মহা মূল্যবান্ মণিমাণিক্যাদি দ্বারা গৃহ সজ্জিত করা হয়। ধনী শ্যামবাসীর মৃতদেহাবশিষ্টের উপর মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা উপলব্ধি হয়, শ্যামবাসীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি ও হিন্দু-রীত্যনুসারে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। হিন্দুগণের ন্যায় মৃতের পুত্রাদির মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। শবদাহের পূর্ব্বে কাঙ্গালিগণকে অর্থাদি বিতরণ করা হইয়া থাকে। অবশেষে পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করেন এবং মৃতের পুত্র অগ্নিহস্তে বারত্রয় মৃতের দেহ প্রদক্ষিণ করিয়া মুখাগ্নি করিয়া থাকে। ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে আত্মীয় স্বজনগণ মৃতের জন্য রোদন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করে। এই সকল হিন্দুরীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

স্বর্গ ও নরক ঃ শ্যামবাসী যাজকগণ বলেন, সর্ব্বসাকুল্যে দ্বাবিংশতি স্বর্গ ও অষ্টবিধ নরক বিদ্যমান আছে। বহু জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জীব তাহার সুকৃতি বা দুষ্কৃতি অনুসারে

স্বর্গ বা নরক ভোগ করে। তাঁহারা বলেন, স্বর্গে গমন করিলে পূর্ণ শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। নরকগুলি আবার মহাভীতিপ্রদ উৎপীড়ন এবং আনুমানিক বহু দণ্ড প্রাপ্তির স্থান।

মন্দিরগাত্রে নরকচিত্র ঃ শ্যামদেশের বহু মন্দিরগাত্রেই ঐ সকল নরক-চিত্র বহুল পরিমাণে খোদিত রহিয়াছে। তাহারা কদাপি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" স্বীকার করে না। তাহাদের মধ্যে কতিপয় নাস্তিকও পরিলক্ষিত হয়। তাহারা বলে, পৃথিবী দৈবক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে, আবার দৈবক্রমেই লয়প্রাপ্ত হইবে। শ্যাম-বাসিগণের বিশ্বাস, দেবগণই তাহাদের রক্ষক। প্রত্যেক স্থানেই তাহাদের পূজার্হ দেবতা বিদ্যমান।

শ্যামবাসীর ধর্ম্ম ঃ শ্যামবাসীর ধর্ম্মে জীবহিংসা. চুরি ও ব্যভিচার করা, মিথ্যাকথা বলা, মদ্যপান করা প্রভৃতি নিষিদ্ধ। এই নিয়মগুলি ভঙ্গ করিলে তাহাকে সকলের নিকট ঘৃণার্হ হইতে হয়। পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলী পালন করিলে তাহার যশ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। তথায় পুরোহিতগণ প্রাউক্ত নিয়মগুলি প্রতিপালন করেন।

সন্ন্যাসাশ্রম ঃ শ্যামদেশে পৌত্তলিক্তা অত্যধিক দৃষ্ট হয়। তাহারা একবার সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলে আর গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। তথায় ঐ প্রকার নিয়মই প্রচলিত আছে। তাহাদের বাসোপযোগী বহু গুম্ফ পরিদৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসিগণের চিরকাল অবিবাহিত থাকিতে হয়। তাঁহারা ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করেন।

নরকবর্ণন ঃ কেবল তাঁহাদের নিরয়-বর্ণনা মন্দির-গাত্রের চিত্রমধ্যেই পর্য্যবসিত হয় নাই। তাঁহাদের তাতে সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টবিধ বৃহৎ নিরয়, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক বৃহৎ নিরয়ে আবার ষোড়শটী ক্ষুদ্র নিরয়ের উল্লেখ আছে। বৃহৎ নিরয় প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় পঞ্চচত্বারিংশৎ ক্রোশ। তাহার মধ্যে লবণাক্ত নদী বিদ্যমান আছে। পাপিগণ তথায় সমুপস্থিত হইলে যমদূতগণ তাহাদিগের অন্ত্র-মধ্যে লৌহশলাকা প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। তখন তাহারা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে এবং তৃষ্ণাতুর হইয়া বারি প্রার্থনা করিলে যমদূতগণ গলিত লৌহ তাহাদের মুখ বিবরে অধঃক্ষেপন করে। তাহাদের নিরয়-বর্ণনা হিন্দুগণের সমতুল্য।

মোকদ্দমা ও আইন ঃ তথায় কোন মোকদ্দমা যথার্থরূপে মীমাংসিত না হইলে শ্যামরাজ স্বয়ং তাহার বিচার করেন। আপিল রাজার নিকটে করিতে হয়। ইহাও হিন্দুগণের রীতি। মনুর আইনও তথায় কিঞ্চিন্মাত্রায় প্রচলিত আছে। ধর্ম্মাধিকরণ বা আদালতে সাক্ষীকে আনয়ন করিলে তাহাকে যে শপথ করিতে হয়, সেই বাক্যমধ্যে হিন্দু দেবদেবীর নামোল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। অধিকন্তু তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট আছে, যথা—যদ্যপি আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যা কথার অবতারণা করি, তাহা হইলে আমি যে স্থানেই গমন করি না কেন, তথায়ই যেন বিপদে পতিত হই। তস্কর, দস্যু, দৈত্য, দানব, ভূত, প্রেত, বায়ু, বরুণ সকলেই যেন আমাকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান

করেন। আমার মস্তকে যেন বজ্রপাত হয়। যম যেন আমাকে অতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করেন। ইত্যাদি—ইত্যাদি। মাজিষ্ট্রেটকে তাহারা প্রিয়চিকীর্ষু বলিয়া সম্বোধন করে। তাহারা রাজা বা কোন পূজনীয় ব্যক্তির আদেশ প্রাপ্ত হইলে, আদিষ্ট ব্যক্তি "শিরোধার্য্য-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম" ইত্যাকার বাক্য উচ্চারণ করে। তাহাদের কোন তারিখের নামোল্লেখ করিতে হইলে তিথি উল্লেখ করিয়া থাকে। যথা অমুক মাসের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে অমুক কার্য্য সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাও হিন্দুরীতি।

বর্ণমালা ঃ অতি প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ ভারতবর্ষ হইতে তথায় বর্ণমালা লইয়া গিয়াছিলেন। কাহারও নিকট হইতে অন্যায় অত্যাচার করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে মৃত্যুর পর তাহার পাপের উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস।

মন্ত্রাদি ঃ "ত্রেয়াইস্মরণ" অর্থাৎ কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইলে, বারত্রয় উচ্চারণ করিবার বিধি তথায় বিদ্যমান আছে। উহাও হিন্দুপ্রথা।

রামায়ণ ঃ ইন্দ্র, সারথি-মাতুলিকে রথ গ্রহণ করিয়া রাজা দশরথকে আনয়ন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন প্রভৃতি বিষয় রামায়ণ হইতে গৃহীত।

আঙ্করে হিন্দু-মন্দির ও মন্দিরগাত্রে চিত্রিত রামায়ণ ঃ শ্যামের অন্তর্গত আঙ্করে ভগ্নাবশেষ স্তূপাদি দৃষ্ট হয়। সেই সুদৃশ্য মন্দির-গাত্রে বিবিধ প্রকারের বহুচিত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। উহা হিন্দু পৌরাণিক বিষয় ও রামায়ণ হইতে গৃহীত। সেই মন্দির-গাত্রে সমগ্র রামায়ণ চিত্রাকারে খোদিত রহিয়াছে। যেমন পঞ্চবিংশতি সহস্র শ্লোকপূর্ণ একখানি সুবৃহৎ রামায়ণ মহাকাব্য আঙ্করের মন্দির-গাত্রে লিখিত রহিয়াছে। ইহা জগতীতলে অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। খিলানের মধ্যবর্ত্তী প্রস্তর খিলান-কার্য্যে ব্যবহৃত হয় নাই। তথায় গৃহাভ্যন্তরে গমনাগমনের পথ বক্র নহে। উক্ত মন্দির-পরিবেষ্টিত প্রাচীরের উপর প্রায় লক্ষাধিক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিত্র খোদিত আছে। উহার বিষয় পাঠ করিতে হইলে বহুদিনের আবশ্যক হয়। এতদ্ভিন্ন আরও বহু চিত্র উক্ত মন্দিরে বিদ্যমান রহিয়াছে। উহাতে রথ, অশ্ব, গজ প্রভৃতি যুদ্ধার্থে গমন করিতেছে এই প্রকার চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। অপর স্থলে রাজগণের শোভাযাত্রা খোদিত। সকল চিত্রগুলিই মনোহর। এতদ্ভিন্ন আরও হিন্দু দেব-দেবীর বহুমূর্ত্তি তথায় খোদিত রহিয়াছে। এক সময়ে শ্যামদেশে যে হিন্দু-প্রাধান্য বর্ত্তমান ছিল, এই মন্দির তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

প্রাচীনকালে জাহাজ-প্রস্তুত ঃ হিন্দু-প্রাধান্যের সময় হইতে শ্যাম-রাজের জাহাজ প্রস্তুত হইত। তাহার জন্য অধুনা প্রাচীন "ডক" দৃষ্ট হয়। বহুদিন পর্য্যন্ত অপর কোন জাতির জাহাজ তৎসন্নিকটবর্ত্তী মহাসমুদ্রে ভগ্ন হইলে এই শ্যাম-রাজের "ডকে" সংস্কৃত হইতে পারিত না। অধুনা বর্ত্তমান শ্যাম-রাজের আদেশে বৈদেশিক জাহাজাদি তথায় অতি সুলভে সংস্কৃত হইতেছে। হিন্দুগণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে সমুদ্রপথে গমনাগমন করিতেন, ইহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে।

এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে—

1. Lunit De La Jonquiere—*Dictionnare Franceis—Siamois*, (Paris, 1992.) II. Ecriture Tableaus I-VI, pp. 8.16.
2. *Voyage De Siam. des perss Jesuites*, envoyez per le Roy aux Indes zet a la Chine. 1686.
3. Lucien Fourneran—*Le Siam Ancien*, (Paris, 1895) pt. I. pp. 45–66.
4. Mandelslo—*Voyages celebres et remarquables* (Amsterdam, 1727.) Tom 1.
5. Crawfurd—(2nd ed, 1830)
6. *Siam Society's Journal*, (Bankok), 1904 etc.
7. D.E. Malloch—Siam.
8. Fergusson—*Tree and Serpent Worship.*
9. Dr. Bastian—*Reisen de Siam.*
10. Lemire—*La France et le Siam.* (Paris 1903).
11. H. Malcolm – Pravels in S.E. Asia, & c., 2 Vols. & c.

গুলবদন বেগম

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুলবদন, ভারতের প্রথম মোগল বাদশাহ বাবরের কন্যা। আকবর আবুলফজলের "আকবর-নামার" উপাদান-সংগ্রহের জন্য গুলবদনের সহায়তা গ্রহণ করেন। বাবর ও হুমায়ুনের জীবনবৃত্তের আখ্যায়িকাগুলি গুলবদনের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল;—"হুমায়ুননামা" তাহারই ফলস্বরূপ। আবুলফজল, সম্রাট কর্তৃক বাবর ও হুমায়ুনের জীবন চরিত সংগ্রহের আদেশ-প্রচারের কথা[১] লিখিয়াছেন সত্য, তবে তাহা গুলবদনের উপর ছিল কি না, একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, "হুমায়ুননামা" ১৫৮৭ (৯৯৫ হিঃ) খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। গুলবদনের "হুমায়ুননামা" সম্বন্ধে আবুলফজল নীরব; তবে তিনি যে বেগমের পুস্তকের সাহায্য লইয়াছিলেন, এ বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

যে সমস্ত ইংরাজ-ঐতিহাসিক মোগল-রাজত্বের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কোন গ্রন্থেই গুলবদনের হুমায়ুন-নামার উল্লেখ নাই। ব্লকম্যান-সাহেবের "আইন-ই-আকবরীতে" গুলবদন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গুলবদনকে তিনি একস্থলে[২] আকবরের বেগম বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বাবরের "আত্মজীবন-চরিত" সম্পাদক Erskine সাহেবও "হুমায়ুন নামা' দেখেন নাই। গুলবদন সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, "হুমায়ুন-নামাই" প্রধান অবলম্বন।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের-রক্ষিত হস্তলিখিত "হুমায়ুন-নামা" খানি লক্ষ্ণৌ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল জর্জ্জ উইলিয়ম হামিলটনের বিধবার নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছিল। এই মহামূল্য গ্রন্থখানির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া বেভারিজ-পত্নী আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

"হুমায়ুন-নামার" প্রথমাংশে বাবরের কথা। ইহার অধিকাংশই গুলবদন, বাবরের আত্মজীবন-চরিত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; কারণ পিতার মৃত্যু-কালে তাহার বয়ঃক্রম মাত্র ৮ বৎসর ছিল; কাজেই তাঁহার নিকট হইতে বাবরের সময়ের কথাগুলি আমরা জানিবার আশা করিতে পারি না। দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ মিউজিয়মের এই পাণ্ডুলিপিখানি অসম্পূর্ণ-শেষের কয়েক পৃষ্ঠা ইহাতে নাই। হুমায়ুনের দ্বিতীয়বার ভারত-বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস ইহাতে আছে। গুলবদন "হুমায়ুন-নামা" রচনা করিয়া ইতিহাসের

১. Akbar nama—Bib. Indica, Vol. I, pp. 29-30.
২. Ain-i-Akbari—Blochmann, Vol. I. p. 48.

যথেষ্ট উপকার-সাধন করিয়াছেন। ইহা প্রকাশিত না হইলে বোধ হয়, বাবরের পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজনবর্গ ও তৎকালীন কয়েকটী পরিবারবর্গের সঠিক বৃত্তান্ত আমরা জানিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। দুঃখের বিষয়, কোনও ঐতিহাসিকই এ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থখানি ব্যবহারে আনিবার সুযোগ পান নাই। এক্ষণে আমরা গুলবদনের জীবন-কাহিনী কিঞ্চিৎ বিবৃত করিব।

গুলবদন আনুমানিক ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মসময়ে বাবর সিন্ধুনদী অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্থান জয় করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। গুলবদনের মাতা-দিলদার বেগম। গুলবদন তাঁহাকে আজাম বলিয়া ডাকিতেন। গুলবদন শৈশবে "আতুনের" নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। মোগল-অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রীর নাম আতুন।

১৫২৫ খৃষ্টাব্দে বাবর পরিবারবর্গকে পুত্র কামরানের হস্তে সমর্পণ করিয়া সিন্ধু অতিক্রম করিবার জন্য কাবুল ত্যাগ করেন। পিতার কাবুল ত্যাগ করিবার অনতিকাল পূর্ব্ব হইতেই গুলবদন তাঁহার বিমাতা হুমায়ুন-জননী মহমের হস্তে ন্যস্ত হন। অতি শৈশবেই মহমের তিনটী পুত্র ও একটী কন্যার মৃত্যু হওয়ায় তিনি গুলবদনের লালনপালন ও শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন।

কাবুল ত্যাগ করিবার পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিনি পরিবারবর্গের সহিত একত্র থাকিবার সুবিধা পান নাই। শিক্রি ও খানওয়ার যুদ্ধের পর নিরাপদে রাজ্যলাভ করিয়া তিনি এক্ষণে (১৫২৮ খৃষ্টাব্দে) তাহাদিগকে হিন্দুস্থানে আসিবার আদেশ পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাবুল হইতে যাত্রা করিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। আলিগড়ের নিকট বাবরের লোকজনের সহিত মহমের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহারা সম্রাটের নিয়োগানুসারে বেগমকে মহা সমাদরে আগ্রায় আনয়ন করেন (১৫২৯ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন)। শিশু গুলবদন সে রাত্রে মহমের সহিত আগ্রায় গমন করেন নাই। তিনি পরদিন দিবাভাগে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সম্রাটের খলিফা মীর নিজামুদ্দিন আলি ও তাঁহারা পত্নী সুলতানাম, কুলজলালীতে (আলিগড়ে) গুলবদনকে বিশেষ আদর-যত্ন করেন। গুলবদন আগ্রায় আসিয়া পিতার চরণ-বন্দনা করেন।

বহুদিন পরে বাবর, পত্নী ও পুত্র-কন্যার মুখ দেখিলেন। কিছুদিন পরে তিনি পরিবারবর্গসহ ঢোলপুর ও শিক্রী যাত্রা করেন। শিক্রীতে গুলবদনের এক আকস্মিক বিপদ সংঘটিত হয়। মহম যখন প্রার্থনায় ব্যাপৃতা ও সম্রাট্ যখন অন্যতমা পত্নী বিবি মুবাবিকার সহিত আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময় শিশুসুলভ চাপল্যবশতঃ গুলবদন মুবারিকাকে বহুবার তাঁহারা হাত ধরিয়া টানিতে অনুযোগ করেন। বালিকার আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে ঐ কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল, কিন্তু পার্ব্বত্য

মুবারিকার বল প্রয়োগে গুলবদনের হাতের হাড় স্থানান্তরিত হইয়া যায়। সুচিকিৎসার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই হাড় পুনরায় যথাস্থানে ন্যস্ত হয়। এই ঘটনার পর তাঁহারা সকলে আগ্রা প্রত্যাগমন করেন।

বাবরের অদৃষ্টে বহুদিন সুখভোগ ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বাবরের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীশোক-বিহ্বলা মহমেরও মৃত্যু হয়। গুলবদন তাঁহার মৃত্যুতে শোকাভিভূতা হইয়া লিখিয়াছেন, —"দিনের পর দিন আমি আকামের (মহম) জন্য ক্রন্দন করিতাম—শোক প্রকাশ করিতাম ও শুকাইয়া যাইতাম। সম্রাট (হুমায়ুন) বহুবার সান্ত্বনা করিবার জন্য আমার নিকট আসিতেন। যখন আমার বয়স দুই বৎসর, তখন আকাম আমাকে স্বীয় সংসারে লইয়া গিয়া লালনপালন করেন—আমার ১০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি আমাদের ফেলিয়া ইহজগৎ হইতে বিদায় লন।"

মহমের মৃত্যুর পর গুলবদন আরও এক বৎসর হুমায়ুনের সংসারে ছিলেন। পরে দিলদার স্বীয় কন্যা ও পুত্র হিন্দালের ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন।

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে হুমায়ুন শেরশাহের নিকট চোসা নামক স্থানে পরাজিত হন। হুমায়ুন পরাজিত হইয়া কোনক্রমে আগ্রায় ফিরিয়া আসেন; তথায় গুলবদনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন গুলবদনের বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর মাত্র। হুমায়ুন তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই; কারণ যখন তিনি ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে অভিযান করেন, সে সময়েও তিনি গুলবদনকে 'তাক্' (টুপি) পরিতে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তিনি তাঁহাকে বিবাহিতা রমণীর চিহ্ন 'লাচাক্' পরিতে দেখেন। ইহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, গুলবদন তখন বিবাহিতা। তবে কখন তিনি প্রথম বিবাহিত হন, তাঁহার পুস্তকের কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। হুমায়ুন গুলবদনকে বলিলেন, —"হায় গুলবদন! অধিকাংশ সময়ই আমি তোমার কথা ভাবিতাম। তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার আমার বড় ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ভাগ্যে যখন পরাজয় ঘটিল, তখন তোমাকে যে সঙ্গে লইয়া আসি নাই, এইজন্য ভগবান্‌কে শত শত ধন্যবাদ দিয়াছি। হায়! আকুইকাকে (হুমায়ুন-পত্নী হাজিবেগমের গর্ভজাত কন্যা) সঙ্গে লইয়া গিয়া কি ভুলই করিয়াছি। যদিও সে শিশু, তবুই তাহার অভাবে আমার প্রাণ কাতর হইতেছে।"

হুমায়ুন এই পরাজয়ের প্রতিশোধ দিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কামরাণ আগ্রায় অসুস্থ হইয়া পড়েন। আগ্রা তাঁহার ভাল লাগিল না। তাই তিনি লাহোরে ফিরিয়া গেলেন। লাহোরে পৌছিয়া তিনি হুমায়ুনকে বারংবার লিখিয়া

পাঠাইতে লাগিলেন—"আমি বড় অসুস্থ, আমাকে দেখিবার কেহ নাই; অতএব সত্বর গুলবদনকে পাঠাইয়া দিলে আমার প্রতি যথেষ্ট উপকার করা হইবে।" হুমায়ুন গুলবদনকে যাইতে বলিলেন। গুলবদনের কিন্তু কামরাণের নিকট যাইবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। হুমায়ুন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইলে কি হয়, গুলবদন তাঁহাকে আপনার সহোদর অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন। গুলবদন অভিমানপূর্ণ স্বরে হুমায়ুনকে বলিলেন, —"ভাই! ইহা আমার কখনও ধারণা ছিল না যে, তুমি কোন কালে আমাকে তোমার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া কামরাণের নিকট যাইতে বলিবে। আমি কখনও মাতা, ভগিনী বা আত্মীয়বর্গ—যাঁহাদের অঙ্কে প্রতিপালিতা হইয়াছি—তাঁহাদের ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিব না।" হুমায়ুন তাঁহাকে বুঝাইলেন, —"ভগিনি! তোমার সাহচর্য্য ত্যাগ করা আমারও আদৌ অভিপ্রেত নহে; তবে কামরাণ বিপন্ন—বার বার তোমাকে পাঠাইবার জন্য অনুরোধপত্র পাঠাইতেছে, আর আমিও বিপদগ্রস্ত—সিংহাসন লইয়া বিশেষ চিন্তান্বিত; এই বিপদ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলেই পুনরায় আমি তোমাকে কামরাণের নিকট হইতে লইয়া আসিব।" অবশেষে হুমায়ুন অনুরোধে গুলবদন কামরাণের নিকট গমন করেন।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কণৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনের আশা-ভরসা সমস্ত নির্ম্মূল হইয়া যায়। তিনি পরিবারবর্গকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবিলম্বে হিন্দালের উপর তাহাদিগকে লাহোরে লইয়া যাইবার ভার প্রদান করেন। এই সময়ে, বিতাড়িত হুমায়ুন কয়েক বৎসর ধরিয়া মরুভূমির মধ্যে কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরসহ স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া যে কতদূর নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, ও কীরূপে মুলতানে শিবিরে দিলদার ও হিন্দালের নিকট হামিদাবাণুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও বিবাহ হয় (১৫৪১ খৃষ্টাব্দে), ইতিহাস-পাঠকের তাহা অবিদিত নাই।

ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে হুমায়ুন ভ্রাতাদের নিকট কোনরূপ সাহায্য বা সহানুভূতি পান নাই। তিনি কাবুলের দিকে গমন করিবার চেষ্টা করিলে, কামরাণ স্বয়ং অগ্রে কাবুলে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন; যাহা হউক, অনেক কষ্টের পর হুমায়ুনই প্রথমে কাবুলে প্রবেশ করেন।

এই সময়ে গুলবদন কামরাণের সহিত কাবুলে গিয়াছিলেন কি না, গুলবদন কোথাও তাহার উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু তিনি যে কাবুলে গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

গুলবদন কাবুলে তাঁহার পুত্রকন্যা লইয়া গৃহকর্ম্মে দিনগুলি বেশ মনের আনন্দে যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার কয়টি পুত্র-কন্যা ছিল, তাহা নিশ্চিত বলিবার উপায় নাই। তবে তিনি তাঁহার গ্রন্থে সদাৎইয়ার নামে এক পুত্রের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

কামরাণ যদিও অপরাপর আত্মীয়াদের উপর অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু গুলবদনের উপর কখন দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই। তিনি গুলবদনকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন।

কামরাণ হিন্দালের হস্ত হইতে কান্দাহার কাড়িয়া লইলে, হিন্দাল নজরবন্দী হইয়া কাবুলে মাতার নিকট ফিরিয়া আসেন। সেই সময়ে (১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে) গুলবদনের সহিত হিন্দালের একবার সাক্ষৎ হয়।

কিছুদিন পরে হুমায়ুন পারস্য হইতে শাহের সৈন্যদল লইয়া ভারতাভিমুখে লুপ্ত-রাজ্যের উদ্ধারের জন্য অভিযান করেন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি কামরাণের নিকট হইতে কাবুল অধিকার করিয়া লন। গুলবদন লিখিয়াছেন, —"পাঁচ বৎসর দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আবার আমরা প্রিয়ভ্রাতা হুমায়ুনকে পাইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিলাম।" ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দ-পর্য্যন্ত তিনি কামরাণের নিকটই ছিলেন।

পরাজিত কামরাণ অগত্যা হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করিলেন বটে; কিন্তু ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে যখন হুমায়ুন আস্কারীর সহিত কাবুল ত্যাগ করিয়া বাদাক্সানাভিমুখে অভিযান করেন, সেই অবসরে তিনি কাবুলে উপস্থিত হইয়া বিমাতা দিলদারের গৃহ দখল করেন ও তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে বলেন। এই সময়েও কামরাণ গুলবদনের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই। তিনি গুলবদনকে বলেন—"তুমি এখানে অবস্থান কর, — মনে করিও ইহা তোমার আপনার গৃহ।" উত্তরে গুলবদন বলিয়াছিলেন—"কেন আমি এখানে থাকিব? যেখানে আমার মা থাকিবেন আমিও সেখানে থাকিব।" তৎপরে কামরাণ স্বীয় সাহায্যের জন্য গুলবদনকে স্বামী খিজির খাঁকে পত্র লিখিতে অনুরোধ করেন। গুলবদন তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এ যাবৎ তিনি স্বামীকে কোন পত্র লেখেন নাই; এক্ষণে যদি তিনি তাঁহাকে পত্র লেখেন, তাহা হইলে তাঁহার হস্তাক্ষরের সহিত পরিচিত না থাকায় তিনি এই পত্রকে জালপত্র ভাবিতে পারেন। আরও বলিলেন, "খাঁ যখন অন্যত্র অবস্থান করেন, তখন পুত্রের জবানীতে আমাকে পত্র লেখেন— স্বয়ং পত্র লেখেন না।" গুলবদন কামরাণকেই পত্র লিখিতে বলিলেন। এই সময় গুলবদনের বয়স ২৫ বৎসর ছিল। কারমাণ অবিলম্বে খিজিরের নিকট তাঁহার ভ্রাতা মেহেদীসুলতানকে পাঠাইলেন ও তাঁহাকে সসম্মানে কাবুলে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

গুলবদন চিরদিনই হুমায়ুনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তিনিও ইহার বহু পূর্ব্বে বহুবার স্বামীকে বলিয়াছিলেন—"তোমার অপরাপর ভ্রাতারা কামরাণের স্বপক্ষে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু, ভগবান করুন, কামরাণের দলভুক্ত হইবার চিন্তা

ঘুণাক্ষরেও যেন তোমার মনে উদয় না হয়। সাবধান! সহস্রবার সাবধান! কখনও যেন সম্রাট্ হুমায়ুনের সঙ্গ ত্যাগ করিও না।" খাঁর মনোমধ্যে পত্নীর অনুযোগ-বাণী জাগরুক থাকায়, তিনি কামরাণের নিকট গমন করেন নাই।

হুমায়ুন বলসংগ্রহ করিয়া পুনরায় কামরাণের হস্ত হইতে কাবুল উদ্ধার করেন। ভীত কামরাণ হুমায়ুনের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন। সরলহৃদয় হুমায়ুনও তাহাকে আন্তরিক ক্ষমা করিয়াছিলেন। এই সময়ে (১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে) তলিকান্ নামক স্থানে হুমায়ুন, —হিন্দাল, আস্কারী ও কামরাণের সহিত সৌভ্রাতৃত্ব স্থায়ী করিবার জন্য এক মিলন-উৎসবের আয়োজন করেন। সম্রাট্ ভ্রাতাদের বলেন—"লাহোরে গুলবদন প্রায়ই বলিত আমার বড় ইচ্ছা, আমি চারি ভ্রাতাকে একবার একত্রে দেখি, আজ আমরা প্রাতঃকাল হইতে সকলে একত্রে রহিয়াছি এবং ভগবান করুন, আমরা চিরদিনই যেন এইরূপ আত্মীয়তা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে পারি।"

এই সময়ে বেগমদের আগ্রহাতিশয্যে হুমায়ুন, —গুলবদন, হামিদা, মাচুচাক্ বেগম, মুবারিকা প্রভৃতিকে লইয়া সুগন্ধী পার্ব্বত্যলতা 'রিয়াজ' দেখিবার জন্য কোইডামান্ উপত্যকায় গমন করিয়াছিলেন। বসন্তকালে পার্ব্বত্য-প্রদেশে রিয়াজের সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠে।[৩]

দুর্ব্বৃত্ত কামরাণ হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবার জন্য গোপনে পুনরায় সৈন্য-সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। হুমায়ুন এই সংবাদে হিন্দালকে লইয়া তাঁহাকে দমন করিবার মানসে পুনরায় অভিযান করেন। কামরাণ ১৫৫১ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর রাত্রিযোগে জিরবর নামক স্থানে হুমায়ুনের শিবির আক্রমণ করেন। হিন্দাল স্বীয় প্রাণদান করিয়া হুমায়ুনের প্রাণরক্ষা করেন।

হিন্দালের এই আকস্মিক মৃত্যু গুলবদনের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিয়াছিল। তিনি শোকোচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন; —"জানি না কোন নিষ্ঠুর এই নিরপরাধ যুবককে তাহার তরবারি দিয়া হত্যা করিল। হায়! ভগবান যদি ইহার পরিবর্ত্তে আমাকে বা আমার পুত্র সদাৎ ইয়ার বা স্বামী খিজিরকে লইতেন!"

ইহার পর কামরাণ নানাস্থানে পলায়ন করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বন্দী হইয়া সম্রাটের নিকট আনীত হন। হিন্দালের মৃত্যু-যন্ত্রণা ও আপনার প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ-স্পৃহা হুমায়ুনের মনোমধ্যে জাগরুক থাকিলেও তিনি কারমাণকে বন্দী রাখিবার পরামর্শ দেন; কিন্তু পারিষদ্‌বর্গের প্ররোচনায় স্বীয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি তাহাকে অন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

৩. Humayun-nama, pp.189-90.

দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ মিউজিয়ম-রক্ষিত এই "হুমায়ুন-নামা" খানি হইতে গুলবদন সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছুই জানিবার উপায় নাই।

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর হুমায়ুন দ্বিতীয়বার হিন্দুস্থান অধিকার করিবার জন্য কাবুল ত্যাগ করেন ও ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই তিনি আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। শেরমণ্ডলের পাঠাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী হুমায়ুন প্রাণত্যাগ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর আকবর সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হন। এক বৎসর ধরিয়া শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি কাবুল হইতে পরিবারবর্গকে আনয়ন করেন।

১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে সম্রাট্-জননী হামিদাবাণু, গুলবদন, সলিমা, হাজি ও গুলচিয়া বেগম মানকোটে রাজ-শিবিরের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। আকবর আত্মীয় স্বজনের মুখদর্শনে আনন্দোৎফুল্ল হন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহারা সকলে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। ভারতে আগমন হইতে (১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে) তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হওয়া পর্য্যন্ত গুলবদনের কোন ঘটনা আমরা ইতিহাস-সাহায্যে জানিতে পারি নাই।

গুলবদনের বয়স এক্ষণে ৫০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। তিনি মুসলমান-রমণীর পবিত্র হজ-ব্রত পালনের জন্য মক্কা যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। আকবর প্রথমে এই প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইয়াছিল। গুলবদনের সহিত যাঁহারা মক্কা গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার আত্মীয়ার সংখ্যাই অধিক। আবুলফজল এই তীর্থযাত্রিগণের একটী তালিকা দিয়াছেন। আমরা নিম্নে কয়েকজনের নাম উদ্ধার করিয়া দিলাম ঃ—

১. আকবর-পত্নী সলিমা সুলতান বেগম
২. আস্কারীর, বিধবা-পত্নী সুলতানাম্
৩. কামরাণের দুই কন্যা—হাজি ও গুলিজার বেগম
৪. উম্ কুলসম—গুলবদনের পৌত্রী

আকবর এই তীর্থযাত্রার সমস্ত ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদান করেন। কয়েকজন বিশ্বস্ত আমীর এই তীর্থযাত্রিদলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর ফতেপুর-শিক্রী হইতে যাত্রা করেন। আকবরের দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের উপর বেগমগণকে সুরাট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিবার ভার ন্যস্ত হয়; কিন্তু গুলবদন শিশু মুরাদকে নানারূপে বুঝাইয়া এই শ্রমসাধ্য-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন। যাত্রিদলের মধ্যে নানারূপ বাধা-বিপত্তি ঘটায় সমুদ্র-যাত্রা করিতে তাঁহাদের কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে তাঁহারা যাত্রা করেন। আরবে

পৌঁছিয়া[৪] গুলবদন সাড়ে তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং চারিবার 'হজ' করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন।[৫]

১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বদাউনীর বন্ধু খাজা ইহাহার উপরে বেগমদিকে ভারতে ফিরাইয়া আনিবার ভার অর্পিত হয়। ফিরিবার কালে তাঁহাদিগকে বড়ই বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এডেনের নিকট পোতমগ্ন হওয়া তাঁহারায় ৭ মাস অতি কষ্টে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন। অধিকন্তু তথাকার শাসনকর্ত্তা তাঁহাদিগের সহিত ভাল ব্যবহার করেন নাই। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ হইতে একখানি জাহাজ আসিতে দেখিয়া গুলবদন, গুলিজার ও খাজা সকলে পরামর্শ করিয়া একখানি নৌকা উহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উক্ত জাহাজখানি বায়াজিদ্ বায়াতের[৬] ছিল; —তিনি মক্কা যাইতে-ছিলেন। বায়াজিদ্ বেগমদের নিকটে আসিয়া সমস্তই শুনিলেন। ইহা হইতে আমরা ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গুলবদন প্রভৃতির এডেনে থাকিবার সংবাদ পাইতেছি। সম্ভবতঃ বায়াজিদই বেগমদের ভারতে ফিরিবার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

কোন্ সময়ে বেগমেরা এডেন ত্যাগ করেন, অথবা কখন তাঁহারা সুরাটে পৌঁছান, তাহা নির্দ্ধারিতরূপে বলিবার উপায় নাই। সুরাটে তখন অতিরিক্ত বৃষ্টিপতন ও সম্রাটের কাবুলে অবস্থানহেতু পুনরায় তাঁহাদের আগ্রায় আসিতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। রাজধানীতে আসিবার মুখে বেগমেরা আজমীরে চিস্তি ফকীরদিগের পুণ্যপীঠ দেখিতে গিয়াছিলেন। কুমার সেলিমও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আজমীরে উপস্থিত হন। সম্রাট্ খানওয়ার নামক স্থানে বেগমদের সহিত মিলিত হন। বদাউনীর মতে এক বৎসর গুলবদনকে এডেনে থাকিতে হইয়াছিল। তিনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে (৯৯০ হিঃ) হিন্দুস্থানে পৌঁছান।

ফতেপুর শিক্রীতে পৌঁছিয়া গুলবদন দেখিলেন—মিশনরী পাদরী একোয়াভাইভা কুমার মুরাদকে খৃষ্টধর্ম্মের নানা নীতিকথা বুঝাইতেছেন। ইহাতে গুলবদন ও হামিদা বিরক্ত হইয়া নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করিাছিলেন।[৭]

৪. বদাউনী বলেন, তাঁহারা ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে (৯৮২ হিঃ) আগ্রা ত্যাগ করেন। গুজরাটে তাঁহাদের এক বৎসর বিলম্ব হইয়াছিল। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে (৯৮৩ হিঃ ৫ সাবান, অর্থাৎ অষ্টম মাস) তাঁহারা মক্কায় পৌঁছান। Muntakhab-ut Tawarikh—Al. Badaoni—W.H. Lowe, Vol. II, p. 216.

৫. লো সাহেব (Badaoni – Vol II, p. 217) বলেন, গুলবদন, —কারবেলা, কাম্, মাসাদ্ ও মক্কা এই চারি তীর্থস্থানে গমন করিয়াছিলেন।

৬. খারাজিদও গুলবদনের ন্যায় আকবেরর আদেশে "হুমায়ুন-নামা" রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের রন্ধনশালার পরিদর্শক ছিলেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সম্রাট হুমায়ুন সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য ঘটনা বারাজিদের পুস্তকে আছে।

৭. Father Goldie's "First Christian Mission to the Great Mughal." (Dublin : Gill & Co. 1897)

আগ্রায় উপনীত হইয়া গুলবদন প্রাগুক্ত "হুমায়ুন-নামা" রচনা করেন। ইহাতে তিনি নিজে যাহা দেখিয়াছেন ও বিশ্বস্তসূত্রে যাহা অবগত হইয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা নহে। ইহা ব্যতীত তিনি বহু পারস্য কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। মীর মাদী সিরাজী "তাজকিরাতুল্-খাতীনে" তাঁহার একটী কবিতার এই দুইটী চরণ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন ঃ—

"হর্ পরী কেউ বা আশিক্ ই খুদ্ ইয়ার্ নিস্ত।
তু ইয়াকীন্ মিদান্ কি হেচ আজ্ উমর্ বর্ খুর্দারি নিস্ত।"

অর্থাৎ ঃ—

নিজ প্রেমিকের প্রতি বিমুখ প্রত্যেক পরী। তুমি নিশ্চয় জানিও যে কেহই জীবন-রূপ ফলভোগ করে না অর্থাৎ জীবন নশ্বর, তাহার মধ্যেই সুখ করিয়া লও।

ইহার পর গুলবদনের জীবনে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা অতি সামান্য। আবুলফজল লিখিয়াছেন—তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ৭০ বৎসর, সেই সময়ে তাঁহার দৌহিত্র মহম্মদ-ইয়ার কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া সম্রাটের বিরাগভাজন হইলে বেগমের মধ্যস্থতায় তিনি নিষ্কৃতি লাভ করেন। হুমায়ুনের ন্যায় আকবরও গুলবদনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন। বাদশাহ বহুবার তাঁহাকে বহুমূল্য রত্নরাজি উপহার দিয়াছিলেন।[৮] · :র গুলবদন ও সলিমা কুমার সেলিমের হইয়া বাদসাহের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ যখনই রাজধানী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র শিবির সংস্থাপন করিতেন, তখনই স্বীয় জননী হামিদাবাণুর শিবিরের সন্নিকটেই গুলবদনের তাঁবু সন্নিবিষ্ট হইত। গুলবদন বহু দান-ধ্যান করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি মুক্তহস্তে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

এদিকে তাঁহার 'গণা দিন' ফুরাইয়া আসিল। ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আগ্রায় কয়েকদিনের জ্বরে তিনি শয্যাগ্রহণ করেন।

হামিদা গুলবদনকে বড়ই শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। গুলবদনের শেষ-সময় পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন। হামিদা আদর করিয়া ননদিনীকে "জিউ" (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা-ভগিনী) বলিয়া ডাকিতেন। যখন তিনি দেখিলেন—রোগিনীর চক্ষে মৃত্যুর করাল ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে, তখন তিনি একবার স্নেহভরে ডাকিলেন, —'জিউ?' কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় ডাকিলেন, —'গুলবদন?' মুমূর্ষু গুলবদন ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া বহুকষ্টে বলিলেন, 'আমি মরিতেছি, তুমি চিরজীবিনী হও।"

আকবর পিতৃ-স্বসার মৃত্যুতে অতীব সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য স্বয়ং তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার আত্মার শান্তির জন্য বহু সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করেন।

---

৮. Al, Badaoni Vol. II. p. 332.

আবেদা খাস্‌বিবি

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী

এই পুণ্যশীলা, বিদুষি-তপস্বিনী, চিরকৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বনকারিণী মহিলার পিতামাতা তাঁহাকে যে নামে আহ্বান করিতেন, সে নাম "খাস বিবি"। কিন্তু তাঁহার আসল নাম হইতেছে "কাৎয়ান্নাদা" অর্থাৎ শিশির-বিন্দু। কিন্তু জনসাধারণের নিকট তিনি "খাস্ বিবি" নামেই পরিচিত।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বসিরহাট মহকুমার অধীন বালিয়া পরগণার মধ্যে খাসপুর গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে পুণ্যময়ী আবেদা খাস্‌বিবির সমাধি-মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান। দর্গা অর্থাৎ সমাধি-মন্দিরের যাহারা সেবায়েৎ, "তাঁহারা সিদ্দিকী" শেখ নামে পরিচিত। শেখ-সাহেবদিগের নিকট তাঁহাদের যে বংশ-পরিচয়-তালিকা (কুর্সিনামা) আছে, তদ্দৃষ্টে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহারা অর্থাৎ দর্গার সেবায়েৎ শেখ সাহেবেরা, আবেদা (তাপসী) খাস্‌বিবির ভ্রাতার বংশধর।

কুর্সিনামা অর্থাৎ বংশ-তালিকা পাঠে আরও জানিতে পারা যায় যে, তাপসী-কুলশ্রেষ্ঠা, আবেদা খাস্‌বিবি এবং তাঁহার ভ্রাতা সায়াদ্‌-উল্লা মোহাম্মাদ আমিন খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। এবং ইঁহারা প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর সিদ্দিকের জ্যেষ্ঠপুত্র হজরত আব্দর রহমানের বংশধর।

পৃথিবীর অশান্তির সৃষ্টিকর্ত্তা, মানবের চিরশত্রু চাঙ্গেজ খাঁর পর, তাঁহার জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র হালাকু খাঁ, যখন পুনরায় রাজধানী বাগ্‌দাদ আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেন, সেই সময় এই পবিত্রবংশীয় জ্বালালুদ্দিন সপরিবারে ভারতবর্ষাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন, এবং দিল্লীর সুলতানের নিকট বৃত্তিলাভ করেন।

কিছুদিন এইভাবে বৃত্তিভোগ করার পর, একদিন জ্বালালউদ্দিনের জ্যেষ্ঠপুত্র মহিউদ্দৌলা, প্রকাশ রাজসভায় সোলতান বলবনের নিকট প্রকাশ করিয়া বলেন, যে "আমরা এইভাবে নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় বৃত্তিভোগী হইয়া জীবনধারণ করিতে চাহি না। আমাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করুন।"

মহিউদ্দৌলার এই প্রস্তাবে, সোলতান বলবন প্রথমে অস্বীকার করিয়াছিলেন, পরে যখন মহিউদ্দৌলাকে কিছুতেই স্বীয় সঙ্কল্প হইতে ফিরাইতে পারিলেন না, তখন সভাসদ-পদে গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ইহারা কয় ভ্রাতাই-কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

জ্বালালুদ্দিন হইতে আরম্ভ করিয়া, আবেদা কাতয়ান্নাদা ওরফে খাসবিবির পিতা মোহাম্মাদ আলেক পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ পুরুষ, দিল্লী এবং আগ্রায় রাজকার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন। মোহাম্মাদ আসিফ সম্রাট হুমায়ুনের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

খাসবিবির মাতার নামও হামিদাবানু ছিল। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কাতয়ান্নাদা ওরফে খাসবিবির জন্ম হয়। খাসবিবির পূর্ব্বে, মোহাম্মাদ আসেকের সালেহাবানু নামী আর একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যে সময় খাসবিবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় হেমন্ত ঋতু ছিল বলিয়া, খাসবিবির 'কাতয়ান্নদা' নামকরণ হইয়াছিল এভং ইতিপূর্ব্বেই সালেহাবানুর মৃত্যু হওয়ায় অপর কোন সন্তানসন্ততি ছিল না বলিয়া, পিতামাতা আদর করিয়া ইহার নাম খাসবিবি রাখিয়াছিলেন।

খাসবিবির পর, তাঁহাদের—আসাদউল্লা মোহাম্মাদ আমিন এবং সারাদউল্লা মোহাম্মাদ আমিন নামক আরও দুইটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, খাসবিবি বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরে ভক্তিমতী ছিলেন। রোজা, নমাজ এবং কোরাণ-শরীফ তোলাওয়াৎ (পাঠ) করিতেই যেন তিনি অধিক পরিমাণে আনন্দানুভব করিতেন। তাঁহার বয়স যখন ১৩ কি ১৪ বৎসর, সেই সময়, তাঁহার পিতামাতা এমন কি সম্রাট হুমায়ুন পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সম্মত হয়েন নাই। বলিয়াছিলেন, "এক হৃদয়ে দুইজন সম্রাটের সিংহাসন স্থাপিত হইতে পারে না। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং পালন করিতেছেন, আমি তাঁহারই হস্তে আমার রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। আপনারা আসাদ ও সায়াদের বিবাহ দিয়া সুখী হইবেন।"

ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। সম্রাটের মৃত্যুর ১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে, হুমায়ুনকর্ত্তৃক পুনরায় ভারত-সিংহাসন অধিকৃত হওয়ার পরই, মোহাম্মাদ আসেকের মৃত্যু হয়। যুদ্ধে আসেক আহত হইয়াছিলেন এবং সিংহাসনাধিকারের কয়েকদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

মৃত্যুকালে তিনি, বিধবা স্ত্রী, তাপসী কন্যা খাসবিবি ও দুই পুত্রকে সম্রাট ও সম্রাট মহিষীর হাতে-হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং সম্রাট, যে কয়দিন জীবিত ছিলেন, আসেকের পরিবারবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দের দিকে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন সেই মৃত্যু-শয্যায়ও তিনি আসেকের পরিত্যক্ত পরিবারবর্গকে ভুলিতে পারেন নাই। অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র জ্বালালউদ্দিন মোহাম্মাদ আকবর এবং বন্ধু বাহরাম খাঁকে, ইঁহাদের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন।

আকবরের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে, আসাদউল্লা মোহাম্মাদ আমিন এবং সায়াদুল্লা মোহাম্মাদ আমিন ভ্রাতৃদ্বয়, প্রত্যহ রাজসভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য বাহরাম খাঁ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়েন, এবং তাঁহারাও যথানিয়মে প্রত্যহ রাজসভায় যাতায়াত করিতে থাকেন।

এদিকে খাসবিবি, পিতৃ-বিয়োগের পরদিন হইতে "গোশা নশীন" হয়েন। যে গৃহে তিনি থাকিতেন, সে গৃহে অপব কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। গৃহের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ থাকিত। আহারের সময় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আহার্য্য-বস্তু গৃহমধ্যে রাখিয়া আসিতে হইত। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এই দীর্ঘ ১২ বৎসর কাল তিনি একই গৃহে গোশানশীন ছিলেন। যে দিন তিনি প্রথম গৃহের বহিষ্কৃত হইলেন, তাঁহার মুখাকৃতি দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

যদিও তিনি জ্বালালউদ্দিন মোহাম্মাদ আকবর অপেক্ষা বয়সে প্রায় এক বৎসরের ছোট ছিলেন, এবং যদিও জ্বালাউদ্দিন আকবর তখন ভারত-সম্রাট হইয়াছিলেন, কিন্তু আবেদা খাসবিবির এই প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতি দর্শনে তিনিও মোহিত হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি এক দিন খাসবিবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আবেদায় সম্মানার্থ তাঁহার পদ চুম্বনও করিয়াছিলেন। কেবল পদচুম্বন করিাই যে তিনি ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, মুক্ত কণ্ঠে একথা স্বীকার করিয়াছিলেন যে, "আমার ন্যায় সহস্র সহস্র সম্রাট প্রথম খলিফা যে হজরত আবুবকর সিদ্দিকের পদসেবা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন, আজি আমি তাঁহারই উপযুক্ত বংশধরের পদচুম্বন করিবার অধিকারী হইয়া ধন্য হইলাম।"

খাসবিবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা সায়াদউল্লা মোহাম্মাদ আমিনের সহিত তাঁহার পিস্তুতা ভগিনী জেব্ উন্নেসার বিবাহ হইয়াছিল। সায়াদউল্লা মোহাম্মাদ আমিন, এক পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। খাসবিবির ইচ্ছানুসারে কামলউদ্দিন মোহাম্মদ আমিন বলিয়া পুত্রের নাম রাখা হইল।

পুত্রের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, সেই সময়, হঠাৎ জ্বররোগে জেবউন্নেসা ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসিনী হয়েন। স্ত্রীবিয়োগজনিত শোকে, সায়াদউল্লাকে বড়ই অস্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি এই দারুণ শোকের বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না; উন্মত্তবৎ হইলেন। সায়াদুল্লার এই প্রকার মানসিক দূরবস্থা দেখিয়া সম্রাট পর্য্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভগিনী খাসবিবি, ভ্রাতা সায়াদউল্লাকে অনেক প্রকার সান্ত্বনাবাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন না। অবশেষে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হওয়াই স্থির হইল।

ঠিক এই সময়েই বিধাতা তাঁহাদের দেশ-ভ্রমণের সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিলেন। যশোহরের জমিদার রাজা প্রতাপাদিত্য বিদ্রোহী হইয়া, দিল্লীশ্বরের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের বিদ্রোহের সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিলে, সম্রাট উক্ত বিদ্রোহীকে দমন-করণার্থ মহারাজ মানসিংহকে প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। তাপসী খাসবিবি এই সুযোগ পাইয়া সম্রাটের অনুমতি ক্রমে

ভ্রাতা সায়াদউল্লা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র কামালউদ্দিন মোহাম্মাদ আমিনকে সঙ্গে লইয়া মহারাজার সেনাদলের সহিত দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হয়েন।

এখন যে স্থানে খাসবিবির রওজা-শরীফ অর্থাৎ পবিত্র সমাধি-মন্দির বর্ত্তমান, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ গ্রামের নাম খাসপুর। কিন্তু পূর্ব্বে ঐ স্থানে যে গ্রাম ছিল, তাহার নাম "ব্রাহ্মণনগর" ছিল বলিয়া পুরাতন কাগজপত্রে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাজ মানসিংহের বিপুলবাহিনী যখন রাজা প্রতাপাদিত্যের মৌতলার দুর্গ আক্রমণার্থ সম্মুখদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন "ব্রাহ্মণনগর" তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। মহারাজ ব্রাহ্মণনগরের শোভা ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, একদিনের জন্য তথায় সৈন্যদিগের বিশ্রাম করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

অনুমতিপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাম্বু-কানাত পড়িতে আরম্ভ হইল। মহারাজ মানসিংহের আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণনগরের প্রধানগণ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। মহারাজও সকলকে সাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ মহারাজকে নজরানা দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, যাঁহারা মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। মহারাজ মানসিংহ অত্যন্ত ব্রাহ্মণ-ভক্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ বাক্যালাপের পর, মহারাজ তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দলপতি নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সদর্পে বলিলেন, "মুসলমানের সহিত আপনি কুটুম্বিতা করিয়াছেন, সুতরাং আপনার এখানে জলস্পর্শ করিলে ধর্ম্মের হানি ঘটিবে।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এইরূপ উক্তিতে মহারাজ কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলেন বটে, কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। মহারাজের সহিত গঙ্গানারায়ণ শাস্ত্রী নামক একজন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে শাস্ত্র-তর্কে আহবান করিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি সেই মুহূর্ত্তেই তর্কে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ব্রাহ্মণদিগের এই প্রকার ভাব দেখিয়া মহারাজ এই কৌশল অবলম্বন করিলেন। বলিলেন, "আপনারা এখন নিরস্ত হউন, যুদ্ধ অন্তে, ফিরিবার সময় তর্ক-সভার অধিবেশন করা যাইবে।" পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ শাস্ত্রী কিন্তু নাছোড়বান্দা, তিনি বলিলেন, "তর্ক-যুদ্ধে যে পরাস্ত হইবে, তাহার শাস্তির কোন ব্যবস্থা হউক।" তখন স্থির হইল, যদি পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ পরাস্ত হয়েন, তিনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ঐরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন।

যুদ্ধ-অন্তে, মহারাজ এবং তাঁহার সৈন্য-সামন্ত পুনরায় ঐ পথেই ফিরিলেন। যথাসময়ে তর্ক-সভার অধিবেশন হইল, তর্কে মহারাজ-পণ্ডিতেরই জয় হইল এবং

পণ্ডিত মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরাস্ত হইলেন। তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং তাঁহার দলের কয়েকজন মাত্র ব্রাহ্মণ মহারাজের অতিথ্য-স্বীকার করিয়া জলযোগ করিলেন এবং মহারাজও উপযুক্তভাবে ব্রাহ্মণদিগের সম্মান রক্ষা করিলেন।

নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা এবং স্ত্রী ব্যতীত সংসারে আর কেহ ছিল না। কি প্রকারে যে তাঁহারা অর্থাৎ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী, কন্যা ও পাড়ার দুই একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা তাপসী খাসবিবির পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহার কোনই সঠিক নিদর্শন কাগজ-পত্রাদিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা খাসবিবির সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ধরিয়া বসিলেন।

খাসবিবির নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি সম্মতি দিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সস্ত্রীক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথম দর্শনেই মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার সতীলক্ষ্মী স্ত্রী মুগ্ধ হইলেন। ক্রমে আলাপ-পরিচয় আরম্ভ হইল, ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও আলোচনা চলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনার পর, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি অবেশেষ ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাও তদবস্থায় ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

এদিকে রাত্রি উপস্থিত হইল। সর্ব্বত্রই সংবাদ প্রচারিত হইল যে, মহারাজ প্রাতঃকালেই দিল্লী যাত্রা করিবেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় খাসবিবি এক স্বপ্ন দেখিলেন, তাহাতে তিনি দেখিলেন যে, যেমন প্রথম খলিফা স্বয়ং তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "মা! আমি তোমার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, যেহেতু খোদা এবং রসুল তোমার প্রতি বড়ই সুপ্রসন্ন। খোদার মর্জ্জি (ইচ্ছা) তুমি এই স্থানেই অবস্থান কর, আর দিল্লী যাইও না। সায়দউল্লা এবং তাহার পুত্র তোমার সেবা করিবে। কামালউদ্দিন মোহাম্মদ আমিনের সহিত নও-মোসলেম, নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ওরফে নুর মোহাম্মদের কন্যা পদ্মাবতী ওরফে সাকিনা বিবির শুভবিবাহ সম্পাদন করিয়া তুমি পুত্রবধূ ঘরে আন। দেখিলাম, তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য স্বর্গে অনেক প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। তুমি শীঘ্রই স্বর্গবাসিনী হইবে। কামাল-উদ্দিনের বংশধরেরাই তোমার রওজার খাদেমরূপে মহাপ্রলয়ের দিন পর্য্যন্ত বিরাজ করিবে।"

রাত্রি প্রভাত হইল। খাসবিবি মহারাজের নিকট সংবাদ দিলেন, "আপনার সহিত আমাদের যাওয়া হইবে না। সম্রাটকে আমাদের অভিবাদন জানাইবেন। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনাদের সর্ব্বপ্রকারে পার্থিব মঙ্গল হউক।"

মহারাজ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি খাস বিবির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে দিন আর মহারাজের যাওয়া হইল না। ইসলামশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে সেই দিন কামালউদ্দিনের সহিত সাকিনা বিবির বিবাহ

হইয়া গেল। কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী পরদিন মহারাজের সহিত দিল্লী গমন করিয়াছিলেন, এবং কয়েকমাস কাল তথায় থাকিয়া তাঁহারা মক্কায় গমন করিয়াছিলেন, আর ফিরিয়া আইসেন নাই।

এই সকল ঘটনার পর, কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মণনগর শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ গ্রামের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও অপরাপর হিন্দু অধিবাসী স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন। খাসবিবির নামানুসারেই ব্রাহ্মণনগরের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, "খাসপুর" রাখা হইয়াছিল। এ পরিবর্ত্তন মহারাজ মানসিংহ নিজেই করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে এই বংশের মাত্র ১১ ঘর লোক খাসপুরে বাস করিতেছেন। খাসবিবি হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশে এ বংশের ১৭ পুরুষ চলিতেছে। এখান হইতে কেহ কেহ আবার পাঞ্জাব-অঞ্চলে, দিল্লী-অঞ্চলে এবং এই বর্দ্ধমান জেলায় উঠিয়া আসিয়াছেন বলিয়া, কাজগপত্রে নিদর্শন পাওয়া যায়।

মহারাজ মানসিংহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্রাট্‌কে সকল কথা জানাইয়াছিলেন এবং সম্রাট্ আকবর শাহ খাসবিবি ও তাঁহার ভ্রাতৃ-বংশের সেবার জন্য ১৭ শত বিঘা লাখেরাজ ভূমি দান করিয়াছিলেন। সেই সনদ ও পাঞ্জার জীর্ণদশা এখন খাসপুরের সিদ্দিকী শেখদিগের নিকট বর্ত্তমান আছে। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, কোন অব্যক্ত কারণে লাখেরাজ ভূমির পরিমাণ এখন ৯ কি ১০ বিঘা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহাও প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের কল্যাণে দখলে নাই।

১৬০৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৬৩ বৎসর বয়সে খাসবিবি ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসিনী হইয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশে আসিয়া যে কয়দিন জীবিতা ছিলেন, সেই সময় ভিন্ন ধর্ম্মের লক্ষ লক্ষ লোককে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, তাঁহার নিকট যে যাহা মানস করে, তাহার তাহা পূর্ণ হয়। মানস করিবার একটু তাৎপর্য্য আছে। নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে বা হইলেই হিতে বিপরীত ঘটিয়া থাকে।

রাত্রিকালে মানস করা নিষেধ। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ দিবাভাগের যে কোন সময় স্নান করিয়া সিক্তবস্ত্রে জোড়হস্তে সমাধি-মন্দির সম্মুখে করিয়া বাসনা জানাইতে হয়।

বলিতে হয়, "মা! তুমি খোদার ও রসুলের প্রিয়পাত্রি! তুমি আমার অমুক বিপদ-মুক্তির জন্য, অথবা সন্তান জন্মিবার জন্য, অথবা রোগ-মুক্তির জন্য খোদার নিকট প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ কর, আমি তোমার নামে এত জন কাঙ্গালী ভোজন করাইব।"

গোরাচাঁদ শাহ্

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী

২৪ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার অধীন বালাণ্ডা পরগণার মধ্যে হাড়ওয়া গ্রামে এই প্রসিদ্ধ পীরের সমাধি-মন্দির বর্ত্তমান আছে।

ইহার প্রকৃত নাম সৈয়েদ আব্বাস আলী। মক্কার কোরেশ-বংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম সৈয়েদ করিমউল্লা ও মাতার নাম বিবি মিন্নতোন্নেসা। ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে মক্কার জমজম মহাল্লায় ইঁহার জন্ম হয়। ৯ কি ১০ বৎসর হইতে সংসারের উপর ইঁহার বিরাগ উপস্থিত হয়। নমাজ, রোজা, কোরাণ-শরিফ, তেলাওয়াৎ এবং দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিবার জন্যই যেন সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। যে সময় ইহার কোন একটি কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিতেন, তখনই তাঁহাকে যেন আরও অধিক পরিমাণে চিন্তান্বিত দেখা যাইত। করিমউল্লা কহিলেন, "এখন হইতে আব্বাসআলীকে আর চক্ষের অন্তরালে যাইতে দেওযা হইবে না।" একদিন আব্বাসআলী অনেক চিন্তার পর পিতা-মাতা নিদ্রিতাবস্থায় থাকিতে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন, পিতা-মাতার চরণ-বন্দনা করিয়া গৃহের বাহির হইলেন। সমস্ত রাত্রি পথ অতিবাহিত করিলেন, প্রভাত হইল, তথাপি বিরাম নাই, সমানভাবেই পথ চলিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, রাত্রি হইল, এক পর্ব্বত-মূলে প্রস্তরখণ্ডের উপর দেহরক্ষা করিয়া শয়ন করিলেন।

শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। রাত্রি অর্দ্ধযাম উত্তীর্ণ হইলে পর স্বপ্ন দেখিলেন, যেন এক সন্ন্যাসী তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "বৎস! আমি তোমার প্রতি বড়ই সন্তোষলাভ করিয়াছি। তুমি আমাকে কখনও দেখ নাই। কেবল লোক-মুখে আমার নাম শুনিয়াই তুমি আমার প্রতি যে পরিমাণ আকৃষ্ট হইয়াছ, আমি তোমার প্রতি তাহার সহস্রগুণ অধিক আকৃষ্ট হইয়াছি। খোদার পদে তুমি যে প্রকারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছ, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সেই পরিমাণে খোদাতায়ালার নৈকট্য-লাভ কর। তোমাকে আর কষ্ট করিয়া আমার আশ্রমে উপস্থিত হইতে হইবে না, আমার আশীর্ব্বাদে তুমি নিদ্রিতাবস্থাতেই খোদাতায়ালার দূত কর্ত্তৃক আমার আশ্রমে নীত হইবে।"

এই স্বপ্ন-দর্শনের পর বালক আব্বাসআলীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, আশা হস্তে একজন তেজস্বী সন্ন্যাসী তাঁহার শিওরে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। যে পর্ব্বত-মূলে তিনি সন্ধ্যাকালে শয়ন করিয়াছিলেন, সে পর্ব্বত-মূল কোথায়? তৎপরিবর্ত্তে এক পর্ণ-কুটীরে একখানি কম্বলের উপর শয়ন করিয়া

রহিয়াছেন, দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন, তাঁহার চতুঃপার্শ্বে মৃগ-চর্ম্মের উপর প্রায় বিংশতি জন যুবক বসিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন।

সন্ন্যাসী, আব্বাস আলীকে সঙ্গে লইয়া কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং জা— নমাজের উপর বসিয়া সেই রাত্রেই আব্বাসআলীকে শিষ্য করিলেন। এই দিন হইতে দ্বাদশ বৎসর কাল, আব্বাসআলী, তাঁহার মুর্শিদ ইমনদেশের বিখ্যাত পীর শাহ জালালের আশ্রমে থাকিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের অশেষ উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন।

এদিকে আব্বাসআলীর পিতা-মাতা প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া পুত্রকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া, চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কোথাও তাঁহারা পুত্রের সন্ধান পাইলেন না। শাহ জালাল যখন বুঝিতে পারিলেন যে, আব্বাসআলী পিতা-মাতার অনুমতি না লইয়াই গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সাধনার সিদ্ধি-লাভের আশা খুবই কম, সুতরাং তিনি স্বয়ং ফকিরবেশে আব্বাসআলীর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আরও এক পুত্র ও দুই কন্যা হইবে বলিয়া বর দিলেন।

হজরতশাহ আব্বাসআলী, দ্বাদশ বৎসর কাল মুর্শিদ-আশ্রমে অবস্থান করিয়া যখন সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং যে দিবস তাঁহার দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইল, সেইদিন, শাহ-জালালের খুল্লতাত ও মুর্শিদ, বিখ্যাত পীর অতিবৃদ্ধ শাহ ফকির স্বয়ং শাহজালালের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "তুমি সশিষ্যে ভারতবর্ষে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। সপ্তাহ কালের মধ্যেই তোমাকে আরব ত্যাগ করিয়া, ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।" তিনি শাহ-জালালের হস্তে এক মুষ্টি মৃত্তিকা দিয়া পুনরায় কহিলেন, "এই মৃত্তিকার আঘ্রাণের সহিত, ভারতবর্ষের যে স্থানের মৃত্তিকার আঘ্রাণ এক প্রকার বলিয়া বিবেচিত হইবে, তুমি সেই স্থানেই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবে।"

শাহ-জালাল গুরুদেবের নিকট হইতে এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, তিন শত যাইট জন শিষ্যকেই নিকটে আহবান করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ! অদ্য আমার গুরু, তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া, সপ্তাহকালের মধ্যে ভারতবর্ষে রওয়ানা হইবার জন্য আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন। তোমরা সকলেই প্রস্তুত হও।" গুরুর এই আজ্ঞা, সকলেই অবনতমস্তকে স্বীকার করিলেন। শাহ-জালাল শিষ্যবর্গের প্রতি পুনরায় আদেশ করিলেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কেহ আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, অনতিবিলম্বে গমন করিতে পার। কিন্তু ষষ্ঠ দিবস সন্ধ্যাকালে এখানে উপস্থিত হইতে হইবে।"

গুরুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অনেকেই গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। আব্বাসআলীও পিতা-মাতার চরণবন্দনার্থ মক্কাভিমুখে ছুটিলেন। যথাসময়ে গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি বালক ও দুইটী বালিকা দ্বারের সন্নিকটে খেলা করিতেছে। যে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই অশ্বটীকে একটী বৃক্ষ-

মূলে আবদ্ধ করিয়া, আব্বাসআলী অন্দরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ইহা দেখিয়া বালক-বালিকাত্রয়, দৌড়িয়া গিয়া পিতা-মাতাকে সংবাদ দিল—একটি অপরিচিত লোক অন্দরে প্রবেশ করিতেছে।

হজরতশাহ আব্বাসআলীর পিতা পুত্র-কন্যার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া দ্রুতপদে বাহিরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, পথি-মধ্যে পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ হইল। পিতামাতা পুত্রের মুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া, হর্ষ ও বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, আব্বাসআলীকে সুদূর ভারতবর্ষে একা যাইতে দেওয়া হইবে না। পুণ্যবান্ সৈয়েদ করিমউল্লার মাহতাবউদ্দিন নামক আর এক পালক পুত্র ছিলেন, তাঁহাকেই আব্বাসআলীর সঙ্গে প্রেরণ করা স্থির হইল।

মাহাতাবউদ্দিন, শাহ আব্বাসআলী অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিলেন। কিন্তু আব্বাসআলীকে তিনি পূর্ব্বাপর বিশেষভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। বিশেষতঃ যখন মাহতাবউদ্দিন বুঝিলেন যে, পীর শাহজালালের কৃপায়, আব্বাসআলী খোদাতায়ালার নৈকট্যলাভ করিয়াছেন, তখন আব্বাসআলীর সঙ্গে থাকিতে তাঁহারও বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। কিন্তু "ছল-চাতুরী ব্যতীত, ফকিরদিগের নিকট হইতে কিছু আদার করা যায় না" এই প্রবাদ-বাক্য স্মরণ করিয়া কহিলেন, "আমি ভাই সাহেবের সহিত যে কোন স্থানে যাইতে স্বীকৃত আছি, যদি ভাই সাহেব আমার নিকট দুইটী বিষয়ের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েন।"

শাহ আব্বাসআলী মাহতাবউদ্দিনের এই কথা শ্রবণ করিয়া, অঙ্গীকারের বিষয় জানিতে চাহিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "আপনি যে ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী, আমি ও সেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে চাহি; সুতরাং আমাকে কিছু মূলধন দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ আপনার যখন অন্তিমকাল উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে আপনার খেলাফৎ দিতে হইবে।"

হজরতশাহ আব্বাসআলী মাহতাবউদ্দিনের এই দাবী গ্রাহ্য করিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন। তখন মাহতাবউদ্দিনও সহাস্যাননে তাঁহার তাঁবেদারী স্বীকার করিয়া লইলেন। এই মাহতাবদ্দিনও পরে একজন জবরদস্ত ফকির হইয়াছিলেন এবং সোন্দল শাহ তাঁহার খেতাব হইয়াছিল। অদ্যাপি তাহার গোরস্থান বীরভূম জেলায় বিরাজমান।

শাহ মাহতাবউদ্দিন ওরফে সোন্দল শাহ যখন হজরত শাহ আব্বাসআলীর নিকট খেলাফতি প্রাপ্ত হইয়া বীরভূমে আসিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং যখন তিনি বীরভূমে আসিয়াছিলেন, তখন বীরভূম জেলায় শাহ জায়নউদ্দিন নামক একজন আবেদ ও জাহেদের একমাত্র বিধবা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এই উভয়ের পুত্ররত্নই কলিকাতার দক্ষিণ ঘুটিয়ারী শরীফ নামক স্থানের জাগ্রত পীর মোবারক গাজী শাহ।

শাহ আব্বাস আলীর ভগিনী বিবি রওশন আরাও একজন জবরদস্ত তাপসী হইয়াছিলেন এবং তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসন্ধানে প্রথমে ভারত-রাজধানী দিল্লী, পরে তথা হইতে বঙ্গদেশের ২৪ পরগণা জেলায় বসিরহাট মহকুমায় কাথুলিয়া পরগণায় তারাগুনিয়া নামক গ্রামে আসিয়া দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মুর্শিদের আদেশ ছিল, তুমি যে স্থানে দিবাভাগে তারা (নক্ষত্র) দেখিতে পাইবে, সেই স্থানেই তোমার আস্তানা হইবে। তারাগুনিয়া গ্রাম ইছামতী নদীর ধারে অবস্থিত। প্রত্যেক বৎসর চৈত্রমাসের ১লা, ২রা ও ৩রা তারিখে তথায় মেলা বসিয়া থাকে।

শাহ-জালাল ৩৬১ জন শিষ্যসহ ১২৯৭ খৃঃ শেষভাগে ভারত-রাজধানী দিল্লীতে উপস্থিত হয়েন এবং ১২৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে দিল্লী হইতে শ্রীহট্টাভিমুখে রওয়ানা হয়েন। অদ্যাপি শাহ-জালালের সমাধি শ্রীহট্টে বিরাজ করিতেছে।

শাহ-জালাল শ্রীহট্টে উপস্থিত হইয়া, শিষ্যবর্গকে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। শাহ আব্বাস আলী যে দলে ছিলেন, সে দলে ২২ জন পীর এক সঙ্গে বাহির হইয়াছিলেন। বারাসত মহকুমার রায়কোলানামক গ্রামে "বাইশ আউলিয়ার দরগা" বলিয়া আজিও একটি দরগা রহিয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ ২২ জনের নাম ও পরিচয় আমরা আজিও প্রাপ্ত হই নাই। যে কয়জনের নাম ও পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

(১) শাহ সুকি, —ইনি পীরের আদেশে পাণ্ডুয়ায় গিয়াছিলেন। (২) দারাফ খাঁ গাজী, ইনি পীরের আদেশে ত্রিবেণীতে গিয়াছিলেন। (৩) শাহ আব্দল্লা, ইনি পীরের আদেশে সির্সিনীতে গিয়াছিলেন। (৪) একদিন শাহ, পীরের আদেশে বারাসত আনারপুর কাজীপাড়ায় গিয়াছিলেন। (৫) শাহ ছকুদেওয়ান পীরের আদেশে খামারপাড়ায় গিয়াছিলেন। (৬) শাহ-সইদ-আকবর, পীরের আদেশে শোহাই গিয়াছিলেন এবং (৭) শাহ আব্দাস আলী, পীরের আদেশে 'ভাটীমুল্লুকে" বালাণ্ডায় গিয়াছিলেন। (৮) শাহ সোন্দাল, ইনি পীর শাহ আব্বাস আলীর আদেশে বীরভূম গিয়াছিলেন।

শাহ সাহেব প্রথমে সেরপুর গুস্তায় আসিয়া, তথা হইতে চৌরাশী গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সম্মুখে প্রকাণ্ড পদ্মানদী; পার হইবার কোনই উপায় নাই। অতঃপর শাহ আব্বাস আলী ঈশ্বরের স্তুতিগানে করিতে করিতে পদ্মানদীতে ঘোড়া নামাইয়া দিলেন, দেখাদেখি, শাহ সোন্দালও স্বীয় অশ্বকে কশাঘাত করিয়া শাহসাহেবের অনুসরণ করিলেন। বিধাতার কৃপায় তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে পদ্মা পার হইয়া পরপারে ইয়াজপুর নামক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অতঃপর শাহ সাহেব দানা নামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি কুটীরে একজন যোগীপুরুষ বসিয়া যোগসাধনা করিতেছেন। শাহ সাহেব তাঁহার ধ্যানভঙ্গ

করাইলেন এবং পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কুটীরে বসিয়া কোন্ বাসনা পূরণের জন্য কতদিন হইতে এরূপ যোগ-সাধনা করিতেছেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি দ্বাদশ বৎসরেরও উর্দ্ধকাল হইল এই স্থানে এই অবস্থায় বসিয়া আছি—গঙ্গাদেবীর দর্শন-আশায়। এই স্থানে বসিয়া গঙ্গাদর্শন পাইতে চাই। যতদিন না দর্শন পাইব, ততদিন এস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইব না।" শাহ সাহেব কহিলেন, "যদি তাঁহার দর্শন পাও স্থানান্তরে যাইবে?" তিনি বলিলেন, "হাঁ"। তখন শাহ সাহেব সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট যোগীপুরুষের যাজ্ঞাপূরণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, হুহু শব্দে জলের তরঙ্গ ছুটিয়া আসিতেছে। আরও দেখা গেল, সেই জলের উপর মকরবাহিনী গঙ্গাদেবী বিরাজ করিতেছেন।

যোগীপুরুষ গঙ্গা দর্শন করিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। তিনি কহিলেন, আমি নিজের যোগবলে গঙ্গাদেবীর দর্শন-লাভ করিয়াছি, এখান হইতে উঠিব না। যোগীপুরুষের এইপ্রকার ব্যবহারে শাহ সাহেব ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুটী চক্ষুকে জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ করিয়া গঙ্গাদেবীকে পাতাল-প্রবেশের জন্য অনুরোধ করিলেন। গঙ্গাদেবী পাতালে প্রবেশ করিলেন। খাতের জল অনেক পরিমাণে শুষ্ক হইয়া গেল। সেই হইতে সেই নবগঙ্গার নাম "দহ-গঙ্গা" হইয়াছে এবং এখন বিকৃত হইয়া "দে-গঙ্গা" নামে অভিহিত হইয়াছে।

অতঃপর শাহ সাহেব তথা হইতে সূর্য্যবংশীয় রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী দেবলা নগরের সিংহ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বাররক্ষক "হামা-দামা" নামক বীরদ্বয়কে দ্বার ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দ্বাররক্ষক বীরদ্বয় দ্বার ছাড়িয়া দিল না, অধিকন্তু মুসলমান ফকির দেখিয়া নানা প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। ফল এই হইল যে, হামা-দামার ন্যায় দুইজন মহাবীর শাহ সাহেবের হস্তে প্রাণ হারাইল। ক্রমে এই সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল এবং রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া ফকির সাহেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন।

রাজা চন্দ্রকেতু শাহ সাহেব প্রকৃত ফকির কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য অনেক প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। লোহার বেড়ায় চাঁপাফুল ফুটাইবার প্রস্তাব, লৌহনির্ম্মিত কদলিবৃক্ষে পক্ক কদলির সৃষ্টি, আড়াই প্রহরকাল রাজ-রাণীর উপর সুবর্ণ-বৃষ্টি প্রভৃতি অনেক প্রকার পরীক্ষায় শাহ সাহেব উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। স্থানীয় বেড়াচাঁপাগ্রাম আজিও শাহ সাহেবের পরীক্ষার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

রাজ-অন্তঃপুরে যখন যুদ্ধের শেষ সংবাদ গিয়া পৌছিল, তখন রাণী কমলাবতী দেবী অপর পুরবাসিনীদিগকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুর-মধ্যস্থিত দীর্ঘিকায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। আজিও সেই দীর্ঘিকা কেতুরাজার 'দ' নামে পরিচিত।

হাতিয়াগড়ের রাজা আকানন্দ রায়ের বাণাঘাতে শাহ সাহেবের অর্দ্ধেক গ্রীবা কাটিয়া গিয়াছিল। শিরস্ত্রাণের বস্ত্র দ্বারা কাটা স্কন্ধ বাঁধিয়াও শাহ সাহেব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ের পর যখন তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন সোন্দাল শাহকে সঙ্গে লইয়া আরও দক্ষিণে ভার্গবপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন।

শাহ সৈয়েদ আব্বাসআলী আসন্নকাল উপস্থিত জানিয়া, শাহ মাহতাবউদ্দিনকে সোন্দাল শাহ উপাধি দিয়া, খেলাফতের সহিত, স্বীয় পাগড়ী তাঁহার শিরে দিয়া, বীরভূম যাইতে আদেশ করিলেন। সোন্দাল শাহ গুরুদেবকে এইভাবে ও এই অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। পরে যখন তিনি অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিলেন, তখন অগত্যা আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইলেন।

সোন্দাল শাহ চলিয়া যাওয়ার পর, ক্রমেই তাঁহার শরীরের অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। ভার্গবপুরের কানু ঘোষ ও কিনু ঘোষ গাভীর অনুসন্ধানে জঙ্গলে আসিয়া শাহ সাহেবের মুমূর্ষু অবস্থা দেখিলেন, এবং তাঁহারাই শাহ সাহেবকে ভূমিতে প্রোথিত করিলেন। অদ্যাবধি তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ প্রত্যেক বৎসর হাড়োয়ায় ফাল্গুন মাসে মেলা হইয়া থাকে।

১২ই ফাল্গুন তারিখে তাঁহার প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া বহির্গত হইয়াছিল। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত কানু ও কিনু ঘোষের বংশধরেরা ঐ ১২ই তারিখে ৭ মণ দুগ্ধ দ্বারা দর্গা ধৌত করিয়া দেয়।

পীর বহরাম্

খুন্দকার গুলাম আহম্মদ

আমরা আমাদের প্রবন্ধের শীর্ষভাগে পবিত্র সমাধি-মন্দিরের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বর্দ্ধমান-সহরের দক্ষিণ প্রান্তে এক পরিত্যক্ত বিজন প্রান্তরে অবস্থিত। এখন তাহা নানাবিধ বনজাত ক্ষুদ্র-বৃহৎ বৃক্ষ-লতা-সমাচ্ছন্ন ভয়াবহ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এককালে উহা লতা-বিতান বিমণ্ডিত, মধুকর-নিকর-কর-করম্বিত, কোকিলা-কাকলি-কূজিত, মলয়ানিল-সঞ্চালিত, তমাল-তালি-মর্ম্মরিত, মনোমুগ্ধকর নয়নাভিরাম উদ্যান-মধ্যে সংস্থাপিত ছিল। এক পার্শ্বে এক স্বচ্ছ সলিলা সরোবর অপর পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ধীরে ধীরে প্রবাহিতা হইত। সরোবরটী এক্ষণে সংস্কার-অভাবে মলিনদশায় উপনীত হইয়াছে।

হুগলী জেলার অন্তর্গত গড়-মান্দারণ গ্রামে এক বিরাট সমাধি-মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। উহা তাপসবর শাহ ইস্মাইল গঞ্জু লশকরের সমাধি-মন্দির। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়াধিপতি হোসেন শাহের রাজত্বকালে কোন যুদ্ধে শাহ ইস্মাইল সহীদ হয়েন। কানু নামে তাঁহার এক খেসমল নারী এবং বহরাম তাঁহার শক্কা অর্থাৎ জলবাহক ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ডিঃ সাহেবগঞ্জ সামীল কানুতাকা গ্রামে শাহ কানুর সমাধি-মন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে ও শত শত নর-নারী দ্বারা সম্মানিত হইয়া আসিতেছে এবং উপরোল্লিখিত পীর বহরাম আমাদের প্রবন্ধোক্ত মহাত্মা শাহ বাহরাম শক্কার সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পীর বহরামের শাহ বাহরাম শক্কার সহিত শাহ ইস্মাইল গঞ্জু লস্করের কোন সম্বন্ধ ছিল না। তিনি আরবদেশীয় লোক। মক্কা-শরীফের কোন নির্দ্দিষ্ট পথে জল বহন করিয়া তত্রত্য তীর্থাগত তৃষিত পথিকগণকে জলদান করিতেন, পরে কোন কারণে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এই স্থানে বাস করেন। কোন্ বিবরণ সত্য, তাহা স্থির করা কঠিন।

শাহ বহরামের সমাধি একটী অন্ধকার প্রকোষ্ঠ স্থাপিত আছে এবং একখানি সামান্য বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বদা আবৃত থাকে। সমাধি-গৃহে প্রবেশ করিলে হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়। সমাধি-গৃহের পূর্ব্বদিকের একচত্বরে আরও কতকগুলি সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমরা অনুসন্ধান দ্বারা তাহার বিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারি নাই। প্রবাদ এই যে, পীর বহরামে বঙ্গবিখ্যাত পারস্য-কবি মুন্সী মহাম্মদী সাহেবের সমাধি বর্ত্তমান আছে। আমাদিগকে কেহই তাহার বিশেষ নিদর্শন দিতে পারে নাই।

তিনি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের একজন সভাপণ্ডিতরূপে কার্য্য করিতেন। বিদ্যোৎসাহী মহারাজ আফ্‌তাবচাঁদ বাহাদুর ইহার ও পণ্ডিত রামতারণ তর্কবাগীশের সাহায্যে ১২৭৫ সালের মনসবী ও সেকন্দর-নামা প্রভৃতি পারস্যগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

সমাধি-উদ্যানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব-কোণে একটী হিন্দু-দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে উহাকে যোগী জয়পালের মন্দির বলে। এই যোগীবর ও শাহ বাহরাম সম্বন্ধে বর্দ্ধমানে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।*

এরূপ কিংবদন্তী বিহারের শাহ মথদুম ও যোগী রতনমালা সম্বন্ধেও শ্রুত হওয়া যায়। (সভাপতি)

খাজা আনোয়ারের গোরস্থান

আবদুল লতিফ

বর্দ্ধমান নগরে "খাজা আনোয়ার" নামক এক সাধুপুরুষের সমাধি-ভবন আছে। যে পল্লীতে ঐ সমাধি-ভবন বিদ্যমান আছে, তাহা তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত "নজুরাত ওয়াকফ্" সম্পত্তি হইতেছে। এজন্য ঐ পল্লী "খাজা আনোয়ারের বেড়" নামে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। সমাধিস্থানের চারিদিক্ ইষ্টক প্রাচীরে পরিবেষ্টিত; প্রাচীরের মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ড সুপ্রশস্ত ও সমচতুষ্কোণ।

সমাধি-ভবনের মধ্যস্থলে প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখেই খাজার সমাধি; উহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম ধারে দুইটী করিয়া চারিটী এবং পাশের দুই ঘরেতে দুইটী সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। খাজার সমাধির দুই ধারের সমাধিগুলি কাহাদের, তাহা জানিবার এখন আর কোনও উপায় নাই। তবে প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখের সমাধিটি খাজার সমাধি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। অপর সমাধিগুলি খাজার আত্মীয়-স্বজনগণের বলিয়া কিংবদন্তি চলিয়া আসিতেছে। খাজা আত্মীয়স্বজন লইয়া ঐ সুন্দর ও সজ্জিত সমাধি-ভবনে চিরনিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন। তাঁহার সমাধি-ভবনের বাহিরে চারিদিকে দিন দিন সমাধি-সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে।

ঐ সমাধির প্রাচীনত্ব নির্ণয় করিবার আমাদের সম্বল একটী ফারসী কবিতার একটী চরণ। উহা সমাধি-ভবনের জনৈক কার্য্যাধ্যক্ষ মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। নিম্নে ঐ কবিতা-চরণ উদ্ধৃত হইল;—

"আহ্ আনোয়ার শহিদে আকবর শোদ।"

ঐ কবিতা-চরণের প্রত্যেক অক্ষরের সংখ্যা একত্র করিলে ১১০৯ হয়; ঐ হিসাবে ১১০৯ হিজরীতে (১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে) খাজা আনোয়ারের মৃত্যু হওয়া অবধারিত হয়।

খাজা আনোয়ার বাঙ্গালার ইতিহাস-পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। তিনি কোথা হইতে কি উপলক্ষে বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলেন এবং কোন্ হেতুতে তাঁহাকে নিহত হইতে হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস বাঙ্গালার ইতিহাসে দেওয়া আছে। বাঙ্গালার ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে. সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের সহিত তত্রত্য জমিদার শোভাসিংহের মনোমালিন্য ঘটিলে শোভাসিংহ বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া প্রধান বিদ্রোহী আফগান-সর্দ্দার রহিম খাঁকে আহ্বান করেন।

শোভার অপঘাত-মৃত্যুর পর, তাঁহার সৈন্য-সামন্তগণ রহিমের আজ্ঞাধীন হয়। রহিম ঐরূপে সেনাবলে বলীয়ান হইয়া "রহিম শাহ" উপাধি ধারণপূর্ব্বক আপনাকে

স্বাধীন বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া বাঙ্গালার অনেক নগর ও জনপদ অধিকার করিয়া লন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের সমস্ত প্রদেশ (রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত) তাঁহার দখলে আসিয়া যায়। নবাব এবরাহিম খাঁ তখন বাঙ্গালার সুবাদার, ঢাকা তখন বাঙ্গালার রাজধানী। নবাব ভাগীরথীর পূর্ব্বদিক্ রক্ষার ব্যবস্থা করিলেও পশ্চিমদিকে বিদ্রোহীর গতিরোধে সমর্থ হইলেন না।

রহিমের বিদ্রোহাচরণ সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহার উপদ্রব নিবারণার্থ আপন পৌত্র শাহজাদা আজিমুশ্শানকে ১১০৮ হিজরীতে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী-পদে বরিত ও খাজা আনোয়ারকে তাঁহার মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করেন।

কুমার আজিমুশশান বাঙ্গালায় আসিয়া অগ্রে বর্দ্ধমানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। বাঙ্গালায় পদার্পণ করিয়াই, রহিমের বিদ্রোহ দমন করা তাঁহার প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু, জমিদার ও প্রধানবর্গের আদর-অভ্যর্থনা ও নূতন সুবাদারীর নজরানা, তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট ও মোহ-নিদ্রাভিভূত করিয়া ফেলিল। বর্দ্ধমানের অদূরে রহিমের রণভেরী বাজিয়া উঠিলে, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। রহিম বর্দ্ধমান আক্রমণে উদ্যত, তদবস্থায় ঝটিতি তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য-চালনা করা সুবাদারের প্রধান কর্ত্তব্য হইলেও, তিনি তাহা না করিয়া অর্দ্ধোন্মীলিত চক্ষু মার্জ্জন করিতে করিতে দূত-হস্তে রহিমের নামে এক পত্র দিলেন। পত্রে রহিমের অপরাধ মার্জ্জনা করিবার আশা দেওয়া হইল ও তাঁহাকে বর্ত্তমান যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে বলা হইল এবং পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে শাহি-দরবারের কোন উচ্চতম পদে অভিষিক্ত করিবার লোভ-লালসাও প্রদর্শন করা হইল। রহিম কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রণনিপুণ বীর; তিনি যুদ্ধে হতবল বা হতোৎসাহ হইলে, শাহজাদার পত্র তাঁহার নিকট মূল্যবান্ হইতে পারিত। ফলে শাহজাদার পত্র পাঠে তাঁহাকে দুর্ব্বল-বোধে রহিম বর্দ্ধিত-সাহস ও গর্ব্বস্ফীত হইলেন। তাঁহার পত্রের লিখিত উত্তরও দিলেন না। দূতকে এইমাত্র বলিয়া দিলেন, “শাহজাদার প্রধান মন্ত্রী খাজা আনোয়ার যদি এখানে আসিয়া পত্র-সমর্থন করেন, তাহা হইলে রহিমশাহ, বাদশাহের আনুগত্য-স্বীকার করিবে।”

সাদাসিধা শাহজাদা একে ত রহিমকে পত্র দিয়াই দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উপর আবার ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলেন। শত্রুর মুখের কথায় নির্ভর করিয়া ও তাহার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া এবং মোগলবংশের সম্মান-সম্ভ্রমের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কয়েকটিমাত্র রক্ষি সমভিব্যাহারে খাজা আনোয়ারের ন্যায় সম্মানিত রাজপুরুষকে, রাজদ্রোহী পাঠান রহিমের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আদেশ দিলেন।

খাজা আনোয়ার রাজনীতি-বিশারদ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও, উদারস্বভাব ও সাধু প্রকৃতি ছিলেন। তাহার উপর অতিমাত্রায় প্রভুর আজ্ঞাবাহীও ছিলেন। সুতারাং রহিমের আচরণে অসরলতা ও শত্রুতার নিদর্শন স্পষ্ট প্রদর্শিত হইলেও, খাজা প্রভুর আদেশ রক্ষাহেতু বিনা বাক্যব্যয়ে কতিপয়মাত্র রক্ষী লইয়া শত্রু শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং শিবিরসমীপবর্ত্তী হইয়া সহসা শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করা অনুচিতবোধে বাহিরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবার জন্য রহিমকে আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু বলদর্পিত রহিম অহঙ্কারবশতঃ শিবিরের বাহির হইলেন না, বরং খাজা শিবিরের ভিতর গিয়া সাক্ষিগণের সম্মুখে সন্ধি-সর্ত্ত স্থিরীকৃত করুন, এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। রাক্ষস-প্রকৃতি রহিম যে, তখন নিরীহ খাজার শোণিত-পিপাসু হইয়াছেন, তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া তদ্দণ্ডেই নগরাভিমুখ হইলেন। খাজাকে প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া রহিম ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া সসৈন্যে শিবির বাহির হইয়া খাজা ও তাঁহার রক্ষিবর্গকে আক্রমণ করিলেন। খাজা বা তাঁহার সহচরগণ কেহই রণবেশে সজ্জিত ছিলেন না, অথচ রহিম ও তাঁহার সেনাগণ সশস্ত্র, কাজেই তাঁহার শত্রুর আক্রমণরোধে সমর্থ হইলেন না, মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাদিগকে শত্রুর অস্ত্রমুখে প্রাণ সমর্পণ করিতে হইল।

আজিমুশ্‌শান ১১০৮ হিজরীতে সুবাদরী-পদে বরিত হওয়া ও খাজা আনোয়ার তাঁহার প্রধান অমাত্য থাকা ইতিহাস প্রমাণ দিতেছে। সুবাদার ও মন্ত্রীর রাজধানী হইতে বাহির হইয়া বর্দ্ধমানে আসিতে কিছুদিন বিলম্বও হইয়াছিল। এমত অবস্থায় খাজার মৃত্যুর সন ইতিহাসে দেখিতে না পাওয়া গেলেও উপরিকথিত পারসি-কবিতা-চরণের সংখ্যানির্দ্দিষ্ট ১১০৯ হিজরী যে তাঁহার মৃত্যুর প্রকৃত সন ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এখন ১৩৩৩ হিরজী চলিতেছে; অতএব খাজার মৃত্যু আজি হইতে ন্যূনাধিক ২২৪ বৎসর হইল, সংঘটিত হইয়া গিয়াছে।

আজকাল খাজার পুত্র-বংশে কোন সন্তানই বর্ত্তমান নাই, এখনকার মতওল্লিগণ তাঁহার বংশধরদিগের কন্যাবংশের সন্তান হইতেছেন। বর্ত্তমান মতওল্লিগণের মধ্যে মুন্সেফ মৌলবী মের্জ্জা বেদার বক্ত্ সাহেব ও ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী মের্জ্জা মেগোস্তা বক্ত্ সাহেব এবং সৈয়দ মোজতরা হোসেনের বাসস্থান বর্দ্ধমান নগরে আছে। অপর মতওল্লি টিপু সুলতানবংশীয় শাহজাদা নসিরদ্দীন ও শাহজাদী মাহতাবুন্‌নেসা বেগম কলিকাতা টালিগঞ্জে বাস করিয়া থাকেন।

আওরঙ্গাবাদ

আকছার-উদ্দিন আহম্মদ

মুরশিদাবাদ জেলায় আওরঙ্গাবাদ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই স্থানে পূর্ব্বে শাসন-বিষয়ক মহকুমা ছিল, কিন্তু ঠিক কখন যে এখানে মহকুমা স্থাপিত হয়, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসরাতীত হইল, এইস্থান হইতেই মহকুমা উঠিয়া জঙ্গিপুরে স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রামটী এখন লোক-বসতি-পরিত্যক্ত, প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ। এই জঙ্গলের মধ্যে কতিপয় মুসলমান সাধুর সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইল। একটীর নিকট বৃহৎ তিন খণ্ড প্রস্তর পতিত রহিয়াছে, তিন খানার উপরেই আরবীয় বর্ণমালাযোগে আরবী-ভাষায় কোরাণ ও হাদিসের কতিপয় শ্লোক লেখা আছে। একখানিতে লেখা আছে, "কি আহ্‌দে সোলতানল ময়াজ্জম অল মোকাররম আলাউদ্দিন ও বেলাউদ্দিন (ছানাউদ্দিন) আবুল-মজাফ্‌ফার হোসেন শাহ সোলতান বেল্লে সৈয়দ শরকথাল হোমায়নী খাল্লাদাল্লাহো মোলকোহু অ সোলতানতোহু" অর্থাৎ বৃহৎ ও মাননীয় সোলতান আবুলমজাফ্‌ফর আলাউদ্দিন ও বেলাউদ্দিনের (ছানাউদ্দিনের) সময়ে হোমায়নীবংশসম্ভূত সৈয়দ শরফের পুত্র হোসেন সাহ সোলতান ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন। তৎপর অপর স্থানে লেখা আছে ১৫০৪ খৃঃ (৯০৯ হিজরী) সন।

অন্য সমাধিতে দুইখানা প্রস্তর ছিল, তাহার একখানা অর্দ্ধবৃত্তাকার আর্চ্চবিশিষ্ট। এই খানা জঙ্গিপুরের কোন হাকিমবাবু লইয়া গিয়াছেন। অপরখানা পতিত আছে, তাহার উপর পরিস্কাররূপে লতা-পাতা ও পুষ্প খোদিত রহিয়াছে। অপর সমাধিতে তিন খানা প্রস্তর পতিত আছে, তাহার উপরও লতা-পাতা-পুষ্প অঙ্কিত ও আরবী অক্ষরে লেখা আছে, কিন্তু পাঠ করিতে পারিলাম না। প্রস্তরগুলি গাঢ় ধূসরবর্ণ; একখান মাপিয়াছিলাম, দীর্ঘ চারি ফুট দশ ইঞ্চি, প্রস্থ ২৪।।০ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি। শুনিলাম, আরও অনেক প্রস্তর ছিল, তাহা কে কোথায় লইয়া গিয়াছে, নির্ণয় করা যায় না।

এইস্থানে কতিপয় বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমানের বাস ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ "কাজী" উপাধিধারী ছিলেন। বোধ হয়, ইঁহাদের বংশের কেহ "কাজী" নামধেয় বিচারকর্ত্তার আসনে সমাসীন ছিলেন। এখনও তাঁহাদের বংশের কেহ কেহ অতি দরিদ্রাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন।

এইস্থান হইতে প্রায় আড়াই মাইল পশ্চিমে দুর্গাপুর গ্রাম। এই গ্রামে অতি প্রাচীন এক দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। দুর্গটী প্রায় দশ বিঘা ভূমির উপর স্থিত। তাহার বাহিরের পরিষ্কার চিহ্ন এখন স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। দুর্গটি এখন ইষ্টক-স্তূপমাত্র; মধ্যে একটি পুষ্করিণীর চিহ্ন বিদ্যমান আছে; ইহার পূর্ব্বোত্তর পার্শ্বে একটী বৃক্ষের নীচে এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর পড়িয়া আছে; তাহাতে কতিপয় দেব-দেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। স্থানীয় অশিক্ষিত লোক এই প্রস্তরখণ্ড পূজা করিয়া থাকে। শুনিলাম, শনি ও মঙ্গলবারে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। পরিখার বাহিরে আরও কতকগুলি বৃহদাকারের প্রস্তরখণ্ড আছে। সে গুলিতেও লতা-পাতা ইত্যাদি অঙ্কিত দৃষ্টিগোচর হইল। এগুলি দেখিলে তোরণের প্রস্তর বলিয়াই অনুমিত হয়। এক স্থানে একটী সুড়ঙ্গ-পথ দেখিতে পাইলাম, কিন্তু ভিতরে যাইবার উপায় নাই।

এই দুর্গাভ্যন্তরস্থ পুষ্করিণীকে লোকে "জিয়ন কুণ্ড" বলে। এ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, একদা গৌড়েশ্বর এই দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে এই দুর্গাধিপতির যত লোক হত হইত, তাহাদের মৃত দেহগুলিকে এই পুষ্করিণীতে ডুবাইলে "জয় কালী" বলিয়া জীবিত হইয়া উঠিত। সত্য-মিথ্যা ভগবান্ জানেন।

শ্যামারূপার গড়

মহারাজ-কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

কিঞ্চিন্ন্যূন প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পালবংশীয় গৌড়েশ্বরগণের সেন-উপাধিধারী সামন্ত রাজগণ শ্যামারূপার গড়ের অধীশ্বর ছিলেন। ইহার অপর নাম ত্রিষষ্ঠীগড় ও ঢেকুর। সেন-রাজগণের অধিকৃত ও পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় "গড়" সেনপাহাড়ি নামেও অভিহিত হইত। গড়ের নামানুসারে অজয়ের উভয় তটবর্ত্তী কিয়দংশ ভূভাগ সেনাপাহাড়ি পরগণা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেনপাহাড়ির উত্তরে বীরভূমি-গৌরব বঙ্গ-কবীন্দ্র জয়দেবের পুণ্যনিকেতন 'কেন্দুবিল্বধাম'। মধ্য-ব্যবধান-পথে প্রবাহিত অজয়ের পবিত্র-নীর, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর, বীরত্ব ও কবিত্বের লীলাক্ষেত্র সেনপাহাড়ি ও কেন্দুবিল্বের পুণ্য-স্মৃতি বহন করিয়া আজিও কৃতার্থ হইতেছে।

কবিবর ঘনরাম-বিরচিত "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" হইতে 'কনকসেন', 'কর্ণসেন', 'লবসেন' বা 'লাউসেন' এবং 'চিত্রসেন' সেনবংশীয় এই চারি জন নৃপতিকে সেনপাহাড়ির অধীশ্বরস্বরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।[১] কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিয়া 'ইছাই ঘোষ' নামক একজন গোপ এই গড়ে কিছুদিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কর্ণসেন-পুত্র লাউসেন তাহাকে বিনষ্ট করিয়া পৈতৃক-রাজ্যের উদ্ধারসাধন করেন। প্রধানতঃ এই কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ধর্ম্মমঙ্গল মহাকাব্য বিরচিত হইয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গল হইতে অবগত হওয়া যায়, ইছাই ঘোষ সেনপাহাড়ির 'ত্রিষষ্ঠীগড়' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'ঢেকুর' নাম প্রদান করিয়াছিলেন এবং গড়ে শ্যামারূপা দেবীর সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[২] শ্যামারূপা নাম-সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। নামটী

১. ধর্ম্মমঙ্গল একাদশ সর্গে হস্তীবধ পালায় লাউসেন আত্ম-পরিচয় দিতেছেন—

"সুশীল সজ্জন সত্যবুদ্ধি কর্ম্মকারে। পরম পীরিতে পরিচয় দিল তারে।
ময়না নগরবাসী সাগর-সমীপ। পিতামহাশয় মোর যার নরাধিপ।
পিতামহ ঠাকুর 'কনকসেন রায়'। যার যশ-কীর্ত্তি জগত জুড়ি গায়।।
ধন্য পিতা 'কর্ণসেন রায়' নৃপমণি।"

অন্যত্র উনবিংশ সর্গে ৪৪৫ সংখ্যক শ্লোক—

"আনন্দে আনন্দ বৃদ্ধি সিদ্ধি শুভাদৃষ্ট।
পুত্র চিত্রসেন তার হইল ভূমিষ্ঠ।"

২. ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে সীতারামপুর ষ্টেশনের পরবর্ত্তী সালানপুর হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে 'ভাঁড়ার পাহাড়' সান্নিধ্যে শ্যামারূপা দেবী 'কল্যাণেশ্বরী' নামে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন, প্রবাদ—শেখরভূমের রাজা কল্যাণশেখর বল্লালসেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া দেবীকে যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাকে উপরিউক্ত স্থানে স্থাপন করেন। তদবধি শ্যামারূপা দেবী কল্যাণেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন।

একটু অদ্ভুত রকমের হইলেও ইহার মধ্যে একটী অর্থ-সঙ্গতি থাকার বিশেষ সম্ভব, এই অনুমানেই তাহা বিবৃত করিতেছি।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিরচিত বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতা হইতে পৌণ্ড, বঙ্গ, উপবঙ্গ, সমতট, বর্দ্ধমান, সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তি বঙ্গদেশের এই কয় বিভাগের নাম প্রাপ্ত হইতেছি। এখন অন্বেষণ করিতে হইবে, "সুহ্ম" বলিতে কোন স্থানকে বুঝাইত? অজয়ের উভয় তটভূভাগই তো রাঢ়ের অন্তর্গত। রাঢ়দেশ সুহ্ম হইলে ইহারই মধ্যে তাঁহার রাজধানী থাকিবে। আমাদের মনে হয়, শ্যামারূপার গড়ই সুহ্মের রাজধানী ছিল এবং কর্ণসেন, লাউসেন, প্রভৃতি হর্ষ-চরিত-বর্ণিত দেবসেন বা তদ-ভ্রাতারই বংশসম্ভূত। সুহ্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী সুহ্মারূপাই কালে শ্যামারূপা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদনুসারে গড় ও শ্যামারূপার গড় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মপাল-পুত্র গৌড়েশ্বর বলিতে আমরা ত্রিভূবনপালকে ধরিয়া লইতে পারি। খুব সম্ভব, লাউসেন ইঁহারই শ্যালিকাপুত্র ছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলে "ইঁহার নাম অনুল্লিখিত হইবার হেতু এই হইতে পারে যে, দেবপাল ও ত্রিভূবন পালকে লইয়া ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ হয়তো গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। হইতে পারে, মন্ত্রী দর্ভপাণি ও সেনাপতি জয়পালের সাহায্যে দেবপাল যখন গৌড়েশ্বর হন, লাউসেনের কার্য্য তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় লাউসেনের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন করিতে গিয়া তাঁহার প্রভুকে গৌড়েশ্বর আখ্যায় অভিহিত করত ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ সকল গোলের হাত এড়াইয়াছেন। ত্রিভূবনপাল ও দেবপালের রাজ্য-গ্রহণের জন্য পরস্পর বিবাদ হওয়া অসম্ভব নহে। ঐরূপ ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় মাণিক গাঙ্গুলী লিখিয়াছেন—

'ধর্ম্মপাল রাজা ম'লো অরাজক দেশ'

অন্যথায় দুই পুত্র থাকিতে রাজ্য অরাজক হয় কিরূপে বুঝা গেল না। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা অনুমান করিয়াছি যে, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে লাউসেন বর্ত্তমান ছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেনের বীরত্ব-কাহিনী যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি দেবপাল বা ১ম মহীপালের সমসাময়িক হইলে বা দেবপালের পক্ষে থাকিলে আবিষ্কৃত পালরাজগণের তাম্রশাসন বা শিলালিপিগুলির কোন না কোনটীতে তাঁহার নাম পাওয়া যাইত।

লাউসেনকে ১ম মহীপালের সমসাময়িক ধরিতে আমাদের অনেকগুলি আপত্তি আছে। মোটামুটী একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। ধর্ম্মমঙ্গল পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইছাই ঘোষ একজন প্রবল-পরাক্রান্ত বীর নৃপতি ছিলেন। তাঁহার স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বলবতী ছিল। দুর্ভেদ্য দুর্গ, অপরিমেয় সৈন্যবল ও তৎকালোপযোগী যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতির তাঁহার অভাব ছিল না। এহেন ইছাই ঘোষ ১ম মহীপালের সময় বর্ত্তমান থাকিলে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় গিরি-লিপিতে তাঁহার

নাম যে নিশ্চিতই স্থান পাইত, তাহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায়। যেহেতু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া রাজেন্দ্র চোল তৎসাময়িক বঙ্গের প্রায় সমস্ত নবপতিকেই যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সকলেরই বিষয় তিরুমলয়-গিরি-লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্যামারূপার গড়ে সে সময়ে ইছাই ঘোষ বর্ত্তমান থাকিলে দক্ষিণ-রাঢ় অপর-মন্দার বা গড়-মন্দারণে রণশূরকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গে বা উত্তর-রাঢ়ে গমন করা রাজেন্দ্র চোলের পক্ষে নিরাপদ হইত না। দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোলও ইছাই ঘোষকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন না এবং গৌড়েশ্বরের সেনা-পরাভবকারী স্বাধীনচেতা ইচ্ছাই ঘোষও রাজেন্দ্র চোলের আস্ফালন নীরবে সহ্য করিতেন না। রণশূরের সহিতও মহীপালের সদ্ভাব ছিল না। বরং বৈরভাবই ছিল। এরূপক্ষেত্রে ইছাই বর্ত্তমান থাকিলে প্রতিবেশী গড়-মন্দারণ-অধিপতি রণশূরের সহিত তাঁহার সখ্যতা একরূপ অনিবার্য্য হইয়া উঠিত। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলাদিতে তাহার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। তজ্জন্য আমরা ধর্ম্মমঙ্গলের মতে লাউসেন ও ইছাইকে ১ম ধর্ম্মপাল পুত্রের সমসাময়িক বলিয়াই অনুমান করিতেছি।

ইছাই'এর দেউল বর্ত্তমান রহিয়াছে।[৩] দেউল, বর্ত্তমানে বিগ্রহশূন্য।

"চৌদিকে পাহাড় পুরী রক্ষিবার
দুর্গম গহন কাটী
করিয়া চত্বর বসালো নগর
রাজার বসতবাটী

নগর বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রায় দশ মাইল স্থলব্যাপী ধ্বংস-স্তূপসমূহ এখন তাহার অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। কঙ্কাল-সম্বল অতীতের এই গৌরব-সমাধি একটা

৩. অজয়ের দক্ষিণতটে ইছাই'এর দেউল এবং উত্তরতটে তাহারই ঠিক সমসূত্রপাতে লাউসেন তলাও। ইছাই'এর সহিত যুদ্ধে আসিয়া লাউসেন তথায় শিবির সন্নিবেশ করেন। লাউসেন-কুণ্ড নামে একটী কূপ ও হাঁটুগাড়ি নামক দুইটী পুকুরের বিলুপ্তাবশেষ লাউসেন-তলাও'এর স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া ডোম জাতি প্রতি বৎসর ১৩ই বৈশাখ এই স্থানে লাউসেনের সেনাপতি তাহাদের স্বজাতি কালুবীরের পূজা করিয়া থাকে। লাউসেন-তলাও'এর কিছুদূরে অজয়ের দক্ষিণতটে "কাঁদুনেডাঙ্গা" নামক স্থানে লাউসেন ও ইছাই'এর যুদ্ধ হইয়াছিল। স্থলটী অজয়-গর্ভে বিলীন হইলেও লোক-চক্ষুর অন্তরাল হইতে পারে নাই। স্থানীয় কৃষকগণ পর্য্যন্ত সেই স্থান দেখাইয়া থাকে এবং অশ্রুপূর্ণ-নয়নে আবৃত্তি করে—

"শনিবার সপ্তমী সম্মুখে বারবেলা
আজি রণে যেওনারে ইছাই গোয়ালা"

প্রবাদ শ্যামারূপা দেবী কর্ত্তৃক ইছাই'এর উপর ঐরূপ দৈববাণী হইয়াছিল।

স্তব্ধ হাহাকার বক্ষে চাপিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কোটাল-পুকুর, চৌকি গড়ে, লোহাটার পুরী ও গড়-গোপালপুর প্রভৃতি সেনা-নিবাস্ এখন নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কোটাল-পুকুর, দক্ষিণে চৌকিগড়ে ও লোহাটার-পুরী, পশ্চিমে গড়-গোপালপুর ও খয়ড়াপাড়ার সেনা-নিবাস গড়ের সীমান্ত রক্ষা করিত। লোহাটার-পুরী, এখন লোয়াগুড়ি নামে খ্যাত। তথাকার "সরকার" উপাধিধারী কায়স্থগণ বলেন, "আমাদেব পূর্ব্বপুরুষ রাধানাথ সরকার 'মহামদার' অত্যাচারে গৌড় হইতে পলাইয়া আসিয়া ইছাই এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইছাই তাঁহার নিকট গৌড়ের অনেক গুপ্ত-রহস্য অবগত হইয়া তাঁহাকে কিছু জায়গীর প্রদান করেন। এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার সেনাপতি লোহাটার উপর সমর্পণ করেন।" রাধানাথ সরকারের বাসস্থান লোহাটার নামানুসারে লোহাটার-পুরী বর্ত্তমানে "লোয়াগুঁড়ি" নামে বিখ্যাত। সরকারগণ প্রায় ২৫ পুরুষ ধরিয়া লোহাটার-পুরীতে বাস করিতেছেন।

গড়ের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব্বদিক্ ভয়ানক উচ্চ, দক্ষিণদিকের সমতল ভূমি বহুদূরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণদিকেই গড়ের সিংহদ্বার ছিল। ইছাই'-এর সেনাপতি লোহাটা বজ্জরের থানাও তাই দক্ষিণ দিকে সংস্থাপিত হইয়াছিল। গড়ের উত্তরে রক্তনালা নামক পরিখা ও দুইটী মুরুচার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই রক্তনালা শ্যামারূপার গড়ের নীচে ঠাক্‌রুণ পুষ্করিণী হইতে বহির্গত হইয়া দৈর্ঘ্যে পূর্ব্বপ্রান্তের সেনা-নিবাস কোটালপুকুর পার হইয়া গিয়াছে। গড়ের মধ্যে একটী সুবৃহৎ বহু পুরাতন তেঁতুলগাছ "যষ্ঠীতলা" নামে বিখ্যাত। ত্রিযষ্ঠীগড় নামের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা জানা যায় না। তবে কর্ণসেনকে ঢেকা মরিয়া দূর করিয়া দেওয়ায় গড়ের নাম ঢেকুর হইয়াছিল; এ অনুমান বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না।

ধর্ম্মমঙ্গল হইতে জলন্দার রাজা জল্লাদশেখর ও ব্যাঘ্র-ভূপতি কামদলের নাম পাওয়া যায়। শুনিতে পাই, গৌড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে শার্দ্দূল শর্ম্মা নামে এক রাজা ছিলেন। জল্লাদশেখরের সহিত শেখরভূমের এবং কামদলের সহিত শার্দ্দূল শর্ম্মার সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে।

প্রতিহার-রাজ নাগভটের বাহুক ধবলনামক যে মহাসামন্তের হস্তে ধর্ম্মপাল বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন, ৫৭৪ বলভী সংবতে ৮৯৩ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ মহাসামন্ত অবনীবর্ম্মার তাম্রশাসনে যাহার পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে—

" অজনি ততোকি শ্রীমান বাহুকধবলো মহানুভবো যঃ
ধর্ম্ম ভবন্নপি নিত্যং রণোদ্যতো নিনশাদ ধর্ম্মং"

তাহার সহিত ধর্ম্মমঙ্গলের কর্পূরধবলের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

ধর্ম্মমঙ্গল কবি-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া তদনুসারে শ্যামারূপার গড় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ অনুসন্ধান করিলে পালরাজ-ইতিহাসের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। আমরা এবিষয়ে ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

"রাজার পোতা" ও "বারাসত"

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ রায় এম্., এ. বি, এল

বর্দ্ধমান হইতে প্রায় ১৪ চৌদ্দ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে মাধবপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। এই "মাধবপুর" "খটনগর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। খটনগর গ্রামের পূর্ব্বদিকে "পাণ্ডুক" নামে একখানি গ্রাম আছে। কথিত আছে, পাণ্ডুক গ্রামে "পাণ্ডু" নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে এই গ্রামের নাম "পাণ্ডুক" হইয়াছে। পাণ্ডুক গ্রামখানি বৃহৎ এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। খটনগর গ্রাম ক্ষুদ্র এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমির উপর অবস্থিত।

পাণ্ডুক গ্রামের উত্তর-পশ্চিম অংশে এক উচ্চ ভূভাগ আছে। এই ভূখণ্ড "রাজার পোতাডাঙ্গা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইস্থানে রাজার প্রাসাদ ছিল ইহাই জনশ্রুতি। খটনগর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে "বারাসত" নামে এক সমতল ভূভাগ আছে। কথিত আছে, এই বারাসতে উক্ত রাজার ধর্ম্মাধিকরণ, কার্য্যালয় ও সৈন্যবাস ছিল।

"রাজার পোতাডাঙ্গা"র সকল অংশই প্রাচীন ইষ্টকপূর্ণ। অনেকস্থান খননের পর দৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকল স্থানের নিম্নে শ্রেণীবদ্ধভাবে ইষ্টক অবস্থিত আছে। সেই সকল ইষ্টক দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে আধুনিক ইষ্টক অপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহাদের বেধ অপেক্ষাকৃত অল্প। অনেক ব্যক্তি রাজার-পোতার ইষ্টক দ্বারা গৃহাদির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। পাণ্ডুক-গ্রামনিবাসী ৺গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য উক্ত স্থানের ইষ্টক লইয়া "কালীবাড়ী" নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই কালীবাড়ী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

উক্ত "রাজার পোতার" যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, সেই স্থানেই অধিক পরিমাণে ইষ্টক পাওয়া যায় এবং অনেক বহুমূল্য প্রস্তরখণ্ডও দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেরূপে ইষ্টক-সকল সজ্জিত আছে, তাহা দেখিয়া সহজেই প্রতীতি হয় যে, উক্তস্থানে পূর্ব্বে কোনও ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাসাদ ছিল।

গত ১৩১৮ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ অজয়নদে প্রবল বন্যা হয়। সেই বন্যার প্রভাবে অজয়নদের উত্তরদিকের "বান্ধের" কোনও কোনও স্থান ভগ্ন হয়। বন্যার স্রোত প্রবলবেগে পার্শ্ববর্ত্তী ও নিকটস্থ গ্রামে প্রবেশ করিতে থাকে। রাজার পোতার অনেক অংশ উক্ত বন্যার স্রোতে স্খলিত হয়। পাণ্ডুক গ্রামস্থ কোনও কোনও ব্যক্তি অনেক ধাতুনির্ম্মিত গোলাকৃতি দ্রব্য প্রাপ্ত হয়েন। সেই সকল দ্রব্য পরিষ্কৃত করিয়া তাঁহারা পরে জানিতে পারেন, সেগুলি সুবর্ণ-মুদ্রা। আমি গত সন ১৩১৮ আশ্বিন মাসে পাণ্ডুক-

গ্রামনিবাসী রাখাল মেটের নিকট সুবর্ণ-মুদ্রা ২১্ একুশ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছি। রাখাল মেটে ঐ বন্যার সময় উক্ত সুবর্ণ-মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল বন্যার পরদিনই ঐ রাজার পোতায় ঐ মুদ্রা এবং আরও কয়েকটী মুদ্রা তাহার হস্তগত হইয়াছিল। রাখাল আমাকে উক্ত মুদ্রাটী বিক্রয়ের পূর্ব্বে অবশিষ্ট মুদ্রাগুলি সামান্য মূল্যে স্বর্ণকারগণকে বিক্রয় করিয়াছিল। আমি উক্ত সুবর্ণমুদ্রাটী যত্নপূবর্বক রক্ষা করিয়াছি। পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, ঐ মুদ্রাটীর এক পৃষ্টে এক রাজমূর্ত্তি এবং অপর পৃষ্ঠে লক্ষ্মীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। রাখালবাবুর মতে মূর্ত্তির নিম্নভাগে গুপ্তাক্ষরে "নরেন্দ্রগুপ্ত" লিখিত আছে।

রাজার-পোতার অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে এক পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি আছেন। কথিত আছে, কালাপাহাড় ঐ দেবীমূর্ত্তির পাদদেশ কর্ত্তন করিয়াছিলেন। কর্ত্তনের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উক্ত দেবীমূর্ত্তি বারাহী-চণ্ডী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রতিদিন উক্ত "বারাহীচণ্ডীর" পূজা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর শারদীয়া-মহানবমীর দিন বহু ছাগ, মেষ, মহিষাদির বলিদান হইয়া থাকে এবং পূজা বিশেষ ঘটার সহিত হইয়া থাকে। বর্দ্ধমানমহারাজের নামে পূজার সংকল্প হইয়া থাকে। উপরিউক্ত দেবীর পূজা ও বাৎসরিক পূজার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে। কথিত আছে, বদান্য মহানুভব বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র "বারাহী-চণ্ডীর" সেবা-পূজার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ নিষ্কর ভূমির উপযুক্ত সনন্দও দিয়াছিলেন।

রাজার-পোতার দক্ষিণদিকে "রস-খালা" নামে এক পুষ্করিণী আছে। গত সন ১৩০২ সালে উক্ত পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় ঐ পুষ্করিণীর মধ্য হইতে আর একমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। তাহাও পাষাণময়ী-মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তির স্থানে স্থানে ক্ষত হইয়াছে এবং কোন কোন অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ধীমান ও বীতপাল

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ কুমার

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধ-ভিক্ষু লামা তারানাথ 'বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যই সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল তথ্যের সত্যাসত্য এখনও নিরূপিত হয় নাই। তারানাথের ইতিহাস তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত, জর্ম্মানদেশীয় পণ্ডিত শিফ্‌নার (Schiefner) এই গ্রন্থ জর্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তারানাথ আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ আশ্রয়ভূমি গৌড়-মগধের প্রাচীন ইতিহাস-সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ইহার মধ্যে কতকগুলি সত্য এবং কতকগুলি মিথ্যা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। পালরাজগণের আবির্ভাবকালের পূর্ব্বে গৌড়দেশে যে অরাজকতা হইয়াছিল তাহা সত্য; কারণ পালবংশের প্রথম রাজা গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে বলা হইয়াছে যে, প্রজাপুঞ্জ অরাজকতা দূর করিবার জন্য গোপালদেবকে রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করাইয়াছিল। তারানাথের গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং তারানাথের গ্রন্থের এই অংশটুকু সত্য। তারানাথ বলিয়াছেন যে, প্রথম মহীপালদেব ৫২ বৎসর ও রামপাল ৪৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারানাথের গ্রন্থের এই অংশ সত্য হইলেও হইতে পারে; কারণ মহীপালদেবের ৪৮ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একাধিক পিত্তল-মূর্ত্তি এবং রামপালের ৪২ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একাধিক পিত্তল-মূর্ত্তি এবং রামপালের ৪২ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং মহীপাল ৫২ বৎসর এবং রামপাল ৪৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। পক্ষান্তরে যে পালরাজবংশ বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ আশ্রয়দাতা, যাঁহাদিগের অধিকারে বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি মহাযানের শাখাসমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল, তারানাথ সেই পালরাজবংশের প্রকৃত বংশ-লতা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তারানাথ বলিয়াছেন যে, দেবপাল ধর্ম্মপালের পিতা ও যক্ষপাল রামপালের পুত্র। কিন্তু খোদিত-লিপি ও তাম্রশাসনের প্রমাণ হইতে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা গিয়াছে যে, দেবপাল ধর্ম্মপালের পুত্র এবং যক্ষপাল জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাঁহার সহিত পালরাজবংশের কোনই সম্পর্ক ছিল না। দিনাজপুর জেলায় মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত মদনপালদেবের তাম্রশাসনে পালরাজগণের সম্পূর্ণ বংশলতা পাওয়া গিয়াছে। ইহার সহিত তারনাথ কর্ত্তৃক সংগৃহীত বংশলতার তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তারানাথের ইতিহাসে বহু ভ্রমপ্রমাদ আছে।

সুতরাং ইহা স্থির যে, বাঙ্গালাদেশের কুলগ্রন্থের ন্যায় তারানাথের ইতিহাসের অনেক কথাই ভিত্তিহীন এবং উপযুক্ত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণদ্বারা সমর্থিত না হইলে, তারানাথের উক্তিও ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না। তারানাথ বলিয়া গিয়াছেন যে, মগধবাসী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্রভদ্র-প্রণীত একখানি গ্রন্থে রামপালের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ প্রদত্ত আছে; ক্ষত্রিয়-জাতীয় পণ্ডিত ইন্দ্রদত্ত-প্রণীত

বুদ্ধপুরাণ নামক গ্রন্থে সেনবংশের প্রথম চারিজন রাজার ইতিহাস সঙ্কলিত আছে। দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থদ্বয়ের একখানিও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বাঙ্গালাদেশের একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান-ঐতিহাসিক তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন। মালদহ নিবাসী রিয়াজ-উস্-সালাতীন্ প্রণেতা তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থানে বলিয়াছেন "বচন্দ কিতাবে দীদা অম্" 'কোন' গ্রন্থে দেখিয়াছি। কোন গ্রন্থকার এই সকল গ্রন্থের নাম দেন নাই এবং অদ্যাবধি কোনও ইতিহাসে এই সকল নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই; কিন্তু ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত শত শত আরবি ভাষায় লিখিত শিলালিপি দ্বারা রিয়াজ-উস্-সালাতীন-লেখকের উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। তারানাথের অনেক উক্তির বিরুদ্ধবাদী প্রমাণই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তারানাথের উক্তির উপরে নির্ভর করিয়া ভারতশিল্পের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ভিন্সেন্ট স্মিথ্ বলিয়াছেন, "নাগার্জ্জুনের সময়ের নাগজাতীয় শিল্পিগণের নিদর্শনসমূহ (প্রস্তর অথবা ধাতুমূর্ত্তি এবং চিত্র) বরেন্দ্রবাসী ধীমান এবং তৎপুত্র বিৎপালো (বীতপাল) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বা অঙ্কিত নিদর্শনসমূহের তুলনায় কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। ইঁহারা দেবপাল ও ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। পিতাপুত্র উভয়েই প্রস্তর ও ধাতুমূর্ত্তি নির্ম্মাণে এবং চিত্রাঙ্কণে দক্ষ ছিলেন। বিৎপালো (বীতপাল) বঙ্গদেশে বাস করিতেন এবং তিনি ধাতুমূর্ত্তি-নির্ম্মাণের পূর্ব্বদেশীয় রীতির শ্রেষ্ঠ (স্থাপয়িতা) বলিয়া গণিত হইতেন। মগধে তাঁহার চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতির বহু ছাত্র ছিল বলিয়া, তিনি পরবর্ত্তীকালে মধ্যদেশের প্রধান চিত্রকর এবং তাঁহার পিতা পূর্ব্বদেশের চিত্রকরগণের প্রধানরূপে গণ্য হইতেন।" তারানাথের ইতিহাসের "মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির উৎপত্তি" নামক চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে গৌড়ীয়শিল্প-সম্বন্ধে এই কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তারানাথের গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে, শিলালিপিতে বা তাম্রশাসনে ধীমান বা বীতপালের নাম পাওয়া যায় নাই। তথাপি গৌড়রাজমালার উপক্রমণিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন, "এই যুগে, বরেন্দ্রমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া (ধর্ম্মপালদেবের এবং দেবপালদেবের শাসন-সময়ে) ধীমান এবং তৎপুত্র বীতপাল গৌড়ীয়শিল্পে যে অনিন্দ্যসুন্দর রচনা-প্রতিভা বিকশিত করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ "শিল্পকলায়" সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহার সন্ধানলাভে অসমর্থ হইয়া, লেখকগণ এই যুগের মগধের এবং উৎকলের শিল্প-নিদর্শনকে মগধের এবং উৎকলের প্রাদেশিক শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন বলিয়াই ব্যাখা করিয়া আসিতেছেন।"

গৌড়-বিবরণের শিল্পকলাখণ্ড অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা যখন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন উক্ত চিত্রশালার যে তালিকা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সংগৃহীত মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে ধীমান-

নির্ম্মিত কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। এই তালিকা ইংরেজি ভাষায় লিখিত, ইহাতে সংগৃহীত মূর্ত্তিগুলির বিশদ বিবরণ প্রদত্ত আছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি যে কয়টি মূর্ত্তি ধীমাননির্ম্মিত মনে করিয়াছেন, তাহার কোনটিতেই খোদিতলিপি নাই; থাকিলে তালিকায় অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকিত। খোদিতলিপির অভাবে কোন একটি মূর্ত্তি কি প্রমাণের বলে ব্যক্তিবিশেষের শিল্পনিদর্শনরূপে গণ্য হইতে পারে, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। যাঁহারা বিজ্ঞানানুমোদিত ঐতিহাসিক রচনা-প্রণালীর গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের লেখনী হইতে কেমন করিয়া এই সকল কথা নিঃসৃত হইল! বলা বাহুল্য, ইহা ইতিহাস নহে। বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণদ্বারা সমর্থিত না হইলে তারানাথের উক্তিও ইতিহাস বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

রাঢ়ে ও বঙ্গে যে সমস্ত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি বরেন্দ্রভূমিতে আবিষ্কৃত মূর্ত্তি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বর্দ্ধমান জেলার অট্টহাস গ্রামে একটি প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। মূর্ত্তিটি পদ্মাসনে উপবিষ্টা জরাজীর্ণা শীর্ণা নারীমূর্ত্তি। মূর্ত্তির পাদপীঠে উপাসক ও উপাসিকার মূর্ত্তি এবং একটি অশ্ব বা গর্দ্দভের মূর্ত্তি দেখা যায়। ইহা কোন্ দেবতার মূর্ত্তি তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই; কিন্তু মূর্ত্তিটি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যিনি ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহার শিল্প-প্রতিভা অসাধারণ। দেবীর কটিদেশে একখানি বস্ত্র আছে, কিন্তু তাঁহার দেহের উর্দ্ধভাগ অনাবৃত। যেরূপ কৌশলের সহিত জীর্ণদেহের পঞ্জরগুলি এবং শীর্ণ স্তনদ্বয় খোদিত হইয়াছে তাহা দেখিলেই বোধ হয়, যে, দেবীর শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাঁহার শীর্ণ অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাস্যরেখা শিল্পীর অপূর্ব্ব কলা-কৌশলের নিদর্শন। দেবীর কণ্ঠে সূত্রহারে লম্বিত কবচ এবং মণিবন্ধে সামান্য বলয় ব্যতীত তাঁহার দেহে অন্য কোন অলঙ্কার নাই, তাঁহার কেশপাশ আলুলায়িত, গণ্ডদ্বয় শীর্ণ, তথাপি মূর্ত্তি হইতে যেন এক অপূর্ব্ব প্রভা বাহির হইতেছে। এই জাতীয় মূর্ত্তি, এমন অপূর্ব্ব শিল্প-নিদর্শন, ইতিপূর্ব্বে গৌড়ে, বঙ্গে, রাঢ়ে অথবা মগধে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমায় যে তিনটি পিত্তলময় মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেরূপ মূর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে বরেন্দ্র-ভূমিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রোডেনষ্টাইন বলিয়াছেন যে. পৃথিবীর কোন চিত্রশালাতেই এইরূপ অনিন্দ্যসুন্দর ভারতীয় ধাতুমূর্ত্তি নাই। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জেলার চুড়াইন গ্রামে একটি রজতের বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা এখন কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ভারতের অন্য কোন স্থানে এরূপ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। রাঢ়ে ও বঙ্গে আবিষ্কৃত এই সমস্ত নিদর্শনের প্রমাণের বিরুদ্ধে কেবল তারানাথের উক্তির উপরে নির্ভর করিয়া বরেন্দ্রবাসী

ধীমানকে গৌড়ীয় শিল্প-রীতির প্রতিষ্ঠাতা নির্দ্দেশ করা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর অনুমোদিত হয় নাই। গৌড়ীয় শিল্পের প্রকৃত ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। গৌড়, বঙ্গ, মগধ, অঙ্গ ও রাঢ়ে একই শিল্পরীতি প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত প্রদেশের মূর্ত্তিসমূহের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ না করিয়া কেবল প্রদেশমাত্রের মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া গৌড়ীয় শিল্পরীতির ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। পাল ও সেনবংশীয় রাজগণের নাম ও রাজ্যাঙ্কসমেত খোদিতলিপিযুক্ত, বহু প্রস্তর ও ধাতু-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির সাহায্যে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের কঙ্কাল অবলম্বন করিয়া গৌড়ীয় শিল্পরীতির ইতিহাস রচনা করিতে হইবে, নতুবা তাহা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসরূপে পরিগণিত হইবে না।

বঙ্গীয় স্থাপত্যের ধারা*

শ্রী ননীগোপাল মজুমদার

দ্বিতীয় যুগ

অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে মগধে পালরাজবংশের অভ্যুত্থান হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম প্রথম গোপালদেব। তিনি "মাৎস্য-ন্যায়" বিদূরিত করিবার নিমিত্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গৌড়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিব্বতীয় পণ্ডিত তারানাথের মতে তিনি ওদন্তপুরীর (বর্ত্তমান বিহারের) অনতিদূরে নালন্দায় একটি বৌদ্ধ-দেবালয় নির্ম্মাণ করেন।[১]

গোপালের পুত্রের নাম ধর্ম্মপাল। তিনি বহুদূর পর্য্যন্ত আপনার রাজ্য বিস্তৃত করিয়া ছিলেন। ধর্ম্মপাল উত্তরাপথ জয় করেন; ধর্ম্মপাল বিক্রমশিলা-বিহার নির্ম্মাণ করেন এবং উক্ত বিহারের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য অনেক ভূমি দান করেন।[২] শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক বিক্রমশিলা-বিহার নির্ম্মিত হয়। কানিংহাম বিক্রমশিলা বিহারকে নালন্দার (বর্ত্তমান বড়গাঁও) তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত শিলাও নামক গ্রামের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করেন।[৩] কিন্তু শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে মহাশয় বিবিধ প্রমাণবলে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন যে, প্রাচীন অঙ্গদেশে বিক্রমশিলা-বিহার অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান ভাগলপুরের চব্বিশ মাইল পূর্ব্বে যে পাথরঘাটা নামক স্থানে অসংখ্য বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহাকেই নন্দলালবাবু বিক্রমশিলার অবস্থিতি বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।[৪] ধর্ম্মপাল কোন্ সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "রাম-চরিতের" ভূমিকায় প্রমাণ করিয়াছেন, ধর্ম্মপাল ৭৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন।[৫] আপাততঃ ইহাই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

* প্রথম যুগ "পালবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বের স্থাপত্য"। এই অধ্যায় শুধু রাজাদের কাল-নির্ণয় এবং স্তূপাদির নামোল্লেখে পূর্ণ, কোন গৃহের বর্ণনা নাই। এজন্য ইহা হইতে পাঠক তৎকালীন স্থপতি-বিদ্যা-সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান-লাভ করিতে পারেন না। ছাপা হইল না। (সভাপতি)

১. Vasslief's Taranath p. 54 note.

২. Journal of the Buddhist Text Society, Vol. I Part I, p. II.

৩. Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol. VII, p 83

৪. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V 1909 pp. 7-9 also J.A.S.B. Sept. 1914.

৫. Memoirs A.S.B. 1910 Vol. III No. I. p. 5.

ধর্ম্মপালের পর দেবপাল মগধের রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেবপালের সময়ে উৎকীর্ণ ঘোষবাঁবার শিলাফলকে[৬] লিখিত আছে যে, উত্তরাপথের নগরহার (জালালাবাদের নিকটবর্ত্তী) হইতে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বীরদেব বুদ্ধগয়ায় আগমন করেন এবং দেবপালের অনুগ্রহে যশোবর্ম্মপুরে (বর্ত্তমান ঘোষবাঁবা) বাস করেন। দেবপাল তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়াছিলেন। ইন্দ্রশিলায় তিনি একটি চৈত্য প্রতিষ্ঠা করেন। নালন্দা-মহাবিহারের প্রধান আচার্য্য সত্যবোধির মৃত্যু হইলে বীরদেব দেবপাল কর্ত্তৃক তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত হন। ঘোষবাঁবার শিলালিপি হইতে জানা যায় (বিহারের শত মাইল দক্ষিণে)[৭] মগধদেশে দেবপালের রাজত্বকালে বজ্রাসন-বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দেবপালের পরবর্ত্তী রাজা প্রথম বিগ্রহপাল। বিগ্রহপালের পুত্রের নাম নারায়ণপাল। নারায়ণপালের প্রথম উল্লেখ তাঁহার সপ্তম রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ গয়ার খোদিত-লিপিতে পাওয়া যায়।[৮] গয়ানগরের বিষ্ণুপদ-মন্দিরের প্রাঙ্গণে এখন এই শিলালিপি রক্ষিত আছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায়, যে, নারায়ণপালদেবের রাজ্যের সপ্তম সম্বৎসরে ভাণ্ডদেবনামা জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক সন্ন্যাসিগণের হিতার্থে একটি বিহার নির্ম্মিত হয়। নারায়ণ পালের মন্ত্রীর নাম গুরবমিশ্র। পাশুপতগণের ব্যবহারার্থ নারায়ণপাল তীরভুক্তি-বিষয়ে ভূমিদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনের আচার্য্য-পরিষদের দূতক গুরবমিশ্র। নারায়ণপাল পশুপতির উদ্দেশে "কলশপোত" নামক স্থানে এক সহস্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া কথিত হইয়াছে।[৯] নারায়ণপালের মন্ত্রী গুরবমিশ্র দিনাজপুরে বদালস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্রভূমি নারায়ণপালের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নারায়ণ-পালের পুত্রের নাম রাজ্যপাল। মদনপালদেবের তাম্রশাসনে[১০] লিখিত আছে ঃ—

> "তোয়াশয়ৈর্জলধিমূলগর্ভৈ
> র্দেবালয়ৈশ্চ কুলভূধরতুল্যকক্ষৈঃ।
> বিখ্যাতকীর্ত্তিরভবত্তনয়শ্চ তস্য
> শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোকপালঃ।।" (৯-১০ পংক্তি)

অর্থাৎ নারায়ণপাল-পুত্র রাজ্যপাল সাগরের তলদেশের ন্যায় গভীর-গর্ভ জলাশয় সকল এবং কুলাদ্রিসদৃশ কক্ষবিশিষ্ট দেবালয়সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রখ্যাত হন।

৬. J.A.S.B. 1872. Part I p. 272
৭. Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol. XI pp. 173-175.
৮. Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol. III. p 120. No 6. Pl XXXV.
৯. Indian Antiquary, Vol. XV pp. 304-310.
১০. গৌড়লেখমালা—পৃঃ ১৪৭।

রাজ্যপালের পুত্র দ্বিতীয় গোপালদেব। তৎপুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল।[১১] তিনি দানশীলতার জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শিল্পকলার যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন[১২]। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল। গৌড়াধিপ মহীপালের সারনাথ-লিপি[১৩] (১০২৬ খৃঃ) হইতে জানা যায় যে, তিনি সারনাথের অশোক-স্তূপের সংস্কার-সাধন করেন এবং বারাণসীধামে শিব ও পার্ব্বতীর মন্দির-প্রতিষ্ঠা, অশোক-স্তম্ভোপরিস্থ ধর্ম্মচক্রের জীর্ণ-সংস্কার এবং অভিনব "শৈলগন্ধকুটী" নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

ওঁ নমো বুদ্ধায়।

বারাণসী-সরস্যাং গুরবঃ শ্রীবামরাশিপাদাব্জং।
আরাধ্য নামত ভূপতি শিরোরুহৈঃ শৈবলাধীশম্।।
ঈশানচিত্রঘণ্টাদি কীর্ত্তিরত্নশতানি যৌ।
গৌড়াধিপো মহীপাল কাশ্যাং শ্রীমানকারয়ৎ।।১।।
সফলীকৃতপাণ্ডিত্যৌ বোধাববিনিবর্ত্তিনৌ।
তৌ ধর্ম্মরাজিকাং সাঙ্গ ধর্ম্মচক্রং পুনর্ন বং ।।
কৃতবন্তৌ চ নবীনাং অষ্টমহাস্থানশৈলগন্ধকুটীম্।
এতান্ শ্রীস্থিরপালঃ বসন্তপালোঽনুজঃ শ্রীমান্।।২।।

সংবৎ ১০৮৩ পৌষদিনে ১১।

সারনাথে যে স্তূপে উক্ত খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হয়, তাহা ইষ্টকনির্ম্মিত। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান জগৎসিংহ কর্ত্তৃক ইহা খনিত হইয়াছিল। এখানে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়, তাহার পাদদেশে উক্ত লিপি উৎকীর্ণ ছিল। ইহা এক্ষণে মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। কনিংহাম সারনাথ ধামে স্তূপ-খনন-কালে দেখিয়াছিলেন, উল্লিখিত স্তূপের নিম্নার্দ্ধ প্রস্তর-নির্ম্মিত ও উপরার্দ্ধ ইষ্টকনির্ম্মিত। পূজনীয় রাখালবাবু অনুমান করেন, এই ইষ্টকনির্ম্মিতাংশই মহীপালের সময়ে স্থিরপাল ও বসন্তপাল কর্ত্তৃক যোজিত হয়।[১৪] সারনাথের খনন-কার্য্য হইতে জানা গিয়াছে যে, পালরাজগণ ক্ষুদ্র উপলখণ্ড, ইষ্টক, চূণ ও শুরকি নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যবহার করিতেন। প্রথম মহীপাল মগধ জয় করেন। মগধ তাঁহার শাসনাধীনে বহুকাল ছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার রাজত্বের একাদশ সম্বৎসরে নালন্দার মন্দির, যাহা অগ্নিদাহে বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা পুনঃ সংস্কৃত হয়।

১১. দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে গৌড়রাজ্য একজন বৈদেশিকের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিল। এই বৈদেশিক (কাম্বোজবংশীয় রাজা) ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে বরেন্দ্রমণ্ডলে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।
১২. Memoirs A.S.B. 1910, Part III. p. 9.
১৩. Archaeological Survey Report, Vol III p. 121
১৪. "বৌদ্ধ-বারাণসী"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, ১৬৫ পৃঃ।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন মার্শাল সাহেব নালন্দায় এই মর্ম্মের একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার পঞ্চদশভাগ প্রথম সংখ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইহার শুদ্ধ পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। মহীপালের পুত্র নয়পাল। তিনি গয়ার কৃষ্ণদ্বারিকামন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহার খোদিত-লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, বিশ্বাদিত্য-নাম নীচ-ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নয়পালের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[১৫] তাঁহার রাজত্বকালে বিশ্বরূপ কর্ত্তৃক গদাধর এবং অন্যান্য মন্দির নির্ম্মিত হয়। বিশ্বাদিত্য শিব, বটেশ এবং প্রপিতা-মহেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বিক্রমশিলার বিহার এই সময় খুব প্রতিষ্ঠা-লাভ করে। নয়পালের পিতা মহীপালদেব আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বিক্রমশিলায় আহ্বান করেন। দীপঙ্কর বজ্রাসনের সন্নিকটবর্ত্তী, বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন।[১৬] দীপঙ্কর নয়পালের গুরু। তিনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি বিক্রমশিলা বিহারের প্রধান আচার্য্য হইয়াছিলেন।

নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল। তৎপুত্র দ্বিতীয় মহীপাল। মদনপালদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে —

"তন্নংদনশ্চন্দনবারিহারি কীর্ত্তিপ্রভানন্দিত বিশ্বগীতঃ।
শ্রীমন্‌মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো দ্বিজেশমৌলি শিববদ্ভূব।।"

(১৮-১৯ পংক্তি)

অর্থাৎ তাঁহার কীর্ত্তি-প্রভায় চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি বিশ্বপতি হইয়াছিলেন। দিনাজপুরে তাঁহার নামসংযুক্ত অনেকগুলি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। দ্বিতীয় মহীপালের পর তাঁহার ভ্রাতা শূরপাল গৌড়-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই সময় শ্যামলবর্ম্মা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পদ্মানদীর দক্ষিণভাগস্থ সমস্ত দেশ জয় করেন এবং গৌড়ান্তর্গত "বিক্রমপুরোপান্তে" পুরী নির্ম্মাণ করেন।* শূরপালের পর তাঁহার ভ্রাতা রামপাল গৌড়ের রাজা হন।

রামপালের দ্বিতীয় পুত্র মদন পালদেবের রাজত্বকালে বরেন্দ্রমণ্ডলে সন্ধ্যাকর নন্দী আবির্ভূত হন। তাঁহার "রামচরিত" কাব্য [১৭] হইতে রামপালের সমসাময়িক বিবরণ জানা যায়। রামপাল গঙ্গা এবং করতোয়ার সঙ্গমস্থলে রামাবতী নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। রামচরিতকাব্যে কবির লেখনীমুখে রামাবতীর বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি রামাবতীকে "অমরাবতী-সমান" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, তৃতীয়াংশধৃত বৈদিক-কুলমঞ্জরী।

১৫. Journal of the Asiatic Socicty of Bengal, 1900, Part I pp. 192-193

১৬. Indian Pandits in the Land of Snow, pp. 50-51.

১৭. Sandhyakar Nandi in Memoirs A.S.B. 1910 Vol vii No I. pp. I-54

অমরাবতী সমানে (ক) বরেন্দ্রীকৃতাতঙ্কাম্।
সুমনোভিরভিব্যাপ্তা নিপ্প্রত্যুহামৃতস্য পরিপূর্ণ্যৈঃ।। রাম-চরিত ৩/২৯

রামাবতীনগরে "বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত কর্ব্বুরময় মন্দির" প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাতে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধমূর্ত্তি প্রপূজিত হইতেন। (৩/৪০) কেহ কেহ অনুমান করেন, "কর্ব্বুরময়" বলিতে মীনাকরা ইষ্টকনির্ম্মিত বুঝায়। অভিধানে "কর্ব্বর" শব্দে স্বর্ণ বা বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট এই অর্থ সূচিত করে। কি উপাদানে এই বিচিত্রবর্ণ উৎপন্ন হইত তাহা বলা যায় না। এ সকল মন্দির যে ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ যে মীনাকরা ইষ্টক (Glazed tiles) গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে এগুলি তাহাই। প্রাচীন বিহারাদির বর্ণনায় "মণিমণ্ডিত" শব্দের ব্যবহার আছে। যথা, —

জিনঃ শ্রীভগবান্ বুদ্ধো বিহারে মণিমণ্ডিতে।
জেতবনে স্বশিষ্যৈশ্চ সার্দ্ধং (ব) বিজহার সঃ।।" পিণ্ডপাত্রাবদান[১৮]।

"মণিমণ্ডিত" বলিতে কি অর্থের দ্যোতনা করিত তাহাও জানা যায় না।

রামপালদেব নগর-সন্নিধানে জগদ্দল-মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার বৌদ্ধধর্ম্মানুসরণ বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন—

"মন্দ্রাণাং স্থিতিমূঢ়াং জাগদ্দল-মহাবিহার-চিতরাগাম্।
দধতৌ লোকেশমপি মহত্তারোদীরিতোরুমহিমানম্।।"৩/৭।।

রামাবতীনগর নানা দেবদেবীমূর্ত্তিবিশিষ্ট মন্দির সুশোভিত হইয়াছিল। রামপাল বৌদ্ধ হইয়াও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন নাই। তিনি সাগরদীঘির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার তীরভূমির উপর তিনটি শিবমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। (৩/৪১) রামাবতীনগর অনেকদিন পালরাজগণের রাজধানী ছিল। রামপাল-তনয় মদনপালের মনহলি-তাম্রশাসন[১৯] রামাবতী হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল: —

"শ্রীরামাবতীনগর-পরিসর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ"

রামপালের পর তৎপুত্র কুমারপাল রাজা হন। তাঁহার পরবর্ত্তী নরপতির নাম তৃতীয় গোপালদেব। তাঁহার পর রামপালের দ্বিতীয় পুত্র মদনপাল রাজা হন। তাঁহার রাজত্ব কালে "কলিকাল বাল্মীকি"-গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বর্ত্তমান ছিলেন। মদনপালের সময়ই পালরাজবংশের পতন হয়। মদনপালের পরবর্ত্তী গোবিন্দপাল নামে আরও একজন পালউপাধিধারী নরপতির নাম শুনা যায়। এই সময় হইতে বঙ্গের সেন-রাজগণের প্রাধান্যের বিষয় অবগত হওয়া যায়। পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন,

১৮. Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Mss. in the Library of the Cambridge University, p. 40.
১৯. J.A.S.B. 1900, p. 71 ও গৌড়লেখমালা ১৪৭ পৃঃ।

কিন্তু সেনরাজগণ হিন্দু ছিলেন। পালরাজবংশের শাসন সমগ্র বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে তাঁহারা ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে রাজত্ব করিতেন। মগধপ্রদেশ তাঁহাদের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বঙ্গের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রদেশ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়।[২০] সেনরাজগণ পূর্ব্ববঙ্গ ও মধ্যবঙ্গে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন। সেনবংশের প্রথম নরপতির নাম বীরসেন। সেনবংশীয় বিজয়সেন সমগ্র বঙ্গদেশ জয় করেন। তিনি বরেন্দ্রমণ্ডলে প্রদ্যুম্নেশ্বরের (শিবের) মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক ইহার অবস্থান-ভূমি নির্ণীত হইয়াছে। এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান দেবপাড়া গ্রামে বর্ত্তমান। বিজয়সেন বিজয়পুর নামে যে রাজধানী স্থাপন করেন, সে স্থান হইতে এই গ্রাম ছয় মাইল দূরবর্ত্তী।

বিজয়সেনের মন্ত্রী কবি উমাপতিধর প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের শিলাফলকের প্রশস্তি রচনা করেন। প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দির পূর্ব্বে কত বড় ছিল জানা যায় না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় দেবপাড়াগ্রামের ধ্বংসাবশেষসমূহ দেখিয়া বিবেচনা করেন, উক্ত মন্দির তাদৃশ বৃহৎ ছিল না।[২১] কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন। বল্লাল সেন 'দানসাগর' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। যে স্থানে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহার বর্ত্তমান নাম বাঘবাড়ী। বল্লালের সময় এই স্থান সুরম্য সৌধমালায় বিভূষিত হইয়াছিল। রাজপ্রাসাদের অদূরে অর্দ্ধগৌরীশ্বরের মন্দির বিরাজ করিত। বল্লালসেনের রাজত্বকালে এখানে যে সকল মন্দির রচিত হইয়াছিল, তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট ইষ্টকস্তূপমাত্র এখন বর্ত্তমান রহিয়াছে। বল্লালের সময় গৌড়দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রবর্ত্তন হয়। বল্লালসেন সিংহগিরির উপদেশ পাইয়া তান্ত্রিকমতের পক্ষপাতী হন। সিংহগিরির উপদেশমত তিনি দেবপাড়ার নিকটে একটি বৌদ্ধ-মন্দির ও সুবৃহৎ পান্থশালার প্রতিষ্ঠা করেন। বল্লালসেন "অদ্ভুতসাগর" গ্রন্থের মতানুসারে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

বল্লাল-তনয় লক্ষ্মণসেন উৎকলে, কাশীধামে এবং ত্রিবেণীতে জয়স্তম্ভ নিখাত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে তিনি রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। সেনরাজবংশ যে সময় বঙ্গদেশ শাসন করেন, সে সময় বঙ্গীয় স্থাপত্য-শিল্পের তাদৃশ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। তবে এই সময় হইতেই মন্দির-স্থাপত্যের উন্নতি আরব্ধ হয়। বঙ্গদেশে আধুনিক সময়ে যে সকল মন্দির দৃষ্ট হয়, সেরূপ আকারের মন্দির বঙ্গদেশে কতদিন হইতে নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে তাহা

২০. Dr. Rajendra Lal Mittra in his Indo-Aryans, Vol. II, p. 235,

২১. Indo-Aryans, Vol. II, p. 240.

বলা সহজ নহে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুমান করেন, বঙ্গদেশীয় মন্দিরের প্রথম সূত্রপাত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সংঘটিত হয়। মাদ্রাজের অন্তর্গত মহাবলীপুরে বাঙ্গালা-মন্দিরের অনুকরণে "দ্রৌপদীর রথ" প্রস্তুত হইয়াছিল।[২২] ইহা একটি মন্দিরবিশেষ—পাষাণ কাটিয়া গঠিত হইয়াছিল।[২৩] ইহার আকৃতি বঙ্গদেশীয় "চৌচালা' গৃহের ন্যায়।

বঙ্গীয় স্থাপত্য-শিল্পের আলোচনা করিলে মনে হয়, বহুপূর্ব্বকাল হইতেই আমাদের দেশে ইষ্টকের প্রচলন ছিল। মগধের পালবংশীয় নরপালগণের রাজত্বকালে এবং তাঁহার পূর্ব্বে কি উপাদানে বঙ্গীয় স্থপতিগণ আপনাদিগের রচনা-কৌশল অভিব্যক্ত করিতেন তাহা ঠিক জানা যায় না। ফার্গুসন বলিয়াছেন, ইষ্টকই তাঁহাদের নির্ম্মাণ-কার্য্যের প্রধান উপাদান ছিল। এদেশে প্রস্তর অতিশয় দুর্লভ; সুতরাং প্রস্তর দ্বারা মন্দিরাদি নির্ম্মাণ বহু ব্যয় সাপেক্ষ ছিল; এই জন্যই বঙ্গীয় স্থাপত্যে প্রস্তরের তত প্রচলন হয় নাই। ফার্গুসন প্রভৃতি লেখকগণ বঙ্গদেশে ইষ্টকের এবং খিলানের এত অধিকমাত্রায় ব্যবহারের উল্লিখিত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু হ্যাভেল ইহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তিনি বলেন[২৪], "It is more logical to assume that the Bengali builders being bricklayers, rather than stone-masons, had learnt to use the radiating arch whenever it was useful for constructive purposes long before the Muhammadans came there."

পাল-নরপালগণের রাজত্বকালে গৌড়ই বঙ্গীয় স্থাপত্যের অগ্রণী ছিল। একথা হ্যাভেল স্বীকার করিয়াছেন। তদানীন্তনকালের স্থাপত্যের নিদর্শন গৌড়ে এককালীন লোপ পাইয়াছে, তাহার ভগ্নাবশেষমাত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ফার্গুসন বলেন, গৌড়ীয় নরপতিগণ তাঁহাদের প্রাসাদ ও মন্দিরে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মার্ব্বল-প্রস্তরের স্তম্ভ ব্যবহার করিতেন। স্তম্ভগুলির আকার অতিশয় সুন্দর ও মনোরম ছিল।[২৫] গৌড়ে যখন হিন্দুগৌরব-রবি অস্তমিত হইল, তখন গৌড়-নরপালগণের লোপের সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রবর্ত্তিত স্থাপত্যকলাও লোকে বিস্মৃত হইল। তাহার স্মৃতিচিহ্ন কেবল পরবর্ত্তী যুগের পাঠান-স্থাপত্যে রহিয়া গেল।

২২. Bengali Temples And Their General Characteristics, J.A.S.B. 1909, p. 147.

২৩. Fergusson and Bergess : Cave-temples of India, p. 116.

২৪. "It is easy to understand why in Bengal the Trabeate style was never in vogue. The Country is practically without stone or any suitable material for forming either pillars or beams." History of Indian and Eastern Architecture. Vol. II p. 545.

২৫. Havell : Indian Architecture, p. 56.

তৃতীয় যুগ

পাঠান-যুগের বঙ্গীয়-স্থাপত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ যেমন এদিকে বঙ্গীয়-স্থাপত্যে এক নব যুগের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন, তেমনি আবার পূর্ব্বতন স্থাপত্য-চিহ্নসমূহের ধ্বংস-সাধন করিয়া আপনাদের হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছিলেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজির বঙ্গ-জয়ের সময় গৌড়ের হিন্দু-দেবালয়সমূহ বিজেতৃ কর্ত্তৃক পদ দলিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল, দেবমূর্ত্তিসকল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল।[২৬] প্রাচীন হিন্দুগৌড়ের পতন ও ধ্বংস হইলে গৌড়ের মুসলমান বাদশাহগণ তাহার উপাদান লইয়া মসজিদ ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন, এই নির্ম্মাণ-কার্য্যে হিন্দুশিল্পীগণ নিযুক্ত হইয়াছিল,[২৭] মুসলমান-স্থাপত্যে এইরূপে হিন্দু-প্রভাব বদ্ধমূল হইয়া যায়।

ত্রিবেণীর জাফর গাজির সমাধি-মন্দিরে বঙ্গাক্ষরে বহু খোদিতলিপি আছে। ইহা প্রথমে একটা দেবালয় ছিল, পরে মুসলমানের হস্তে পড়িয়া তাঁহার এই দশা হইয়াছে।[২৮] এই মসজিদই এক্ষণে বঙ্গদেশের যাবতীয় মসজিদের মধ্যে প্রাচীনতম। ইহাতে ১২৯৮ খৃষ্টাব্দের খোদিত-লিপি আছে। গৌড়ের আদিনা মসজিদেও (১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত) হিন্দু-স্থাপত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কেহ কেহ পাঠান-রাজত্বকালের গৌড়ীয় মসজিদসমূহের স্থাপত্যকে সারাসেনিক্ (Saracenic) স্থাপত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু হ্যাভেল সাহেব ইহা উড়াইয়া দিয়াছেন; এতদিন যে স্থাপত্য সারাসেনিক স্থাপত্যের অনুকরণজাত বলিয়া লেখকগণ নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছিলেন, হ্যাভেল তাহাকে সম্পূর্ণ হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যেব অনুকরণজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইয়াছেন। বঙ্গীয় মন্দির ও মসজিদ-সমূহের রচনা-সাদৃশ্য দেখিলে হ্যাভেলের উক্তি যথার্থ বলিয়া মনে হয়।[২৯]

১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ স্বাধীন হইয়া উঠে। এই সময় হইতেই বঙ্গীয়-স্থাপত্যের তৃতীয় যুগের প্রকৃত সূত্রপাত হয়। সার্দ্ধ-দ্বিশতাব্দী কাল বঙ্গের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে, এই সময়ের মধ্যে বঙ্গীয়-স্থাপত্যের প্রচুর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।[৩০] গৌড়, পাণ্ডুয়া,

২৬. Indian and Eastern Architecture. vol. II p. 255.
২৭. Ravenshaw's Gaur. p. 95.
২৮. Pre-Mogul Mosques of Bengal. J.A.S.B. 1910. pp. 24-25.
২৯. 'সপ্তগ্রাম'—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৩১৫, পৃঃ ১৭-১৮) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩০. "All the early Muhummadan buildings at Gaur, are as they seem to be, adaptation of the local Hindu buddhist building tradition, both structurally and decoratively .... The general character of the Muhammadan buildings at Gaur differs as widely from the Saracenic type as any Hindu temple." Indian Architecture, p. 45.

সপ্তগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম, খলিফতাবাদ (বাগেরহাট অঞ্চল) প্রভৃতি স্থান এই যুগের স্থাপত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বঙ্গের সেনরাজগণের পতনের পর বঙ্গীয় স্থাপত্যের ধারায় যে তৃতীয় যুগের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্থূলতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

১. ১২৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।
২. ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বঙ্গদেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহের সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত।
৩. হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহের রাজত্ব-কাল।
৪. বঙ্গে পাঠানরাজগণের পতনের পর মোগল-রাজত্বকাল।

ত্রিবেণীর জাফরগাজির সমাধি-মন্দির ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের প্রথম যুগের স্থাপত্যের ইহাই একমাত্র উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা ত্রিবেণীর গঙ্গা-সঙ্গমের অনতিদূরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সমাধি-মন্দির কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত—সমাধির প্রাচীর প্রস্তরের। সমাধিটি দুই অংশে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে জাফর খাঁ ও তাঁহার স্ত্রী এবং পশ্চিম ভাগে তাঁহার ভ্রাতা বড়গাজী ও তাঁহার পুত্রগণ সমাধিস্থ আছেন। পূর্ব্ব অংশের প্রাচীরের প্রস্তর কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু পশ্চিমাংশের প্রাচীরের প্রস্তর রক্তাভ। শ্রদ্ধাস্পদ রাখালবাবু সমাধির দ্বারচতুষ্টয়ে হিন্দু-স্থাপত্যের নিদর্শন লক্ষ্য করিয়াছেন।[৩১] এই সমাধি-মন্দিরে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভের ব্যবহার হইয়াছে। প্রাচীরগাত্রে চারিটি মিহরাব আছে, কোনওটি ইষ্টকনির্ম্মিত এবং কোনওটি প্রস্তরনির্ম্মিত। সমাধি-মন্দিরের গাত্রসংলগ্ন খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে তুরস্কজাতীয় জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম জয় করেন। জাফর খাঁর সমাধির অনতিদূরে একটি মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও সপ্তগ্রামের লুপ্ত স্থাপত্য-নিদর্শনসমূহের ইতিহাস ইহা হইতে পাওয়া যায়। এই মসজিদের গাত্রে অনেকগুলি খোদিতলিপি আছে। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু সেগুলির মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।[৩২] এই সকল লিপি হইতে জানা যায়, প্রথম ফিরোজশাহের রাজত্বকালে ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁর আদেশে একটির নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হয়।

১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-স্থাপত্যের দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ। হজরৎ পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ (১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত) এ যুগের একটা প্রধান কীর্ত্তি। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হিন্দু রাজা কংস বা গণেশের পুত্র জলালুদ্দীন্ মহম্মদ শা (১৪১৪ হইতে ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দ) গৌড়কে স্থাপত্যসৌষ্ঠবে সুসম্পন্ন করেন। গৌড়নগর তাঁহার সময়

৩১. J.A.S.B. 1910 (January), p. 25.
৩২. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, ১৭ পৃঃ।

অবর্ণনীয় স্থাপত্য সৌন্দর্য্যে মহিমাময় হইয়া উঠে।[৩৩] ইলিয়াস শাহি বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা সুলতান নসিরুদ্দীন্ মহম্মদের সপ্তগ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায়, ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে তরবিয়াৎ খাঁ নামক এক ব্যক্তি সপ্তগ্রামে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন।[৩৪] সপ্তগ্রামের আর একখানি খোদিতলিপিতে উল্লেখ আছে যে, সুলতাঁন নসিরুদ্দীনের শাসনকালে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রুক্‌নুদ্দীন বারবক শাহ তাঁহার অনুচর ইকবার খাঁ কর্ত্তৃক সপ্তগ্রামে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। বারবকের রাজত্বকালে তাঁহার সেনাধ্যক্ষ আজমল খাঁ কর্তৃক ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামে একটি সমজিদ নির্ম্মিত হয়। বাগেরহাটের একখানি খোদিত-লিপি হইতে জানা যায়, এই বৎসর খাজাহান আলি-বাগের হাটে দেহত্যাগ করেন।[৩৫] তিনি বাগেরহাটে ষাটগম্বুজনামক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় করিয়া গিয়াছেন। ষাটগম্বুজে এক প্রকার ধূসরবর্ণের প্রস্তরস্তম্ভ দৃষ্ট হয়।[৩৬] নসিরুদ্দীন্ মহম্মদ শা এই যুগে গৌড়ের দুর্গ সংস্কার এবং অনেক হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করেন। পাণ্ডুয়ার ক্ষুদ্রতর মসজিদটি ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে ইয়ুসুফ শাহের আদেশে তাঁহার সেনাপতি কর্ত্তৃক পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত মন্দিরগুলি ধ্বংস হয়। এই সকল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপকরণ লইয়া মুসলমান মসজিদসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহার প্রমাণ পাওযা যায়।

দিনাজপুরের গোপালগঞ্জের মসজিদ, গৌড়ের চামকাটি ও লটন মসজিদ, বিক্রমপুরের বাবা আদমের মসজিদ, গৌড়ের তাঁতিপাড়া ও গুণমন্ত মসজিদ এই সময়ের রচনা। দ্বিতীয় ফিরোজশাহের রাজত্বকালে গৌড়ের বিখ্যাত "ফিরোজমিনার" নামক স্তম্ভ নিখাত হয়। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে সৈয়দবংশীয় হুসেনশাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের পর হইতে মুসলমান-রাজত্বকালের স্থাপত্যের তৃতীয়কল্পের আরম্ভ হয়। তাঁহার রাজত্বকালে (১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ) গৌড়নগরী নূতন শোভায় মণ্ডিত হইয়া চিত্রার্পিতবৎ প্রতীয়মান হইল। শাদুল্লাপুরের মকদুম শাহের সমাধিমন্দির এবং ছোট সোনাসমজিদ তাঁহার শুভ্রকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দেবীকোটের রুকনখাঁর মসজিদ এবং সুবর্ণগ্রামের গোয়ালড়িহির মসজিদ এই সময়ে নির্ম্মিত হয়। হুসেন শাহের নামের তিন খানি খোদিতলিপি সপ্তগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার একখানা হইতে জানা যায়, হিজরী ৯১১ অব্দে (অর্থাৎ ১৫০৪ খৃঃ) হুসেনশাহের সেনাধ্যক্ষ উলুগ মসনদ হিন্দুখাঁ কর্ত্তৃক সপ্তগ্রামে একটি সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। সপ্তগ্রামে সরস্বতী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলের অনতিদূরে এই সেতুর

৩৩. Ravenshaw's Gaur.

৩৪. Blochman's Contributions, J.A.S.B. 1870 and 1873, p. 270.

৩৫. J. Westland's Report on the District of Jessore, p. 22–J.A.S.B. 1867.

৩৬. J.Westland's Report, p. 12.

ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মসনদ হিন্দুখাঁ হুসেনশাহের পৌত্র ফিরোজশাহের রাজত্বকালে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে কালনায় একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন।[৩৭] হুসেনশাহের মৃত্যুর পর ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র নসরৎশাহ্ নবাব হন। তাঁহার রাজত্বকালের দুইখানি খোদিত লিপি সপ্তগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। হি. ৯৩৬ অব্দে (১৫২৯ খৃঃ অঃ) জলালুদ্দীন হুসেন কর্ত্তৃক সপ্তগ্রামে দুইটি মসজিদ নির্ম্মিত হয়। সেই মসজিদ-দ্বয়ে উল্লিখিত দুইখানি খোদিতলিপি সংযুক্ত ছিল। নসরৎশাহের রাজত্বকাল স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। তিনি ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে "কদম-রসুল' নির্ম্মাণ করিয়া তদানীন্তন কালের পাঠানস্থাপত্যের চিত্র অক্ষয় করিয়া গিয়াছেন। রাজসাহীর বাঘা-মসজিদ (১৫২৩-১৫২৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত) ও গৌড়ের বড়সোনা মসজিদ (১৫২৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত) নসরৎশাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড় এবং গুর্জ্জরদেশ উত্তরভারতে স্থাপত্য-গৌরবে সর্ব্বাপেক্ষা মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীযুক্ত হ্যাভেল সত্য সত্যই বলিয়াছেন,[৩৮] "In studying the development of Muhammadan architecture in Gujarat, Malwa, and in the Deccan, it will always be profitable to look to Gaur rather than to Persia." ফলতঃ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় স্থাপত্যেও এক বিভিন্ন গৌড়ীয় রীতির প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। নসরৎশাহের মৃত্যুর পর বঙ্গীয় স্থাপত্যের তাদৃশ উন্নতি লক্ষিত হয় না। গৌড়ের পাঠান-বাদশাহগণের পতনের পর (১৫৭৬ খৃঃ অঃ) বঙ্গে দিল্লীর মোগল-সম্রাট্‌গণের শাসন বদ্ধমূল হয়। তাহার পর হইতে তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ-কর্ত্তৃক বঙ্গভূমি শাসিত হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বতন পাঠান-নবাবগণ যে স্থাপত্যগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, তাহা এই সময় ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসে। মোগল-রাজত্বকালে বঙ্গদেশে যে সকল মসজিদ, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেগুলি পাঠান-স্থাপত্যের তুলনায় তত উল্লেখযোগ্য নহে। ঢাকার পরিবিবির সমাধিমন্দির, সাতগম্বুজ মসজিদ, বড় কাটরা, ছোড় কাটরা, ইমামবাড়া প্রভৃতি এই যুগের মোগলস্থাপত্যের নিদর্শন। মুসলমান-শাসনকালের স্থাপত্যের তৃতীয় যুগে অর্থাৎ মোগল-রাজত্বকালে বঙ্গদেশের কতিপয় স্থানে অতি সুন্দর সুন্দর দেবালয় নির্ম্মিত হয়। তন্মেধ্যে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্যই এ যুগের স্থাপত্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব। বঙ্গীয় মন্দির-সমূহ যে রীতি অনুসারে রচিত হইত, তাহা যে শুধু বঙ্গভাষাভাষী জনগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে। বঙ্গের প্রত্যন্ত প্রদেশের অধিবাসিগণকেও এই অপূর্ব্ব স্থাপত্যরীতি

৩৭. "সপ্তগ্রাম"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, ৩১ পৃঃ।

৩৮. Havell : Indian Architecture, p. 124.

আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুদূর আসাম-প্রদেশের অন্তর্গত মাইবঙ্গের রণচণ্ডীর প্রস্তর-গৃহে (১৭২১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত), শিবসাগরের "পঞ্চরত্ন" মন্দিরে এবং জব্বলপুরের অন্তর্গত চেদিরাজগণের প্রাচীন রাজধানী বিলহরি-মন্দিরে বঙ্গীয় স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষিত হইয়াছে।[৩৯]

বাঁকুড়াজেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে যে সকল মন্দির বিরাজ করিতেছে তাহাদের শিল্প সৌন্দর্য্য বাস্তবিক চিত্তাকর্ষক। বিষ্ণুপুরের মন্দির-সমূহে যে অপূর্ব্ব কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বঙ্গদেশের আর কোনও মন্দিরে দৃষ্ট হয় কিনা সন্দেহ। এখানকার কতকগুলি দেবালয় ইষ্টকে এবং কতক এক প্রকার গৈরিক প্রস্তরে (laterite) নির্ম্মিত। এইরূপ প্রস্তর বাঁকুড়াজেলায় অনেক পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের বর্ত্তমান মন্দিরসমূহকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।[৪০] (১) যে সকল মন্দিরে একটি চতুষ্কোণ শিরোগৃহ আছে—যেমন মল্লেশ্বর মন্দির ও (২) যাহাদের ছাদ বাঙ্গালা ঘরের ছাদের ন্যায়—যেমন মদনমোহন, লালজী, এবং রাধাশ্যামের মন্দির; (৩) যাহাদের আকার উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরের ন্যায়, কেবল উপরি ভাগে পাঁচটি গম্বুজ আছে। ইহাদিগকে "পঞ্চরত্ন" মন্দির বলে—যেমন শ্যামরায় ও মদনগোপালের মন্দির; (৪) ইহাদিগকে লোকে জোড়বাংলা মন্দির বলে। ইহাদের আকৃতি বাঙ্গালা-কুটীরের ন্যায়। এইরূপ একটি মন্দির বিষ্ণুপুরে আছে। এই সকল মন্দিরের মধেও মদনগোপালের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য ও কৌতূহলজনক। ইহা গৈরিক প্রস্তরে (laterite) নির্ম্মিত। এরূপ পঞ্চরত্নমন্দির বঙ্গদেশে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। হ্যাভেল, মার্শাল এবং ব্লক প্রমুখ মনীষিগণ বিষ্ণুপুরের মন্দির-সমূহের গঠন-সৌষ্ঠবে আকৃষ্ট হইয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।[৪১] মৃত ডাক্তার ব্লক ইহাদের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "It is not on account of their age or their historical association that these temples claim the interest of archaeologist, but because they represent the most complete set of specimens of the peculiar Bengal style of temple-architecture." বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ দেবালয় সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা। মোগল-শাসনকালে এদেশে কিরূপ মন্দির নির্ম্মিত হইত, তাহাদের বিশেষত্ব, লক্ষণ এবং আকারই বা কি প্রকার ছিল প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি প্রবন্ধে তাহার বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।[৪২]

৩৯. Archaeological Survey Report – Bengal Circle, 1902-3.
৪০. Archaeological Survey of India – Bengal Circle (1904) Dr. Bloch's Report, p.6.
৪১. Havell : Indian Architecture, p. 122.
Archaelogical Survey Report, 1903-4 pp.9 and 54.
৪২. Bengali Temples and their general characteristics. J.A.S.B. 1909, pp. 141-64.

ইষ্টকের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের সূত্রপাত বাঙ্গালা মন্দিরে কোন্ সময় হইয়াছিল তাহা বলা সুকঠিন। উড়িষ্যার স্থাপত্যের ইহা একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে হয়। উড়িষ্যার মন্দির-গাত্রে যেমন বিভিন্নাকারের মূর্ত্তি খোদিত আছে, বঙ্গীয় মন্দির-গাত্রেও সেই প্রকারের মূর্ত্তি-সকল খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি সকলই যে পৌরাণিক অথবা ধর্ম্মভাবোদ্দীপক এমন মনে হয় না। উড়িষ্যার মন্দিরসমূহের প্রাচীর-কার্য্যে প্রণয়রসাত্মক চিত্র (erotic figures) দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালার অনেক মন্দিরে ইহার নিদর্শন আছে। পবিত্র দেবালয়ে এরূপ কলুষিত চিত্রসকল কেন স্থান পাইয়াছিল তাহার কারণ অদ্যাপি সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

বঙ্গের প্রাচীন স্থাপত্যচিহ্নসমূহের অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে। ইহা কতক কালের নিষ্ঠুর পীড়নে এবং কতক মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের ধ্বংসসাধনের পর সংঘটিত হইয়াছিল। গৌড়, সপ্তগ্রাম, পাণ্ডুয়া এইরূপে হতশ্রী ও বিগতসৌধ হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, মালদহ, এবং রঙ্গপুর গৌড়ের অবশেষ আহরণ করিয়া শোভায় ও সম্পদে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল। লর্ড কার্জ্জনই সর্ব্বপ্রথম ধ্বংসের হস্ত হইতে ভারতীয় পুরাবস্তুর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন; তাহা না হইলে তাহা এতদিন বর্ত্তমান থাকিত কিনা সন্দেহ। আজ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের যে এত উন্নতি দেখিতেছি, তাহার মূলে এই সদাশয় শাসনকর্ত্তার একাগ্র হিতকামনা নিহিত রহিয়াছে।

বঙ্গের অনেক কীর্ত্তি ধরাবক্ষে বর্ত্তমান থাকিলেও অধিকাংশ কীর্ত্তিচিহ্ন বসুমতীর অন্ধকার গর্ভে আশ্রয় লইয়াছে। সেগুলির উদ্ধারের ব্যবস্থা হওয়া একান্ত আবশ্যক; তাহা না হইলে অতীত ও বর্ত্তমানের ছিন্নসূত্র কখনও যুক্ত হইবে না। যে সদাশয় রাজতন্ত্রের উদারতায় সাঞ্চী ও সারনাথে, ভরৌচ ও পাটলিপুত্রে, উরুবেলা ও বুদ্ধগয়ায় শত শত কীর্ত্তিরত্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমরা আশা করি, তাঁহাদের আনুকূল্যে বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বিলুপ্ত পুরাকীর্ত্তির অসংখ্য অভিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইবে এবং বঙ্গীয় স্থাপত্যের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক তাহাদের ইতিহাস রচনা করিয়া সার্থক-জন্মা ও বরণীয় হইবেন।

ভারতীয় স্থাপত্য-বিজ্ঞান

শ্রী মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী

স্থাপত্য উপবেদানুমোদিত শিল্পগ্রন্থ ও ময়দানব

বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ও রামায়ণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে যতদূর আভাস পাওয়া যায় তাহা দ্বারা ভারতীয় স্থাপত্যের প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব প্রমাণ হইতেছে। এক্ষণে যে সকল প্রাচীন অথচ প্রকৃত শিল্পগ্রন্থ বা শাস্ত্র এ পর্য্যন্ত বহু স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

"মানসার" আমাদিগের একখানি অতি প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্পবিষয়ক গ্রন্থ। "ময়শিল্প" নামে আর একখানি অতি প্রাচীন স্থাপত্য-বিষয়ক গ্রন্থ আছে। উভয় গ্রন্থই গৃহাদির পরিমাণ ও তাহার নির্ম্মাণ-কৌশলের একই প্রকার নিয়মাবলীতে পরিপূর্ণ, কেবল সাম্প্রদায়িকভাবে তাহাতে মূর্ত্তিস্থাপনা ও তাহার প্রতিষ্ঠাবিধি স্বতন্ত্রবিধ দেখিতে পাওয়া যায়। মাদ্রাজনিবাসী মহাত্মা রামরাজ হিন্দুদিগের স্থাপত্য-বিষয়ক বহুগবেষণাপূর্ণ যে বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—"মানসার", "ময়মত", 'কাশ্যপ', 'সকলাধিকার', 'বিশ্বকর্ম্ম', 'সনৎকুমার', 'সারস্বতম্', 'পঞ্চরাত্রম্' ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"প্রথম চারিখানি ব্যতীত অবশিষ্ট গ্রন্থের অনেক অংশই পাওয়া যায় নাই, তাহাতে সেই গ্রন্থগুলি প্রায় অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে, এবং তাহার পত্রগুলিও নিতান্ত জীর্ণ ও গলিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।" কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরীতে 'মানসার' গ্রন্থের একখানি হস্তলিখিত অতি প্রাচীন পুঁথি আছে। তাহা ৪৬টী অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে এই খানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। কিন্তু রামরাজ যে গ্রন্থখানির বিররণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থ অপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া মনে হয়, কারণ তাহাতে ৫৮টী অধ্যায় আছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে উল্লেখ করিব। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন, 'তাঞ্জোর' হইতে এইরূপ আর একখানি গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অধ্যায়গুলি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত এবং বিষয়গুলিও সামান্য ভিন্ন প্রকারের। গ্রন্থখানি অত্যন্ত প্রাচীন, কীটদষ্ট ও বিনষ্টপ্রায়। তবে গ্রন্থখানির নাম ঠিক 'মানসার' নহে, তাহার নাম 'মানবসার'।

দ্বিতীয়খানি—"ময়মত", ইহা "ময়মৃৎ", "ময়শিল্প", 'বাস্তুশাস্ত্র' অথবা 'পৃথ্বীশতন্ত্র' বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ইহা ছন্দে লিখিত। ইহাতে ২৬টী অধ্যায় আছে। এ পুঁথিখানিও সম্পূর্ণ অখণ্ড অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। ইহার অধ্যায়-নির্দ্দিষ্ট সূচী বিবরণ এইরূপ ঃ—

"১ম—স্থাপত্য নির্দ্দেশ; ২য়-৩য়—গৃহাদি প্রস্তুত করিবার জন্য স্থান-নির্ব্বাচন ও তাহার সংস্কারবিধি; ৪র্থ—জমীর দৈর্ঘ্যাদি পরিমাণ-নির্দ্দেশ; ৫ম—বৃত্তাদি প্রস্তুত করিবার জন্য "কম্পাস" বা পর্কালের কেন্দ্র-নির্দ্দেশ; ৬ষ্ঠ—গৃহাদি প্রস্তুত করিবার জন্য তাহার সীমা নির্দ্দেশক "পিন" বা কাষ্ঠের গজাল বসাইবার নিয়ম; ৭ম—দেবাদির নৈবেদ্য, ৮ম-৯ম—গৃহাদির পরিমাণ এবং নগর ও গ্রামাদি স্থাপন করিবার নিয়ম; ১০ম—চতুষ্কোণ ও অষ্টকোণ ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার বিধি, ১১শ—গৃহাদির ভিত্তিস্থাপন ও তদুপলক্ষে শাস্ত্রীয় উৎসবাদির বিধি; ১২শ—উপান (plinth) ভিত্তিতল (bases); ১৪দশ—স্তম্ভ (pillars); ১৫শ—প্রস্তর-নির্ম্মিত কার্য্য; ১৬শ—গ্রথিতকরণ ও তাহার উপাদানসমূহ; ১৭শ—গৃহাদির ছাদ ও চূড়া; ১৮শ—একতল গৃহ; ১৯—দ্বিতল গৃহ; ২০শ—২১শ—ত্রিতল ও চতুর্ত্তলাদি উচ্চ গৃহ-সমূহের নির্ম্মাণপ্রণালী, ২২শ—গোপুর অর্থাৎ তোরণ, পুরদ্বার বা গেট; ২৩শ—মণ্ডপ; ২৪শ—কোষাগার, পুস্তকাগার ও বিচারালয় ইত্যাদি; ২৫শ—কৃষিক্ষেত্র; ২৬শ—রৈখিক পরিমাণ বা রেখা-গণিতাদি বিষয়; এই ছাব্বিশটী অধ্যায়ে তাহা বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে।"

রাজা রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন—"আমি এইরূপ তিনখানি প্রাচীন পুঁথি দেখিয়াছি। প্রথমখানি 'ময়শিল্প', ইহা তন্ত্রের ধরণে লিখিত। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ লিখিত আছে;—

১ম—বিশ্বকর্ম্মার উৎপত্তি, তক্ষক (Carpenter) ও বর্দ্ধকী (Sculpture) ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি; ২য়—পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন যুগে মনুষ্যদিগের দৈর্ঘ্য বিস্তার পরিমাণ, প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার কাষ্ঠ ও প্রস্তর; ৩য়—ভাস্কর ও সূত্রধরাদি জাতীয়দিগের কার্য্য; ৪র্থ—শিব ও অন্যান্য দেবতাদিগের অভিষেকমন্দির; ৫ম—দেবতা ও শিবলিঙ্গাদির পরিমাণ; ৬ষ্ঠ—রথ ও শকটাদির গঠনপ্রণালী; ৭ম—রথাদির প্রতিষ্ঠাবিধি; ৮ম—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী ও অন্যান্য দেবীমূর্ত্তির গঠনপ্রণালী; ৯ম—ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞোপবীত; ১০ম—সুবর্ণ, রজত, ও মঞ্জুসূত্রের যজ্ঞোপবীত, দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করিবার সময় কোন্ দেবতা কোন্ দিগভিমুখে বসাইতে হইবে, হেমশিলার বিবরণ (দক্ষিণ-মেরুর পর্ব্বতাভ্যন্তরে তাহা পাওয়া যায়) ইত্যাদি; ১১শ—ইন্দ্র, মাহেশ্বরী ও অন্য দেবদেবীর বিবরণ; ১২শ—১৩শ রাজমুকুট, চূড়া ও শিরোভূষণ; ১৪শ—স্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল সিংহাসন, শিরচূড়া ও অন্যান্য শিরোভূষণ এবং মন্দিরাদির সংস্কার; ১৫শ—শিবালয়ের দ্বার পরিমাণ; ১৬শ—অন্যান্য দেবমন্দিরের দ্বার পরিমাণ; ১৭শ—বিজ্ঞেশ মন্দির। এই পুঁথিখানির অধিকাংশই অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন ভাবে পাওয়া গিয়াছে।

তৃতীয়খানি রাজা রাধাকান্ত দেবের পুস্তকালয়ে আছে। ইহার নাম "বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ"। ইহা ১৩টী অধ্যায়ে বিভক্ত। ১ম—উপক্রমণিকা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদির বাসোপযোগী বিভিন্ন প্রকারের স্থান গৃহাদি নির্ব্বাচন; ২য়—গৃহারম্ভের উপযুক্ত সময় বা লগ্ন স্থিরীকরণ; ৩য়—গৃহস্বামী বা তদীয় স্ত্রী অথবা তাহার পুত্রের হস্ত-পরিমাণে জমীর বর্গ-নিরূপণ; গৃহাদির উপর নাক্ষত্রিকী শক্তির ক্রিয়া; ৪র্থ—খট্টা, পালঙ্গ, গৃহ, পথ ও মণ্ডপের বিবরণ; ৫ম—বিশেষ বিশেষ দেবতাদিগের নৈবেদ্যাদি দ্রব্যাদি; ৬ষ্ঠ—নানা প্রকার গৃহ, এবং ই-কাদি গৃহ-প্রস্তুতকরণোপযোগী উপকরণ সকল; ৭ম—গৃহকর্ত্তার জন্মলগ্নাধিপ গ্রহের বলানুসারে গৃহদ্বারের পরিমাণ-নির্দ্দেশ; ৮ম—পুষ্করিণী, গৃহ ও কূপাদির প্রস্তুত-প্রণালী; ৯ম—বৃক্ষচ্ছেদন বিধি; ১০ম—গৃহপ্রবেশ; ১১শ—দুর্গ-নির্ম্মাণ-কৌশল; ১২শ—গৃহারম্ভের পূর্ব্বে জমী হইতে অস্থি আদির স্থানান্তর করিবার নিয়ম; ১৩শ—বিভিন্নপ্রকার গৃহ ও তাহার অলঙ্কার-সমূহের স্বাভাবিক লক্ষণাদি বিষয়, এই তেরটী অধ্যায়ে লিখিত আছে।

চতুর্থখানি এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরীতে আছে। ইহার স্থানে স্থানে অপরাজিতা পৃচ্ছা ও জ্ঞানরত্নকোষ বলিয়া লিখিত আছে। পূর্ব্বোক্ত পুস্তকদ্বয়ের ন্যায় এখানিও তন্ত্রের ধরণে লিখিত। কিন্তু তন্ত্রসমূহ যেমন শিব বা দেবীর উক্তি, ইহা তেমনি বিশ্বকর্ম্মার উক্তি, ইহাতে ৩৫টি সূত্র আছে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-বিষয়ক অনেক কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

উত্তরভারত হইতে আরও দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে "শিল্পশাস্ত্র", ও "বাস্তু-প্রদীপ"। এই সকল গ্রন্থ বংশ অথবা শিষ্য-পরম্পরায় পুনঃ পুনঃ প্রতিলিপি হওয়াতে এতাধিক ভ্রমপূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং এত প্রাচীন পারিভাষিক শব্দে ইহা পরিপূর্ণ যে, বর্ত্তমান সময়ে তাহার সকল ভাব পরিগ্রহ করা অতীব দুরূহ বলিয়া বোধ হইতেছে। বিশেষ এ দেশে একাধারে শিল্পশাস্ত্রে ও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ তেমন পণ্ডিতও এখন কেহ নাই, যিনি ইহার প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য-বিষয়ে মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন। তবে আশা আছে, কালে এই সকল প্রাচীন শিল্পগ্রন্থ হইতে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যবিষয়ক বহু অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে।

মিথিলা ও বারাণসী হইতে আমিও কয়েকখানি স্থাপত্যশিল্পসম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার মধ্যে "বাস্তুশাস্ত্র" ও "বাস্তুরত্নাবলী"ই প্রধান। ইহা প্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থ। স্থাপত্য-বিষয়ক অনেক তথ্য ইহাতে লিখিত আছে।

মহামতি রামরাজ বলেন—"শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে যতগুলি গ্রন্থ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে "মানসার"ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ। বিশেষ স্থাপত্য-সম্বন্ধীয় অতি উচ্চ অঙ্গের বিষয়-সমূহ ইহাতে লিখিত আছে।" কেহ কেহ অনুমান করেন, "মানসারের" কয়েক

অধ্যায়-মাত্র প্রতীচ্য খণ্ডে "মেনসুরেসন্" নামে অধুনা প্রচারিত। ইহার উপক্রমণিকায় লিখিত আছে যে, ইহা ৫৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক অধ্যায় বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় পূর্ণ। যত দূর বুঝা গিয়াছে, তাহাতে ভূম্যাদির পরিমাণ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য এবং গৃহাদি প্রস্তুতোপযোগী ভূমি-নির্ব্বাচন ইত্যাদি বিষয় ইহাতে আছে। ইহার সূচী-নির্দ্দিষ্ট বিষয়-সমূহ নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইল ঃ—

১ম—স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও সূত্রধরের কার্য্যে দৈর্ঘ্য-বিস্তার-পরিমাণ; ২য়—'শিল্পী' শব্দের ব্যুৎপত্তি, শিল্পীর ক্রিয়া ও গুণ এবং বিশ্বকর্ম্মা হইতে প্রথম শিল্পী-চতুষ্টয়ের উৎপত্তির বিবরণ, তাহাদের পঞ্চবিধ কর্ম্ম যথা —ভাস্কর, সূত্রধর, কর্ম্মকার, কাংসকার ও স্বর্ণকারাদির কার্য্য ও গুণাগুণ লিখিত আছে। ৩য় হইতে ৫ম অধ্যায় পর্য্যন্ত মন্দির, প্রাসাদ ও বিভিন্ন জাতির আবাসগৃহ প্রস্তুত-করণোপযোগী স্থান-নির্ব্বাচন; ৬ষ্ঠ শঙ্কু, সূর্য্যঘড়ি বা ছায়া ঘড়ি, দিগ্‌নির্ণয়-বিধান ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ আছে; ৭ম—গ্রাম, নগর, মন্দির, প্রাসাদ ও গৃহাদির বিভাগ সহ মানচিত্র বা নক্সা করিবার প্রণালী; ৮ম—দেবালয় ও গৃহাদিতে সময় সময় নানাবিধ উৎসব উপলক্ষে পূজা ও নৈবিদ্যাদির অনুষ্ঠান; ৯ম—গ্রাম, সহর, তদন্তর্গত পথ ও পল্লী-স্থাপনের বিধি-ব্যবস্থা; ১০ম—ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নগরের বর্ণনা; ১১শ—ইষ্টকাদি নির্ম্মিত অট্টালিকার পরিমাণ-নির্ব্বাচন; ১২শ—গৃহের গর্ভবিন্যাস অর্থাৎ সঙ্কল্পিত বাটীর মধ্যস্থলে মূল-ভিত্তি-স্থাপন; ১৩শ—উপপীঠ (pedastals); ১৪শ—অধিস্থান (basement); ১৫শ—বিবিধ স্তম্ভের বিবরণ এবং তাহাদের পারিপ্রেক্ষিতিক পরিমাণ; ১৬শ—প্রস্তর (entablature); ১৭শ—বৃহৎকাষ্ঠাদির যোজনা ও তাহার বিবরণ; ১৮শ—বিমান, দেবালয় এবং প্রাসাদাদির বিবরণ; ১৯শ—হইতে ২৮শ—পর্য্যন্ত দশটি অধ্যায়ে মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে চূড়া এবং একতল হইতে ক্রমান্বয় দ্বাদশতল পর্য্যন্ত তাহাদের পরিপ্রেক্ষিতিক পরিমাণসহ বিস্তৃত বিবরণ; ২৯শ—প্রাকার ও দেবালয়ের বহিরঙ্গন; ৩০শ—দেবালয়-গাত্রে সংরক্ষিত দেবতাদিগের বিবরণ; ৩১শ—গোপুর বা সিংহদ্বার ও তাহার চূড়াসংযুক্ত গৃহ; ৩২শ—মণ্ডপ (porticos); ৩৩—শালা (hall) দালান, ৩৪শ—নগরের বিবরণ; ৩৫শ—সাধারণ বাসগৃহ; ৩৬ ও ৩৭শ—বহির্দ্বার ও পুরদ্বারের পরিমাণ; ৩৮ও ৩৯শ -প্রাসাদ বা রাজাট্টালিকার বিবরণ; ৪০শ—রাজকুমার ও রাজপরিবারের বিবরণ; ৪১শ—রথাদির নির্ম্মাণ-বিধি; ৪২—চৌকি, খট্টা, গদি, বিছানা ইত্যাদি বিষয়; ৪৩ হইতে ৪৫শ-দেবতার ও রাজার সিংহাসন প্রস্তুত করিবার নিয়ম; ৪৬শ—অভিষেকবিধি; ৪৭শ—মণিময় অলঙ্কারাদি; ৪৮শ—ব্রহ্মাদি দেবমূর্ত্তি গঠন প্রণালী; ৪৯শ—শিবলিঙ্গ; ৫০শ—দেবতাদিগেব আবাহন-উপলক্ষে স্নানাদির রীতি; ৫১শ—শক্তিমূর্ত্তি; ৫২শ—হইতে ৫৫শ—অধ্যায় পর্য্যন্ত যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব

মুনিঋষি ও অন্যান্য বিবিধ গঠন প্রণালী; ৫৬-৫৭শ—দেবতাদিগের বাহন ও যানাদির বিবরণ; ৫৮শ—মূর্ত্তি-সমূহের চক্ষু ইত্যাদি সূক্ষ্মস্থান খোদিত করিবার নিয়ম, দেবতা-প্রতিষ্ঠা ও উৎসবাদির বিবরণ এবং গ্রন্থের উপসংহার লিখিত আছে।

রামরাজ-কথিত দ্বিতীয় পুস্তক "ময়মত"। অনেকে মনে করেন, ইহা সূর্য্যসিদ্ধান্ত-লেখক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া থাকিবে। রামায়ণোক্ত দশাননের রাজভবন ময়মতকারের তত্ত্বাবধানেই নির্ম্মিত বলিয়া কথিত আছে। রামায়ণে তিনি "ময়দানব" বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহাভারত পাঠেও জানিতে পারা যায়, যুধিষ্ঠিরের রাজসভাও 'ময়দানব' নামক কোন এক প্রসিদ্ধ স্থপতি কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হইয়াছিল। রামায়ণের ময়দানব এবং মহাভারতের ময়দানব যে একই ব্যক্তি পুরাণাদি পাঠে সাধারণতঃ তাহাই মনে হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াও বোধ হয়। বাস্তবিক ত্রেতায় লঙ্কাধিপতি রাবণের অট্টালিকা বা প্রাসাদ-নির্ম্মাণ, সে কোন অতীত যুগের কথা আর তাহার কতকাল পরে দ্বাপরের শেষে বা কলির প্রারম্ভ-সময়ে যুধিষ্ঠিরের রাজসভা একই ব্যক্তি দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। বিশেষ পুরাণাদির মধ্যে ময়দানব পরশুরামের মত সপ্ত চিরজীবীর মধ্যে অন্যতম বলিয়াও কোথাও বর্ণিত নাই। সুতরাং এমন অবস্থায় সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেই প্রাচীনকালে ভারতে বিশ্বকর্ম্মার প্রতিম আদি 'ময়' হইতে বংশপরম্পরায় বহু ব্যক্তি এই স্থপতিবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বহু নরপতির আদেশক্রমে তাঁহারা ভারতের নানাস্থানে অসংখ্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বংশের আদিপুরুষ গোত্র ও প্রবরকারের ন্যায় সেই আদি 'ময়' নামেই পরিচিত হইতেন। ভারতে এইরূপ বংশ বা কুলাগত ভাবে যে কোন বিদ্যার চর্চ্চা অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা চিরকালই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ইহা কাহারই অবিদিত নাই। ময়-বংশীয়গণ সময় সময় তাঁহাদের আবিষ্কৃত স্থাপ্রত্য-বিজ্ঞানের বহুতত্ত্বপূর্ণগ্রন্থ রচনা করিয়া আদি 'ময়' প্রণীতা গ্রন্থের পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। স্থাপত্য-শিল্প-বিষয়ক পূর্ব্বোদ্ধৃত যে কয়খানি গ্রন্থের বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই দাক্ষিণাত্য হইতে সংগৃহীত এবং একই বিষয় লইয়া প্রায় একই ধরণে লিখিত, গ্রন্থগুলির নামও প্রায় এক ভাবের। এই সকল গ্রন্থের আলোচনা-ব্যপদেশে ভারতের আরও একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। এ স্থলে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না।

মানসারাদির রচয়িতা ময়বংশীয়গণ পুরাণাদির মধ্যে "দানব" বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহারা অনার্য্য ছিলেন না। তাঁহার বহুকাল হইতে দাক্ষিণাত্যে প্রবাসী বা তথায় উপনিবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থই তাহারা প্রথম পরিচয়স্থল। তাঁহারা বংশ-পরম্পরায় উক্ত প্রদেশে বসবাস করিয়াও আপনাদিগের আদিম ভাষা বিস্মৃত হন নাই

বা তাহাতে তিলমাত্র অবহেলা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা অনার্য্য হইলে এই সকল গ্রন্থ কখনই সুসংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেন না। কারণ দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়াদি ভাষাও নিতান্ত আধুনিক নহে; তাহা যেমন প্রাচীন, তেমনই সাহিত্য-সম্পদেও পরিপুষ্ট। গ্রন্থের লিখিত বিষয় মধ্যেও কোন স্থলে অসভ্যতা বা বর্ব্বরতার ছায়ামাত্রও নাই। অধিকন্তু আর্য্যের বর্ণাশ্রম, ধর্ম্মানুগতশিক্ষা ও সংস্কারের উপদেশ দৃঢ়তরভাবে তাহাতে বর্ণিত আছে। তবে ময়বংশীয়গণকে "অসুর" বা দানব বলিয়া পুরাণাদি গ্রন্থে পরিচিত করিবার কারণ কি? এতদ্‌সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, দৈত্য-দানব বলিয়া পূর্ব্বে কোন স্বতন্ত্র জাতি ছিল না। 'বীরমালায়' উদ্ধৃত ঋগ্‌বেদের নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে প্রমাণিত হয় যে, 'দস্যু' অর্থেই সেকালে দৈত্য ও দানবাদি শব্দ ব্যবহৃত হইত।

'ইন্দ্রঃ সমুৎসু যজমানমার্য্যং প্রবদ্বিশ্বেষু শতমূতিরাজিষু
মনবে শাসদ্‌ব্রতান্ ত্বচং কৃষ্ণামরন্ধয়ৎ।।'

অন্যত্র— "নানা হি অগ্নে অবসে স্পর্দ্ধন্তে রায়ো অর্য্যঃ।
তূর্ব্বন্তো দস্যুমায়বো ব্রতৌঃ শিক্ষান্তে অব্রতম।।"
"ত্বং হি শূরঃ সনিতা চোদয়ো মনুষো রথম্।
সহাবান দস্যুং অব্রতমোযঃ পাত্রং ন শোচিষা।।"

যাঁহারা জগতে শান্তি ও সভ্যতার চিরশত্রু ছিলেন, তমোগুণের পূর্ণ-অবতাররূপে জগতে আবির্ভূত হইয়া মানব-সমাজে সতত বিভীষিকার রাজ্য বিস্তার করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তাঁহারাই দস্যু বা দানব বলিয়া পুরাণাদির মধ্যে বর্ণিত হইয়াছেন। প্রাচীনকালের বৃত্র, তারক, শুম্ভ, নিশুম্ভ, ত্রিপুর প্রভৃতি ভীম-বিক্রান্ত অসুরগণ, হিরণ্যকশিপু, কংশ, বাণ, জরাসন্ধ আদি প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতিগণের বিষয় পাঠ করিলে, সহজেই উপলব্ধি হয় যে, তাঁহারা অনার্য্য ছিলেন না, তাঁহারা কোনরূপ অশিক্ষিত বা অসভ্যও ছিলেন না। রাজ্যশাসন ও রণ-নৈপুণ্যাদি রাজোচিত ধর্ম্মেও তাঁহারা অনভিজ্ঞ ছিলেন না। বরং তাঁহাদের সুন্দর কার্য্যশৃঙ্খলা, রণকৌশল ও বিবিধ যুদ্ধাস্ত্রাদির ব্যবহার-বাহুল্যে অনেক সময় আর্য্য ও দেবতারাও স্তম্ভিত এবং রাজ্যচ্যুত হইতেন। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, অতি প্রাচীনকালে ভারতের আধিপত্য লইয়া দিতি ও অদিতির পুত্রগণের মধ্যে অনেক সময় তুমুল সংগ্রাম হইত। সেই সকল যুদ্ধে দৈত্যেরাও সময় সময় জয়লাভ করিতেন। দেববংশ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া বিজন অরণ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেন। আবার কালক্রমে কোন আদিতেয় বীরের অভ্যুত্থান হইলে অথবা কোন ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণবীরের সাহায্যেও দৈত্য-গ্রাস হইতে দেব-রাজ্যের উদ্ধার হইত। যাহা হউক, আর্য্যবংশসম্ভূত হইয়াও যাঁহারা বিপুল তেজ ও দুরাকাঙ্ক্ষ-পুষ্ট হইয়া স্বর্গ-মর্ত্ত্য রসাতল করতলগত করিবার

আয়োজন করিতেন, দেবতা ও তদনুগত আর্য্য রাজন্যবর্গকে অবহেলা করিতেন এবং পরবর্ত্তী সময়ে ভারতে বৈষ্ণব-মত সু প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাতে আদৌ আস্থা স্থাপন না করিয়া কঠোর শৈবমতাবলম্বী হইয়া থাকিতেন, তাঁহারাই প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক "দানব" নামে অভিহিত হইতেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত কংশ, বাণ, ও জরাসন্ধ প্রভৃতি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। এতদ্ব্যতীত সেই সকল ব্যক্তির অনুগত আত্মীয়-স্বজনও দানব নামে পরিচিত হইতেন। শিল্পাচার্য্য স্থপতি-কুল-রবি আদি "ময়" প্রত্যক্ষ বিষ্ণুবিদ্বেষী, কঠোর শৈব ও প্রভূত বিক্রমশালী রাবণ প্রভৃতির সহায়তাপ্রাপ্ত অনুগত ব্যক্তি হইবার কারণেই, এবং শৈবপ্রধান দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে বহুকাল উপনিবিষ্ট হইবার কারণেই উত্তর-ভারতের বৈষ্ণব কবি ও ঐতিহাসিকগণের নিকট তিনি দানব আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিলেন। তবে রামায়ণের সময় হইতে মহাভারতের সময় পর্য্যন্ত ময়বংশীয়গণই যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থপতি বা শিল্পাচার্য্যের পদে আসীন ছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের বহু পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ আর্য্যের আদি শিল্পগুরু বা দেবতা বিশ্বকর্ম্মাকে তাঁহারা যে, আপনাদের কুলদেবতা বলিয়া পূজা করিতেন, সে কথা তাহাদের রচিত গ্রন্থ মধ্যেই বর্ণিত আছে। যাহা হউক, তাঁহারা যে কারণে উত্তর ভারতে দানব বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন, মহাবীর রাবণ প্রভৃতিও বোধ হয়, সেই পূর্ব্বোক্ত কারণে উত্তর-ভারতীয় কাব্য ও ইতিহাসের মধ্যে "রাক্ষস" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকিবেন। নতুবা রাবণ পাণ্ডিত্যে ও নীতিনিপুণতায় নিতান্ত সাধারণ পুরুষ ছিলেন না। বিষ্ণু-অবতার সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রও তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকিই তাঁহার রামায়ণে সে কথা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা অনুমান হয় যে, পূর্ব্ববর্ণিত দৈত্য ও দানবদিগের ন্যায় লঙ্কাধিপতি রাবণও আর্য্য-বংশসম্ভূত ছিলেন। কোন কোন শাস্ত্রে সে কথার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত ও আভাষও আছে। তিনি নাস্তিক বা ভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাসীও ছিলেন না; তাঁহার রচিত "অর্ক-প্রকাশ" প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি কঠোর শৈব ছিলেন, তৎকৃত "শিবতাণ্ডব" স্তোত্র ভারত-প্রসিদ্ধ।

কেবল রাক্ষস ও দানব বলিয়া নয়, ভারতের বাহিরে ভিন্নদেশবাসী বা ম্লেচ্ছ বলিয়াও যাহারা পরিচিত, তাঁহারাও এই বিশাল আর্য্যবংশসম্ভূত। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশাবতংশ মহারথ সগর আর্য্যগণের মধ্যে কতকগুলি ম্লেচ্ছ অর্থাৎ অনাচারী, অত্যাচারী ও দুর্বৃত্ত ব্যক্তিকে বেদপাঠ ও বষট্কারবিহীন করিয়া কঠোর দণ্ডসহ ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়া গিয়াছিলেন। কুলগুরু মহামতি বশিষ্ঠের পরামর্শেই তাঁহারা প্রাণে বিনষ্ট না হইয়া ঐরূপ বিশেষ বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া এদেশ দূরীভূত হইয়াছিলেন। মহারাজ সগর শকগণের মস্তকের অর্দ্ধভাগ এবং যবন ও কাম্বোজগণের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন

করাইয়াছিলেন, পারদগণ মুক্তকেশ এবং পহ্নবগণকে শ্মশ্রুধারণের দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। শক, চীন হূণাদি জাতিসমূহ তাঁহাদেরই বংশধর। সহস্র সহস্র শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও সেই বংশীয়গণ তাঁহাদের পিতৃপুরুষের লাঞ্ছনা-চিহ্ন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। হরিবংশের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"সগরস্তাং প্রতিজ্ঞান্তু গুরোর্ব্বক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্ম জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকারহ।।
অর্দ্ধ শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈবচ।।
পারদা মুক্তকেশাচ পহ্নবা শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায় বষট্কারা কৃতাস্তেন মহাত্মনা।।"

ইহার পর-অংশেই স্পষ্টতরভাবে লিখিত আছে যে, শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, কোল-সর্প, মহিষ, দর্ব্ব, চোল ও কেরল ইহারা সকলেই ক্ষত্রিয়। বশিষ্ঠের বচনানুসারেই ইহারা ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহা দ্বারা বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, যাঁহারা য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্দিগের রচিত গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া দ্রাবিড়-স্থাপত্যকে স্বতন্ত্র এবং আর্য্য-স্থাপত্য অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অতি প্রাচীনকালে আর্য্যগণই এই সকল প্রদেশে উপনিবিষ্ট সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম কর্ম্ম, শিল্প ও সাহিত্যাদির প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তাহারই ফলে এতদঞ্চলে এমন কি ভারত-মহাসাগরস্থিত যক প্রভৃতি দীপাঞ্চলে আর্য্য-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের ভূরি ভূরি নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে উপর্য্যুপরি ভিন্নদেশীয় ও কঠোর ধর্ম্মান্তরবিশ্বাসী জন-মণ্ডলীর অবিরত উপদ্রব ও অত্যাচারে প্রাচীন আর্য্য-স্থাপত্যের চিহ্নমাত্রও এখনও নাই; একথা এক্ষণে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে সে প্রাচীন আদর্শ না থাকিলেও আর্য্যশাস্ত্র ও সাহিত্যে তাহা অতি স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে দাক্ষিণাত্যে কোনদিনই সেরূপ বিজাতীয় অত্যাচার না হইবার কারণ প্রাচীন স্থাপত্যাদির যে বিশেষ অঙ্গহানী হয় নাই এ কথা বলাই বাহুল্য!

পূর্ব্বোক্ত স্থাপত্য-গ্রন্থের মধ্যে কশ্যপঋষি প্রণীত "কাশ্যপ" নামক গ্রন্থখানিও অতি প্রাচীন। ইহাতেও আর্য্য-স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য-সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। ইহা নাটকাকারে লিখিত, বিষয়সমূহ মানসারেরই অনুরূপ—কেবল বিভিন্ন ধরণের সঙ্কলিত মাত্র।

"সকলাধিকার" বা "সকলাধিকার-চন্দ্রিকা" নামে আর একখানি গ্রন্থ জীর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, এখানি মহামুনি অগস্ত্য প্রণীত। মহাভারত-বর্ণিত পাণ্ড্য ও চোলবংশীয়দিগের রাজত্ব-সময়ে ইহা রচিত হইয়াছিল, ইহার যে অংশটুকু পাওয়া

গিয়াছে তাহা অতি সামান্য মাত্র; তাহাতে কেবল ভাস্কর্য্য শিল্প-সম্বন্ধে মূর্ত্তিসকলের পরিমাণাদির বিষয় এমন বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিত আছে যে, তাহা পাঠে অনুমান হয়, ইহার সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি অত্যন্ত বৃহৎ এবং তাহা যে "মানসার" অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠতর সে বিষয়ে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যদি কোন সময়ে সেই বিরাট্ গ্রন্থের সম্পূর্ণাংশ পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতীয় শিল্পকলা যে কত উচ্চ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা দেখিয়া সমগ্র জগৎ একদিন বিমোহিত হইয়া যাইবে।

অর্থশাস্ত্রের কোন কোন অংশে সাংগ্রামিক-স্থাপত্য অর্থাৎ দুর্গাদির নির্ম্মাণ-কৌশলও বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে।

"মনুষ্যালয়-চন্দ্রিকা"য় সাধারণ গৃহাদির প্রস্তুতি-প্রণালী লিখিত আছে। যাহা হউক, এই সকল গ্রন্থ হইতেই যথাসাধ্য সার সঙ্কলন করিয়া, প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্য-স্থাপত্যের তুলনাসহ ক্রমে ক্রমে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। ভারতের মধ্যে এখনও যে সকল স্থাপত্যের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, যথাসাধ্য সংগৃহীত তাহারও প্রতিলিপি এই আলোচনায় ব্যবহার করিবার ইচ্ছা আছে।

দেবশিল্পী ও শিল্পীলক্ষণ

আর্য্যের শিল্পীঠাকুর বিশ্বকর্ম্মা দেবশিল্পী বা দেব-স্থপতি বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ন্যায় চতুরাননবিশিষ্ট এবং সমগ্র শিল্পশাস্ত্রের অধিপতি। এদেশে ইহার প্রচলিত ধ্যান ও প্রণাম-মন্ত্র নিম্নলিখিতরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

"দংশপাল মহাবীর সুচিত্র কর্ম্মকারক।
বিশ্বধবক্ত্বঞ্চ দেবেশ বাসনামানদগুধবক্।।" (ধ্যান)
দেবশিল্পিন্ মহাভাগ দেবানাং কার্য্যসাধক।
বিশ্বকর্ম্মন্নমস্তুভ্যং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ।। (প্রণাম)

ইঁহার চারিটী পুত্র (১) কুমার বিশ্বকর্ম্মা, (২) সত্বস্ব, (৩) মায়া, (৪) মনু। এতদ্ব্যতীত আরও চারি পুত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহাদের নাম কোথাও পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, তাঁহাদের কার্য্যাবলীর এইরূপ নির্দ্দেশ আছে, যথা; স্থপতি (Architect); সূত্রগ্রাহী (Measurer), বর্দ্ধকী বা বর্দ্ধসী (Joiner) এবং তক্ষক (Carpenter); এই চতুর্ব্বিধ শিল্পীরা জ্ঞানাদির পরিচয়-সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্থপতি—সমগ্র শিল্পশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ, নিবিষ্টমনা, নিষ্কলঙ্কচরিত্র, উদারহৃদয়, সত্যনিষ্ঠ এবং দ্বেষ-হিংসা-বিবর্জ্জিত হইবেন। সূত্রগ্রাহী প্রায় স্থপতির ন্যায় গুণসম্পন্ন হইবে, তবে গণিতশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। স্থপতির পুত্র বা প্রধান শিষ্যই সূত্রগ্রাহী হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। বর্দ্ধকী স্থিরচিত্ত, ধীর, শান্ত ও মানচিত্র-অঙ্কনে নিপুণ ও

পরিপ্রেক্ষিতাদি (Perspective) বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। তক্ষক সদানন্দচিত্ত ও সমগ্র যান্ত্রিকশিল্পে কৃতকর্ম্মা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে উক্ত চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম করিবার বিধি ছিল। এই সকল লক্ষণ ব্যতীত সর্ব্বপ্রধান স্থপতি-সম্বন্ধ আরও লিখিত আছে যে, সমগ্র গণিত শাস্ত্র, অঙ্কনবিদ্যা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও পুরাণতত্ত্ব, আয়ুর্ব্বেদ-স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগে কোন পাশ্চাত্যস্থপতিরও এতাদৃশ গুণের উল্লেখ আছে কি? যখন ভারতে এমন দিন ছিল, যখন স্থপতির লক্ষণসমূহ এত উন্নত ছিল, তখন ভারতের যে কি ভাব ছিল, তাহা কি আজ আমরা একবার চিন্তা করতে সমর্থ হই? বাস্তবিক প্রধান স্থপতির এই সকল গুণ থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই লক্ষণসমূহ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সে কালেও কর্ম্মের সুন্দর বিভাগ-বিধি ছিল। সমুন্নত পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পূর্ণতার দিনে যেমন সর্ব্ববিষয়ে কর্ম্ম-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সে কালেও ঠিক তেমনই ছিল। সর্ব্বপ্রধান স্থপতি (চিফ্ আর্কিটেক্ট) সাধারণ স্থপতি অর্থাৎ (ইঞ্জিনিয়ার বা আর্কিটেক্ট), সূত্রগ্রাহী (মেজারার বা ওভারসিয়র), বর্দ্ধকী (জয়েনার বা ড্রাফ্‌সম্যান) এবং তক্ষক (কার্পেন্টার ও স্কাল্‌প্‌চার) ইত্যাদি কারিগরিসমূহ। এই সকল ব্যক্তি দ্বারাই সমস্ত স্থাপত্য-কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে।

আর্য্যদিগের দৈর্ঘ্য-বিস্তার-পরিমাণ-নির্দ্দেশ

প্রাচীনকালে আর্য্যগণ শিল্পশাস্ত্রের আলোচনা উদ্দেশে সর্ব্বপ্রথমেই পরমাণু হইতে সকল বিষয়ে পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা ঃ

৮ পরমাণুতে	এক রথরেণু	৮ উৎকুণে	এক যব
৮ রথরেণুতে	এক বালাগ্র	৪ যবে	এক অঙ্গুলি
৮ বালাগ্রে	এক উৎকুণা	১২ অঙ্গুলিতে	এক বিতস্তি
১২ আঙ্গুলি বা ২বিতস্তিতে	এক শিশুহস্ত	২৭ অঙ্গুলিতে	এক ধনুরাগ্রহ হস্ত
২৫ অঙ্গুলিতে	এক প্রাজাপত্য হস্ত	৪ ধনুরাগ্রহ হস্তে	এক দণ্ড, যষ্টি বা ধনু
২৬ অঙ্গুলিতে	এক ধনুর্মুষ্টি হস্ত	৮ দণ্ড যষ্টি বা ধনুতে	এক রজ্জু

ইহাতে চারি প্রকার হস্তের পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের পরিমাণ করিবার জন্যই তাহাই উল্লেখ লিখিত আছে।

শিশুহস্ত—বস্ত্র, খট্টা, পালঙ্গ, রথ ও যানাদি সাধারণ জিনিস মাপিবার জন্য এই ২৪ অঙ্গুলি পরিমাণ শিশুহস্তের প্রচলন আছে।

প্রাজাপত্য হস্ত—ইহা ২৫ অঙ্গুলি পরিমিত। ইহা দ্বারা মানবদেহে, মূর্ত্তি, দেব-বিগ্রহ, মন্দির ও বিমানাদি পরিমিত হইয়া থাকে।

ধনুর্মুষ্টি হস্ত—২৬ অঙ্গুলি পরিমিত হস্ত, ইহার সাহায্যে গৃহ, অট্টালিকা ও তাহার ভূমি পরিমিত হইয়া থাকে।

ধনুরাগ্র হস্ত—পথ, গ্রাম ও নগরাদি পরিমাণ করিবার জন্য এই ২৭ অঙ্গুলি পরিমিত ধনুরাগ্র হস্ত ব্যবহৃত হইত।

ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের পরিমাণ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের পরিমাণ-দণ্ডের ব্যবহার এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ গজ, ইলাহি গজ ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। য়ুরোপের মধ্যে যে এ প্রথা প্রচলিত নাই তাহা নহে। উদাহরণস্বরূপ অশ্বের উচ্চতা আদি পরিমাণ করিতে হইলে এখনও মুষ্টিহস্ত ব্যবহারের প্রচলন আছে।

বেদের সরমা

শ্রী শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সরমা শব্দের অর্থ কুকুরী। বেদে যে 'সরমা' নাম পাওয়া যায়, তাহাও দেবকুকুরী অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সরমা বেদে ইন্দ্রের দূতীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পণিগণ যে গাভী সকলকে লুকাইয়া রাখে, ইন্দ্রের আদেশে সে তাহাদের সন্ধান আনিয়া তাঁহাকে দেয়।

সরমাকে আমরা যে কুকুরীরূপে বর্ণিত দেখিতে পাই, বেদে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আর্য্যজাতির পাশ্চাত্য-শাখায় ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সরমারই অনুরূপ গ্রীকদিগের মধ্যে আমরা সিরিয়াস্ নাম প্রাপ্ত হই। এই সিরিয়াস্ (Sirius) স্বরূপতঃ নক্ষত্র, কুকুর নহে। গ্রীকভাষার এই সিরিয়াস্ (Sirius) নামের লাটিন ভাষায় আমরা Canicula রূপ প্রাপ্ত হই। Canicula (dog-star) শব্দের মূল Canis সংস্কৃত কুকুরবাচক শ্বন্ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। আমরা সরমার পাশ্চাত্য অনুবাদ যে কুকুর-নক্ষত্র পাইয়াছি, তাহার উদয়-সময় পাশ্চাত্য-ভাষায় 'dog-days' বা কুকুর-দিবস নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই 'কুকুর-দিবসের' কাল ৩রা জুলাই হইতে ১১ই আগষ্ট পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বর্ষাঋতুর সহিত কুকুরনক্ষত্রের সম্পর্ক থাকিতে পারে বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের অনুসন্ধানে Sirius বা কুকুরনক্ষত্রের উদয়ে উত্তর-ভারতে বর্ষা আরম্ভ হওয়ারই প্রমাণ পাওয়া যায়, —

..."to mark the beginning of the new and the end of the old year, at the time of the summer solstice, when the star Sirius, the Zend, Tish-trya rises and the raius in Northern Indian begin" (*The Ruling Races of Prehistoric Times* by J.I. Hewitt, Vol. I. p. 14.)

উপরি উক্ত Sirius গ্রীক্ মহাকবি হোমার কর্ত্তৃক Orion বা মৃগশিরা নক্ষত্রই কুকুররূপে বর্ণিত হইয়াছে—This was the dog-star, Sirius called by Homer the dog of Orion, and Mriga-Vyadha, the deer-hunter by the Hindus." *Ibid,* p. 23.

মৃগশিরা নক্ষত্রের সহিত এইরূপ যোগ হইতে আমরা Sirius নামের প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করিতে সমর্থ হই। Sirius মৃগশিরার শিরস্ শব্দেরই যে স্পষ্ট অপভ্রংশ, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। Sirius প্রথম মৃগশিরানামক সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জকেই

বুঝাইত বলিয়া বোধ হয়। পরে তন্মধ্যস্থিত অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রবিশেষের সরমা নামের সহিত যোগ হইতে সরমার কুকুর অর্থানুসারে ইহার অর্থও কুকুর হইয়াছে এবং তদনুসারে ইহার অনুবাদও dog-star বা কুকুর-নক্ষত্র হইয়াছে। কেবল যে Sirius নক্ষত্রই সারমেয়ের কুকুর অর্থানুসারে 'কুকুর-নক্ষত্র' নাম হইয়াছে তাহা নহে। কিন্তু বেদে সারমেয়ের অর্জ্জুন বা শ্বেতবর্ণ বিশেষণ হইতে গ্রীকদিগের অপর এক নক্ষত্রের নাম যেমন আর্গাস্ (Argus) হইয়াছে, তেমনই ইহা কুকুররূপেও পরিচিত হইয়াছে। সেই ঋক্‌টী নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

"যদর্জ্জুন সারমেয় দতঃ পিশংগ যচ্ছসে।
বীবভ্রাজংত ঋষ্টয় উপস্রক্কেষু বস্পতো নিষুস্বপ।।"

৭ম মণ্ডল ৫৫ সূক্ত।

"হে শ্বেতবর্ণ ও কোন কোন অংশে পিঙ্গলবর্ণ সরমাপুত্র! তুমি যখন দন্তপ্রকাশ কর, তাহা আমার নিকট আহারের সময় সৃক্কণীপ্রদেশে আয়ুধের ন্যায় বিশেষরূপে শোভা পায়। তুমি সুখে নিদ্রা যাও।"

উদ্ধৃত ঋকে বাস্তোস্পতি দেবতাই সারমেয়রূপে আখ্যাত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই যে গ্রীক্-সাহিত্যে Argus (আর্গাস্) ও ইউলিসিসের অনুপস্থিতি সময়ে তাঁহার বাটীর রক্ষকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উপরি উদ্ধৃত ঋক্-সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিৎ হিউইট্ উপরি উল্লিখিত মর্ম্মেই মন্তব্য করিয়াছেন। যথা—"...The dog called in the Rigveda, Arjuna the fair one, and Sarameya, the yellow dog... who shows his teeth is invoked as *Vastoshpati* the lord or guardian (*pati*) of the house (*Vastu*) the dog Argus, who guards the house of Odysseus during his absence" (*Ibid*, Vol. II. p. 23)

প্রথমতঃ Orion বা মৃগশিরা নক্ষত্র বৎসরান্তকরূপে পূজিত হইত, পরে বর্ষাপ্রবর্ত্তকরূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়া Sirius বিশেষ প্রাধান্য-লাভ করে, কিন্তু তাহা হইলেও মৃগশিরার কুকুররূপেই ইহা পরিচিত হয়। এ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হিউইট্ এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

...it was the change from the earliest form of his worship as the year-star Orion to that of the rain-star Sirius who ruled the year of five seasons beginning with the summer solstice, which was officially recognised when Is—is Satit the star Sirius called by Homer the dog of Orion, brought back the body of Osiris from Byblus to Egypt." (*Ibid*, p. 409)

এই প্রকারে এক দিকে Orion-এর সহিত মৃগশিরার সম্বন্ধ হইতে এবং অন্য দিকে ইহাই উজ্জ্বল নক্ষত্রের সহিত সরমার সম্বন্ধ হইতে Sirius কুকুরনক্ষত্র হইয়াছে।

এক্ষণে সরমা বা কুকুর যে পণিদিগের নিকট হইতে গাভী উদ্ধার করেন তাহার তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সরমা যখন Sirius বা বর্ষানক্ষত্র হইতেছে, তখন গাভী সকল যে বর্ষাকালীন মেঘ হইবে তাহা অল্পায়াসে বুঝিতে পারা যায়। বর্ষানক্ষত্রের উদয়ে মেঘসকল আকাশে পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে; তৎপূর্ব্বে মেঘসকল পরিদৃশ্যমান হয় না, ইহাই মেঘদিগের লুক্কায়িত থাকায় সরমাকর্ত্তৃক ইহাদিগের উদ্ধার বলিয়া রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইতেছে।

গাভী সকল পণিদিগের দ্বারা লুক্কায়িত হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়, সেই পণিসকল কে? ও কোথায় গাভীদিগকে লুক্কায়িত রাখে? তাহা বুঝিতে পারিলেই সরমার উপাখ্যানের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাই হয়। বেদের পণিসকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী অনার্য্য জাতি বলিয়াই পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতসকল প্রমাণ পাইয়াছেন। বেদের ভাষ্যে (১/১২৪/১০) সায়ণাচার্য্যও পণি বণিক্ অর্থেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা ইহাদিগকে সমুদ্র-বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ফিনিসীয় জাতি বলিয়াই মনে করি। পণি ও ফিনিসীয় এই উভয়ের মধ্যে শব্দগত বিশেষ সাদৃশ্যও বর্ত্তমান। ফিনিসীয়দিগের দেশ আসিয়া-মাইনরের সমুদ্র-বেষ্টিত সিরিয়া উপকূলস্থিত ফিনিসিয়া। পণিদিগের দ্বারা গাভী বা মেঘসকল অবরুদ্ধ হওয়ার অর্থ আমাদিগের নিকট সমুদ্রে জলরূপে মেঘের অবস্থানের রূপক বলিয়া বোধ হয়। ফিনিসীয় জাতি সমুদ্র-বাণিজ্য করিত বলিয়া, সমুদ্র তাহাদিগের দুর্গরূপে বর্ণিত হওয়া অস্বাভাবিক হয় না। Sirius বা সরমার উদয়ে তখন সূর্য্যের প্রখর উত্তাপহেতু সমুদ্র হইতে অপর্য্যাপ্ত বাষ্প উত্থিত হইয়া আকাশ-মার্গে মেঘরূপে সঞ্চিত হয়। ইহাই সরমা কর্ত্তৃক গাভীদিগের আবিষ্কার। দক্ষিণ-পশ্চিম মন্‌সুন (monsoon) যোগে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে পূর্ব্বোক্ত মেঘরাশি ভারতবর্ষে পরিচালিত হইয়া যে বৃষ্টিপাত করে, ইহাই ইন্দ্রকর্ত্তৃক গাভীদিগের উদ্ধাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে বেদের একটী ঋক্ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে কিরূপে বায়ুযোগে গুহা-লুকায়িত গাভী সকলকে উদ্ধার করেন তাহারই বর্ণনা পাওয়া যায় যথা ঃ

"বীলু চিদারুজত্নু ভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ। অবিন্দ উস্রিয়া অনু।।"৫

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৬ষ্ঠ সূক্ত।

"হে ইন্দ্র! দৃঢ়-স্থানের ভেদকারী এবং বহনশীল মরুৎদিগের সহিত তুমি গুহার গাভী সমুদয় অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে।"

মেঘ যে সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হয়, নিম্নোদ্ধৃত ঋকেই তাহার স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

"সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ।"[৭]

ঋগ্বেদ ৭ম মণ্ডল ৫৫ সূক্ত।

মেঘ বর্ষণ করে বলিয়াই 'বৃষভ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে মেঘ যে গাভীরূপে কল্পিত হইতে পারে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকারেই সমুদ্র গাভীর গুহারূপে পরিণত হইয়াছে।

ফিনিসীয়দিগের স্থানের সহিত যে Orion বা মৃগশিরা নক্ষত্রের যোগ আছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে প্রমাণিত হয় ঃ "This was the chief seat of the phaenicia worship of Tammuz or Dumuzi (Orion)" (*Ibid*, p. 409)। পণিগণ বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ও অনার্য্য বলিয়াই আর্য্যগণ তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করিতেন "Their special avertion were the trading races, whom they called panis and who are shown to be non-aryan in speech." (*Ibid*, p. 106)

সারমেয় বা কুকুর-নক্ষত্র সিরিয়াসই যে বর্ষা-মেঘ দক্ষিণ হইতে আনয়ন করে, তাহারও স্পষ্ট প্রমাণ পুরাতত্ত্বের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ঃ "...while Tistrya (Sirius) brings the rains from the southern constellation of Sata-Vacsa or Argo" (*Ibid*, p. 482)

বেদে সরমা ও পণির যে কথোপকথন আছে,—তাহাতে সরমা বহুদূরের বহুদিনের পথ জল অতিক্রম করিয়া যাওয়ারই উল্লেখ পাওয়া যায় যথা ঃ

"কিমিচ্ছন্তী প্রেদমানড্ দূরে হ্যধ্বা জগুঁরিঃ পরাচৈঃ।
কাস্মেহিতিঃ কা পরিতক্ম্যাসীৎ কথং রসয়া অতরঃ পয়াংসি।।"

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১০৮ সূক্ত।

"হে সরমা! তুমি কি বাসনায় এখানে আসিয়াছ? ইহা অতি দূরের পথ। এপথে আসিতে হইলে পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আসা যায় না, আমাদিগের নিকট এমন কি বস্তু আছে, যাহার জন্য আসিয়াছ। কয় রাত্রি ধরিয়া আসিয়াছ? নদীর জল পার হইলে কিরূপ?" রমেশ বাবুর অনুবাদ।

ইহাতে সমুদ্র পার হইয়া সরমার যাওয়ার আভাসই যেন পাওয়া যায়। কারণ রসা নদীর জল বলিয়া অনূদিত হইলেও, 'রস' শব্দে যখন জল বুঝায়, তখন রসার অর্থ জলাধারই হয় এবং 'অর্ণব' শব্দের ন্যায় ইহাও সমুদ্রের বাচকই হয়। সুতরাং ইহাতে সরমার আবিষ্কৃত গাভী বা মেঘ যে দক্ষিণ সমুদ্র হইতে আনীত হয়, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

গাভী-হরণ ও উদ্ধার উপাখ্যানের সহিত যে ফিনিসীয় বা সিরীয়দিগের দেশেরই বিশেষ যোগ, বেদের নিম্নোদ্ধৃত ঋকে তাহার বিশেষ প্রমাণ পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে ঃ

"ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলম্।
ত্বাং দেবা অবিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ।"৫

ঋগ্বেদ ১মণ্ডল ও ১১ শ সূক্ত।

"হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি গাভী হরণকারী বল নামক অসুরের গহ্বর উদঘাটিত করিয়াছিলে; তখন বলাসুর নিপীড়িত দেবগণ ভয়শূন্য হইয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

উল্লিখিত ঋকের বল আসিয়রীয় "বল" নামধারী রাজগণ বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে, এবং আসিরীয়, অসুর নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এস্থলে আমরা শ্রদ্ধেয় রমেশ বাবুর মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—"ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আসিরীয় ইতিহাসের বাবিলনাধিপতি "বল" দিগের সহিত বৈদিক 'বলের' ঐক্য-সাধন করিতে উৎসুক, এবং তিনি আসিরীয় 'অসরের' সহিত অসুরের, ঐক্যসাধনে উৎসুক।" তাঁহার প্রণীত ঋগ্বেদের প্রথম দুই অধ্যায়ের ভূমিকা দেখ এবং তাঁহার প্রণীত Aryan witness দেখ। ঋগ্বেদানুবাদ ২৩ পৃঃ।

গ্রীক্‌বীর ইউলিসিসের গৃহরক্ষক কুকুর আর্গাসের (Argos) যে আমরা শত চক্ষুর উল্লেখ পাই, উপর শতভিযানক্ষত্রের সহিত উহার অভিন্নতা হইতে তাহার তাৎপর্য্য আমরা পরিষ্কার উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। শত নক্ষত্রের সমষ্টিভূতা বলিয়াই শতভিষা নাম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আর্গাস শত নক্ষত্রের সমষ্টিভূত হওয়াতেই এই শতনক্ষত্র ইহার চক্ষুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে শতভিষার শতনক্ষত্রের দ্বারা যেমন আর্গাসের শত চক্ষুর ব্যাখ্যা হইতেছে—তেমনই আর্গাসের কুকুররূপ কল্পনা দ্বারাও নক্ষত্র-কুকুররূপে কল্পিত হওয়ার ব্যাখ্যা হইতেছে।

বেদে দাহের মন্ত্রে প্রেতাত্মার পথে আমরা দুইটি প্রহরীকুকুরের উল্লেখ প্রাপ্ত হই যথা—

"অতিদ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা।
অথাপিতৃন্ত সুবিদত্রাঁ উপেহি যমেন যে সধমাদং মদন্তি।।"১০

"হে মৃত! এই যে দুই কুক্কুর, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষু ও বর্ণবিচিত্র, ইহাদিগের নিকট দিয়া শীঘ্র চালিয়া যাও। তৎপর যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সহিত সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন কর।"

এস্থলে কুকুর দুইটী "সারমেয়" শব্দের দ্বারা বিশেষিত হওয়ায়, সরমার সহিতই ইহাদের যোগ প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং সরমা যেরূপ নক্ষত্র, এই দুইটীও যে তদ্রূপ নক্ষত্র, তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। এই নক্ষত্র দুইটীর অবস্থান কোথায় এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। ইহাদের অবস্থান ছায়াপথে (Milky way) বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে। "বৃহদ্দেবতা" নামক বৈদিক গ্রন্থে সরমা সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন হয়। উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সরমা ইন্দ্রকর্ত্তৃক পণিদিগের নিকট হইতে গাভী উদ্ধার করিয়া আনয়ন করিবার জন্য প্রেরিত হইলে পণিগণ গাভীদিগের দুগ্ধপান করাইয়া তাহাকে আপনাদের বশীভূত করে। তখন সরমা প্রত্যাবর্ত্তনকরত গাভী দেখিতে পায় নাই বলিয়া, ইন্দ্রের নিকট প্রকাশ করে। ইন্দ্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিলে সরমা সেই দুগ্ধ বমন করিয়া ফেলে। এই বমনের দুগ্ধই ছায়াপথরূপে পরিগণিত হয়, এবং সরমা ইহার প্রহরীকার্য্যের জন্য নিযুক্ত হয়। ইহাতে সরমা যে চারি চক্ষুবিশিষ্ট কুকুর রূপ ধারণ করে, তাহাই যমের প্রহরী কুকুররূপে ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে।

বেদের প্রাগুক্ত দুই কুকুরের কথা জেন্দাবেস্তা গ্রন্থেও পাওয়া যায়। গ্রীক্‌দিগের Sirius যেরূপ সরমার অনুরূপ, তেমনই সরমার পরিণামভূত দুই কুকুরের ন্যায় সিরিয়াসের পরিণামভূত দুই কুকুরও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের একটীর নাম "কুয়োন" (Kuon) ও অপরটীর নাম "প্রশ্যোন"। এই উভয় নামের সহিত সংস্কৃত শ্বন্‌ ও প্রশ্বন্‌ শব্দের যথেষ্ট সাদৃশ্যই দৃষ্ট হয়। লাটীন্‌ ভাষায় এই উভয়েরই যে নাম Canis major (বৃহৎ কুকুর) ও Canis minor (ক্ষুদ্র কুকুর) হইয়াছে, তাহারও মূলে কুকুরবাচক বেদের শ্বন্‌ শব্দই বর্ত্তমান। উভয়ই ছায়াপথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত। এ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত হিউইট লিখিয়াছেন :

These are the two four-eyed dogs of the Zenda-Vesta, the twin dog-stars of the Greeks, Sirius or Kuon and Procyon the Sanskrit Svan and Prasvan, the dog (Shvan) and the fore (pra) dog Canis major and Canis-minor one in each side of the milky-way' (*Ibid*, Vol. II, p. 24.)

উপসংহারে নক্ষত্রের 'সরমা' নাম বা কুকুর নাম কেন হইল, তাহাই আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইহা দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় বলিয়া আমরা মনে করি। এক ব্যাখ্যা এই যে, সরমা প্রথম কুকুর বুঝাইত না, প্রথম বর্ষা-নক্ষত্রকেই বুঝাইত। বেদে ইহার যে 'অর্জ্জুন' বিশেষণ আমরা পাইয়াছি, ইহার 'উজ্জ্বল' অর্থদ্বারা সরমা যে উজ্জ্বল নক্ষত্রবিশেষের বাচক ছিল তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণই দেখা যায়। পরে সরমারই নিকটবর্ত্তী ছায়াপথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী উজ্জ্বল নক্ষত্রদ্বয়ের সরমার সহিত সম্বন্ধ হইতে যেমন "সারমেয়" নামে অভিহিত হইয়াছে, তেমনই কুকুরের ন্যায় বিনিদ্র ও অতন্দ্রিতভাবে ইহারা আকাশের পথে প্রহরীর কার্য্য করে বলিয়া কুকুরের নামে 'শ্বা' বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে। সরমা যে প্রথমে কুকুরের বোধক ছিল না, কুকুর অর্থে সরমা শব্দের প্রয়োগ যে অতীব বিরল তাহা হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কুকুর অর্থে "সারমেয়" শব্দের বহুল প্রয়োগ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথম

নক্ষত্রবাচক সরমা শব্দ হইতে কুকুরের সহিত সাদৃশ্য মূলে রূপকভাবে "সারমেয়" কুকুরের বাচক হইয়াছিল পরে প্রাকৃতিকভাবেই 'সারমেয়' শব্দ কুকুরের অভিধেয় হইয়াছে।

পক্ষান্তরে বলা যাইতে পারে যে, বেদে ও প্রাচীন সাহিত্যে নক্ষত্র-গ্রহাদির নামের সহিত যে জন্তুর সম্বন্ধ না দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে। বেদে ভল্লুকের নামে নক্ষত্রের নাম "ঋক্ষ"* দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্র, শশ ও মৃগের সহিত যোগ হইতে 'শশী' ও 'মৃগাঙ্ক' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মৃগের শিরের সহিত সাদৃশ্য হইতে নক্ষত্রবিশেষের 'মৃগশিরা' নাম হইয়াছে। রাশির নামে যে জন্তু নামের যোগ দেখা যায়, এই প্রকারেই যে তাহার প্রথম সূচনা হইয়াছে তাহা পরিষ্কাররূপেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত জন্তু নামের যোগের মধ্যেও পুরাতত্ত্বের একটী ক্রম পরিলক্ষিত হয়। ভল্লুক, মৃগ, কুকুর প্রভৃতির সহিত প্রথম পরিচিত হওয়াতেই আর্য্যগণ সম্ভবতঃ ইহাদের সহিত সাদৃশ্য দর্শনপূর্ব্বক গ্রহনক্ষত্রের তৎসূচক নামই প্রদান করিয়াছিলেন। সরমা বিশেষরূপে ইন্দ্রের দূতীরূপে বর্ণিত হওয়ায় ইন্দ্রোপাসনার প্রাদুর্ভাব সময়েই যে আর্য্যদিগের দ্বারা গৃহপালিত পশুরূপে কুকুরের ব্যবহার প্রচলিত হয় তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাগুক্ত পর্য্যালোচনা সকল হইতে এক সরমা নামের মধ্যে পুরাতত্ত্বের কত সূত্র যে অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম।

"অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চ নক্তং দদৃশে কুহচিদ্দিরেযুঃ।"

ভারতের সহিত চীনের সম্বন্ধ

(ফা-হিয়েন)

শ্রী গুণালঙ্কার মহাস্থবির

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধগ্রন্থরাজি চীনে নীত হইতে আরম্ভ করে। তৎসমস্ত হইতেই চীনাবাসিগণ বুদ্ধ ও বৌদ্ধ তীর্থস্থানসমূহের বিষয় অবগত হন। ইৎসিং বলেন যে, তাঁহার ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৭০ খৃঃ অব্দে চীনদেশীয় প্রায় ২০ জন লোক চুয়েন-প্রদেশের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের মহাবোধি-বৃক্ষ সন্নিধানে উপনীত হন। মহারাজ শ্রীগুপ্ত তাঁহাদের ও তাঁহাদের দেশবাসিগণের সম্মানার্থ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উহার নাম দেওয়া হয় 'চীন-মন্দির'। ২৯০ খৃঃ অব্দে চু-সি-হিঙ্গ নামে জনৈক চীন-পরিব্রাজক খোতান পর্য্যন্ত গমন করেন। কিছুদিন পরে ফালিঙ্গ নামে আর এক ব্যক্তি উত্তর-ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হন। নিঃসন্দেহে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সেই হইতে আরও কয়েকজন লোক তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ায় ঘটনাক্রমে যে কয়খানি চৈনিকলিপি-সম্বলিত প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই খানির উপর চি-ই ও হোয়ুন নামক দুই জন চীন-পর্য্যটকের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহাদের মধ্যে চি-ই ক একজন ভিক্ষুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় যে, চীন হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিক্ষুগণ তীর্থ-পর্য্যটন-মানসে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, মিলিন্দ-পঞ্হা নামক সুপ্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থেই আমরা সর্ব্বপ্রথম চীন-দেশের এবং ললিত বিস্তর নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সংস্কৃতগ্রন্থেই চীনালিপি হূণ-লিপির উল্লেখ দেখিতে পাই।

চীন-পর্য্যটকগণের মধ্যে শাক্যপুত্র ফা-হিয়ানই সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহা হইতেই সর্ব্বপ্রথম আমরা ধারাবাহিক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হই। সুঙ্গুন ও চাঙ্গ্যুএঃ (হিউয়েন সাং) তাঁহার অনেক পরবর্ত্তী।

চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা

কো-সাঙ্গছুএন নামক চীন-গ্রন্থ পাঠে জানা যায় শাক্যপুত্র (সিঃ) ফা-হিয়ান্ শেন্‌সি প্রদেশের পিঙ্গ্যঙ্গ জেলার অন্তঃপাতী বুয়ঙ্গ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পূর্ব্ব নাম কুঙ্গ, তিনি তিন বৎসর বয়সে শ্রামণের হন, চীনদেশে যে সকল বৌদ্ধগ্রন্থ ছিল না, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিবার মানসে তিনি ৩৯৯ খৃঃ অব্দে কতিপয় সঙ্গী সমভিব্যাহারে স্বদেশ পরিত্যাগ করেন এবং ১৪ বৎসর দেশ-পর্য্যটনে অতিবাহিত করিয়া নান্‌কিনে প্রত্যাগমন করেন, তথায় বুদ্ধভদ্র নামে জনৈক ভারতবর্ষীয় শ্রমণের সাহায্যে অনেক

বৌদ্ধগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। সৌভাগ্যক্রমে ফোকোকি নাম দিয়া তাহার একটি সুন্দর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন, অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। উক্ত ফোকোকি নামক সু-প্রসিদ্ধ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে আমরা খৃষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থাবিষয়ক পশ্চাল্লিখিত সংবাদগুলি প্রাপ্ত হই।

বুচাঙ্গ (উদ্যান) দেশ হইতে আর্য্যাবর্ত্তের সীমা আরম্ভ, তথায় তখন বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় উন্নতির অবস্থা। তথা সর্ব্বশুদ্ধ ৫০০ হীনযানীয় সঙ্ঘারাম ছিল।

বুচাঙ্গ হইতে সুহোতো (স্বাত) দেশ অবস্থিত ছিল, তথায় ও বৌদ্ধধর্ম্ম দৈনন্দিন প্রসার লাভ করিতেছিল।

স্বাত হইতে গান্ধার পূর্ব্বদিকে প্রায় ৫ দিনের পথ, তথাকার অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই মহাযান-মতাবলম্বী ছিলেন।

গান্ধার হইতে চুছশিলো (তক্ষশিলা) পূর্ব্বদিকে প্রায় ৭ দিনের পথ, তথাকার রাজা, প্রজা ও অমাত্য সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন।

গান্ধার হইতে ফোলুষ (পুরষপুর Peshawar) দক্ষিণদিকে প্রায় ৪দিনের পথ। তথায় বৌদ্ধরাজ কনিষ্ক (কিনিকিঅ, কনিক) একটি সুন্দর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র তখনও বিদ্যমান ছিল, ইউ এচিবংশীয় জনৈক বৌদ্ধ-নরপতি ঐ ভিক্ষাপাত্রের জন্য তদ্দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তথায় ৭০০ ভিক্ষু বাস করিতেন।

ফোলুষের ষোল যোজন পশ্চিমে নকি দেশ (নগরহার), তথায় ৭০০ শতাধিক ভিক্ষু বাস করিতেন, তথায় বৌদ্ধ কীর্ত্তিকলাপের সীমা ছিল না।

লোই দেশে (রোহি অর্থাৎ আফ্‌গানিস্থানে) ৩০০০ হীনযানীয় ভিক্ষু ছিলেন।

লোই হইতে পোন (বন্নু) দেশ দক্ষিণদিকে প্রায় ১০ দিনের পথ, তথায় ত্রিসহস্রাধিক হীনযানীয় ভিক্ষু বাস করিতেন, পোন হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে সিন্ধু নদী, উহার পরপারে পিচু (ভিড়) নামে একটি দেশ, তথায় হীনযান ও মহাযান মত বেশ প্রসার লাভ করিতেছিল।

পিচু হইতে মোতুলো (মথুরা) দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে ৮০ যোজনের কিছু কম, যমুনার (পুনার) তীরে ২০ খানি সঙ্ঘারাম ও ৩০০ ভিক্ষু ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা সমধিক উন্নত। মরুভূমির অপর প্রান্তে ভারতবর্ষের দেশসমূহ অবস্থিত। সেখানকার নৃপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। মথুরার দক্ষিণে মধ্যদেশ, তথায় কেহ জীবহত্যা, সুরাপান ও পেঁয়াজ রসুন ব্যবহার করিত না, কেবল চণ্ডালেরা মৃগয়া ও মাংসবিক্রয় করিত। ভিক্ষুগণের বাসস্থানের সন্নিকটে অনেক চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, ভিক্ষুণীরা প্রধানতঃ আনন্দের চৈত্যকে, শ্রামণেরগণ প্রধানতঃ রাহুলের চৈত্যকে, আভিধার্ম্মিকগণ অভিধর্ম্ম-চৈত্যকে, বিনয়ধরগণ বিনয়-চৈত্যকে এবং মহাযানিগণ প্রজ্ঞাপারমিতা, মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরকে পূজা করিতেন।

মথুরা হইতে সাংকাশ্য দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রায় ১৮ যোজন, তথায় শাক্যমুনি বুদ্ধের এবং ব্রহ্মা, শক্র প্রভৃতি দেবতাগণের অনেক চৈত্য বিদ্যমান ছিল। তথায় প্রায় ৯০০০ হীনযানীয় ও মহাযানীয় ভিক্ষু-ভিক্ষুণী বাস করিতেন। তাঁহাদের আহার-বিহারাদি এক সঙ্গে হইত। এই জেলায় আর একটী সঙ্ঘারামে প্রায় ৬০০।৭০০ ভিক্ষু ছিলেন।

সাংকাশ্য হইতে কিজৌই (কনৌজ) দক্ষিণ-পূর্ব্বে ৭ যোজন, গঙ্গার তীরে নগরটী অবস্থিত ছিল। তথায় হীনযানীয় দুইটী সঙ্ঘারাম ছিল।

কনৌজ হইতে ৩ যোজন দক্ষিণে আলো নামক একটী বনপ্রদেশ (আটবী, অটবী)। তথা হইতে ১০ যোজন দক্ষিণ-পূর্ব্বে শাচিদেশ, অন্য তীর্থিক ও ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষা-পরবশ হইয়া বৌদ্ধকীর্ত্তিকলাপ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন। তখনও বৌদ্ধকীর্ত্তিকলাপের অনেক ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান ছিল।

শাচি হইতে ৮ যোজন দক্ষিণে কিউসলো (কোশল) ও উহার রাজধানী শেবেই (শ্রাবস্তী)। তখন শ্রাবস্তী প্রায় জনশূন্য, তথায় ২০০ পরিবারের অধিক অধিবাসী ছিল না। ফা-হিয়ানের পূর্ব্বে তদ্দেশে কেহই আসে নাই, তথায় অনেক বৌদ্ধ-কীর্ত্তিকলাপ বিদ্যমান ছিল, এবং বৌদ্ধ অন্য তীর্থিকের মধ্যে অনেক সংঘর্ষ হইয়াছিল, ও অন্যতীর্থিকগণ পরাজিত হইয়া বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়াছিল। প্রবাদ ছিল যে, তখন জেতবন-বিহারের চতুর্দ্দিকে ৯০ খানি সঙঘারাম ছিল। তন্মধ্যে একটী ভিন্ন অপর গুলির মধ্যে বৌদ্ধভিক্ষু বাস করিতেন। কোশলে তখন ৯৬ সংখ্যক ভিন্ন সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁহারা সকলেই জগৎ-প্রপঞ্চের সত্যতা স্বীকার করিতেন। তাঁহারা সাধারণের নিকট অধিক সম্মান পাইতেন, বৌদ্ধভিক্ষুরাও যে নিতান্ত অনাদর পাইতেন তাহা নহে। দেবদত্তের শিষ্য-সম্প্রদায়ও তথায় বিদ্যমান ছিল। তাহারা শাক্য মুনি বুদ্ধ ভিন্ন বর্ত্তমানকল্পের অপর তিন জন বুদ্ধকে সম্মান করিতেন।

শ্রাবস্তীর ১২ যোজন দক্ষিণপূর্ব্বে নপিক নগর, ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধের জন্মস্থান। তথা হইতে ২ যোজন উত্তরপূর্ব্বে কপিলাবাস্তু, কপিলাবাস্তু তখন রাজশূন্য, প্রজাশূন্য, এক বৃহৎ মরুভূমিতে পরিণত। তখন তথায় কয়েকজন ভিক্ষু ও প্রায় ১০ ঘর বৌদ্ধমাত্র অতীতের সাক্ষিস্বরূপ বিদ্যমান ছিল।

কপিলাবস্তু হইতে ৫ যোজন পূর্ব্বে বুদ্ধের জন্মস্থান লান্‌মো (রামকগ্রাম), রামকগ্রামও তখন প্রায় মরুভূমিতে পরিণত। অধিবাসীর মধ্যে একটি বিহারে কেবল কয়েকজন ভিক্ষু ছিলেন।

রামকগ্রাম হইতে, ১৯ যোজন পূর্ব্বে কুশীনগর হিরণ্যবতী নদীর তীরে অবস্থিত। তথায় অনেক সঙঘারাম ছিল, অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প যে কয় ঘর ছিল, তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন।

কুশীনগর হইতে, প্রায় ১৭ যোজন দক্ষিণ-পূর্ব্বে বৈশালী ও তদুত্তরে মহাযান-বিহার, বৈশালীতে একটি বৌদ্ধসভা হয়। ঐ সভায় ৭০০ স্থবির সম্মিলিত হইয়া "বিনয়পিটক" আলোচনা করেন।

বৈশালীর ৪ যোজন পূর্ব্বে পঞ্চনদীর সঙ্গমস্থল, উহার এক যোজন দক্ষিণে মগধ ও পাটলিপুত্র। তথায় অশোক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তথায় অনেক বৌদ্ধ-কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান ছিল। পাটলিপুত্রে এক সময় রাধাস্বামী (লোতৈসজপিসি) নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাযান মতাবলম্বী ছিলেন, দেশের রাজা প্রজা সকলেই তাহাকে সম্মান করিতেন। অশোকারামের সন্নিধানে একটী মনোহর মহাযানীর সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইয়াছিল, তথায় আর একটী হীনযানীয় বিহারে ৭০০। ৮০০ ভিক্ষু বাস করিতেন। তাঁহাদের আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ ছিল না, নানাদিক্ হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থবিরগণ আসিয়া বাস করিতেন, শিক্ষার্থী শ্রমণ এবং পণ্ডিতগণও এই বিহারে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, মঞ্জুশ্রী নামে এক জন ব্রাহ্মণ উপাধ্যায় বাস করিতেন। দেশের খ্যাতনামা স্থবির ও মহাযানীয় ভিক্ষুগণ তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

পাটলিপুত্রের ৯ যোজন দক্ষিণ-পূর্ব্বে ইন্দ্রশীলগৃহ, তথায় অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তি-কলাপের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান ছিল, ফা-হিয়ানের সময়ে উহা জনপ্রাণীশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

ইন্দ্রশীল হইতে ১৫লি দক্ষিণ-পূর্ব্বে গৃধ্রকূট-পর্ব্বত। উহা হইতে ৩০০ পথ উত্তরে একটী প্রাচীন সহর। তথায় কলন্দবেণুবন-বিহার (সপ্তপর্ণীগুহা), এখানে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর ৫০০ স্থবির সম্মিলিত হইযা বৌদ্ধশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

চেতীর ৪ যোজন পশ্চিমে গয়াসহর, তখন উহা জনপ্রাণীশূন্য, বৌধিমণ্ডপের সন্নিকটে তিনটি সঙ্ঘারামে ভিক্ষুগণ বাস করিতেন। তাঁহারা সকলে বিনয়ানুশাসন রক্ষা করিয়া চলিতেন। গয়ার ৩লি দক্ষিণ কুক্কুটপাদ পর্ব্বত, উহার এক গর্ত্তে কাশ্যপের দেহ সংরক্ষিত ছিল।

বারাণসীতে ঋষিপত্তন মৃগদাবে দুটী সঙ্ঘরামে বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাস করিতেন।

মৃগদাবের ১৩ যোজন উত্তর-পশ্চিমে কৌশাম্বী, তথায় ঘোশিরবন বিহারের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান ছিল। ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে অধিকাংশই হীনযানীয় ছিল, উহার ৮ যোজন পূর্ব্বে কতকগুলি সঙ্ঘরামে প্রায় ১০০ ভিক্ষু বাস করিতেন। তথা হইতে ২০০ যোজন দক্ষিণে তথ্সিন (দক্ষিণ) দেশ। তথায় পোপুয় (পারাবত) নামে কাশ্যপ্ বুদ্ধের এক সুরম্য সঙ্ঘারাম ছিল। উহার বহুদূরে লোকালয়সমূহ অবস্থিত ছিল। তথায় অন্য তীর্থিকগণ বাস করিতেন। তাঁহারা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কিছুই জানিতেন না।

বিনয়-পিটকের অন্বেষণে ফাহিয়ান্ বারাণসী হইতে পুনরায় পাটলীপুত্রে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর-ভারতবর্ষে কোথাও আদি গ্রন্থ না পাইয়া তিনি মধ্যদেশ পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিতে বাধ্য হন। তথায় তিনি এক মহাযানীয় সঙ্ঘারামে মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত বিনয়বিধিগুলি প্রাপ্ত হন। কথিত ছিল, ঐ সকল বিধি ভিক্ষুগণ বুদ্ধের জীবদ্দশায় প্রতিপালন করিতেন। অষ্টাদশ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন বিনয়শাস্ত্র থাকিলেও প্রধান প্রধান বিষয়ে তাঁহারা এক ছিলেন। কেবল কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষাপ্রদ ও আচার নিয়মপক্ষেই তাঁহাদিগের যাহা কিছু পার্থক্য ছিল। (Fio-Kwo-Ki, Ch. XXXVI, page LXX) যাহা হউক, উক্ত মহা-সাংঘিক বিনয়াশাস্ত্রকে সকলে পরিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করিতেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি ৭০০০ গাথা-সম্বলিত আর একখানি বিনয়-শাস্ত্র প্রাপ্ত হন। উহা ভিক্ষুরা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রখানি সর্ব্বাস্তিবাদী ও চৈনিক ভিক্ষুগণ ব্যবহার করিতেন। সর্ব্বাস্তিবাগী ভিক্ষুগণ শাস্ত্রগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিতেন, সুতরাং তাঁহাদের কোন লিখিত পুস্তক তখনও ছিল না। ঐ সম্প্রদায় হইতে চীনা-পরিব্রাজক ৬০০০ গাথা-সমন্বিত সংযুক্তাভিধর্ম্ম-হৃদয়-শাস্ত্র, ২৫০০ গাথা-সমন্বিত নির্ব্বাণ সূত্র এবং ৫০০০ গাথা-সমন্বিত বৈপুল্য-পরিনির্ব্বাণ-সূত্র প্রাপ্ত হন। অপিচ মহাসংঘিক সম্প্রদায়ের একখানি অভিধর্ম্ম-শাস্ত্রও পাওয়া গিয়াছিল। এই কারণে ফাহিয়ান তথায় তিন বৎসর কাল সংস্কৃত-শিক্ষা ও বিনয়পিটক নকল করা কার্য্যে ব্যাপৃত হন। যখন তাওচিঙ্গ মধ্যদেশে আগমন করেন, তিনিও দেখিতে পান যে, তথাকার শ্রমণেরা সুন্দররূপে বিনয়ানুশাসন মানিয়া চলিতেন। মাননীয় ফাহিয়ান বিনয়শাস্ত্রের প্রচার-মানসে একা চীনাভিমুখে প্রত্যাগমন করেন। গঙ্গার মোহনার দিকে ১৫ যোজন গিয়া তিনি চেন্ পো (চম্পায়) উপনীত হন। তথা হইতে ৫০ যোজন পূর্ব্বে তাম্রলিপ্ত-বন্দর সাগর সঙ্গমে অবস্থিত। তথায় ২৪ খানি সংঘারাম ও অনেকজন ভিক্ষু ছিলেন। লোকেরা সচরাচর বৌদ্ধ-ধর্ম্মকেই মানিতেন। ফাহিয়ান তথায় সূত্রাদি নকল ও মূর্ত্তি-চিত্র-অঙ্কনকার্য্যে দুই বৎসর অতিবাহিত করেন।

তাম্রলিপ্ত হইতে বাণিজ্য-পোতের সাহায্যে ফাহিয়ান সিংহলদ্বীপে উপনীত হন। তথায় পূর্ব্বে নাগ ও যক্ষ ব্যতীত কোন জন-মানবের সমাগম ছিল না। কেবল বিভিন্ন দেশ হইতে বণিক্‌গণ বাণিজ্যের জন্য তথায় আগমন করিতেন। দুর্দ্দান্ত নাগ ও যক্ষদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ বুদ্ধ শূন্যপথে তথায় আগমন করেন। তাঁহার পদ-চিহ্নের উপর পরবর্ত্তীকালে ৪৭০ ফিট উচ্চ এবং সুবৃহৎ চৈত্য নির্ম্মিত হয়। উহার পার্শ্বে অভয়গিরি-সংঘারামে ৫০০০ ভিক্ষু বাস করিতেন। সিংহলের লোকেরা বলিতেন যে, তখন তথায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫০। ৬০ হাজার ভিক্ষু বাস করিতেন। দন্তধাতু পূজার ১০ দিন পূর্ব্বে ভেরী-নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করা হইত, "...অসংখ্য জন্মের পর তথাগত নির্ব্বাণ-লাভ করেন। সেই ঘটনা অদ্য হইতে

১৪৯৭ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। লোক-লোচন অন্তর্হিত হওয়ায় জগতের নর-নারী সকলেই শোকে মুহ্যমান হন।" অভয়গিরি হইতে ৪০ লি পূর্ব্বে পোতি (বোধি) বিহার। তথায় ২০০০ ভিক্ষু বাস করিতেন। তন্মধ্যে তমোকিউটি (ধর্ম্মাকোটি বা ধর্ম্মগুপ্ত) নামে জনৈক খ্যাতনামা স্থবিরকে দেশবাসী সকলেই অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।

রাজধানীর ৭ লি দক্ষিণে মহাবিহার। তথায় ৩০০০ ভিক্ষু বাস করিতেন।

ফাহিয়ান সিংহলে দুই বৎসর কাল অবস্থান করেন এবং অন্বেষণ করিতে করিতে মহীশাসক-সম্প্রদায়ের এক খণ্ড বিনয়-পিটক প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি এক এক খণ্ড দীর্ঘাগম, সংযুক্তাগম ও সন্নিপাত-পিটক (সূত্র-পিটক) প্রাপ্ত হন। তৎসমুদয় চীনদেশে তখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। মূলভাষার এই সকল গ্রন্থ লইয়া ফাহিয়ান বাণিজ্য-পোতে আরোহণ করেন। পথিমধ্যে প্রবল বাত্যা উপস্থিত হয়। যখন তরণী অতলে যায় যায়, তখন তিনি একান্তমনে অবলোকিতেশ্বর ও বৌদ্ধসাধুগণের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে আরম্ভ করেন।

৯০ দিনের পর ফাহিয়ান যে-পোতি (যাবা কিংবা সুমাত্রা) দ্বীপে উপনীত হন। তদ্দেশে পাষণ্ড ও ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম সমধিক প্রসারলাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মসম্বন্ধে লোকে বিশেষ কিছু জানিত না। যাবা হইতে পুনরায় বাণিজ্য-পোতে ফাহিয়ান দীর্ঘ প্রবাসের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

কৈবর্ত্তজাতি ও ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণ

শ্রী সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস

বঙ্গদেশে কৈবর্ত্তজাতি একটী গরিষ্ঠ সম্প্রদায়। বঙ্গের পুরাতত্ত্ব-পর্য্যালোচনায় এই জাতির অনেক পুরাবৃত্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গের অধিকাংশ স্থান এই জাতির করতলগত ছিল। বগুড়া জেলার দিব্যক. রুদ্রক ও রাজা ভীম এক সময়ে সমগ্র বরেন্দ্রভূমি অত্যাচারী রাজা ২য় মহীপালের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ময়মনসিংহ জেলায় ভোগবেতালে এই জাতীয় রাজা নবরঙ্গ রায়, বছাই রাজা (রাজা বৎধর), নদীয়া ও যশোহর জেলায় বল্লালসেনের সমসাময়িক লাটদ্বীপ ও কঙ্কদ্বীপের রাজা, মেদিনীপুরের অন্তর্গত তম্‌লুক, সুজামুঠা, তুর্কা, ময়নাগড়ের রাজবংশ, ঢাকা জেলার সাভারের স্বাধীন রাজা হরিশ্চন্দ্র পালের বংশধরগণের অতীত কীর্ত্তিকলাপ আজিও এই জাতির পূর্ব্ব-স্বাধীনতার দেদীপ্যমান প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসকিগণের কৃপাদৃষ্টির অভাবে এই সকল ইতিহাস বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাস-রচনার দিকে অনেকের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। যদি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে হয়, তবে এই জাতির বিবৃতির সহিত সম্বন্ধ রাখিলে প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার হইবে না।

বিগত ২০ বৎসর যাবৎ কৈবর্ত্তজাতির জাতীয় তত্ত্ব-সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। কৈবর্ত্ত শব্দ লইয়াই কত বাক্‌বিতণ্ডা হইয়া গেল। সম্প্রতি, বি, বেনার্জী কোম্পানী শ্রদ্ধেয় শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের সহযোগে পূজনীয় রামকমল তর্কালঙ্কার মহশয়ের "প্রকৃতিবাদ অভিধানের" নূতন সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। এই অভিধানে কে (জলে) বর্ত্ততে ইতি কে— বৃত্‌ + অচ্‌ = কেবর্ত্ত ততঃ স্বার্থে অণ্‌ প্রত্যয়ে কৈবর্ত্তপদ সিদ্ধ করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা ছাত্রমণ্ডলী ও শিক্ষকগণকে ভুল-শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কারণ কে পূর্ব্বক বৃত্‌ ধাতুর উত্তর অচ্‌ প্রত্যয়ের কোন বিধান নাই। গ্রহিনন্দি সূত্রে কেবল ধাতুর উত্তর অচের বিধান আছে। সোপপদ ধাতুর "পচদ্যচ্‌" হওয়ার বিধি নাই। গণনির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন আকৃতিস্থলে কেবল ধাতুর উত্তর অচ্‌ প্রত্যয় হয়। এই জন্যই গঙ্গাধর, ভূধর প্রভৃতি অণ্‌ বাধক স্থলেও মল্লিনাথাদি মহাবৈয়াকরণগণ উক্ত সূত্র দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ধরতি ইতি ধরঃ গঙ্গায়া ধরঃ এইরূপ হইবে। এই জন্যই বর্ত্ততে ইতি বর্ত্ত পচাস্যচ্‌ হইবার পর, ক শব্দ সহ বর্ত্ত শব্দের সমাস করিলে সাধারণ সূত্রানুসারে ৬ষ্ঠী তৎপুরুষে কস্য বর্ত্তঃ কবর্ত্ত পদ হইবে। কবর্ত্ত পদে অণ্‌যোগে কৈবর্ত্ত পদ সিদ্ধ হয় না।

কে—বৃত্ + অচ্ করিয়া অলুক-সমাসও হইতে পারে না। অলুক-অধ্যায়ে কৃদন্ত-বিধির নিয়ম এই যে, কৃৎসূত্র দ্বারা সপ্তম্যন্ত উপপদে ধাতুর উত্তর প্রত্যয় বিহিত হইলে সেই উপপদের সপ্তমীরই অলুক্ হয়। কৃৎসূত্রে আছে "সপ্তম্যাং জলে উ" মনসিজঃ। কাজেই তৎপুরুষে "কৃতি বহুলম্" এই সূত্র দ্বারা মনোজঃ ও মনসিজঃ পদ সিদ্ধ হয়। যখন "কে—বৃত + অচ্" হইবার কোন কৃৎ সূত্রই বর্ত্তমান নাই, তখন সপ্তমীই বা কোথায়? তাহার অলুক্ই বা কিরূপে হইবে?

প্রকৃত প্রস্তাবে কিম্ শব্দ সহ অজন্ত বর্ত্তের সমানাধিকরণ সমাস হইবার পর অণ্‌যোগে কৈবর্ত্ত পদ হইয়াছে, অতএব বৃত ধাতু অচ্ = বর্ত্ত, কিম্ + বর্ত্ত = কিম্বর্ত্ত, কিম্বর্ত্ত + অণ্ = কৈবর্ত্তঃ ... ... (১) অথবা—

কিংবৃত্ত + অণ্ = কৈবর্ত্ত ... ... (২) জগদ্বিখ্যাত বটলিঙ্ক ও রথ প্রকাশিত সংস্কৃত-জর্ম্মাণ অভিধানে কিম্বর্ত্ত + অণ্ প্রত্যয় করিয়া কৈবর্ত্ত পদ সিদ্ধ করা হইয়াছে।

আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি শব্দের ন্যায় কিম্বর্ত্ত বা কৈবর্ত্ত শব্দও স্থানবাচক। কিম্বর্ত্ত বা কৈবর্ত্ত-দেশের রাজন্যগণ কৈবর্ত্ত নামে খ্যাত।

আমরা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিতেছি না। ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণ নামে একখানি পুরাণ মান্দ্রাজদেশে অনেক স্থানে আছে। ঐ গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। ঐ পুরাণের ৪ চারি খণ্ড মান্দ্রাজ-সরকারী-লাইব্রেরীতে আছে। একখানি তাঞ্জৌর রাজার লাইব্রেরীতে আছে। আমরা পত্র বিনিময়ে জানিয়াছি, ঐ পুরাণখানি উক্ত দুই স্থানেই সুরক্ষিত অবস্থাতে আছে। তাঞ্জৌর রাজবাটী হইতে নকল করিয়া আনান যাইতে পারে। ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণের কৈবর্ত্ত শব্দের সহিত বঙ্গবাসীকর্ত্তৃক ব্যবহৃত কৈবর্ত্ত শব্দের ঐক্য আছে। কৈবর্ত্ত অর্থ যে "কে (জলে) বর্ত্ততে" নহে, তাহা এই পুরাণখানির দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়। ঐ পুরাণখানির প্রতিপাদ্য-বিষয় কতকগুলি স্থানের মাহাত্ম্য-বর্ণন। ইহাতেই বুঝা গেল, কৈবর্ত্ত স্থানবাচক শব্দ।

জর্ম্মনীর লিপজিগ হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত-হস্তলিপি গ্রন্থের যে সুবৃহৎ ক্যাটালগ আছে, তাহাতে দেখা যায়, ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে।

১. উশীরবন-মাহাত্ম্য
২. কাশীকেদার-মাহাত্ম্য
৩. কাশী-মাহাত্ম্য
৪. চম্পকারণ্য-মাহাত্ম্য
৫. জল্পেশ্বর-মাহাত্ম্য
৬. তুলাকাবেরী-মাহাত্ম্য
৭. দুর্গাপুরী-মাহাত্ম্য
৮. দেবীপুরী-মাহাত্ম্য
৯. পঞ্চনদ-মাহাত্ম্য
১০. পুষ্পবন-মাহাত্ম্য
১১. বৃদ্ধগিরি-মাহাত্ম্য
১২. বেতাল-কবচ
১৩. বেদারণ্য-মাহাত্ম্য
১৪. শ্বেতারণ্য-মাহাত্ম্য
১৫. সুবর্ণ-স্থান
১৬. স্বামিগিরি-মাহাত্ম্য

এই গুলি সমস্তই স্থানের নাম। এই সকল স্থান লইয়াই ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণ। সুতরাং ব্রহ্মকৈবর্ত্ত স্থানের নাম হইতেছে। এই কৈবর্ত্ত শব্দ সহিত কৈবর্ত্তজাতির নামগত সাম্য আছে। ইহাতেই বোধ হয়, কৈবর্ত্ত শব্দের অর্থ কিম্বর্ত্ত বা কৈবর্ত্তবাসী রাজন্যগণ। যেমন কাম্বোজ, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশনামী জাতি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যদি পুরাণ খানির নকল আনাইতে পারেন, তবে কৈবর্ত্ত জাতির তত্ত্বানুসন্ধানে অনেক প্রকৃত কথা বাহির হইতে পারে। উহার মুদ্রণের ব্যয়ও বঙ্গীয় মাহিত্য-সমাজ আংশিক বহন করিতে পারেন।

ঐ পুরাণখানি যেখানে যে অবস্থায় আছে, তাহাও আমরা মান্দ্রাজ প্রাচ্য-হস্তলিপির পুস্তকালয় ও তাঞ্জোর রাজবাটীর পত্রে অবগত আছি।*

* There are four copies in the Government Oriental Ms. library, Madras,—being Nos 2141-2144 of the Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts. Vol. IV. pt. I
In Rajah's Library, Tanjore, there is one Ms. (Burnell's Catalogue, p. 180)

শুক্লী জাতির বিবরণ

শ্রী ব্রজনাথ চন্দ

মেদিনীপুর জেলায় কতকগুলি অনন্য-সাধারণ জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শুক্লী জাতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই "শুক্লী" নামটি বঙ্গদেশীয় জাতিবাচক শব্দ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; ইহা তৈলিক, তাম্বুলিক প্রভৃতি শব্দের ন্যায় ব্যবসা-সূচক বা বঙ্গদেশীয় কোন জাতিবাচক শব্দের অপভ্রংশও নহে। তবে এ দেশীয় এক কৃষক-সম্প্রদায়ের এইরূপ কর্কশ নাম গ্রহণের আবশ্যকতা কি?

মেদিনীপুর জেলার শুক্লীগণ আপনাদিগকে শোলাঙ্কী-ক্ষত্রিয়গণের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন ও তাঁহারা পশ্চিমদেশ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া যে বাস করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ-বাক্য হইতে বিশেষরূপে বিশ্বাস করেন। পরলোকগত রিসলি মহোদয় তাঁহার Tribes and Castes of Bengal নামক গ্রন্থে এই প্রবাদ-বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন ও সময়াদি সংবাদপত্রে উক্ত প্রবাদ-বাক্য-মূলে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই জাতির একটী পুরাতন কুলজী পুস্তক ও কয়েকটী তাম্রশাসন প্রকাশিত হইয়া এই জাতির ইতিহাস-সম্বন্ধে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। সময়ে সময়ে ক্ষত্রিয়গণ কিরূপে বঙ্গদেশে শূদ্রভাবাপন্ন হইয়াছেন, এই জাতি তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

ইহাদিগের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কতকগুলি শোলাঙ্কি-রাজপুত যবনদিগের ভয়ঙ্কর অত্যাচারে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া জগন্নাথদেবের দর্শনকরত মেদিনীপুর জেলায় কেদারকুণ্ড পরগণাতে বাস করিয়াছিলেন ও তথায় চাপলেশ্বর মহাদেবের পূজা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে স্থানে গড় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের দলপতি বীরসিংহের নামানুসারে বীরসিংহপুর নামে অভিহিত হইতেছে। বীরসিংহের বংশধরগণ কালক্রমে মাইতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া উক্তগ্রামে বাস করিতেছেন এবং এখনও ইহারা এই জাতির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কুলজী পুস্তকে ইঁহাদের আগমন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"সিদ্ধকুণ্ডে যাব সবে হইল একমন।
ব্রহ্মচারী বেশে দেখা দিল ত্রিলোচন।।
সবংশ সহিত যে পড়িল পদতলে।
সর্ব্বজয় হউক বলি সদানন্দ তুলে।।
গলে বস্ত্র দিয়া যে রহিল যোড় করে।

পূর্ব্ব-কেদারে যাব সমুদ্র-ভিতরে।।
কেদারে যাইয়া বাছা আমা উদয় দিবে।
দেবতাপূজিত লিঙ্গ তথায় পূজিবে।।
সেখানের প্রজাগণ পলাইয়া গেছে।

* * * *

অযোধ্যায় ভাইয়ের চরণে প্রণমিল।
সীতারাম লক্ষ্মণ হনুকে বন্দিল।।
কাশীপুরে বিশ্বনাথের চরণ কৈল পূজা।
সদয় হইয়া বর দিল দেবরাজা।।
সেখান হইতে সবে গয়াভূমে গেল।
পিতার উদ্দেশ হেতু কুশহস্ত হইল।।
ব্রহ্মবংশ-চূড়ামণি পুরোহিত তথা।
পত্রে লিখিয়া দিল পিণ্ডের ব্যবস্থা।।
যজ্ঞেতে আমার জন্ম জানিবে কারণ।
তাহা বুঝি কৈল বিপ্র মন্ত্র আবাহন।।
যজ্ঞের লক্ষ্মণ সব বর্ত্তমান হৈয়া।
বসিলেন পিণ্ডদানে চৌদিকে বেড়িয়া।।
দ্বিজরূপে বসিয়াছেন দেব বিশ্বনাথ।
দেখ দেখ তোমাদের পিতা যে সাক্ষাৎ।।

* * * *

কেদারে আসিতে লোক আইল বহুতর।
কোথা হইতে আসিলেন দেখি মহাশূর।।
ব্রাহ্মণ সজ্জন কিবা ভব্য মহাজন।
কেদারে রহিবে কিবা যাবে অন্য স্থান।।
যজ্ঞমল্ল কহেন দেবের উদয় দিব।
পশ্চিম কেদারে থাকি এ কেদারে রব।।"

উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশ হইতে ইঁহারা যে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ও ইঁহারা পরম শৈব ছিলেন বলিয়া মহাদেবকে যে, ইঁহারা আদি-পুরুষ বলিয়া মনে করিতেন, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহাঁরা যে শুলকি নামে পরিচিত ছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যায়। ব্রহ্মচারী মল্লদিগকে নিম্নলিখিতরূপে বলিতেছেন যথা ঃ—

"রত্নগ্রাম হতে তোমা এদেশে পাঠালে।
সে কেদারের নিত্য বাপু এ কেদারে পাবে।।
* * * *
দানচন্দ্র জমিদার সেই দেশে ছিল।
বল কর‍্যা রামচন্দ্র তারে ধর‍্যা নিল।।
তাঁহারে সংগ্রাম করি বিরোধ মিটিলে।
দুই জনে শুলাকি নৃপে কন্যাগণ দিলে।।"

এই শুলাকি যে শোলাঙ্কি শব্দের অপভ্রংশ তাহাতে সন্দেহ করিবার আর কি আছে? মহাভবিষ্যপুরাণে অর্ব্বুদ-শিখরে ত্রিবেদী শুক্ল, প্রমার, পুরিহর ও চৌহানের সহিত কুণ্ড হইতে সমুৎপন্ন হইয়া কিরূপে দ্বারকা-নগরীতে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে যথা ঃ "অগ্নিদ্বারেণ প্রষযৌ সশুক্লোহর্ব্বুদ পর্ব্বতে।।
জিত্বা বৌদ্ধান্ দ্বিজৈঃ সার্দ্ধং ত্রিভিরণ্যেঃ সবন্ধুভিঃ।
দ্বারকাং কারয়ামাস কৃষ্ণস্য কৃপয়া হি সঃ।।"

এই শুক্লই শোলাঙ্কীদিগের আদি-পুরুষ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব* কর্ত্তৃক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত তালচেরে প্রাপ্ত কুলস্তম্ভ দেশের তাম্রশাসনে এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে ঃ

১. ওঁ স্বস্তি ত্রিভুবনবিদিতে শূল্কীকাংশবংশভূষণো রাজা
২. ওম সিতকাঞ্চন সুভন নিজ ভুজব্রজ বিনির্জ্জিত দুর্দ্ধর বৈরীবারণ গিরী
৩. যাজ্জাতং সতো মহানৃপতি শ্রীমৎ বিক্রমাদিত্য পরম নামধীপ যু
৮. গলো নীর্মলকরবাল কিরণ কলাপ ভাসুরো কেদালাধিবাসী
৯. শ্রীস্তম্ভেশ্বরী লব্ধবরপ্রভাবে। মহানুভাবঃ পরম মাহেশ্বরো
১২. শ্রীকুলস্তম্ভরাসকঃ কুলশা।

ইহাতে কুলস্তম্ভদেব শুক্লীকাংশবংশভূষণ, গিরীশ অর্থাৎ শিব হইতে উৎপন্ন ও কেদালাধিবাসী বলিয়া বর্ণিত আছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটী পত্রিকায় শুক্লীবংশের দুইখানি তাম্রশাসন প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই শুক্লীবংশ দাক্ষিণাত্যের প্রাচ্য-চালুক্যবংশের এক শাখা। তাঁহার সম্পাদিত উভয় তাম্রশাসন পুরীধামের রাঘবমঠ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই উভয় তাম্রশাসনের বর্ণনাতে লিখিত আছে ঃ

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ডে এই শুক্লীজাতির পূর্ব্ব ইতিহাস সবিস্তার প্রদত্ত হইয়াছে।

"স্তম্ভেশ্বরী লব্ধবর প্রদাদ শুল্কীকুলভূপ ক্ষিতিপ্রখ্যাত শ্রীমান্ কুলস্তম্ভদেবঃ কেদালো ...কচ্ছদেবঃ।" এই বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্তম্ভেশ্বরী। বোধ হয়, দাক্ষিণাত্যে চালুক্যবংশের গৌরব-রবি অস্তমিত হইলে এই বংশের কোন কোন মহাত্মা উৎকলের নিরাপদ পার্ব্বত্য-প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহারা শুল্কী বা শুল্কিক ও তাঁহাদের অধিষ্ঠান-ভূমি কেদাল বা কেদার নামে অভিহিত হইয়াছিল। মেদিনীপুর জেলাতেও ইহারা যে অংশে বাস করেন, তাহা অদ্যাপি 'কেদারকুণ্ড' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

কুলজী পুস্তকে উল্লিখিত আছে যে, সমাগত শোলাঙ্কীদিগের মধ্যে তেরজন প্রধান মল্ল বাঙ্গালার কোন রাজা জয়েন্দ্রভূপতির ঔরসজাত তের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুলজী পুস্তকে এই মল্লদিগের ও কন্যাগণের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই কন্যাগণের গর্ভজাত পুত্রগণেরও একটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে ও পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহারা কেদারকুণ্ড পরগণায় যে যে স্থানে বাস করেন তাহাও প্রদত্ত হইয়াছে। সেই গ্রামগুলি এখনও কেদারকুণ্ড পরগণাতে বর্ত্তমান।

ইঁহারা মেদিনীপুরে আসিয়া আপনাদিগের সামন্ত-প্রথা পরিত্যাগ করেন নাই। রাজার অধীনে 'ভাই' উপাধিধারী দ্বাদশজন সামন্ত থাকিতেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের অধীনে ছয় জন করিয়া সামন্ত থাকিতেন ও যুদ্ধকালে ইঁহারা যে যাহার দল লইয়া যুদ্ধার্থে বহির্গত হইতেন। যথা ঃ

"এবে কই মন দিয়া শুনহ বিচার।
বার জন বাহাত্তর জনের লহ ভার।।
* * * *
রায় রামানন্দ জীতা রাগি রঘু পটল।
হিন্দাই ছাড়িয়া হৈল শাসমল্লের দল।।"

এই বার-ঘরি, বাহাত্তর-ঘরি বিভাগ এখনও এই সমাজে বিলুপ্ত হয় নাই। শোলাঙ্কিগণ এদেশে আসিয়া বহু দুর্দ্দান্ত দস্যু ও রাজগণকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া দেশে শান্তি-স্থাপন করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা-রাজের করদ-রাজগণের সহিত ইঁহাদের বন্ধুত্ব ছিল। সবঙ্গের পড়িছাগণ উড়িষ্যা-রাজের নিকট হইতে কেদারকুণ্ডু পরগণার সনন্দ আনাইয়া দিয়াছিলেন। চাপলেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ-কালে নারায়ণগড়ের রাজা প্রস্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি বিবরণ কুলজী-পুস্তকে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। এই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উড়িষ্যা রাজ্যের উত্তরসীমারক্ষার্থ এই শোলাঙ্কিগণ কেদারকুণ্ডু পরগণা জাইগিরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পরগণা হইতে তাঁহাদের আবার কিরূপে পুনরুচ্ছেদ হইল তাহা আর পাওয়া যায় নাই। সীমান্ত-রক্ষার জন্য মুসলমান-সংঘর্ষই যে ইহার প্রধান

কারণ তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এই সংঘর্ষে শোলাঙ্কিদল সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বীর হইয়াছিল। স্ত্রীলোক ও বালকগণ প্রাণ ও ধর্ম্মরক্ষার্থ আত্ম-সংগোপন করিয়াছিলেন। হতাবশিষ্টগণ আপন আপন ক্ষত্রিয়-চিহ্নসমূহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যে স্থানে এই মহাশোকাবহ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি 'সূতছাড়া' নামে অভিহিত হইয়া এ শোচনীয় ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দলপতি উদেরাজ বীরসিংহের রাণী সুভদ্রা সবঙ্গের পড়িছাদিগের নিকট আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তাহারা রাণীর ও তাঁহার আশ্রিতবর্গের বাসাদি-হেতু পঞ্চাশ বিঘা ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভূমি এক্ষণে 'বাড়-সুভদ্রা' নামে খ্যাত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ সবঙ্গগ্রামের একাংশেই বর্ত্তমান। এই গ্রামটীতে এখনও অধিকাংশই শোলাঙ্কিদিগের বাস দৃষ্ট হয় এবং ইহা এখনও শোলঙ্কী-রাজের অমাত্যবংশীয়দিগের হস্তগত রহিয়াছে। এই গ্রামের মধ্যে একটী উচ্চ ভূমিতে অনেক সময় স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা ও পুরাতন ইষ্টকাদি পাওয়া যায়। বোধ হয়, এইখানেই সুভুরাণীর বাসস্থান ছিল। এইরূপে রাজর্ষি শুঙ্কের বংশ-সম্ভূত একদল ক্ষত্রিয় এই সুদূর বঙ্গে একটী কৃষিজীবী-জাতিরূপে পরিণত হইয়াছেন।